ভাওয়ালের

ষড়যন্ত্র

(রাজবংশের ইতিহাস, মামলার বিবরণ
ও সম্পূর্ণ রায়)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস
সম্পাদিত

১ম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল

উৎসর্গ

অশান্তির তুমুল ঝড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে যখন আমি ভিক্ষা করি ঈশ্বরের করুণা—সংসারের শোক, তাপ, জ্বালা জুড়াতে, চরিত্রগঠনের সহায়তায় যখন ডুবে যাই গভীর চিন্তা-সাগরে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যানে—তখনই আমার মানস-পটে ফুটে ওঠো, ওগো আমার মা—জীবন্ত প্রতিমা! তোমার অভয় হস্ত আমার মাথায় রেখে যেন আশীর্ব্বাদ কর, "কি ভয় তোর কি ভয়?" দেশের কাজে যখন থাকি কারাগারে সেই অন্ধকারেও দেখি তুমি আছ দাঁড়িয়ে, আর শুনি তোমার অভয়বাণী,—"ওরে আমার সন্তান, বীরের মত তোর শির যেন চিরদিন উন্নত থাকে।" ওগো আমার মা! তোমার বুকে-পিঠে মানুষ, স্নেহ-সুধাধারা পেয়ে ধন্য—আমি তোমার সেই ছেলে—যার পড়াশুনা সেদিন বন্ধ হ'ল দেখে তোমার চোখের জল পড়েছিল ঝরে'—তোমার মত মা পেয়ে সেই অমি ভাগ্যবান সন্তান আজ সাধ করে' দিচ্ছি একটা ক্ষুদ্র উপহার তোমার হাতে তুলে—জানি তা আদর করেই নিচ্ছ—আর তারই সঙ্গে দিচ্ছি আমার মাথাটা তোমার পায়ের তলায় নোয়ায়ে।

তোমার বড় ছেলে—

"নগেন"

সন্ন্যাসী রাজা

নিবেদন

আনন্দবাজার পত্রিকায় যেদিন হইতে আমি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা পড়িতে আরম্ভ করি—উভয় পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দেখিয়া—আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল, বাদী সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার—রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জীর জেরা ও সওয়াল পাঠ করিয়া আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল, তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং জজ বাহাদুরকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন, বাদী সন্ন্যাসীবেশে মধ্যমকুমার জীবিত। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল এই মামলা আদ্যোপান্ত ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিয়া সুবিজ্ঞ প্রবীণ জজ যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সওয়াল শেষ হইবার পর—রায় বাহির হইবার নির্দ্দিষ্ট তারিখের বহু পূর্ব্ব হইতে আমি "রাণী-সন্ন্যাসীর লড়াই" সিরিজ (কবিতা গল্প ও নাটক প্রভৃতি) পুস্তিকা সকল একে একে বাহির করিতে থাকি—জন-সমাজ এই ক্ষুদ্র লেখকের ৶১০ পয়সা মূল্যের পুস্তিকা সকল ক্রয় করিয়া যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র আমি আশাতীত সাফল্য লাভই করি নাই—অধিকাংশ ব্যক্তিই যে সন্ন্যাসীকে রাজাসনে বসিতে দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের এই মনোভাবও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি

সন্ন্যাসীর জয় দেখিতে চাহিয়াছিলাম—রায় পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি—দেশবাসীও আনন্দিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার পুস্তিকা সকলের পাঠক-পাঠিকারা শুদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা আমাকে ভাওয়াল মামলার বিবরণ ও সম্পূর্ণ রায় সমেত একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত করিবার জন্য এতদূর বিরক্ত করিয়াছেন যে, আমি বাধ্য হইয়া নিজেকে অক্ষম জানিয়াও সেই মস্তবড় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। পুস্তকখানির নাম দিলাম "ভাওয়ালের ষড়যন্ত্র।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দরিদ্রের সাধ মিটিল না—পুস্তক-খানির কলেবর যে প্রকার দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা ছিল, অর্থাভাব বশতঃ তাহা করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য দীন সম্পাদকের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। তাড়াতাড়ি পুস্তকখানি বাহির করিতে স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ দোষ থাকিলেও আশা করি সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি—

চাঁপাপুকুর—২৪ পরগণা। বিনীত—

আশ্বিন—১৩৪৩ সাল। "সম্পাদক"

রাজা কালীনারায়ণ রায়

ভাওয়ালের

ষড়যন্ত্র

রাজবংশের ইতিহাস

ঢাকা ও মৈমনসিং জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল একটী প্রাচীন পরগণা। শোনা যায়, ভাওয়াল গাজী নামক একজন পাঠান জমিদারের নামানুসারে ঐ পরগণার নাম ভাওয়াল হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাওয়ালের রাজধানীর মান জয়দেবপুর—পূর্ব্বে ইহা পীড়াবাড়ী নামে একটী গ্রাম ছিল। জমিদার জয়দেবনারায়ণের নামানুসারেই এই জয়দেবপুর নামকরণ হইয়াছে।

জয়দেবনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম ইন্দ্রনারায়ণ রায়। ইন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র বিজয়নারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও কীর্ত্তি-নারায়ণ। চন্দ্রনারায়ণ রায়, উদয়নারায়ণ নামে এক পুত্র রাখিয়া বিজয়নারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। বিজয়নারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়েন। কীর্ত্তিনারায়ণের তিন পুত্র ছিল—তাহাদের নাম হরিনারায়ণ,

নরনারায়ণ ও লোকনারায়ণ। মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ জ্ঞাতি বিরোধে বিষ প্রয়োগে নিহত হইলে উদয়-নারায়ণের পুত্র রাজনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক জমিদারীর শাসন সংরক্ষিত হয়। রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত লোকনারায়ণ রায় জমিদারীর কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। লোক-নারায়ণের পত্নীর নাম সিদ্ধেশ্বরী দেবী।

স্বামীর মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বরী দেবী নাবালক পুত্র গোলক নারায়ণকে লইয়া একেবারে বিপদ-জালে জড়াইয়া পড়িয়া-ছিলেন। জ্ঞাতি শত্রুরাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া-ছিলেন। নারায়ণদাস বাবু নামে কোর্ট-অব ওয়ার্ডসের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র এক ব্যক্তিই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে অধিক যত্নবান ছিলেন—তিনিই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম। এই নারায়ণদাসবাবু, সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও তাঁহার নাবালক পুত্রের উপর যথেষ্ট অত্যাচারে করিয়া তাঁহার অংশ বাকী রাজস্বের দায়ে ক্রোক করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা মহনুভব রাজপুরুষদের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার অংশ ক্রোক বিমুক্ত হয়।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুত্র গোলকনারায়ণ সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সংসারে উদাসীন, সর্ব্বদাই সাংসারিক ব্যাপার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কাজেই সিদ্ধেশ্বরী দেবী গোলকনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণকে অল্পবয়স হইতেই জমিদারী শাসন বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। কি কি গুণ থাকিলে মানুষ প্রকৃতই রাজা নামের যোগ্য হইতে পারে,

সিদ্ধেশ্বরী দেবীই এ শিক্ষা তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাই পরবর্ত্তীকালে তিনি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং মহামান্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই কালীনারায়ণের বংশ-ধরেরাই ভাওয়ালের রাজবংশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

রাজা কালীনারায়ণের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১২৬৫ সনে। তিনি ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এমন কি উত্তম বক্তৃতা করিতেও পারিতেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় তাঁহার যে বিশেষ অধিকার ছিল—তাহার নিদর্শন তিনি স্বয়ং রাজবিলাস নামে জয়দেবপুরের প্রাসাদ ও জলের কল ইত্যাদি নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি চিত্র-বিদ্যা ও ফটোগ্রাফি কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। গীত বাদ্যে তাঁহার মত ওস্তাদ খুব কমই দেখা যাইত। দেশ বিদেশ হইতে বিখ্যাত বিখ্যাত ওস্তাদেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। জয়দেপুর ও কালীগঞ্জে দুইটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। জনহিতকর কার্য্যে ইনি মুক্ত-হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন। ১৩০৮ সনের বৈশাখ মাসে ৪১ বৎসর বয়সে রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা রাণী সত্যভামা দেবী, বনিতা রাণী বিলাসমণি দেবী, এবং তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

বংশ-তালিকা

জয়দেবনারায়ণ রায়

|

ইন্দ্রনারায়ণ রায়

|

কীর্ত্তিনারায়ণ রায়

লোকনারায়ণ রায় (পত্নী—সিদ্ধেশ্বরী দেবী)

|

গোলকনারায়ণ রায়

পত্নী—চন্দ্রকলা দেবী (নিঃসন্তান)

—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী

|

—নীলমণি দেবী

|

—স্বর্ণময়ী দেবী

|

—কলমকামিনী দেবী

কালীনারায়ণ রায় (পরে রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী
নামে পরিচিত)

পত্নী—১ম—ব্রহ্মময়ী দেবী (নিঃসন্তান)

২য়—রাণী জয়মণি দেবী (নিঃসন্তান)

৩য়—রাণী সত্যভামা দেবী

|

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

পত্নী—রাণী বিলাসমণি)

কৃপাময়ী দেবী—স্বামী বিলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ও কন্যাগণ)

(১) ইন্দুময়ী দেবী—স্বামী গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এম-এ, বি-এল।

(২) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—স্বামী জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৩) রণেন্দ্রনারায়ণ রায় (মৃত)—পত্নী সরযুবালা দেবী

(৪) **রমেন্দ্রনারায়ণ রায়** (?)—পত্নী বিভাবতী দেবী

(৫) তড়িন্ময়ী দেবী—স্বামী ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬) রবীন্দ্রনারায়ণ (মৃত)—পত্নী আনন্দ কুমারী দেবী
কুমার রামনারায়ণ রায় (দত্তক পুত্র—
আনন্দ কুমারীর ভ্রাতুষ্পুত্র)

— —

ভাওয়াল

মামলার বিবরণ

রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম বিলাসমণি। রাজকুমারেরা কেহই বিদ্যালাভ করিয়া সুপণ্ডিত হইতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রণেন্দ্র-নারায়ণ সামান্য বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ রাজকুমার রবীন্দ্রনারায়ণের পাঠাভ্যাসে আদৌ মন ছিল না—কোন প্রকারে নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছিলেন মাত্র। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ইন্দুময়ী দেবী, তাঁহার স্বামীর নাম গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি, এল। মধ্যমা রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, স্বামীর নাম জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী তড়িন্ময়ী দেবী, স্বামীর নাম ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজকুমারেরা বিবাহিত হইলেন। বড় রাজবধূর নাম সরযূবালা দেবী, মধ্যমার নাম বিভাবতী দেবী এবং কনিষ্ঠার নাম আনন্দকুমারী দেবী। মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। তিনি বনে জঙ্গলে বাঘ ভালুক শিকার করিতেন। তাঁহার একটা চিড়িয়াখানা ছিল, সেখানে অনেক প্রকার প্রাণী প্রতিপালন করিতেন। কলিকাতার নিকটস্থ উত্তরপাড়ার রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের

ভাগিনেয়ী বিভাবতীকে মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ১৩০৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ করেন। তখন মধ্যমকুমারের বয়স আঠারো উনিশ বৎসর এবং বিভাবতীর বয়স তেরো বছর মাত্র। মেজকুমারের চরিত্র ভাল ছিল না, তিনি উপদংশ আদি কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি সপরিবারে দার্জ্জিলিংএ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে শৈল-নিবাসে গিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী বিভাবতী, বিভাবতীর বড় ভাই সত্যেন্দ্র বানার্জ্জি, আশু ডাক্তার (পারিবারিক চিকিৎসক), মুকুন্দ গুণ, কুমারের কেরাণী বীরেন বানার্জ্জি আরও দুই একটী কেরাণী, চাকর, চাকরাণী, দ্বারবান প্রভৃতি।

কুমারের পিতা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩০৮ সনে ১৩ই বৈশাখ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তাঁহার জননী রাণী বিলাসমণিও ১৩১৩ সনে ৭ই মাঘ মারা যান। কুমার যখন দার্জ্জিলিংএ যান, তখন তাঁহার পিতা বা মাতা কেহই জীবিত ছিলেন না। কুমারের বিধবা বৃদ্ধা পিতামহী রাণী সত্যভামা দেবী জীবিতা ছিলেন। তিনি এবং কুমারের মধ্যমা ভগিনী কুমারের সহিত দার্জ্জিলিংএ যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কুমারের শ্যালক সত্য বাবু দার্জ্জিলিংএ বাসা ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, সে বাসা ছোট সেখানে বিধবাদের থাকিবার বিশেষ অসুবিধা আছে। কাজেই তাঁহাদের যাওয়া হইল না।

দার্জ্জিলিং গিয়া কুমার চৌদ্দ পনরো দিন ভালই ছিলেন। তাহার পরে কুমারের অসুখ হয়। রাত্রে পেট কাঁপিয়াছিল। পরদিন পারিবারিক চিকিৎসক আশু ডাক্তারকে তিনি সে কথা

বলিলেন। আশু ডাক্তার তখনই একজন সাহেব ডাক্তার ডাকিয়া আনে। ডাক্তার রোগী দেখিয়া ঔষধ দেন। কুমার সে ঔষধ খাইলেন। পরের দিনও সাহেব ডাক্তারের ঔষধ খাইলেন। কিন্তু কুমারের কোন উপকার হইল না। তাহার পরে আশু ডাক্তার রাত্রে একটা কাচের গ্লাসে করিয়া তাঁহাকে কি একটা ঔষধ দিল। ঔষধ খাইবার তিন চারি ঘণ্টা পরে কুমারের বুক জ্বালা করিতে লাগিল—বমি হইল—শরীর ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করিল। কুমার নাকি সে সময় বলিয়াছিলেন, "আশু! কি ঔষধ আমাকে তুমি খাওয়াইলে?" কুমার যন্ত্রনায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে আর কোন ডাক্তার আসে নাই। তাহার পর দিবস কুমারের রক্ত বাহ্য হইতে লাগিল—শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বাহ্যে খুব ঘন ঘন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ কুমার চৈতন্য হারাইয়া ফেলিলেন। সেই চৈতন্য লোপের সঙ্গে সঙ্গেই নাকি তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেল। এই ঘটনা ৯০৯ খৃঃ ৮ই মে মধ্য রাত্রির সময় ঘটিয়াছিল।

কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে আশু ডাক্তার, সত্য বানার্জ্জি প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে কুমারের অত্যন্ত উদর বেদনা, রক্তমিশ্রিত ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হইতেছিল। সে সময় সাহেব ডাক্তার ক্যালভার্টকে আর ডাকা হয় নাই। তবে কুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডা: ক্যালভার্ট উপস্থিত হয়েন। তিনি পাঁচ সাত মিনিটকাল কুমারের হৃদযন্ত্র, শিরা, তলপেট এবং শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া বলেন, কুমারের

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়

মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর, ডাঃ নিবারণ সেন কুমারকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে দেখিতে পান। এইভাবে কুমারের জীবনলীলা সমাপ্ত হয়। মধ্যরাত্রিতে কুমারের মৃত্যু হয়, পরদিন প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কুমারের মৃতদেহ ঐ ঘরে ছিল। তাহার পর, মৃতদেহ নীচের তলায় লইয়া যাইয়া খাটিয়াতে রাখা হয় এবং শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় কুমারের দেহ চিতার আগুণে ভস্মীভূত করা হয়।

কিন্তু অপরাপর অনেক লোকের বিবরণে পাওয়া যায়, সন্ধ্যার পরেই কুমারের মৃত্যু ঘটে এবং লোকজন সংগ্রহ করিয়া সেই রাত্রিকালেই কুমারের মৃতদেহ দার্জ্জিলিংএর শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া লোকে উচ্চকণ্ঠে হরিবোল দিতে থাকে। ঠিক সেই সময় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হয়। লোকজন শ্মশানে থাকিতে না পারিয়া মৃতদেহ খাটিয়ার উপর ফেলিয়া রাখিয়া আশ্রয়ের জন্য দূরে চলিয়া যায়। তাহার পর, ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেলে তাহারা পুনরায় শ্মশানে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, আশ্চর্য্য ব্যাপার! শব খাটিয়া হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সকলেই ভাবিতে লাগিল, কি হইল, কোথায় গেল সে শব? কেহ বলিল, হয়ত বন্য শেয়াল বা নেকড়ে টানিয়া বনের ভিতর লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন সে মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করাও দায়, অথচ এমন ঘটনা জনসমাজে গিয়া তাহারা প্রকাশ করেই বা কি করিয়া। তখন তাহারা একটা কৌশল অবলম্বন করিল।

কোথা হইতে একটা মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শ্মশানে চিতার উপর শায়িত করিল এবং তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিল।, তাহার পর কুমারের শব বলিয়া তাহাই জ্বালাইয়া দিল।

অবিলম্বে বিধবা রাণী বিভাবতী দেশে ফিরিয়া আসিয়া শাস্ত্রসঙ্গতভাবে কুমারের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মেজকুমার দার্জ্জিলিংএ মরিয়া গিয়াছেন, সকলেই ইহা অবগত হইলেন। কিন্তু গুপ্ত রহস্য চিরস্থায়ী ভাবে ঢাকিয়া রাখা অসম্ভব। যাহারা সব সত্য ব্যাপার অবগত ছিল, তাহারা কাণাঘুসা করিতে লাগিল, অবিলম্বে গুজব উঠিল, মেজকুমার মরেন নাই—তিনি শ্মশান-ক্ষেত্র হইতে কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছেন। সে গুজব মেজকুমারের পিতামহী রাণী সত্য-ভামা দেবীর কানে গেল। তিনি বর্ত্তমানে কুমারের মাতৃ-স্থানীয়া অভিভাবিকা। রাণী সত্যভামা সে গুজব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন। তিনি অবিলম্বে বর্দ্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের নিকট কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া একখানা পত্র লেখেন এবং যথাসময়ে তাহার উত্তর প্রাপ্ত হয়েন।

১৯০৯ খৃঃ অব্দে মে মাসে দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু হয় কিন্তু প্রায় বারো বৎসর পরে১৯২১ খৃঃ অব্দে একজন মৌন সন্ন্যাসী ঢাকায় আসিয়া বুড়িগঙ্গার তীরে বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের উপর অব-স্থান করেন। সাধুর নিকট অনেক লোক যাওয়া আসা করিত। তাহারা সাধুকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিল। অবিলম্বে সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কুমারের আত্মীয়

জনও আসিলেন, এবং তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিলেন। জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী কাশিমপুর নামক স্থানের জামদার তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন, এবং তিনিই যে মেজকুমার তাহা বুঝিতে পারিয়া হস্তী-পৃষ্ঠে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দিলেন।

রাণী সত্যভামা সাধুকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তিনিই মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ। রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও তাঁহাকে চিনিলেন। তখন মৌন সন্ন্যাসী তাঁহাদের কাছে নিম্নলিখিত আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন।

"দার্জ্জিলিংএ আমার মৃত্যু হয় নাই, অজ্ঞান হইাছিলাম মাত্র। যখন আমার পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন আমি হিমাচলের উপর এক জঙ্গলে। চারিজন নাগা সন্ন্যাসী সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আমার জীবন রক্ষা করে। বাবা দর্শনদাস লোকদাস প্রীতনদাস ও ধরমদাস, এই চারিজন সন্ন্যাসী আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। সন্ন্যাসী দর্শনদাসের কাছে শুনিলাম, সন্ন্যাসীরা আমার কল্পিত মৃত্যু-রাত্রিতে সহসা শ্মশানে বহু-লোকের হরিধ্বনি শুনিতে পান। সে সময় ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হয়—হরিধ্বনিও বন্ধ হইয়া যায়। সন্ন্যাসীরা কৌতুহলের বশ-বর্ত্তী হইয়া সন্ধানে বাহির হইলেন, হরিধ্বনিকারীদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না কেন? শ্মশানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, খাটিয়ার উপর আমি শায়িত কিন্তু জীবিত। অচিরে আমার সেবা-শুশ্রূষা না করিলে মরিয়া যাইব। সন্ন্যাসীরা নিকটে কোন লোকজন দেখিলেন না। তখন তাঁহারা চারি-

জনে আমাকে বহন করিয়া তাঁহাদের গুহা-মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের সেবায় আমি বাঁচিয়া উঠিলাম বটে কিন্তু তখন আমি স্মৃতি হারাইয়া ফেলিয়াছি—আমি কে, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি কিছুই আমার স্মরণ হয় না। আমি বনে বনে তীর্থে তীর্থে পাহাড়ে পর্ব্বতে সেই সাধুদের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাশী, বৃন্দাবন, কাশ্মীর, তিব্বত নেপাল প্রভৃতি কত দেশ ভ্রমণ করিলাম।

অমরনাথে আমি সন্ন্যাসী ধর্ম্মদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য হই। তখন হইতে সন্ন্যাসীরা আমাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকিতেন। মন্ত্রগ্রহণের পর একে একে আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে থাকে। গুরুর কাছে আমার পরিচয় প্রদান করিলাম। তখন তিনি আমাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। আমি মৌন সন্ন্যাসী বেশে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

সাধুর পরিচয় শুনিয়া রাণী সত্যভামা ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর তাঁহার উপর আর কোন সন্দেহ রহিল না। রাণী তাঁহার ২য় পৌত্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জয়দেবপুরে এক বড় সভা হইল। সে সভায় অন্ততঃ চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত হইল। সকলে একবাক্যে সাধুকে মেজকুমার বলিয়া স্বীকার করিল। তখন সত্যভামা দেবী কুমারকে জয়দেবপুরের বাড়ীতে লইবার জন্য কলেক্টরীতে অনুমতি চাহিলেন, কেননা তখন কুমারের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে। রাণী সত্যভামা

পৌত্রকে পুনর্জীবিত পাইয়া তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সরকার তাঁহার কোন আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। অথচ, দেশের লোক, কুমারের আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে মেজকুমার স্বীকার করিয়া লইলেন। সরকার সন্ন্যাসীকে ভণ্ড প্রতারক ঘোষণা করিলেন।

সমগ্র দেশ সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয় চিনিয়া লইল শুদ্ধ কোর্ট অব ওয়ার্ড, রাণী বিভাবতী (মেজকুমারের সাধ্বী বনিতা) ও তাঁহারই কয়েকজন আত্মীয় ও পৃষ্ঠপোষক কুমারকে চিনিতে পারিল না।

রাণী সত্যভামা কলেক্টারের কাছে আবেদন নিবেদন করিয়াও যখন জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে কুমারকে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইলেন না, তখন কুমারের মেজভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও তাঁহার পুত্র বুদ্ধুবাবু প্রভৃতি সাধুকে তাঁহাদের ঢাকার বাড়ীতে (৪ নং আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট) লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী মেজকুমার সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। প্রজারা দলে দলে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল, তাঁহাকেই ভূস্বামী স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নজর খাজনা প্রদান করিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রচুর টাকা উঠিতে লাগিল। প্রজাগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল তাহারা দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া আদালতে মামলা উপস্থিত করিয়া কুমারের সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে।

এই ব্যাপারে আশু ডাক্তার বিচলিত হইয়া পড়িল—সে

কুমারের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছে বলিয়া দেশের লোক তাহার উপর রুষ্ট হইল। সে তখন ভয়ে ভয়ে ভাওয়ালের বড় রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণের শ্যালক শৈলেন্দ্র মতিলালকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতেই তাহার অন্তরের আতঙ্কের ভাব বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেশবাসীর ধারণা হইয়াছিল, আশু ডাক্তারই কুমারের প্রাণ বিনাশের জন্য ঔষধের সহিত আর্ষেনিক বিষ প্রদান করিয়াছিল।

রাণী সত্যভামা দেবী তখনও হাল ছাড়েন নাই। তিনি পুনরায় বর্দ্ধমানের মহারাজকে জানাইলেন, আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই সাধুই প্রকৃত রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, আমার মধ্যম পৌত্র। আমার অন্তরে এমন দুর্ব্বলতা নাই যে অপর একজন লোককে আমার পৌত্র স্বীকার করিয়া লইয়া আমার শ্বশুর কুলের সিংহাসনে বসাইয়া দিব। বর্দ্ধমানের রাজা রাণীকে উপদেশ দিলেন, রাজস্ব বিভাগের মেম্বর মিঃ এফ, সি ফ্রেন্সের নিকট আবেদন করিতে। রাণী তাহাই করিলেন কিন্তু ফল হইল না। সরকার কুমারের আত্মীয় স্বজনগণের শত অনুরোধ সত্বেও তাঁহাকে প্রতারক ছাড়া আর কিছুই মনে করিলেন না।

আত্মীয় কুটুম্ব ও দেশের ভদ্রাভদ্র সাধুকে কুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ স্বীকার করিয়া লইল—তাঁহাকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া রাজকুমারের সম্মান প্রদান করিতে লাগিল—পরিচিত জমিদারেরাও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করিতে লাগিলেন—জনসাধারণের নিকট সাধু মেজকুমার বলিয়াই

সাব্যস্ত হইলেন। রাণী সত্যভামা সর্ব্বস্বপণ করিয়া কুমারের পৈত্রিক সম্পত্তি ও মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তখনও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি সাধুর নামেই লেখাপড়া করিয়া দিবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সহসা সত্যভামা দেবীর মৃত্যু হইল। রাণীর মৃত্যুকালীন ইচ্ছা অনুসারে সাধু শ্মশানে তাঁহার মুখাগ্নি-ক্রিয়া করিলেন এবং তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আত্মীয়-স্বজন, বহু মাননীয় ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই সাধুকে কুমারের সম্মান প্রদান করেন। সহস্র সহস্র লোক ভুরিভোজনে পরিতুষ্ট হয়।

সত্যভামা দেবীর মৃত্যুর পর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সাধু মেজ-কুমারের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যত্নবতী হইলেন। তিনি সাধুকে ভগিনীর যত্নে ও ভালবাসায় নিজের আবাসে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, ভ্রাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিতেই হইবে। বড় রাজকুমারের বিধবা পত্নী সরযু দেবী তাঁহার সহায়তায় প্রস্তুত হইলেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ভ্রাতার পক্ষে রেভিনিউ বোর্ডে আবার অনুরোধ-পত্র পাঠাইলেন কিন্তু বিফল হইল—বোর্ড তাঁহার অনুরোধ না-মঞ্জুর করিয়া পাঠাইল। কাজেই বাধ্য হইয়া সাধুকে বিভাবতী দেবীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা উপস্থিত করিতে হইল। এই মামলার নামই "ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা।"

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পত্র

১৯১৩ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সেক্রেটারী অব দি বোর্ড অব রেভিনিউকে যে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

মহাশয়! অতি বিনীতভাবে আমি জানাইতেছি যে, ঐ সাধুই আমার ভ্রাতা কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় সে বিষয় আমার পিতামহী বর্দ্ধমানের মহারাজকে এবং ঢাকার কালেক্টরকে দুইখানি পত্র লিখেন। তিনি কুমারকে (সাধুকে) জয়দেবপুরে আনিবার জন্য ঢাকার কালেক্টর সাহেবকে যে পত্র লিখেন, তাহার প্রত্যুত্তরে কালেক্টার সাহেব তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া তিনি তাঁহাকে (সত্যভামা দেবীকে) ঢাকায় যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে সত্যভামা দেবী আমার ৪নং আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে আমার ভ্রাতা কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বাস করিতেছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা পত্রোত্তরে জানান যে তাঁহার (সত্যভামা দেবীর) পত্রের একখানা নকল বোর্ড অব রেভিনিউর সদস্য মাননীয় এফ সি, ফ্রেন্সএর নিকট দাখিল করিয়াছেন। আমার পিতামহী মামলাটীর খসড়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন ও যাহাতে উহা কার্য্যকরী হয় সে জন্য তিনি যে দলিলকে ভিত্তি করিয়া বোর্ড অব রেভিনিউ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণকে প্রতারক বলিয়া জারি

করিয়াছেন তাহারই একটী নকল লইবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ঢাকায় আমার বাটীতেই ১৯২২ সালে ১৫ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। আমার পিতার তিন কন্যা, জ্যেষ্ঠা মৃতা। জীবিত দুইজনের মধ্যে আমিই বড় সুতরাং আমার পিতামহীর অসম্পূর্ণ কার্য্য আমারই স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। গত পাঁচ মাস যাবত আমার পিতামহী আমার বাটীতেই বাস করিতেছিলেন। আমি জানি, সাধুই যে তাঁহার ২য় পৌত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, সে বিষয়ে তাঁহার কত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে মুখাগ্নির অধিকার তাঁহার ২য় পৌত্রকেই দিয়া যান এবং দাহ শ্রাদ্ধ উভয় কার্য্যই তাহার দ্বারা সম্পাদন হয়। ঢাকাতেই শ্রাদ্ধ কার্য্যে সহস্রাধিক লোক বহু মাননীয় লোক সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শবদাহের সময় আমি আমাদের বহু আত্মীয়বর্গ সহ উপস্থিত ছিলাম।

বর্দ্ধমানের মহারাজার উপদেশ অনুসারে আমি এই মামলাটি বোর্ড অব রেভিনিউর সদস্য মাননীয় এফ, সি, ফ্রেন্সের নিকট উপস্থিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া বোর্ড অব রেভিনিউ ১৯২১ সালের প্রচার-পত্র জারি করিয়াছিলেন তাহার একটী নকল পাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করি। আমি কলিকাতায় আমার এজেন্টএর নিকট একটী ওকালতনামা

পাঠাইতেছি। কয়েকজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রয়োজনীয় দরখাস্ত করিবার জন্য উপদেশ দিতেছি।

ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত

স্বাক্ষর—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

কিন্তু বোর্ড-অব-রেভিনিউ ১৯২৩এর ১৫ই মার্চ্চ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর অনুরোধ না-মঞ্জুর করিয়া উত্তর পাঠান।

বাদীর প্রার্থনা

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বাদী আদালতের নিকট নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

(১) বাদীকে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হউক।

(২) বিবাদী রাণী বিভাবতী দেবীর উপর এই মর্ম্মে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সম্পত্তি ভোগ দখলের ব্যাপারে তিনি যেন বাদীকে কোন প্রকারে বাধা প্রদান না করেন।

(৩) সমস্ত বিবাদীর উপর এই মর্ম্মে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, এই মামলার শুনানী বলিবার সময়ে তাঁহারা যেন বাদীর ভোগদখলে কোন প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।

(৪) যে অবস্থায় এবং যে কারণে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আইন অনুসারে বাদীর আর যদি কোন প্রকারে কোন কিছু সাহায্য প্রাপ্য হয়, তাহা প্রদান করা হউক।

(৫) মামলায় বাদী পক্ষের যে ব্যয় হইবে, তাহা বিবাদী পক্ষ হইতে আদায় করিবার জন্য বাদীর অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হউক।

মামলার প্রতিবাদীগণ

মূল প্রতিবাদিনী—রাণী বিভাবতী দেবী, ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী।

এতদ্ব্যতীত রাণী সরযুবালা দেবী (ভাওয়ালের বড়কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী) রাণী আনন্দকুমারী দেবী (ভাওয়ালের ছোটকুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিনী) এবং কুমার রামনারায়ণ রায় (রাণী আনন্দকুমারী দেবীর দত্তক পুত্র)—এই তিনজন মামলার অন্যান্য প্রতিবাদী।

মামলার বিচার্য্য বিষয়

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচার্য্য বিষয়সমূহের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) বাদীর মামলা দায়ের করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি না।

(২) এই মামলা তামাদি দোষে বারিত কি না।

(৩) দখলে নাই বলিয়া বাদী সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত কি না।

(৪) বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কি না।

(৫) বাদী ও ভাওয়ালের মেজকুমারের মধ্যে সাদৃশ্য আছে কি না।

(৬) প্রতিবাদীর পক্ষে লিখিত জবানবন্দী অনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের ফলে বাদী ঐহিক অধিকার বঞ্চিত হইয়াছে কি না।

প্রতিবাদী পক্ষের অথবা, লিখিত বিবৃতি অনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের কথা মানিয়া লইয়াও বাদীকে ঐহিক অধিকার সম্পর্কিত কোন সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে কি না।

(৭) বাদী স্থায়িভাবে ইঞ্জাংসনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে ; তাহা সে পাইতে পারে কি না।

(৮) সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত মামলায় বাদীর কোন স্বত্ব প্রতিপন্ন হয় কি না।

(৯) মেজকুমারের শবদেহের সৎকার হইয়াছিল কি না।

(১০) বাদী কোন সুবিধা পাইতে পারে কি না এবং তাহার কোন সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকিলে তাহা কিরূপ ধরণের।

ভাওয়ালের সম্পত্তি

তিন কুমারের কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁহাদের পত্নিগণ তাঁহাদের অংশের মালিক। সম্পত্তি পরিচালনায় অক্ষম বলিয়া রমেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীর অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ছোট রাণী আনন্দকুমারী রামনারায়ণ নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। আনন্দ-কুমারীর অংশের এক চতুর্থাংশ রামনারায়ণকে মালিকী স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে। আনন্দকুমারীর অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল, বর্ত্তমানে তাঁহার নিজের হাতে আসিয়াছে। বড়রাণী কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে মাসহারা পান।

বাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার

মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জী

বিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার

মিঃ এ, এন, চৌধুরী

মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী

সন্ন্যাসীর জবানবন্দী

আমার নাম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতার নাম ৺রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। আমার বয়স ৫০ বৎসর, ব্যবসা জমিদারী।

আমার ঠাকুরদাদার নাম রাজা কালীনারায়ণ রায়। আমার ঠাকুরমার নাম সত্যভামা দেবী। মার নাম রাণী বিলাসমণি। আমি বাদী। আমরা তিন ভাই, তিন বোন। আমি মধ্যম ভাই, আমার বড় ভাইর নাম রবীন্দ্র, তিনি মারা গেছেন। আমার বড় বোনের নাম ইন্দুময়ী দেবী, তিনি সকলের চেয়ে বড়। মধ্যম বোনের নাম জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। ইন্দুময়ী দেবী মারা গেছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বেঁচে আছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী আমার বড় ভাইয়ের বড়। আমার তৃতীয় বোনের নাম তড়িন্ময়ী দেবী। তিনি বেঁচে আছেন, তিনি ছোটকুমারের ছোট, আমিও ছোট বলিয়া ডাকিতাম। ছোটকুমার বড়কুমারকে বড়দা বলিয়া ডাকিত। আমার জিহ্বা মোটা হইয়া গেছে, তাই অস্পষ্ট। আমার জিহ্বার নীচে একটা মাংসপিণ্ড আছে। দার্জ্জিলিং যাইয়া অসুখের কথা মনে আছে, জিহ্বার ঐ দোষ দার্জ্জিলিং যাইয়া অসুখের পর হইয়াছে। আমার মাতৃভাষা বাংলা। এখন আমি বাংলা ভাষায় কথা কহিতেছি। আমার ভাষার টান আছে কি না বুঝি না. বাহিরের লোক বুঝিতে পারেন। আমার

ভাষার টানের কারণ আমি ১২ বছর সন্ন্যাসীদের কাছে ছিলাম ও এই ১২ বছর হিন্দুস্থানীতে কথা বলিয়াছি, তাহারাও আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলিত। এই জন্য হিন্দিতে একটু টান থাকিতে পারে। বিবাহ হয়েছিল ১৩০৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমার স্ত্রীর নাম বিভাবতী। আমার বিবাহ জয়দেবপুরে হইয়াছিল। আমার বিবাহের সময় আমার বয়স ১৮।১৯ বছর হইয়াছিল, আমার স্ত্রীর তখন ১৩ বছর ছিল। আমি সত্য ব্যানার্জ্জিকে চিনি। তিনি আমার স্ত্রীর ভাই, যখন আমার বিবাহ হয়, তখন সত্যেন আমার সমবয়সী ছিল, সত্য তখন পড়তো। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বাশুড়ী, দুইটী শালী বেঁচে ছিল, তাহারা থাকিত উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া রামনারায়ণ মুখার্জ্জির বাড়ী, রামনারায়ণ মুখার্জ্জি আমার মামা শ্বশুর। আমার পিতা ১৩০৮ সনে ১৩ই বৈশাখ মারা যায়। আমার মা ১৩১৩ সনের ৭ই মাঘ মারা যায়, আমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে। ছেলেবেলা পশু-পক্ষী নিয়া জীবন কাটাইয়াছি। কবুতর, হাঁস, পাঁঠা, খাসীর গাড়ী। গাড়ীতে খাসী জুড়িয়া চালাইতাম। খাসীর গাড়ী আমি নিজে চালাইতাম। লেখা-পড়ায় আমার মন যাইত না। আমার মাষ্টার ছিল। আমার দ্বারিক মাষ্টার ছিল। দ্বারিক মাষ্টার আমার ৭।৮ বৎসরের সময় আসে। দ্বারিক মাষ্টারের কাছে ক, খ, গ, ঘ শিখিয়াছি A, B, C শিখিয়াছি। লেখাপড়ার দিকে মন দেই নাই।

দ্বারিক মাষ্টার বলিত 'তুমি রাজার ছেলে, নাম দস্তখত করিতে শেখ'। দ্বারিক মাষ্টারের কাছে নাম দস্তখত করিতে

শিখিয়াছি।. ইংরাজী ও বাঙ্গালা দস্তখত ছাড়া আর কিছু…।
(The witness is asked to write and the written paper is tendered and marked.)

A document is field in court on behalf of the plaintiff and marked Ext. 3 series the signatures of the plff tendered and marked Ext. 3 (5—6)

জয়দেবপুর চিড়িয়াখানা ছিল, তাহা আমার পিতার মৃত্যুর পরে হয়। চিড়িয়াখানা হওয়ার পূর্ব্বে পশু, পাখী আমার বৈঠক-খানার বারান্দায় থাকিত। চিড়িয়াখানা আমি করি; সমস্ত পশু, পাখী চিড়িয়াখানায় নেওয়া হয়। চারিটা বাঘ, দুইটা বড় ও ছোট বাঘ। বারান্দায় পশু-পক্ষী আনা হয়। চারিটি বাঘ, একটা শিয়াল। সাদা শিয়াল জঙ্গলে পাওয়া যায়, সাদা শিয়াল আমাকে কৈলাশ চক্রবর্ত্তী দেয়। কৈলাশ চক্রবর্ত্তী বলধার কর্ম্মচারী ছিল। একটা লাল শিয়াল ছিল। ২টা বনমানুষ, একজোড়া শম্বর, একজোড়া ছোট হরিণ, একজোড়া কৃষ্ণ ষাঁড়, একটা উট ছিল, একটা কুমীর ছিল, একটা গাধা ছিল, কুমীরটা পুষ্করিণীর মধ্যে ছিল, একজোড়া শালিক, ১৫।১৬টা ময়ুর ছিল, রাজহাঁস ছিল, পাতিহাঁস ছিল, উটপাখী একজোড়া. ধনেশ পাখী ছিল, একজোড়া তিতর পাখী ছিল, কেনারী পাখী ছিল।

আমাদের Estateএর ও আমার নিজের হাতী ছিল। আমার নিজের চারিটা হাতী ছিল। প্রধান মাহুত আমার

দিলবর ছিল। Estate-এর ১৪।১৫টা হাতী ছিল, ৪০।৫০টা ঘোড়া ছিল। অনেক গাড়ী ছিল, একটা রূপার গাড়ী ছিল। ব্রুহাম, টমটম ছিল। আমি হাতী চড়িতে পারিতাম, কানে ধরিয়া শুড় দিয়া উঠিতাম, আমি ঘোড়া চড়িতে পারিতাম। আমি গাড়ী চালাইতে পারিতাম, আমি সর্ব্বদা নীচ লোকের সাথে,—যথা সহিস, কোচয়ান ইত্যাদির সাথে শীকার করিতে পারিতাম। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ শিকার করিয়াছি। অনুকুল ঘোষ মাষ্টার ছিল। আর একজন ছিল নাম মনে নাই। তার বাড়ী পশ্চিম-বঙ্গে। Wasten সাহেব মাষ্টার ছিল। তাহার কাছে কিছু শিখি নাই। তারপরে সে ঘোড়া হাতীর ম্যানেজার ছিল। সে আমাদের চেয়ে ঘোড়া হাতী ভাল manage করিতে পারিত। আমি Gollegiate school-এ মাসে ১০।১৫ দিন পড়িতাম। নিজেদের Gamp ছিল। সেখানে চা বিস্কুট খাইতাম। জয়দেপুরে Polo ground ছিল। সেই জায়গা পরিষ্কার করার সময় সেখানে বড় বড় গাছ ছিল, তালগাছ প্রভৃতি ছিল, আমি ও ছোট ভাই Polo খেলিতাম। বড় ভাই খেলে নাই। আমি ভোরে চা খাইয়া হাতী, ঘোড়া দেখিতাম। ঘোড়ার দানাটানা ডলামলা ইত্যাদি দেখিতাম। হাতীকে স্নান করাইত ও খাওয়ান দিত। তারপর চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদিকে খাওয়ান দিতাম। এই সমস্ত ব্যাপারে ২।৩টা বাজিত, তারপর স্নান করিয়া খাইতাম। তারপর কখনও শিকারে যাইতাম, কখনও হাতীতে ঘুরে বেড়াইতাম। এইরকম করিয়া সন্ধ্যা ৬টায় বাড়ী ফিরিতাম। বাড়ী ফিরিয়া তাস পাশা

খেলিতাম, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আমি একবার লর্ড কিচেনার সাহেবের সাথে শীকারে গিয়াছিলাম, দার্জ্জিলিং যাওয়ার দেড়মাস আগে। Lord Kitchner এক হাতীতে যান, আমি ভিন্ন হাতীতে গিয়াছিলাম। আমি দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। আমার বাবা জীবিত থাকিতে গিয়াছি। পিতার আমলে বড়দিনের সময় যাইতাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে তিন ভাই কলিকাতায় গিয়াছি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা কলিকাতায় বড়দিনের সময় যাইতাম। আমার শরীর অনুযায়ী আমার পা ছোট, আমার পা চিরকালই ছোট আছে।

আমার মার হাত পা ছোট ছিল। আমাদের রাজপরিবারের মধ্যে মেজ বোনের, ছোট ভাইর, বুদ্ধুর হাত পা ছোট ছিল। বুদ্ধু জ্যোতির্ম্ময়ীর ছেলে। বুদ্ধু মারা গিয়াছে। তিনি ভাদ্র মাসে মারা যান। আমার হাতের কব্জায় "রেখ" আছে।

আমি ১৪৪ ধারার মোকদ্দমায় Mr. Martin সাহেবের কাছে জবানবন্দী দিয়াছি। তখন হইতে এখন আমি মোটা হইয়াছি। তখন আমার হাতের ঐ রেখা আরও ভাল দেখা যাইত। আমাদের পরিবারে আমার, বাবার, আমার ছোট ভাইর, মেজ বোনের, বুদ্ধুর হাতে এই রকম রেখা ছিল, আমার ঠাইন পিসিরও ছিল। ঠাইন পিসির নাম কৃপাময়ী দেবী। (আমার পায়ের পাতার) আমার পায়ের চামড়া পুরু ও খসখসে। আমার পিতার, ছোটকুমারের, ঠাইন পিসির, মেজ বোনের, বুদ্ধু, মণির পায়ের চাম এই রকম ভারী ও খসখসে ছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর এক ছেলেই ছিল, নাম বুদ্ধু। আমার গায়ের রং-এর মত, জ্যোতির্ম্ময়ীর, আমার ছোট ভাইরও ছিল। আমার চক্ষুর মত জ্যোতির্ম্ময়ী ও বুদ্ধু ও ছোটকুমারের কটা ছিল। তাহাদের চুলও কটা ছিল। আমার গায়ে, হাতে ও পায় দাগ আছে। আমার ডান হাতে বাঘের খাব্লার দাগ আছে। ছোট বাঘ। বাঘ চিড়িয়াখানায় ছিল। বাঘের বয়স ৫।৬ মাস হইতে পারে, এই ঘটনা দার্জ্জিলিং যাওয়ার ২।৪ বছর আগে হয়। সেই খাব্লার দাগ আছে। আমার একটা দাঁত ভাঙ্গা। (Broken tooth shown to the Court) দুই আনী আছে, চৌদ্দ আনী গেছে। রাজবাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়া Railway station-এর দিকে একটা রাস্তা, আমার ছোট ভাই হাতীতে আসিতেছিল। আমি টমটমে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতেছিলাম। ঘোড়া হাতী দেখিয়া ভয় পায়, তাহাতে পড়িয়া দাঁত ভাঙ্গে। আমাকে অশ্বিনী ডাক্তার দেখে। পড়িয়া যাইয়া যে দাঁত ভাঙ্গে সেই ভাঙ্গা দাঁত পাওয়া যায় নাই। আমার ছোট ভাই ও বোনের বিয়ের কথা মনে আছে। তাহাদের বিয়ের সময় আমি কাকের নীচে (বোগল দাবায়) লাঠি দিয়া হাটিতাম। আমার বাঁ পায়ের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ রকম ভাবে হাটিতাম, বিয়ের ৬।৭ দিন আগে ঐ ঘটনা আস্তাবলে ঘটে। ফিটন গাড়ীর চাকা চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে পা কাটিয়া গিয়াছিল (Shown to the Court) পা কাটিয়া যাওয়ায় আমি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। তারপরে কাপড় ছিঁড়িয়া তেনা (নেকড়া)

জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার ৭।৮ বছরের সময় মাথায় একটা ফোট হইয়াছিল। দাগ আছে (Shown to the Court) আমার মাজায়ও একটা ফোট হইয়াছিল। তখন আমার ৮।৯ বছর বয়স। এই ফোটের দাগ আছে (Shown to the Court)। আমার সিফিলিস্ হইয়াছিল, দার্জ্জিলিং যাওয়ার ৪।৫ বৎসর আগে হয়। মেয়ে মানুষ হইতে এই রোগ হয়। এই অসুখ আমার লিঙ্গে হয়। ত্রৈলক্য ডাক্তার এই অসুখ চিকিৎসা করে। বাড়ীর লোকেরা এই অসুখ জানিত, ঐ স্থানে ঔষধ লাগাইত দুইজন, বোঁচা ও নৈসা চাকর। আমার লিঙ্গে একটা তিল আছে। লিঙ্গের চামড়ায় তিল আছে, লিঙ্গের অসুখ সারিতে ২।৩ মাস লাগে। তারপর আমার বাঘী হয়, বাম দিকে। লিঙ্গের অসুখের ১ মাস পরে বাঘী হয়। ডাক্তার দেখে, তাহা কাটান হয়। এলাহী ডাক্তার বাঘিটা অস্ত্র করে। বাঘির অস্ত্রের চিহ্ন আছে। ঘা শুকাইয়া ছিল, তারপর পা ও হাতে সিভিলিসের ঘা হইয়াছিল। সিভিলিসের দাগ হাতে পায়ে আছে (Shown to the Court)।

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার মা Estateএর charge নিয়াছেন, আমার বাবা মাকে trustee করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদের Estateএ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ম্যানেজার ছিল। মায়ের আমলে তিনি dismissed হন। মা তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিয়াছিলেন। অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছে। এই জন্য dismissed (ডিস্‌মিস্) হন।

তিনি কাগজ-পত্র পুষ্করিণীর মধ্যে ও কিছুটা কুয়া পায়খানায়

ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান। পুষ্করিণী ও কূয়া রায় বাহাদুরের বাড়ীর। পুষ্করিণী ও কূয়া পায়খানার কাগজ-পত্র সম্বন্ধে আমি জানি। আমার হুকুমে উঠান হয়। জালওয়ালা আনিয়া জাল খেওয়া দিয়া ৭।৮ বস্তা কাগজ পুকুর হইতে উঠান হয়। যখন কূয়া পায়খানা হইতে কাগজ উঠান হইয়াছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কূয়া পায়খানার উপরে খেঁর ছিল। খেঁর তোলা হইলে দেখা যায় খাতা-পত্র। তারপরে টেঁটা মারিয়া কাগজের বস্তা তোলা হয়। পায়খানায় ময়লা ছিল বলিয়া টেঁটা দিয়া তোলা হয়। আমার টাকা ভাঙ্গতির জন্য কালীপ্রসন্নের নামে ১০।১১ লক্ষ টাকার নালিশ করে। এই মোকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছিল। ডিক্রি হওয়ার আগে কালী-প্রসন্ন ঘোষের সাথে ঢাকা নলগোলা আমার বাসায় দেখা হয়। তখন সেখানে আমার বড় ভাই ও ছোট উপস্থিত ছিল। কালী প্রসন্ন ঘোষ আমাদের বলিল, "আমি পুরাণ কর্ম্মচারী, মাকে বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" আমাদের কাছ থেকে কালী-প্রসন্ন ঘোষ একটা চিঠি নিয়া আসে। তাহাতে আমরা দস্তখত করি—সেই চিঠি জয়দেবপুর মার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ৫০০০০৲ টাকায় আপোষ ডিক্রি হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরে আমার বড় ভায়ের শ্বশুর সুরেন্দ্র মতিলাল ম্যানেজার হয়। তিনি এক বৎসর ম্যানেজার থাকেন। তারপর Mayer সাহেব manager হয়।

(Ext. B. is shown and he identified his signature. The signature is marked Ext. 2.)

Mr. Mayer দুই বছর manager ছিল। আমার মা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। আমার ভাইকে দিয়া সে Estate, Court of Wardsএ দেওয়াইয়া ছিল। যখন Court of Wordsএ দেয় তখন আমার বড় ভাই কলিকাতায় ছিল। Mayer সাহেবের চাকুরী যাওয়ার পরে সে জয়দেবপুর ছাড়িয়া যায়। তাহার পর আমি সংবাদ পাই যে আমার বড় ভাই দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। আমার দাদার সাথে দার্জ্জিলিং Mayer সাহেব ছিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি কলিকাতা যাই। আমার মা ও ছোট ভাই জয়দেবপুরে থাকে। যাহাতে Estate, Court of Wardsএ যাইতে না পারে এইজন্য আমি কলিকাতা যাই। Court of Wards, Estate দখল লইতে পারিয়াছে কি না তাহা আমি তখন জানি না, তার পরে আমার ছোট ভাই ও মা কলিকাতা আসে। Estate যাহাতে Court of Wardsএ যাইতে না পারে পরে সেইজন্য আমি ও ছোট ভাই একসঙ্গে ও মা, অপর দরখাস্ত Boardএ দেই। তখন আমাদের উকীল হরেন্দ্র মিত্র ছিল, বড় পিউ সাহেব ও Jackson ব্যারিষ্টার ছিল, Boardএ কোন ফল পাইলাম না। Estate ফিরাইয়া পাই নাই। তারপরে আমার মা High Courtএ মোকদ্দমা করে। কি "Bose" Attorney ছিল। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার ছিল। আর একজন ছিল, নাম মনে নাই। তারপরে Court of Wards, Estate ছাড়িয়া ছিল, আমার মা মোকদ্দমা তুলিয়া নেন। তারপরে আর Mayer সাহেব আমাদের Estate ম্যানেজার ছিল না। তারপর আমি আমার ছোট ভাই,

বড় ভাই ও মা সকলেই জয়দেবপুর ফিরিয়া আসিলাম। তারপরে যোগেশ মিত্র ম্যানেজার হয়। তারপরে জ্ঞানশঙ্কর সেন ম্যানেজার হয়। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে শেষবার কলিকাতা ১৩০৫ সনের পৌষ মাসে তিন ভাই, তিন বৌ কলিকাতায় যাই। বড় ভাই আগে যায়, লভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী থাকে।

লভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী ভাড়া করে। সেই বাড়ীতে আমরা প্রথম যাই। তারপরে আমরা ভিন্ন বাসা করি। বড় ভাই জলের কলের কাছে একটা বাসা করে। আমরা ঐ বাসার দক্ষিণ দিকে একটা বাসা করি। দিগেন্দ্র বানার্জ্জি আমার পুত্রা। আমার বড় বোনের মেয়েকে তাহার ভাই বিবাহ করিয়াছে। এই সময় দিগেন্দ্র বানার্জ্জি আমার সাথে ছিল। সেই সময় আমার সিফিলিস অসুখও ছিল। তখন আমার তুই হাতে ঠ্যাংএ সিফিলিসের ঘা ছিল। তখন আমার চিকৎসা হইয়াছিল, ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করে। আর কোন ডাক্তার আমাকে দেখিয়াছিল কি না মনে নাই। আমার পিত্তশূলের ব্যথা জীবনে কখনও ছিল না।

কলিকাতা হইতে আমরা মাঘ মাসের শেষে ফিরি। শৈলেন্দ্র মতিলাল আমার বড় ভাইর শালা হয়। শৈলেন বাবু কলিকাতা হইতে আমাদের সঙ্গে আসেন। আমরা যখন কলিকাতা হইতে আসিলাম, তখন আমার শালা সত্যেনবাবু কলিকাতা ছিল। আমরা কলিকাতা হইতে আসার পরে সত্যের সহিত আমার জয়দেবপুর দেখা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা আমার শালা উত্থাপন করে। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগেও Lord

Kitchnerএর সঙ্গে শীকারে আমার শালা সত্য, যতীন মুখার্জ্জি যায়। আমি ও সত্য এক হাতীতে যাই। বাঘ শীকার করিয়াছিলাম, শীকারের সময় সত্যবাবু ছিল না। যখন বাঘ ডাক দিল তখন সত্যবাবু ভয় পাইল ও তাহাকে এক বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।

দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা বাড়ীর সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। তখন আমার ঠাকুর মা ও আমার বোন জ্যোতির্ম্ময়ী যাইতে চাহিয়াছিল। রাজবাড়ীতে বৌদের স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার প্রথা ছিল না। দার্জ্জিলিংএর বাড়ী দেখিতে যাওয়ার আগে আমার শালা ও মুকুন্দ গুণ জানিতে পারিয়াছিল বাড়ীর কে কে দার্জ্জিলিং যাইবে। দার্জ্জিলিংএর বাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল। সত্যবাবু ফিরিয়া আসিয়া এই খবর দেয়। বাড়ীর নাম মনে আছে। বাড়ী ঠিক করে আসার পরে আমার ঠাকুর মা বোনেরা যায় নাই। সত্যবাবু আসিয়া বলিল যে সেখানে বিধবাদের থাকিবার অসুবিধা আছে ও বাড়ী ছোট। আমি, আমার স্ত্রী, আমার শালা সত্য, আশু ডাক্তার, আমার কেরাণী বীরেন বানার্জ্জি ও Clerk দুইজন ছিল। চাকর যামিনী, বিপিন, ঝগড়া, প্রসন্ন জব্বর, গিয়াছিল। ঝগড়ির মা তীর্থদাই গিয়াছিল। আমরা যখন দার্জ্জিলিং যাই, তখন দীগেন্দ্র বানার্জ্জি জয়দেবপুর ছিল। দিগেন্দ্র বাবু সচরাচর জয়দেবপুর থাকে। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন দিগেন্দ্রবাবু জয়দেবপুর ছিল না, আমি তাহাকে টেলিগ্রাফ করাইয়া জয়দেবপুর আনাই। দার্জ্জিলিং যাওয়ার

জন্য আনাই। তিনি দার্জ্জিলিং যান নাই। কারণ সত্যবাবু বলিল যে মুকুন্দইত আছে তাহার যাইয়া কাজ নাই। দার্জ্জিলিং যাইয়া আমার শরীর ভালই ছিল। ১৪।১৫ দিন পর আমার অসুখ হয়। রাত্রে পেট ফাঁপা ছিল। তার পরদিন আশু ডাক্তারকে ইছিলাম (বলিয়াছিলাম)। আশু ডাক্তার ভোরে একজন সাহেব ডাক্তার আনে। সাহেব ডাক্তার আমাকে ঔষধ দিয়াছিল। সেই ঔষধ আমি খাইয়াছিলাম। তার পরের দিনও সাহেব ডাক্তারের ঔষধ খাই। তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। তার পরে আশু ডাক্তার রাত্রে ঔষধ দিয়াছিল, ঔষধটা কাঁচের গ্লাসে করিয়া দিল। এই ঔষধ খাইয়া কোন উপকার হয় নাই। বুক জ্বালা করিয়াছিল, বমি হইয়াছিল। শরীর ছট্ ফট্ করিয়াছিল। এই সব আশু ডাক্তার আমাকে ঔষধ খাওয়াইবার ৩।৪ ঘণ্টা পরে হয়। চিৎকার পাড়তে লাগলাম। সেই রাত্রে আর কোন ডাক্তার আসে নাই। তার পরদিন আমার রক্ত বাহ্যি হইতে লাগিল। শরীর খুব দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তারপর আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়া পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার আসিয়াছিল কিনা জানি না। অজ্ঞান হওয়ার পরে কি হইয়াছিল তাহা আমি কিছুই জানি না। তার পরে জ্ঞান হইয়াছিল। তখন আমি পাহাড়ে জঙ্গলে। তখন আমি খাটিয়ার মধ্যে শুইয়া আছি। খাটিয়া মাটীর উপর ছিল, উপরে টীনের ছাপরা, সেখানে ৪ জন সন্ন্যাসী ছিল। আমার জ্ঞান হইলে আমি বলিলাম, "কোথায় আসিলাম আমি?"

সন্ন্যাসীরা বলিল, "তোমার শরীর দুর্ব্বল, কথা কইও না" এই কথা তাহারা হিন্দিতে বলিয়াছিল। তখন আমি হিন্দি বুঝিতাম। আমার বাড়ীর সহিস, কোচোয়ান, দারওয়ান, মাহুতের কাছে শিখিয়াছি। তারপরে আমি কোন কথা কই নাই।

এই ছাপরায় থাকি—১৫।১৬ দিন ছিলাম। তখন সন্ন্যাসী-দের সাথে আমার কোন কথা হয় নাই। ১৫-১৬ দিন পরে আমি সেখান হইতে চলিয়া যাই। ঐ ৪টী সন্ন্যাসীদের সাথে যাই, হাটিয়া গেছি ও Train এ গেছি ; তার পরের কথা আমার মনে আছে যে আমি কাশীতে গেছি। কাশী অশীঘাটে ছিলাম। তখনও ঐ ৪টী সন্ন্যাসী সাথে ছিল। অশীঘাটে সাধুর আশ্রমে ছিলাম। সেখানে আরও অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। বাঙ্গালী ও পশ্চিমা সাধুর সহিত দেখা হইয়াছিল। বাঙ্গালী সাধু দুই জনের সাথে কথা হইয়াছিল। তাহাদের সাথে বাঙ্গালা, হিন্দি সাধুর সাথে হিন্দিতেই কথা হইয়াছিল। ঐ সাধু ৪ জনের সাথে আমার কথা বার্ত্তা হিন্দিতে হইয়াছিল।

অশীঘাটে থাকাবস্থায় আমি কে, আমার বিষয় কিছুই স্মরণ ছিল না। আমি অশীঘাটে ৪।৫ মাস ছিলাম। আমার সাথে ৪ জন সাধুও রহিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে অশীঘাট পর্য্যন্ত যাইতে ১ বছর সময় যায়। অশীঘাট হইতে বিন্ধ্যাচল যাই। সাথে চারিজন সাধুও ছিল। বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকুট যাই। সেখান হইতে এলাহবাদ, সেখান হইতে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার, তারপর হৃষিকেশ, সেখান হইতে লছমনঝোলা,

তারপর কাশ্মীর। কাশ্মীরে করামুলা Subdivision শ্রীনগর রাজধানীতে যাই। সেখান হইতে অমরনাথ পৌঁছি, এই স্থান হইতে হেঁটে ও Trainএ গিয়াছি। হাঁটিয়া যখন যাই তখন পাহাড় জঙ্গল দিয়া যাই। অশীঘাট হইতে অমরনাথ যাইতে চার বছর লাগে। অমরনাথ একটা তীর্থ। যাহারা অমরনাথে যায়, তাহারা নীচে গ্রাম আছে সেখানে থাকে। অমরনাথে ২৩ দিন থাকি।

অমরনাথে থাকাকালীন আমি শিষ্য হই ও মন্ত্র নেই। ধর্ম্মদাসের শিষ্য হই ও তাহার নিকট হইতে মন্ত্র নেই। ধর্ম্মদাস ঐ চার জনের মধ্যে একজন। মন্ত্র আমার মনে আছে। মন্ত্র নেওয়ার পর সাধুরা আমাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকিত। মন্ত্র নেওয়ার পর আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এই সম্বন্ধে আমার ধারণা হইয়াছিল। মন্ত্র নেওয়ার পরে আমার গুরুর সাথে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। এর পরে আমার ধারণা হয় যে আমাকে দার্জ্জিলিং শ্মশানে ভিজা অবস্থায় সন্ন্যাসীরা পায়। তাহাদের আমি সাথে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কে, বাড়ী কোথায় ইত্যাদি আমার কিছুই মনে নাই। আমি মাঝে মাঝে মনে করিতাম, আমার বাড়ী ঘর আত্মীয় কোথায় আছে এই কথা মনে করিতাম। আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার আলাপ হইত। গুরু বলতেন সময় হইলে তোমাকে বাড়ীতে যাইতে দিব। সময় হওয়া মানে কি আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি এই বুঝিলাম যে যদি সংসারের মায়া আত্মীয় স্বজন বাড়ী

ঘরের মায়া ছাড়িয়া আসিতে পারি তাহা হইলে আমাকে সন্ন্যাস দিবে। ইহা আমি অমরনাথ ছাড়িবার পরে হইল। এই কথা আমি বাড়ী ফিরিয়া আসার ১ বছর আগে হয়। অমরনাথ হইতে আমি ঐ চারজন সন্ন্যাসীর সাথে আবার উত্তরে গেলাম। চম্বা পাহাড়, চম্বা রাজধানী, বুল্লু পাহাড় তারপর শুচেতমুণ্ডী গেলাম। সেখান হইতে নেপাল যাই। অমরনাথ হইতে শুচেতমুণ্ডি যাওয়া পর্য্যন্ত ২।৩ বৎসর লাগে। হাটিয়া ও Trainএ গিয়াছি। শুচেতমুণ্ডী হইতে নেপাল যাইতে ২।৩ বছর লাগলো। নেপাল পশুপতিনাথ তীর্থে গিয়াছি। পশুপতিনাথে আমার আরও সাধুর সাথে দেখা হয়। পশুপতিনাথে একজন বড় সাধু আছে। তাহার নাম বাঙ্গালী বাবা। তাহার কাছে আমি গিয়াছিলাম। বাঙ্গালী বাবা হিন্দি বলে। নেপাল হইতে আমরা তিব্বত যাই। তিব্বত হইতে ফিরিয়া আবার নেপাল আসিলাম। নেপাল হইতে তিব্বত ও তিব্বত হইতে নেপাল যাইতে আসিতে তিন চার মাস লাগে। তারপর নেপাল হইতে নীচে আসি এক বছর পরে। নেপাল হইতে যখন নামি তখন ঐ ৪ জন সন্ন্যাসী আমার সাথে ছিল। নেপাল হইতে বরাহছত্তর আসি। বরাহছত্তরে যখন আসি তখন আমার মনে হইল যে আমার বাড়ী ঢাকা; তখন আমি এই বিষয়ে গুরুকে বলিয়াছিলাম। গুরু বলিল, যাও, তোমার সময় হইয়াছে। আমি বুঝিলাম দেশে, বাড়ীঘরে যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে ফিরিয়া যদি আসি তাহা হইলে তাঁহার সহিত হরিদ্বারে দেখা

হইবে, একথা সে বলিল। বরাহছত্তর হইতে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। তখন আমি একা ঘুরিয়াছি; বরাহছত্তর হইতে প্রথমে পূর্ণিয়া জেলায়, তারপর রংপুর, তারপর কামাখ্যা, তারপর গৌহাটী। গৌহাটী হইতে Trainএ উঠিলাম, Train এ ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে উঠিলাম। তারপর ফুলছড়ি হইয়া ঢাকা আসিলাম। মন্ত্র নেওয়ার পর হইতে পরনে কৌপিন ছিল। চুল কটা ছিল, হাতে করঙ্গ ছিল। করঙ্গটা লাউর তৈয়ারী, করঙ্গকে কমণ্ডুল বলে।

আমার দাঁড়ি ছিল। আমি ঢাকায় রাত্রি ১২টা কি ১টার সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই রাত্রে ঢাকা ষ্টেশনেই রহিয়া গেলাম। ভোরে ষ্টেশন হইতে সদর ঘাটে আসিলাম। নিজেই সদরঘাটে চলিয়া আসিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া আমার মনে হইল যে আমি এখানে বহুদিন চলা-ফেরা করিয়াছি। সদরঘাটে যাইয়া নদীর মধ্যে যে চর আছে সেখানে গেলাম। সেখান হইতে বেলা ১০টার সময় ফিরিয়া আসিলাম ব্যক্ল্যাণ্ড-বাণ্ডে। সেইদিন Bukland Bandএ রহিলাম, রঘুবাবুর বাড়ীর গেটের সামনে থাকি। এইরকম ২।৩ মাস ছিলাম। ঐখানে থাকার সময় বহু লোকজন আমার কাছে আসিত। তাহাদের এই রকম কথা হইত যে "এই ভাওয়ালের কুমার, এই মেজকুমার।" তাহাদের মধ্যে আমার বহু চেনা লোক দেখিয়াছি। তাহাদের সাথে আমার এমনি বাজে কথা হইয়াছে। তাহারা আমার সাথে বাংলায় কথা বলিত। আমি হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমার গুরুর নিষেধ ছিল, বাংলায়

কথা বলা। আত্ম-পরিচয় দেওয়াও নিষেধ ছিল। আমি কাশীমপুরের প্রসাদ রায়কে চিনি। যখন আমি Bukland Bandএ ছিলাম তখন অতুলপ্রসাদকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সাথে আমার ২।৩ দিন কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিতেন "মেজকুমার।" তিনি আমাকে ২।৩ বার কাশীমপুরে নিতে চাহিয়াছিলেন।

তিনি আমাকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমাকে বলিলে আমি কাশীমপুর Trainএ গিয়াছিলাম। সঙ্গে ভুলু ছিল। ভুলুই অতুলপ্রসাদ রায়। Trainএ জয়দেবপুর গেলাম, সেখান হইতে হাতীতে কাশীমপুর গেলাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে সারদাবাবু ও ভুলুর সাথে বহু চিনা ছিল। সেখানে ৫।৬ দিন ছিলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়াছি। তখন সেখানে সারদা, তার বড় ও ছোট ভাইয়ের ছেলেরা ছিল। অতুল সারদাবাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে। যখন খাওয়া করি, তখন অতুলও ছিল। অতুলের পিতার নাম অন্নদা প্রসাদ রায়-চৌধুরী। আমার জিহ্বা ভার থাকায়, কথা মাঝে মাঝে বাহির হয় না। আমার খাওয়ার সময় খাওয়ার ঢং দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছিলেন এই মধ্যমকুমার—মধ্যম-কুমারও এইভাবে খাইত। তর্জ্জনী উঠাইয়া সাক্ষী বলেন, আমি বরাবরই এইভাবে খাইয়াছি, আমি দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে আমি অনেকবার সারদা ও অতুলের সাথে খাইয়াছি, আমার খাওয়া দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছেন যে, "এই রকমে মেজকুমার খাইত। আমার সন্দেহ হয় এই মেজকুমার।"

কাশীমপুর হইতে জয়দেবপুর আসি। যোগেন্দ্র বানার্জ্জির ছেলে রাম আমাকে হাতীতে জয়দেবপুর লইয়া যায়। তখন রাম কাশীমপুর Estateএ সারদাবাবুর কর্ম্মচারী ছিল। যোগেন্দ্রবাবু তখন রাজবাড়ীতে কাজ করে। রাম এখন কোথায় কাজ করে জনি না। এই হাতী রাজবাড়ীর। জয়দেবপুরে সন্ধ্যা ৬টা ৬৷৷টার সময় পৌঁছি। রামের সাথে ২।৩ জন লোক আসিয়াছিল। জয়দেবপুরে আসিয়া সেদিন মাধববাড়ীতে থাকি। রাজবাড়ীর মধ্যে নামি।

সেখান হইতে মাধববাড়ী যাই। তখন আমার এই সব জায়গা চিনা মনে হইত। মাধববাড়ী বিগ্রহ আছে। আমাদের জয়দেবপুরের রাজার ঐ বিগ্রহ। আমি সেই রাত্রে মাধববাড়ীতে যে কামিনী ফুলের গাছ আছে সেই গাছের নীচে থাকি। কাশীমপুরের লোকেরা আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলিত। আমিও হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমি তাহাদের হিন্দিতে বলিয়াছি, কারণ আমার গুরু আমাকে আত্ম-পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই রাত্রে কামিনী ফুল গাছের নীচে বহু লোকজন আসিয়াছিল। সেই রাত্রে সেইখানেই বসিয়াছিলাম। তার পরদিন মাধববাড়ীর উত্তর দিকে একটা গলি আছে, বাড়ীর মধ্যে যাওয়ার সেই গলি দিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম। সেই রাস্তা মেয়েদের যাওয়ার রাস্তা। ঐ গলি দিয়া গিয়া খাজাঞ্চিখানার বারান্দা দিয়া পায়খানা গেলাম। সেই রাস্তা রাজবাড়ীর। সেই পায়খানায় আমি নিজেই চিনিয়া গেলাম। পায়খানা হইতে

আসিয়া স্নান করিলাম। পায়খানার মধ্যে কল আছে, সেই কলে স্নান করিলাম। সেই পায়খানাটা under drainএর। সেই drain চিলাই নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। স্নান করিয়া মাধব বাড়ীতে আসিলাম। তারপরে একটা গোল বারান্দা আছে, সেইখানে আমার ছোট ভাই থাকিত। সেখানে গেলাম ও বসিলাম। সেদিন দুপুর পর্য্যন্ত ওখানেই ছিলাম। তারপর সেখানে জয়দেবপুরের মেয়ে ছেলে স্ত্রীলোক বুড়া বহু লোক আমাকে দেখিতে আসে। তারপর বুদ্ধু সেখানে আসে। তারপর বৈকালে ৬৷৷টার সময় আমাকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নিয়া যান। সেখানে যাইয়া আমার ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, বোন জ্যোতির্ম্ময়ী, ভাগিনা, (বোনের ছেলে) বড় বোনের ছেলে সেখানে ছিল।

তাহাদের চিনিলাম সেখানে এক ঘরে ছিলাম। রাজবাড়ীর অন্যান্য জায়গা দেখিয়া সমস্ত চিনিলাম, কারণ ২৫ বছর ছিলাম। আমার আত্মীয় স্বজন চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেখানে আমার বোন ও ঠাকুরমার সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমি তখন তাহাদের সহিত হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমার বোন হিন্দিতে কথা বলিতে পারে। তিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। ঠাকুরমা দাঁড়াইয়াছিল। আমি সেদিন আত্ম-পরিচয় দেই নাই। আত্মীয় কুটুম্ব দেখিয়া মায়া হয় না? আমারও মায়া হইয়াছিল। একঘরে থাকিয়া তারপরে আবার রাজবাড়ীতে ঐ গোল বারান্দায় গেলাম। সেই রাত্রে সেই গোল বারান্দায় রহিলাম। তার পরদিন বুদ্ধু আমাকে খাওয়ার জন্য

নিমন্ত্রণ করিল। আমি গোটা ১২ টার সময় নিমন্ত্রণ খাইতে যাই। আমি সমস্ত আত্ম-পরিচয় দেই নাই।

রাণী
বিভাবতী দেবীর জেরা

রাণী বিভাবতীকে মিঃ চ্যাটার্জ্জী জেরা করেন—

প্র—গোবিন্দ বাবু কি সৎলোক ছিলেন না? উ—আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। যতদূর জানিতাম তিনি সৎলোকই ছিলেন। যতদিন জয়দেবপুর ছিলেন তিনি বেশী কারও সঙ্গে মিশতেন না—তিনিও আমাদের দিকে আসতেন না— আমরাও তাঁর দিকে যেতাম না। প্র—জ্যোতির্ময়ী দেবীর চুলের রং কি রকম ছিল আপনি গিয়া দেখলেন? উ—চুলের রং লালচে ছিল। প্র—মেজকুমারের মত নয় কি? উ—কতকটা একরকমকই। প্র—মেজকুমারের হাত পায়ের গড়ন কি রকম? উ—ছোট ছোট। আমার শাশুড়ীর হাত পায়ের গড়নও ছোট ছিল। কৃপাময়ী দেবীর পাও বড় ছিল না।

প্র—আপনি নিশ্চয়ই কৃপাময়ী দেবীকে প্রণাম করেছেন? উ—হাঁ। প্র—তাঁর পায়ের চামড়া কোমল ছিল না খসখসে

ছিল ? উ—আমি লক্ষ্য করিনি যে চামড়া কি রকম ছিল। প্র—আপনি জানেন র‍্যাঙ্কিন সাহেব আপনার দিকে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল—তার বাবদ কত টাকা খরচ গিয়াছিল ? উ—হ্যাঁ, শুনেছি। আমি বলতে পারব না—ম্যানেজার জানে—আমি কোন খোঁজও করি নাই কত টাকা খরচ গেছে, র‍্যাঙ্কিন সাহেবকে সাক্ষ্য দিতে আনতে। প্র—র‍্যাঙ্কিন সাহেব স্বীকার করেছেন—মেজকুমারের সঙ্গে বাদীর সাদৃশ্য আছে যারা বলেছেন তারা মিথ্যা কথা বলেননি ? আপনি কি তাঁদের উক্তি মিথ্যা বলবেন ? যাঁরা সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন বাদীর সঙ্গে মেজকুমারের বিশেষ সাদৃশ্য আছে তারা মিথ্যা কথা বলেছেন বলতে চান ?

উ—মিথ্যা নয় ভুল বলেছেন। প্র—আপনি এই কথা বলতে চান ঐ ভদ্রলোকেরা মেজকুমারের মুখ ভুলে গেছেন কিন্তু কোর্টে আসিয়া মিথ্যা কথা বলেছেন ? উ—কে কি মনে করিয়া বলেছেন কি করিয়া বলিব। হয়ত তারা ভুল করেছেন, না হয়, শুনে শুনে তাঁদের একটা ভুল ধারণা হয়েছে। প্র—বড়কুমার, মেজকুমার ও ছোটকুমার এই তিনের ভিতর কে বেশী লেড়াপড়া জানতেন ? উ—বড়-কুমার। তবে খুব বেশী তফাৎ ছিল না তিনের ভিতর। প্র—আপনি বড়কুমারকে ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলতে শুনেছেন ? উ—হ্যাঁ। প্র—কি রকম লোকের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছেন ?

উ—সাহেব সুবাদের সঙ্গে আলাপ করতে শুনেছি। রেল ষ্টীমারে শুনেছি এবং সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে অনর্গল ইংরেজী

বলিতে শুনেছি, এবং অন্য বাঙ্গালী ম্যানেজারের সঙ্গে ইংরেজী ২।১টা কথা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। প্র—কোন্ ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছেন? উ—খুব সম্ভব মায়ার সাহেবের সঙ্গে। প্র—আর কোন সাহেবের নাম বলতে পারেন যাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেছেন? উ—ঢাকার থেকে যে সমস্ত সাহেব যেত তাদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছি ছাদ থেকে। প্র—আপনারা যখন ষ্টীমারে ট্রেণে যেতেন, পর্দ্দা দিয়ে যেতেন? উ—পাল্কীতে উঠতাম। আমরা ট্রেণ ষ্টীমারে কামরা রিজার্ভ করে যেতাম, আমাদের গাড়ীর দরজা বন্ধ থাকত। শিয়ালহদ গেলে খুলিয়া দিতাম। গোয়ালন্দে দরজা বন্ধ থাকত না। প্র—গোয়ালন্দ থেকে ট্রেণ ষ্টীমারে উঠা-নামার সময় পাল্কী থাকত? উ—হাঁ। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে বলেন—আমি শুনেছি বড়কুমারকে সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে, কোথায় বলেছেন তা বলতে পারব না।

প্র—এটা কি ঠিক নয় যে মেয়েরা গাড়ীতে যে কেবিনে থাকতেন, সেখানে সাহেবরা যেতেন না? উ—না। প্র—আপনারা উঁকি মেরে দেখতেন, বড়কুমার ইংরেজীতে সাহেবদের সঙ্গে কথা বলছেন? উ—উঁকি মেরে নয়, কম্পার্টমেণ্ট থেকেই দেখেছি। প্র—বড়কুমারকে আপনি ক'মিনিট অনর্গল ইংরেজী বল্‌তে শুনেছেন? উ—তা বলতে পারব না।

প্র—বড়কুমার ইংরেজীতে ২।৪ মিনিট্ বলতে পারতেন কিনা জানেন না? উ—নিশ্চয় জানি? প্র—ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কোথায় ইংরেজীতে বড়কুমারকে কথা বলতে শুনেছেন?

উ—জয়দেবপুর ও কলকাতায়। প্র—আপনার স্বামী কি ২।৪ মিনিট অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলতে পারতেন? উ—হাঁ, প্র—যে রকম বড়কুমার ইংরেজীতে কথা বলতেন মেজকুমারও সেই রকম বলতে পারতেন? উ—হা। প্র—আপনি মেজকুমারকে ২।৪ মিনিট ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলতে শুনেছেন? উ—ডাক্তারের সঙ্গে অসুখ বুঝাইতে কত ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছি, দুই মিনিটও হইতে পারে তিন মিনিটও হইতে পারে।

প্র—আমি কি এই বুঝব বড়কুমার ও মেজকুমার দরকার হ'লে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারতেন? উ—হাঁ, তাই আমার ধারণা। প্র—এটা বুঝা যাচ্ছে যে বড়কুমার ও মেজকুমার দরকার হইলে বাংলাও বলতে পারতেন, ইংরেজীতেও কথা বলতে পারতেন? উ—সর্ব্বদা বাংলাই বলতেন কিন্তু কখনও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন। প্র—আপনি নিজের কানে বড়কুমার ও মেজকুমারকে প্রয়োজন হইলে সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছেন? উ—হাঁ। প্র—আপনার কথাতে এই বুঝা যাচ্ছে যে তাঁরা ইংরেজীতে সব কথা বুঝতে পারতেন? উ—হাঁ, আমি কোন অসুবিধা লক্ষ্য করি নাই।

প্র—আপনার বিয়ের পর থেকেই কি বড়কুমার ও ছোটকুমারকে ইংরেজী বলতে শুনেছেন। উ—ঠিক ক'রে বলতে পারব না কবে থেকে শুনেছি।

প্র—আপনি এত বড় শিক্ষিত পরিপারের মেয়ে হয়ে বিয়ের

পর কি আপনার কৌতুহল হয়নি আপনার স্বামী ইংরেজী বলতে পারেন কিনা ? উ—না। প্র—আপনার বিয়ের আগে কৌতুহল হয়নি আপনার ভাবী স্বামী ইংরেজী বলতে পারেন কিনা ? উ—না—ইচ্ছা হয়নি। বিয়ের পর কখন থেকে আমার স্বামীকে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছি, তাও বলতে পারব না।

প্র—একজন ইংরেজের সহিত ইংরেজীতে স্বামীকে কথাবার্ত্তা বলিতে শুনা কি একটা মনে রাখবার মত কথা নয় ? উ—আমি মনে রাখিনি।

প্র—হোয়ার্টন সাহেবের নিকট আপনার ভাসুর, স্বামী ও দেবর খুব মন দিয়ে ইংরেজী পড়াশুনা করতেন কি ? উ—কি করতেন তা জানি না।

কোর্ট প্রশ্ন করেন,—হোয়ার্টন সাহেব কি খুঁড়িয়ে চলতেন ? উ—বোধ হয় একটু খুড়িয়ে চল্‌ত। প্র—আপনার স্বামীকেও কি রেল ষ্টীমারে ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে শুনেছেন ? উ—সর্ব্বদা শুনি নাই, তবে কখনো কখনো শুনেছি। প্র—জয়-দেবপুরে যে সব সাহেব দেখা করতে আসত তারা কি রাজ-বাড়ীর অন্দরমহলে আসত ? উ—না। প্র—আপনি জানেন কি মেম সাহেবের ইংরেজী বুঝা আমাদের পক্ষেও একটু শক্ত ? উ—আমি তো বুঝতে পারি না কি করে বলব ? প্র—যদি মেম সাহেবরা আপনার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে আসত আপনারা কাছে থাকতেন কি ? উ—হাঁ, কুমারেরা ভেতরে এসে পরিচয় করিতে দিতেন।

প্র—আপনি কোন সাহেবের সঙ্গে আপনার স্বামীকে অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছেন? উ—আমি অনর্গল কথা বল্‌তে শুনি-নি ২।১টা কথা বলতে শুনেছি। তিন মিনিট কালও হইতে পারে।

প্র—ছোটকুমারকে সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বল্‌তে শুনেছেন।

উ—২।৪টা কথা বলতে শুনেছি। প্র—ছোটকুমারকে ইংরেজীতে কথা বলতে জয়দেবপুরে ছাড়া আর কোথায় শুনেছেন? উ—জয়দেবপুরে শুনেছি, আর কোথায় শুনেছি বলা শক্ত তবে কলকাতায়ও শুনেছি। প্র—আপনার বিয়ের বছর শুনেছেন কি? উ—কবে শুনেছি মনে নাই। প্র—আপনি ছোটকুমারকে কোন ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছেন মনে পড়ে কি? উ—ম্যানেজারের সঙ্গে নিড্‌হ্যাম্‌ সাহেবের কথা বলতে শুনেছি। মায়ার সাহেবের মেমের সঙ্গেও ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছি।

প্র—আপনার বিয়ের পর টের পেয়েছিলেন কি যে আপনার বংলাতে জ্ঞান বেশী না মেজকুমারের বংলাতে জ্ঞান বেশী? উ—না, টের পাই নাই। প্র—বাংলার জ্ঞান তিন ভায়ের ভিতর কার বেশী—এটা বিয়ের বছর টের পেয়েছিলেন কি? উ—হাতের লেখা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। হাতের লেখা বড়কুমারের সব চেয়ে ভাল ছিল।

প্র—এটা সত্যি কি দার্জ্জিলিংএর দুর্ঘটনার পর আপনি নূতন করে লেখাপড়া শিখেছিলেন? উ—না। প্র—আপনার

মনে পড়ে অপনার দাদা আপনার জন্য বই-টই খাতা-টাতা কলকাতা থেকে আনতেন যখন আপনি ঢাকা থাকতেন? উ—না, বই-টই আনতেন না—ষ্টেশনারী জিনিষ আনতেন।

প্র—আপনি যেরূপ সুন্দর করে ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করছেন—বড়কুমারও কি এই রকম সুন্দর করে ইংরেজী বলতে পারতেন? উ—নিশ্চয়ই।

কোর্ট প্রশ্ন করেন,—আপনি প্রথম যখন জয়দেবপুর এলেন তখন ওদের কথা বুঝতে পারতেন? উ—হঁা। প্র—আপনার বিয়ের সময় থেকে এখন কি বেশী শিক্ষিতা নন? উ—না, লেখাপড়ার দিক থেকে বেশী নই, তবে বয়সের অনুপাতে যদি ধরেন, তাহলে বেশী। প্র—মেজকুমারের হাতের লেখা কি আপনার চেয়ে ভাল ছিল? উ—খারাপ ছিল না কিন্তু ভাল ছিলও বলতে পারি না। প্র—এই কথা কি আপনি হিন্দু-পত্নী হিসাবে বলছেন? উ—না, তাঁর হাতের লেখা আমার চেয়ে খারাপ ছিল না।

প্র—আপনারা যে সোমবার দার্জ্জিলিং থেকে চলে এলেন, ষ্টেশনে কিসে চড়ে এসেছিলেন মনে আছে? উ—পাল্কীতে। প্র—এটা সত্যি কিনা পাল্কীতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন? উ—না। প্র—আপনি কি হলপ করে বলতে পারেন আপনি পাল্কীতে মূর্চ্ছিত হন নাই? উ—ঠিক যাকে অজ্ঞান বলা হয় তা হই নাই। প্র—তাহলে আপনার কি রকম হয়েছিল? উ—আমি খুব অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলাম। প্র—আপনার ভাই

যদি বলেন, "বিভাবতী পাল্কীতে মূর্চ্ছিত হয়েছিল" তাকি আপনি মেনে নিতে রাজি আছেন ?

উ—তিনি কি ভাবে বলেছেন কি করে বলব—তবে তিনি যদি উহাই ফেইন্টিফিট্ (মূর্চ্ছা) মনে করে থাকতেন তাহলে বলতে পারেন। প্র—আপনি বল্‌ছেন বাদীর মুখের সঙ্গে আপনার স্বামীর মুখের সাদৃশ্য নাই, তার কারণ আপনি আপনার স্বামীর মুখ ভুলে গেছেন ? উ—তা কি সম্ভবপর ! প্র—সত্যবাবুকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে ? উ—হঁা। প্র—তাঁর ঠোঁট কি রকম ? উ—পুরু। তাঁর ভ্রু মোটা না সরু, সোজা না বাঁকা ? উ—মোটা। সোজা নয় বাঁকা বলা যেতে পারে। প্র—সত্য বাবুর চোখ কি রকম ? উ—বড় এবং ভাসা।

প্র—কুমারের ভ্রু কি কালো বাঁকা লাইনের মতো যেমন আপনি বলেছেন তুলি দিয়ে আঁকা সেটা আপনি বুঝিয়ে দেন। উ—ভ্রুর শেষ দিকটা ও চোখের দিক্‌টা বাঁকা ছিল, কিছুটা ধনুকের মত।

প্র—কুমারের ভ্রুটা কি নীচ পর্য্যন্ত এসে পড়েছে ? উ—কারো ভ্রু ঐ রকম থাকে বটে কিন্তু তাঁর অসম্ভব মত লম্বা ছিল না। প্র—টিকোলো নাকটা কি ? উ—টিকোলো নাক সরু আর উঁচু হয়—থেঁতা ও চওড়া হয় না।

প্র—সত্যবাবুর নাক টিকোলো না কি ? উ—হাঁ টিকোলো কিন্তু খানিকটা বড় বেশী। প্র—আপনার ভাইয়ের কান বড় না ছোট ? উ—দস্তুর মত। প্র—সত্যবাবুর গায়ের রং কি রকম ? উ—হলদে ধরণের ফর্সা। (এই সময় A (50)

চিহ্নিত কুমারের ফটো বিবাদিনীকে দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি জিজ্ঞাসা করেন)—ঠোঁট্‌টা কি রকম? উ—এই ছবির ঠোঁটটা একটু মোটা দেখা যাচ্ছে। প্র—ঐ ছবির উপরের ঠোঁটটা কি পাতলা দেখ্‌ছেন? উ—আমি একে মোটা ঠোঁট্‌ বলতে পারি না। (কুমারের আর একখানা ফটো দেখাইয়া, বলেন) —এই ফটোতে ঠোঁট্‌ কি পাত্‌লা দেখ্‌ছেন, না মোটা দেখছেন? উ—মোটাও বলতে পারি না খুব বেশী পাতলাও বলতে পারি না।

প্র—আপনাকে যদি এই ফটো দেখাইয়া কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনি পাতলা ঠোঁট্‌ বলবেন? উ—না, মাফিক মত। আমি পাতলাও বলব না, মোটাও বলব না, স্বাভাবিক মত বল্‌ব। প্র—আপনি কি এই ঠোঁট্‌ পাত্‌লা বল্‌বেন? উ—না পাতলা বলব না, সমান মত বল্‌ব।

প্র—আপনি ফটোতে যে কান দেখ্‌ছেন তাকি ছোট বলবেন? উ—আমি বড় বল্‌ব না, মাফিক মত বলব। (ঐ ফটোর নাক দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জী বলেন)—ফটোর নাকের ডগা দেখে কি টিকোলো বল্‌বেন? (এই সময় কুমারের আর একখানি ফটো দেখাইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী জিজ্ঞাসা করেন) এই-খানা কি আপনার স্বামীর ফটো? উ—এই ফটোখানা ঠিক নয়। (আর একখানা ফটো দেখাইয়া বলেন)—এখানা আপনার স্বামীর ফটো কিনা? উ—হ্যাঁ। প্র—ঐ ফটোর নাককে কি টিকোলো নাম বল্‌বেন? উ—ছবি দেখে ঠিক বুঝছি না টিকোলো কিনা।

প্র—ফটোতে নাক কি রকম দেখাচ্ছে? উ—ফটোতে ভাল উঠে নাই, ছবির নাক টিকোলো তবে থেঁতা নয়। প্র—আপনার মতে নাক কি দু'রকম? উ—অনেক রকমই আছে। প্র—আপনি ভ্রু বলেছেন বাঁকা, এই ভ্রু কি বাঁকা? উ—এই ফটোতে ভাল উঠেনি। (কুমারের আর একখানি ফটো দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন)—এই ফটোর ভ্রু কি সরু? উ—হাঁ।

(অন্য একটী ফটো দেখাইয়া)

প্র—আপনি এই ফটোগ্রাফ কি আগে দেখেছেন? উ—না। প্র—দুজনের কাউকে চেনেন? উ—না।

প্র—আপনার জবানবন্দীতে কুমারের ভ্রু, চোখ, নাক, কান, এক রকম বলেছেন, ফটোতে অন্য রকম দেখাচ্ছে, তাহলে কি ফটোগ্রাফ ভুল বলবেন? উ—ফটোগ্রাফ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না।

প্র—আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ ২৫।২৬ বৎসর থাকেননি। ঐ ২৫।২৬ বৎসর আপনার ভাইয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকছেন, তাতে এটা কি বোঝা যাচ্ছে না যে আপনার ভাইয়ের মুখ আপনার স্বামীর মুখের স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে? উ—এ একটা অস্বাভাবিক কথা বলছেন।

প্র—আপনি জানেন প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বিশেষ ধরণ-ধারণ থাকে যা তাদের বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত থাকে? উ—হাঁ। প্র—আপনি বাদীর সঙ্গে কথা বলেন নি কিম্বা তাকে কারো সঙ্গে বলতে শোনেনওনি? উ—না।

প্র—লোককে গলার আওয়াজে চিনা যায় ঠিক কি?
উ—হাঁ।

প্র—আপনার জবানবন্দী যেদিন আরম্ভ হইল, যেদিন এখানে বাদীকে দেখলেন—তখন তার নাকটী টিকোলো কিনা —মুখ ঠোঁট, কান, নাক, ভ্রু এইগুলি ঠিক করে দেখেছিলেন মেজকুমারের মত কিনা? উ—আমি মুখ ভাল করে দেখে-ছিলাম। আর আর সমস্তও দেখেছি। আমি এই লোকটা কি রকম তাই দেখেছি—মেজকুমারের মত কিনা তা দেখি নাই। প্র—আপনি কি পেইন্ট (রং-মাখা) করেন? উ—না। প্র—ছোটকুমারের রং কি রকম ছিল? উ—খুব ফর্সা ও লালাভ ছিল—সাহেবের মত। প্র—ছোটকুমারের রং কি বাঙ্গালীদের ভিতর সাধারণতঃ দেখা যায়? উ—না।

প্র—আপনি কি বিবেচনা করে বলতে পারেন যদি আপনার স্বামী এতদিন জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁর গায়ের রং কি রকম হত? উ—বেঁচে থাকলে ফর্সাই থাক্‌তেন। প্র—বয়সের সঙ্গে মানুষের রংএর একটু তফাৎ হয় জানেন কি? উ—বল্‌তে পারব না।

প্র—আপনার গায়ের রং বিয়ের সময় যেমন ছিল, সে রকমই আছে না পরিবর্ত্তন হয়েছে? উ—বল্‌তে পারি না। প্র—আপনি কি জজ সাহেবকে বলতে চান আপনার বিয়ের সময় যে রকম রং ছিল এখনও সেই রকম আছে? উ—পূর্ব্ব-বঙ্গে এসে আমার গায়ের রং ময়লা হয়ে গেছে। (কোর্ট বলেন—পশ্চিম বঙ্গের লোকের সাধারণ ধারণাই এই রকম)।

প্র—বিয়ের সময় যে রকম রং ছিল, এখন কি সেই রকম রং আছে? উ—আমি লক্ষ্য করে দেখি নি। (A 50 চিহ্নিত ফটোটি আবার দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলেন)—উপরের ঠোঁটের মধ্য দিয়া নীচের ঠোঁটের দিকে যদি একটা লাইন টানা যায় তবে কি এটা বাহিরের দিকে থাকে? উ—আমি বলতে পারি না।

প্র—এই ফটোখানার নীচের ঠোঁট দেখা যায় ডান দিকে একটু বাঁকা। উ—আমি বুঝিতে পাচ্ছি না। প্র—আপনি শুনেছেন আপনার স্বামীর নীচের ঠোঁট ডান দিকে একটু বাঁকা ছিল? উ—আমি দেখিও নি, শুনিও নি। প্র—আপনার শ্বশুরের পরিবারের আর কারও ঐ রকম ছিল? উ—হাঁ আমার ভাসুরের ছিল, তবে তাঁর বাঁদিকে বাঁকা ছিল। ডান দিকে বাঁকা কারও ছিল না। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত শুনেছেন বাদীর ঠোঁট ডান দিকে বাঁকা? উ—না। প্র—আপনার স্বামীর কানের লতিটা আল্‌গা ছিল কিনা? উ—একথা ঠিক নয়, তবে একটু ফাঁক ছিল। (কুমারের ফটো দেখাইলেও বিবাদিনী বলেন)—ঐ রকমই ফাঁক ছিল।

প্র—আপনার স্বামীর এই ফটো কত বয়সের তোলা বল্‌তে পারেন? উ—১৯।২০ বৎসর বয়সের আমার মনে হয়। প্র—এটা কি ধরে নিতে পারি যে ৫০ বৎসর পরে কি রকম থাকবে কানের লতি—এটা আপনার বলা অসম্ভব? উ—আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কানের লতি বদলায় না। প্র—আপনি কি পরীক্ষা করে কখনও দেখেছেন, ২০ বৎসর

পরে যেমন ছিল ৩০ বৎসর পরেও সেই রকম আছে? উ—হাঁ আমার ভাইয়ের আমি তাই দেখেছি। প্র—আপনি আপনার ভাইয়ের কান দেখে আসছেন কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেন নি? উ—আমি লক্ষ্য করিনি, তবে রোজই দেখ্‌ছি একভাবেই আছে। প্র—আপনার ভাইয়ের মুখ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যা দেখেছেন এখনও সেই রকম দেখছেন? উ—মুখের আদল বদলায়নি। একেবারে চিরযৌবন থাকা অসম্ভব। মুখের চামড়া একটু ঢিলা হয়েছে, বয়সের সঙ্গে সাধারণ যে রকম পরিবর্ত্তন হয় সেই রকমই হয়েছে। প্র—আপনি আগের চাইতে মোটা হয়েছেন কি? উ—হাঁ।

প্র—তুই সেট্‌ ছোটকুমারের লেখা দেখাতে আপনি বলেছিলেন—আপনাদের পক্ষ হতে যা দেখান হচ্ছে সেটা আরও ভাল লেখা—কি মনে করে একথা বলেছিলেন? উ—আমার চোখে ভাল লাগে। প্র—তুই রকম লেখার ভিতর যখন পার্থক্য আছে বলেন কেন আছে বলতে পারেন? উ—সেটা আমি বিশ্লেষণ করে বলতে পারব না। প্র—আপনি যখন লেখেন আপনার লাইনগুলি খুব সোজা হয় কি? উ—খুব বাকা হয় বলে মনে হয় না। সোজাই হয় একটু বাঁকা যে হয় না তা বলি না।

প্র—আপনার বাংলা হাতের লেখা বড় কুমারের হাতের লেখার থেকে ভাল না খারাপ? উ—আমি তা বলতে পারব না। প্র—আপনি বড়কুমারের হাতের লেখা দেখেননি? উ—হাঁ। প্র—আপনি ভাসুরের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা

করতে চান না নাকি? উ—না। প্র—তবে আপনি বলছেন না কেন? উ—বড়কুমারের হাতের লেখাই ভাল ছিল। প্র—বড়কুমার, বড়রাণীর ভিতর কার লেখা ভাল? উ—বড়কুমারের। আপনি বড়রাণীর লেখা চেনেন? উ—হাঁ। প্র—ছোট রাণী চিরদিনই কি চিঠি লিখতে পারতেন? উ—হাঁ। প্র—আপনাদের তিন যায়ের ভিতর আপনার হাতের লেখাই কি ভাল? উ—আমি তা বল্‌তে পারি না, সকলে তাই বলে।

কুমারের শালা
সত্যেন ব্যানার্জ্জীর
জবানবন্দী ও জেরা

(জবানবন্দীর শেষাংশ)

আমি ফণী বানার্জ্জীকে চিনি। ফণীবাবু মনমোহনকে নিয়া কখনো আমার বাড়ীতে যায় নাই। মনমোহনবাবুর ভাইও কখনো আমার বাসায় যায় নাই। আমি জয়দেবপুর যাইয়া মেজকুমারের বিশ্রামের ঘরে শুইতাম। মেজকুমার তাহার নিজের ঘরেই শুইতেন।

জয়দেবপুরে মেজকুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে যে টেলিগ্রাম এসেছিল, তাহা আমি কখনও দেখি নাই। বাদী আসার পর ম্যানেজারের বা কালেক্টারের নিকট হ'তে আমি একটী চিঠি পাই—সমস্ত টেলিগ্রামগুলি পাঠাবার জন্য—যে গুলিতে মেজকুমারের রোগ ও মৃত্যু সবই লেখা আছে। আমি ঐ বিষয়ের কতকগুলি টেলিগ্রাম শৈলেন্দ্র মতিলালের নিকট দেখিয়াছি। আমার মনে হয় যে আমি এই মর্ম্মে ম্যানেজারকে বা কালেক্টারকে চিঠি দেই যে সরযূবালা দেবী বা শৈলেন্দ্রবাবুর নিকট এই মর্ম্মে চিঠি লিখুন।

মেজকুমার সব কুমারদের মধ্যে বেশী বুদ্ধিমান। মেজকুমারের চেহারা আমার মনে আছে। তাহার রং খুব ফর্সা ছিল। শরীর ছিল হরিদ্রাভ এবং মুখ ছিল লালাভ। তাহার চুলের রং বাদামী, নাক ধারাল এবং চোখা। চক্ষু হালকা নীল ও ভাসা-ভাসা। কান মানানসই। ঠোঁট পুরু নয় পাতলাই। তাহার নীচের ঠোঁট বাঁকা ছিল না। বড়কুমারের ঠোঁট বাঁকা ছিল। মেজকুমারকে খালি গায়ে দেখেছি। তাহার বুকের মাঝখানে সামান্য লোম ছিল। সে বুক কামাইত না। মেজকুমারের কোন বাঘী অপারেশন্ হয়েছে বলে আমি শুনি নাই। তাহাকে বাঘে থাবা দিয়েছে বা তাহার হাতে উহার দাগ আছে এবং তাহার দাঁত ভেঙ্গেছে বলে শুনি নাই। গাড়ীর চাকা পায়ের উপর দিয়া যাওয়ায় কোন দাগ পড়েছিল বলিয়াও শুনি নাই।

মেজকুমারকে গাড়ী চালাতে ও ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি। সে বাম হাতে রাস ধরত।

১৯০৯ সনের কয়েক মাস আমি ডাইরী রেখেছিলাম। মেজকুমারের মৃত্যুর পর যখন আমরা জয়দেবপুর ফিরে এলাম তখন আমাকে ম্যানেজমেণ্ট সম্বন্ধে বলা হয়। বিভাবতীর সেয়ার সম্বন্ধে আমিও কিছুই জানিতাম না। আমি ঐ দলিল আসল দলিল বলে মনে করি নাই। আমি মনে করেছি যে আমার বোনের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। আমি মনে করলাম যে আমি ঘটনাগুলি লক্ষ্য করব এবং প্রতিদিনের সমস্ত ঘটনা এবং তাহাতে আমার মতামত প্রতিদিন লিখে রাখব। তখন আমি ডাইরী লিখতে আরম্ভ করি। আমি ভেবেছিলাম যে দার্জ্জিলিংএর ঘটনাবলী যতদূর সম্ভব লিখে রাখব। বছরের শেষ পর্য্যন্ত ডাইরী লিখেছিলাম। যখন পরিচালনার ব্যবস্থা সংক্রান্ত দলিলের কথা চলে গেল এবং বিভাবতী তার পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পেলেন তখন লেখা বন্ধ করলাম। কিন্তু ডাইরী আমার কাছে নাই, উহা চুরি হয়ে গেছে। আমার সন্দেহ যে উহা বাদীর হাতে আছে। ঐ ডাইরী ছাড়া আমার সমস্ত পুরাণ চিঠি ও কাগজ-পত্র চুরি গেছে। আমার সন্দেহ হয় যে মনোমোহন ভট্টাচার্য্য সেই বরখাস্ত করা কেরাণী ইহা নিয়েছে। আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল যখন আমি ঢাকায় এসে জানতে পারলাম যে মনোমোহন মেজকুমারের কুষ্ঠি-পত্র বাদী-পক্ষের হাতে দিয়েছে। এই কুষ্ঠি-পত্র ও পুরাণ চিঠি-পত্রের নকল ছিল।

(এ সময়ে মিঃ চৌধুরী বলেন যে ঐ ডাইরী সাক্ষীর হাতে থাকিলে উহা সে নিজেই কোর্টে দাখিল করিত।)

বিভাবতী তাহার সম্পত্তি পরিচালনা করবার জন্য আমাকে ছাড়াও সুরেন্দ্র মতিলালের নিকট উপদেশ নিত। সুরেন্দ্র মতিলাল বড়কুমারের শ্বশুর। তিনি আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। আমিও বা কোন সময় যেতাম। মতিলালবাবু চিঠির খসড়া করে দিলে আমরা উহা বিভাবতীর সই ও চিটের জন্য তাহার নিকট পাঠিয়ে দিতাম। এ সব চিটের কোন কোনটা পোষ্য রদের মামলায় দাখিল করা হয়েছে। সুরেন্দ্র মতিলালের লেখা আমি চিনি। (একজিবিট ২৫৯-২৫৯ এফ্ প্রভৃতি দেখান হইলে) সাক্ষী বলেন এগুলি সবই সুরেন্দ্র মতিলালের লেখা।

বড়রাণী ও বিভাবতীর মধ্যে ১০ বৎসর যাবৎ ভাল ভাব নাই। যেদিন হ'তে বিভাবতী পোষ্য সংক্রান্ত মামলায় সংশ্লিষ্ট না থাকলেও সাক্ষ্য দ্বারা উক্ত মামলা সমর্থন করেছে সেই দিন হ'তেই এ অবস্থা।

ছোটকুমারের মৃত্যুর পর সরযূবালা দেবী ক্রমাগতই চেষ্টা করছিলেন তার ভাইএর ছেলেকে পোষ্য নেবার জন্য। আনন্দকুমারী উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাই আনন্দকুমারী রামনারায়ণকে পোষ্য নিলে সরযূবালা দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হন। তিনি কখনও আনন্দকুমারীকে বা তাহার পোষ্য রামনারায়ণকে ক্ষমা করিবেন না। বিভাবতী ঐ পোষ্য স্বীকার করিলে তিনি তার বিরুদ্ধেও ক্ষেপে গেলেন।

বিভাবতী পোষ্য সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্য দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি চুপ করেই ছিলেন। যখন জানলেন বিভাবতী পোষ্যের

পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন তখন তিনি তাহার বিরুদ্ধে গেলেন। ভাবলেন এক ঘায়ে তিনটি পাখী অর্থাৎ বিভাবতী, রাম ও আনন্দকুমারীকে মারবেন। অবশ্য এই সমস্তই আমার নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান।

আমার সহিত সরোজিনী দেবীর সদ্ভাব নাই। সুরসুন্দরীর সহিতও আমার বা বিভাবতীর ভাল ভাব নাই। রামশশী দত্ত নামে বিভাবতীর এক কর্ম্মচারী আছে। সে প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ তাহার চাকুরী করে। তাহার বাড়ী হুগলী। সে বর্ত্তমানে ঢাকায় আছে।

প্র—এ কথা কি সত্যি যে মেজকুমারকে দার্জ্জিলিংয়ে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে? উ—না। প্র—ইহা কি সত্য যে আপনি আশুকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে যেখানে মেজকুমারকে পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করতে আদেশ দিয়েছিলেন? উ—না। প্র—আপনি কি মেজকুমারকে দার্জ্জিলিং যেতে বাধ্য করেছিলেন? উ—কখনও না।

মিঃ বি, সি চ্যাটার্জ্জির জেরা—

প্র—আপনি আপনার বোনের সহিত একমত কি না যে তার বিষয় সম্বন্ধে আপনি সতর্ক থাকেন? উ—হ্যাঁ। প্র—এই মামলা সম্পর্কে আপনি তার স্বার্থ দেখেন কি? উ—হ্যাঁ। প্র—তার স্বার্থ ছাড়া এই মোকদ্দমায় আপনার নিজের কোন স্বার্থ আছে কি? উ—হ্যাঁ। প্র—প্রয়োজন হলে আপনি

উকীল প্রভৃতিকে পরামর্শ দিতেন এই মর্শ্মে এই আদালতে রাণী বিভাবতী যে উক্তি করেছেন তাহা কি আপনি সমর্থন করেন? উ—উকীলরা যা জানতে চেতেন তাই বলতাম।

প্র—বিবাদীগণের অথবা বিভাবতীর পক্ষে এই আদালতে আপনি কখনও কোন চালাকি করেন নাই একথা কি আমি ধরে নিতে পারি? উ—না, যদি কোন চাতুরী থাকে তবে আমি নিজেই লজ্জিত হব। কোর্টে সত্যি ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু আমি বলি নাই।

প্র—এই আদালতের নিকট যা কাল্পনিক তার পরিবর্ত্তে যা সত্যি তাই উপস্থিত করার দিকে দৃষ্টি রাখতে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কি? উ—আমি কেবল সত্যি ঘটনা বল্‌তে চেষ্টা করেছি।

প্র—আমি কি ইহা ধরে নিতে পারি যে আপনি এই আদালতে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাহা বেশ বুঝতে পেরেছেন? উ—সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি তা বলি না কিন্তু নানা কাগজে পড়েছি। উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্যগুলি ভাল করেই পড়েছি। ষ্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার স্থানীয় বাঙ্গলা কাগজ 'চাবুক' 'বাংলার রূপ' প্রভৃতিতে পড়েছি।

প্র—আপনি কি বলতে চান যে সাক্ষ্যের সঠিক বিবরণের জন্য আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন ছিলেন না? উ—আমি সেগুলো সঠিক বিবরণ বলেই মনে করতাম। তবে উদ্বিগ্ন ছিলাম না। প্র—কে আপনাকে ভরসা দিল? উ—আমার মনে নাই। প্র—কেন আপনি এই রিপোর্টগুলি পড়তেন? উ—

স্বভাবতঃই। প্র—কেন স্বভাবতঃই পড়তেন? উ—কারণ এর সঙ্গে আমার ভগিনী, আমি নিজে এবং আমার পরিবারের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম জড়িত।

প্র—এইগুলি কি আপনার পক্ষে খুব প্রণিধান যোগ্য বিষয়? উ—হাঁ, কারণ আমার বিরুদ্ধে এরূপ সমস্ত অমূলক নিন্দাবাদ ও কুৎসিৎ অভিযোগ পড়েছি যা হয়ত বাদী নিজে আনতেও সাহস পেতেন না, তাই আমি এই সমস্ত সাক্ষ্য পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্র—আপনি কি জানেন যে বিবাদী পক্ষ এই সমস্ত সাক্ষ্যের নকল নিতেছেন? উ—আমি জানি। প্র—আপনার পক্ষে এই সব নকল পাওয়া কি অসম্ভব? উ—না। উ—এই সব কপিতে সঠিক বিবরণ থাকে কি? উ—হাঁ। 'ষ্টেট্সম্যান'এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে কি? উ—হাঁ। প্র—আপনাকে কেহ কি বলেছে যে 'অমৃতবাজারে' যা উঠে তা সঠিক বিবরণ? উ—আমার উকিলদের সহিত পরামর্শের সময় আমি শুনেছি। শশাঙ্কবাবু ও পঙ্কজবাবু আমাকে বলছেন। উ—এই কথাবার্ত্তা আপনি সঠিক বিবরণ জানতে চেয়েছিলেন বলেই কি উঠেছিল? উ—কারণ আমি বোধ হয় কোন স্থানীয় কাগজ সম্বন্ধে তাদের কাছে অভিযোগ করেছিলাম যে সেই পত্রিকাতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অসম্পূর্ণ বিবরণ থাকে। কলিকাতার পত্রিকা সম্বন্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। এই মোকদ্দমার সত্য খবর সম্বন্ধে অমৃত-বাজার পড়তেই আমি উপদিষ্ট হয়েছিলেম।

প্র—ধরুন আপনি এই মোকদ্দমার বিবাদী পক্ষ। তা

হলে আপনি কি এই আদালতে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার টাইপ-করা নকল দেখতে চাইতেন? উ—আমার মনে হয় কাগজে যে বিস্তৃত বিবরণ বের হয় তাই যথেষ্ট।

কোর্টের প্রশ্নে—আমি বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্যের কতকগুলি ছাপান নকল দেখেছি। প্র—কার কার সাক্ষ্যের ছাপান নকল দেখেছেন? উ—বিভাবতী দেবী ও বাদীর দেখেছি। অন্য কারোটা মনে নাই। পত্রিকায় যে সাক্ষ্য সমস্ত বের হয় নাই তারই টাইপ করা কপি দেখেছি। কর্ণেল ক্যালভার্টের সাক্ষ্য আমি উকিলের নিকট হতে শুনেছি। বোধ হয় পঙ্কজবাবু ও সরকারী উকিলের কাছ থেকে শুনেছি।

প্র—আপনি কি আজই প্রথম শুনলেন যে মিঃ লিণ্ডসে ও ক্যালভার্টের সাক্ষ্য উভয় পক্ষের খরচে বিলেতে গিয়ে নেওয়া হয়েছিল? উ—আমি আজই প্রথম শুনলাম। তবে এতে আমি আশ্চর্য্য হইনি। আমি এ সম্বন্ধে তাদের কাছে খোঁজ নেই নাই। আমি জানি না, গিয়ে লওয়া হয়েছিল কিনা। আমি তাদের কাছে শুধু সাক্ষ্য কি দিয়াছে তাই শুনেছি। এবং তাদের কথার উপরই বিশ্বাস করেছি। সাক্ষ্য নিজে পড়ে দেখি নাই। বিবাদী পক্ষের উকিলের কথায় আমি অমৃতবাজারের খবর যথার্থ বলেই ধরে নিয়েছি।

প্র—আপনি কি জানেন যে বাদী বলেছেন বিভাবতীর চক্ষু একটু বসা, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অন্যান্য চিহ্ন সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন। উ—হাঁ। প্র—আপনি কি জানেন যে জেরার সময় মিঃ চৌধুরী বলতে চেয়েছেন যে এক নম্বর বিবাদী রাণী

বিভাবতীর শারীরিক চিহ্ন সম্বন্ধে বাদী যা বলেছেন তা মিথ্যা? উ—আমি আজ পর্য্যন্ত তা জানি না, বা এবিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। প্র—আপনি কি জানেন, আপনার বোন বলেছেন যে তিনি আপনাকে ইহা উকিলদের জানাতে বলেছিলেন? উ—আমি যখন পড়েছি তখন নিশ্চয়ই জানি। প্র—এই সম্বন্ধে আপনি কারো কাছে বলেছেন? উ—আমি উকিলদের কাছে বলেছি। আমি নিজে তাদের লিখেও জানিয়েছি। প্র—আপনি কি বুঝতে পারছেন যে যদি বিভাবতী সাক্ষীর কাঠগড়ায় না দাঁড়াতেন তা' হলে আদালত তার অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং বসা চোখের পাতা দেখতে পারতেন না? উ—উহাকে চিহ্ন বলা যায় না।

প্র—আপনি কি জানেন যে বিল্লু বাবুকে মিঃ চৌধুরী পুনরায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বিভাবতী অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েছিলেন? উ—হাঁ। প্র—বিভাবতী কি বলেছেন জানেন? উ—হাঁ। আপনি কি জানেন যে মিঃ চৌধুরী কেন বিল্লুকে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন? উ—আমি জানি না। হয়ত বিভাবতীর পরামর্শেই হয়ে থাকবে। আমি এই পরামর্শ দেই নাই। প্র—আপনি ও আপনাদের পক্ষ থেকে এই মোকদ্দমা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে বাদীর খুব বড় পা আছে বলে অনেক কিছু বলেছিলেন? উ—আমি বলিনি। তার পায়ের দিকে তাকাবার সুযোগ আজ পর্য্যন্ত আমার হয় নি।

প্র—আপনি কি বলতে চান যে মিঃ চৌধুরী এইচ, ডি, ঘোষালকে বিনা পরামর্শেই এ প্রশ্ন করেছিলেন? উ—আমি

জানি না। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। প্র—আপনি কি জানেন যে মিঃ চৌধুরী ঘোষালকে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে মেজকুমারের খুব ছোট ছোট মেয়েলী পা ছিল এবং ৬নং জূতা পায় দিত? উ—আমি জানি না। প্র—মেজকুমারের ছোট পা ছিল কিনা? উ—হাঁ। প্র—মেজকুমার ৬নং জূতা পায় দিত এ কথা বলতে মিঃ চৌধুরীকে কে পরামর্শ দিয়াছিল? উ—জানি না। প্র—আপনি কি আজই এ কথা প্রথম শুনলেন? উ—হয়ত পূর্ব্বেই শুনেছি, সেই সময়েই বা পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছি। প্র—By that time (বাই দ্যাট টাইম) মানে কি? উ—যখন ঘোষালের জেরা হচ্ছিল। প্র—কোথায় আলোচনা হয়েছিল? উ—বোধ হয় কলিকাতায় আমার বা রায় বাহাত্বরের পুত্রের বাড়ীতে এই কথা হয়েছিল।

কোর্ট—রায় বাহাত্বরের সেই ছেলের নাম কি? উ—শিশিরবাবু।

প্র—৬ নং জূতা সম্বন্ধে কে পরামর্শ দিয়েছে? উ—আমি জানি না। আমার পরিচিত কেহ দেয় নাই। এর মধ্যে আমি বিভাবতীকেও ধরে নিচ্ছি। বহু পূর্ব্বে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস ইউরোপীয়ান দর্জ্জি, জূতা প্রস্তুতকারক প্রভৃতির বিশেষ খোঁজ করেছিলেন। হয় ত মিঃ চৌধুরী সেই সমস্ত কাগজ-পত্র দেখে থাকবেন। বাদী আসার পর এই তদন্ত হয়েছিল। বোধ হয় গত ২।৩ বৎসর যাবৎ চলেছে। আমি নিজেও এই অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেক ব্যবসায়ীকে আমি এ বিষয়ে বলেছি তবে কোন পয়েন্ট সম্বন্ধে কিছু বলি

নাই। এগুলো রায় বাহাদুর শশাঙ্ক ঘোষ, এ্যাডভোকেট জেনারেল, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল, লিগ্যাল রিমেমব্রান্স প্রভৃতি আইন ব্যবসায়ীদের কাজ।

চ্যাটার্জ্জী বলেন, আমি বলিনা যে বিবাদী পক্ষে গভর্ণমেণ্ট আছেন।

প্র—আপনি কি হলপ করে অস্বীকার করবেন যে বিভাবতী দেবী বোর্ড অব রেভিনিউকে জানিয়েছেন যে মেজকুমার ৬নং জুতা পরতেন? উ—বিভাবতী কখনও জানায় নাই। অন্য কর্ম্মচারীরা বলিতে পারে। প্র—আপনি কি বলিতে চান মেজকুমার ৬নং জুতা পরতেন? উ—আমি বলতে চাইনা কারণ আমি জানি না। প্র—আপনি বা আপনারা জানেন বলেই এ বিষয়ে মিঃ চৌধুরী জেরা করেছিলেন? উ—না। প্র—মিঃ চৌধুরী বলেছেন—বাদীর পা মেজকুমারের পায়ের চেয়ে বড় একথা কি আপনি জানেন? উ—হতে পারে, আমি শুনতে পারি। তবে আমি বলি না যে মিঃ চৌধুরী নিজেই ইহা উদ্ভাবন করেছেন, মিঃ চৌধুরী আমার ভগ্নীর পক্ষ থেকেই জেরা করেছেন। প্র—আপনি কি জানেন না যে বাদীর পা কোর্টে পরীক্ষা করে ঐ জুতা পায় দেওয়া হয়েছিল? উ—জানি, হতে পারে এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

প্র—মেজকুমারের খালি পা দেখেছেন? উ—দেখেছি কোন সন্দেহ নেই। যেমন তার মুখ দেখেছি পাও ঠিক তেমনি দেখেছি। প্র—আপনি কি আশুবাবুর সহিত এ বিষয়ে একমত যে জ্যোতির্ম্ময়ী, বুদ্ধু ও মেজকুমারের পায়ের

হাঁটুর চামড়া অস্বাভাবিক রকমের কর্কশ? উ—আমি জানি না। কর্কশ চামড়া প্রভৃতি বলতে আপনি কি বুঝাতে চান? প্র—ছোটকুমারের পা-তে কি কোন বিশেষত্ব আছে? উ—জানি না। মেজকুমারের, জ্যোতির্ম্ময়ীর ও বুদ্ধুর পায়ে কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিনি। জ্যোতির্ম্ময়ীর পা আমি খুব কমই দেখেছি। বাদীর পা আমি পরীক্ষা করে দেখিনি। জ্যোতির্ম্ময়ী ও বাদীর হাঁটুর চামড়া কর্কশ ইহা আমি জানি না। প্র—এ বিষয়ে আপনি কোন সাক্ষ্য পড়েছেন কি? উ—নিশ্চয়ই পড়েছি কিন্তু মনে নাই।

প্র—কোন্ পত্রিকায় পড়েছেন বলতে পারেন? উ—হলপ করে বলতে পারি না। আপনি কি আজ পর্য্যন্ত ওয়াকিবহাল আছেন যে মেজকুমারের হাঁটুতে একটা দাগ আছে? উ—আমি শুনেছি অথবা পড়েছি। কাহার নিকট শুনেছি বলতে পারি না। প্র—যাদের নিকট শুনেছেন তারা কি বাইরের লোক না যারা এই মোকদ্দমার খবরাখবর করেন তারা? উ—আমি বলতে পারি না, কারণ ইহা আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি না। প্র—আপনি জানেন কি বিবাদীপক্ষের কাউনসেল এই মর্ম্মে দরখাস্ত করেছিলেন যে মেজকুমারের সেই যায়গায় কোন কাটা দাগ নাই যা বাদীর বাঁ হাঁটুতে আছে। উ—আমি জানি না। যদি তিনি ইহা করে থাকেন, কেন করেছেন জানি না। তবে উপদেশ অনুসারেই করেছেন। আমি জানি না যে মেজকুমারের বাঁ হাঁটুতে কোন কাটা দাগ আছে। আমি বলছি না যে আমি দেখিনি বলেই তা নেই। আমি

বলতে পারি না যে কাউনসেলকে কে এইভাবে মামলা উপস্থিত করতে উপদেশ দিয়েছেন। সে সব পুরাণো কর্ম্মচারী ভাল জানত, তারা বলতে পারে, তাদের মধ্যে রায়সাহেব যোগেন্দ্র বানার্জ্জি হয় ত বলে থাকবেন। প্র—কর্ম্মচারী ছাড়া আর কে ইহা জানতে পারে? উ—চাকরেরা এবং আমার বোন। চাকরদের মধ্যে বিপিন, মুনিয়া (মুইনা) এই দুইজন বেঁচে আছে এরাই জানে।

প্র—বিবাদীপক্ষের কাউনসেল এই বলেছেন যে ছোট-কুমারের বিয়ের সময় মেজোর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি? উ—আমি জানি না। এ সব উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্র—আপনি কি বলতে চান যে মেজকুমারের যে কাটা দাগ ছিল এবং যা সকলেই স্বীকার করেন, সেই দাগ বাদীর আছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত করা কোর্টের পক্ষে প্রয়োজন নয়? উ—'আমি বলি না'—এ কথা কখনও বলি নাই। এটা বিশেষ দরকারী প্রশ্ন। কিন্তু দাগটা গাড়ী দুর্ঘটনা না অন্য কিছুর জন্য হয়েছে সেটা মনে রাখা মোটেই প্রয়োজনীয় মনে করি নাই।

প্র—বাদীর ও মেজোর স্বীকৃত দাগ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছেন? উ—না। তবে আমি বলি না যে কুমারের ঐ সব দাগ ছিল। অপর পক্ষে আমি শুনেছি যে বাদীর গায়ে এমন কতকগুলি দাগ আছে যা কুমারের ছিল। আমি আরও শুনেছি যে কুমারের গায়ে যে সব দাগ ছিল সেগুলি বাদীর গায়ে তৈয়ারী করা হয়েছে। আমি এ কথা জয়দেবপুরের অধিবাসী

ও চাকর বাকরদের এবং স্থানীয় উকীলের নিকট শুনেছি। প্র—কবে শুন্‌লেন। উ—সাধু এসেছেন পরে। প্র—স্থানীয় উকীল বলতে কি বোঝেন ? উ—মিঃ শশাঙ্ক ঘোষ, পঙ্কজ ঘোষ ও উপেন্দ্র বানার্জ্জি প্রভৃতি।

প্র—তৈরী কথাটা নিরলম্ব নাকি ? উ—আমি জানি না। কি উপলক্ষে তারা একথা উল্লেখ করিছিলেন সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আমার নাই। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত শুনেছেন কি যে বাদী আসার পর আত্মীয় স্বজন বলেছেন যে বাদীর শরীরে কুমারের মতই চিহ্ন আছে ?

উ—'বাদীর শরীরে কুমারের চিহ্ন সকল বর্ত্তমান'—এ কথা জ্যোতির্ম্ময়ী ছাড়া আর কেহ বলে নাই। প্র—বিবাদীপক্ষ হতে এখনকার উল্টো কথা বলার পূর্ব্বে আপনারা সকলেই কি এই বলিতেন না যে বাদীর শরীরের চিহ্নগুলি তৈরী করা হয়েছে ? উ—বিবাদীপক্ষ হতে কাউনসেল চিহ্ন সম্বন্ধে কি বলেছেন জানি না—আমি কখনও ইহা বলি নাই যে বাদীর চিহ্নগুলি তৈরী করা হয়েছে।

প্র—যখন কোর্টে বলছিলেন যে চিহ্নগুলি তৈরী করা হয়েছে তখন কি মেডিক্যাল জুরিসের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ? উ—না। প্র—আপনি কি এই বলবেন যে বাদীর চিহ্নগুলি মেজকুমারের চাপান হয়েছে ? উ—না। প্র—আপনার বোনের পক্ষ থেকে কুমারের জীবন-বীমার টাকা তুলবার ব্যবস্থা করেছিলেন কি ? উ—হ্যাঁ। ১৯১০ সালে ১১ সালে কিনা বলতে পারি না, তবে বড়কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বে।

প্র—বাদী আসার পর পলিসির কাগজ-পত্র সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? উ—হাঁ। প্র—কি করা হয়েছে? উ—আমাদের কাছে যে কপি ছিল আমরা উহা বোর্ড অব্ রেভিনিউতে পাঠিয়েছিলাম।

প্র—কোম্পানীর নিকট তে মূল কাগজপত্র ছিল সে সম্বন্ধে বোর্ড কি করেছেন জানেন? উ—আমাদের কাগজ-পত্র পেয়ে নিশ্চয়ই কিছু করেছেন। কোর্টের প্রশ্নে—বাদী আসার এক সপ্তাহ বা দশ দিন পর পলিসির কাগজ বোর্ডে পাঠিয়েছিলাম। প্র—আপনাদের কাছে কি কাগজপত্র ছিল? উ—টাকা তুলবার যে ফর্ম্ম পূর্ণ করা হয়েছে তারই নকল। আমি বোর্ডের অফিসার ও মেম্বারদের সহিত দেখা করেছিলাম। আমি কখনও একা কখনও রায় বাহাদুরের সাথে সেখানে গিয়াছি। আমি মিঃ লিথব্রীজকে বলেছিলাম যে মূল কাগজ তাহার দেখা উচিত। উহা যে শুধু ফটোগ্রাফ তা জানিনা। জীবন-বীমা আফিসে আমি বা আমার কোন লোক মূল কাগজের জন্য লিখে পাঠায় নি, তবে বোর্ড লিখিতে পারে।

প্র—আপনি কি জানেন যে বোর্ডে ঐ কাগজ কয়েকমাস ছিল—পরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উ—আমি জানি না। মিঃ চৌধুরী বলেন—মিঃ চ্যাটার্জ্জী কি জানেন যে ঐ কাগজ বোর্ডে ছিল? মিঃ চাটার্জ্জী—ঐ সম্পর্কিত চিঠি-পত্র এখানে দেখবার সাহস থাকলে সকলেই জান্তে পারত। উহা যে বোর্ডে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্র—বাদী জীবন-বীমা প্রস্তাবপত্র দাখিল করেছেন জানেন

কি ? উ—আমি জানি না। বিবাদীপক্ষ হতে পলিসির সমস্ত কাগজ-পত্র দাখিল করা হয়েছে। প্র—আপনি কি শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে বাদী কোম্পানী হইতে মূল কাগজ আনিয়ে দাখিল করেছেন ? উ—আমি জানি না। মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ক্যাডি প্রদত্ত গোপনীয় রিপোর্ট (একজিবিট ২৩০) দেখান হইলে সাক্ষী উহা কোর্টে পড়ে না। তাহাতে সনাক্ত চিহ্নের মধ্যে বাম হাঁটুর উপর একটা কাটা দাগের উল্লেখ আছে। সাক্ষী স্বীকার করেন যে ইহা সনাক্ত চিহ্ন তবে তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

প্র—আপনি কি আজই প্রথম শুনলেন যে এই কাগজ বাদী কোর্টে দাখিল করেছেন ? উ—হ্যাঁ, আজই প্রথম শুনলাম যে বাদী ইহা কোর্টে দাখিল করেছেন। প্র—এই বিশেষ ঘটনাটাকে আপনার উকিলরা কি আপনাকে জানায় নাই ? উ—না, কোন বিশেষ কাগজ সম্বন্ধে আমাকে তারা বলে নাই।

প্র—আপনি আপনার উকীলদের যে পরামর্শ দিয়েছেন তা দিয়ে নিজেকেই মিথ্যাবাদী করে তুলেছেন এ কথা বলতে কি আপনি লজ্জা বোধ করছেন। উ—আমি কখনও এ বিষয়ে আমার উকীলদের পরামর্শ দেই নি।

প্র—আপনি কি জানেন যে ডাঃ ব্রাড্‌লি এখানে বলেছেন যে ঐ কাগজে যে চিহ্নের কথা লেখা আছে উহা বাদীর শরীরে আছে ? উ—হয়ত পড়েছি, সম্ভবতঃ শুনেছি, আমার কিছু মনে নাই।

প্র—ছোটকুমারের বিয়ের সময় মেজকুমার পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন কি না এ সম্বন্ধে আপনার স্মৃতিদ্বার কি একেবারেই রুদ্ধ? উ—হাঁ। প্র—মেজকুমারের জীবন-বীমা সম্বন্ধে মিঃ জি, সি, সেন, কোম্পানীর এজেণ্ট ছিলেন না বলে আপনি আপনার উকিলদিগকে মিথ্যা পরামর্শ দিয়াছিলেন কি না? উ—আমি এই পয়েণ্টে উকিলদের কোন পরামর্শ দেই নাই। মিঃ চৌধুরীকে আমি পরামর্শ দেই নাই।

প্র—আপনি জানেন যে জি, সি, সেন যে এজেণ্ট ছিলেন না এ কথা মিথ্যা বলছেন?

উ—না। আজ পর্য্যন্তও আমি বলতে পারি না যে মিঃ চৌধুরীকে এই বিষয়ে কে বলেছেন? ইহা সত্য কি মিথ্যা আমি জানি না।

প্র—মিঃ জি, সি, সেনকে কি এই প্রশ্ন মিঃ চৌধুরী করেছিলেন? উ—আমি জানি না। আমি তার সাক্ষ্য পড়েছি। মিঃ চৌধুরীর এই কথা হয়ত আমার চোখে পড়ে নাই—নয় ত যে কাগজ আমি পড়েছি তাতে উহা ছিলই না। যদি উহা দেখতাম তবে আমি ভাবতাম যে উহা মিথ্যা খবরের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্র—আপনি কি জানেন যে জি, সি, সেনকে মিঃ চৌধুরী বলেছিলেন যে জি, সি, ভড় সেই কোম্পানীর এজেণ্ট ছিল। উ—আমি জানি না। প্র—আপনি জি, সি, ভড়কে চিনেন কি না? উ—না। তাহাকে জানি না, ঐ বীমা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট জি, সি ভড়কে জানি না। মিঃ চৌধুরীকে কে পরামর্শ

দিয়াছিল জানি না—আমি কোন অনুসন্ধান করি নাই। প্র—জি, সি, সেন যে বাদীকে সনাক্তের জন্যই সাক্ষ্য দিয়াছেন, জানেন? উ—হ্যাঁ। আমি এখন পর্য্যন্তও কোন ধারণা করতে পারি নাই যে জি, সি সেনকে কেন মিঃ চৌধুরী এই প্রশ্ন করেছিলেন? জি, সি সেনের সাক্ষ্য আমি বিশেষ ভাবে পড়েছি

প্র—আপনি ও আপনার সংশ্লিষ্ট লোকেরা মিঃ চৌধুরীকে কোন মিথ্যা উপদেশ দিয়াছেন? উ—কখনও না। জীবন-বীমার টাকা পাবার পূর্ব্বে রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে সনাক্তের এফিডেভিট সার্টিফিকেট যে কোম্পানীতে পাঠান হয়েছিল তাহা জানি। কলীপ্রসন্নবাবু কুমারদের ভাল জানতেন। তিনি আমার চেয়ে কুমারদের বেশী দেখেছেন কিন্তু আমার মত এত ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন নাই। কারণ তিনি বুড়ো ছিলেন।

(একজিবিট ২৮ দেখাইয়া।)

প্র—ঐখানে যে লেখা আছে কুমারের রং ফর্সা উহা কি ঠিক? উ—হ্যাঁ, তবে আমি বলি খুব ফর্সা, সময় অনুযায়ী ঠিকই লেখা আছে। প্র—এই কাগজ যে বিবাদীপক্ষ দাখিল করেছে জানেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি কি জানেন যে বিবাদীদের বিরুদ্ধে বাদীও ইহা কোর্টে দাখিল করেন? উ—না। প্র—এখানে দেখিতেছেন যে রায় বাহাদুর কালী-প্রসন্ন ঘোষ বলিতেছেন যে মেজকুমারের চক্ষু ও চুল কটাভ? উ—হ্যাঁ। প্র—আপনি বিবাদীপক্ষের উকীলদের কি উপদেশ দিয়েছিলেন যে মধ্যমকুমারের চক্ষু ফিকে নীল বা নীলাভ?

উ—আমার পক্ষে কোন উপদেশ দেওয়া অসম্ভব। আমি এই উপদেশ দেই নাই।

প্র—আমি আপনাকে বলছি যে আপনি কোন উপদেশ দিয়াদেন এ কথা অস্বীকার করছেন শুধু আপনাকে বাঁচাবার জন্য? (to save your skin) উ—আমি ইহা অস্বীকার করছি। ইহা অসভ্যতা (impertinence) মিঃ চাটার্জ্জী বলেন, সাক্ষী নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইবেন এবং এই কথা বলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন।

মিঃ চৌধুরী "আপনাকে বাঁচাবার জন্য" কথাটায় আপত্তি করিলে জজসাহেব বলেন যে to save your skin কথাটা কোন খারাপ নয়। আর যে পর্য্যন্ত আমি কোন প্রশ্ন উত্থাপনে অনুমতি না দেই সে পর্য্যন্ত সাক্ষী প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। তৎপর সাক্ষী বলেন যে আমি উক্ত কথাটা বলিয়াছি বলিয়া দুঃখিত। আমি উহা তুলিয়া লইলাম।

প্র—আপনি উকিলদের কি পরামর্শ দিতেন? উ—যে সমস্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতো বা আমি নিজে যাহা ব্যক্তিগত ভাবে জানি সে সম্বন্ধে সমস্তই আমি উকিলদের পরামর্শ দিতাম। বিবাদীপক্ষকে সাহায্য করিবার জন্যই ইহা বলতাম। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সাক্ষ্য পড়েছি। ৯ই তারিখ ভোরে তিনি এসেছিলেন কিনা জানি না। তবে তখন আমি তাকে জানিতাম না। আমি কোর্টে এই কথা বলি না যে আমার অনুপস্থিতিতে তিনি এসেছিলেন।

প্র—আপনি জানেন কি যে তিনি বলেছেন যে তিনি ভোরে ষ্টেপ এসাইডে গিয়ে এক আবৃত শব দেখেন এবং তাঁহার নাড়ী ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা করতে চান—ইহা কি হতে পারে না? উ—হতে পারে। ঐ রকম হয়ে থাকলে আমার সাম্‌নে হয় নাই, আমি সব সময় শবের কাছে ছিলাম না। প্র—আপনি কি বলেন যে তিনি ৯ই তারিখ কেন এসেছিলেন তা যে তিনি বলেছেন এ কথা আপনি জানেন না? উ—তিনি কেন এসেছিলেন সেই সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে। প্র—আপনার অজানিত ভাবে ৯ই তারিখ ভোরে কোন ডাক্তার কি কুমারের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখতে পারেন? উ—হতে পারে অসম্ভব নয়।

আশু ডাক্তারের সাক্ষ্য

ডাঃ আশুতোষ ওরফে অনুকূল দাসগুপ্ত (৫২) তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, ১৮৯৫ সালে তাঁহার পরলোকগত পিতা ডাঃ মহিম দাসগুপ্ত জয়দেবপুর রাজবাড়ীর গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে সাক্ষীর পিতার ঢাকা বাবুরবাজারে আর পি সেন এণ্ড কোং নামে একটি ডিস্‌পেন্সারী ছিল সাক্ষী তখন স্কুলে পড়িতেন। কুমারদিগকে বহুবার দেখিয়াছেন।

কুমারদের বয়স তখন ৭ কি ৮ বৎসর তখন নলগোলা রাজ-বাড়ীতে সাক্ষী প্রথম কুমারদিগকে দেখেন। ১৯০৫ সালে সাক্ষী ঢাকা মেডিকেল স্কুল হইতে পাশ করেন। তাহার পর সাক্ষী ৬ মাস বিনা বেতনে রাজবাড়ীতে তাহার পিতার সহকারীরূপে কাজ করেন। অতঃপর সাক্ষী এক বৎসর বলদা দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিক্যাল অফিসাররূপে কাজ করেন। সাক্ষী পুনরায় মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে রাজ-বাড়ীতে তাঁহার পিতার সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালে সাক্ষীর পিতার মৃত্যু হয়। সাক্ষীর পিতার মৃত্যুর পর ডাঃ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইহার পর ছোটকুমারের মৃত্যু পর্য্যন্ত সাক্ষীই গৃহচিকিৎসক ছিলেন। ছোটকুমারের মৃত্যুর পর সাক্ষী জয়দেবপুর বাজারে ডিসপেন্সারী খুলিয়া চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন।

অতঃপর রাজকুমারী ইন্দুময়ী দেবীর নিকট হইতে তাঁহার (ইন্দুময়ীর) মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মাসিক ১৫৲ টাকা মাসোহারা পাইতেন এবং ১৯১৫ অথবা ১৯১৬ সালে রাজ-পরিবারস্থ লোকের চিকিৎসা করিবার জন্য বাদীর আগমন পর্য্যন্ত রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহাকে বাৎসরিক এককালীন কিছু টাকা দিতেন। সাক্ষী বুদ্ধুবাবুকে উপদংশের জন্য চিকিৎসা করেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট হইতে তার পাইয়া তিনি কলিকাতা যান। কলিকাতা বুদ্ধুবাবুর অস্ত্রোপচারের সময় সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন। ইন্দুময়ী দেবীর

নিকট হইতে তার পাইয়া সাক্ষী ইন্দুময়ী দেবীর জামাতা বীরেন বানার্জ্জিকে চিকিৎসা করিবার জন্য জলপাইগুড়ি যান। সাক্ষী বড়রাণীর ভাই শৈলেন্দ্রকে বসন্তরোগের চিকিৎসা করেন। বড়রাণীর চক্ষু রোগের জন্য মেজর ম্যানর যখন তাঁহাকে চিকিৎসা করেন তখন সাক্ষী তাঁহাকে (বড়রাণীকে) দেখাশুনা করিতেন।

ডাঃ আশু দাশগুপ্ত আরও বলেন, তিনি চক্ষুরোগের জন্য সত্যভামা দেবীকে চিকিৎসা করেন। ১৫২০ সালে সাক্ষী সত্যভামা দেবীর উইলে সাক্ষী হন। কুমারেরা টেনিস খেলিতেন। মেজকুমার ও ছোটকুমার পলো খেলিতেন, গান করিতে পারিতেন এবং ইংরাজী, হিন্দী ও বাঙ্গালা জানিতেন। সাক্ষী যখন বলদা হইতে জয়দেবপুরে আসেন, তখন মেজকুমার পিত্তশূল, উপদংশ ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। মেজকুমারের 'বাগী' রোগ ছিল না। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সাক্ষী ছোটকুমারের সঙ্গে কলিকাতা যান এবং তথায় ১৫ দিন অবস্থান করেন। সাক্ষী মেজকুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যান। মেজকুমার ৮ই মে মধ্যরাত্রিতে ডাঃ ক্যালভার্ট ও ডাঃ নিবারণ সেনের সম্মুখে মারা যান।

প্র—তাঁহার অবস্থা কখন খারাপ হয়? উ—সেইদিন দুপুরের পর হইতে। প্র—তাঁহার রোগের লক্ষণ কি ছিল? উ—অত্যন্ত বেদনা এবং রক্তমিশ্রিত ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ মল; তাঁহার মল চাউল-ধোয়া জলের মত ছিল না। প্র—যে রোগে তিনি মারা যান সেই রোগ তাহার কবে হয়? উ—মৃত্যুর

৩।৪ দিন পূর্ব্বে। প্র—তাঁহার অসুখের বিস্তৃত বিবরণ কি আপনার স্মরণ আছে? উ—আমার স্মরণ নাই তবে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও তার ইত্যাদি হইতে আমার কিছু স্মরণ আছে।

প্র—কুমারের যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা আপনি কি করিয়া জানলেন? উ—ডাঃ ক্যালভার্ট ৫।৭ মিনিট পর্য্যন্ত কুমারের হৃদযন্ত্র, শিরা, তলপেট এবং শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া বললেন যে, কুমারের মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর ডাঃ নিবারণ সেন কুমারকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে দেখিতে পান। ডাঃ বি, বি, সরকার সর্ব্বপ্রথম কুমারের মৃত্যু ঘোষণা করেন—একথা সত্য নহে। কুমারের মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। পরদিন প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কুমারের মৃতদেহ ঐ ঘরে ছিল। তাহার পর মৃতদেহ নীচের তলায় লইয়া যাইয়া খাটিয়াতে রাখা হয় এবং শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। সাক্ষী এই সময় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা করেন। বীরেন বানার্জ্জি মাটীতে গড়াগড়ি খাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। সরিপ খাঁ চিতায় ঝম্প প্রদান করিতে চাহে। মৃতদেহ আপাদমস্তক ঢাকা ছিল—একথা সত্য নহে।

প্র—আপনি মেজকুমারকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, একথা কি সত্য? উ—নিশ্চয়ই নহে। প্র—ইহা কি সত্য যে, আপনি একটী ছোট গ্লাসে করিয়া কোন ঔষধ দেন এবং তাহা পান করিয়া কুমার এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, 'আশু, তুমি আমাকে কি পান করাইলে'। উ—না। যে

সব কর্ম্মচারী কুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, জয়দেবপুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাদের সকলকেই তাঁহাদের পদে বহাল রাখা হয়। সাক্ষী বাদীকে প্রথমতঃ জয়দেবপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে দেখিতে পান। তখন বাদীর সঙ্গে সার্কেল অফিসার তামস দত্ত ছিলেন। সাক্ষী বাদীকে তিন চারবার দেখিয়াছেন। বাদী মেজকুমার নহেন। "ফকীর বেশে প্রাণের রাজা" শীর্ষক একখানা পুস্তিকা প্রকাশের অভিযোগে সাক্ষী পূর্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন। বাদীপক্ষ পূর্ণ ঘোষের মামলার খরচ বহন করেন। সাক্ষী মেজকুমারকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ঐ মামলায় এমন কোন আভাস দেওয়া হয় নাই। ঐ মামলায় সাক্ষী বাদীকে সাক্ষ্য মান্য করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। মেজকুমারের চক্ষু নীলাভ, পিঙ্গলা ছিল, (পরে বলেন) পিঙ্গল নহে নীলাভ। বাদীর চোখ কটা, পিঙ্গলবর্ণ ছিল।

চ্যাটার্জ্জীর জেরা

প্র—আপনি বাদীর অত্যন্ত বিরোধী? উ—হাঁ, আমি তাঁহার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। প্র—এ কথা কি সত্য যে, জয়দেবপুরের রাস্তায় চলিবার সময় আপনি প্রায় ছড়ি দিয়া নানা জিনিসের উপর আঘাত করিয়া বলেন যে, পাঞ্জাবীর মাথা ভাঙ্গিতেছি? উ—না, আমি জানি যে,

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী জবানবন্দী এবং মেজরাণীর জবানবন্দীর মধ্যে কতকটা অসামঞ্জস্য আছে। প্র—সেই অসামঞ্জস্যের হাত এড়াইবার জন্যই কি আপনার সাক্ষ্য যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে? উ—জানি না। প্র—আপনি যে ব্যবস্থা-পত্রের কথা বলিলেন, ডাঃ ক্যালভার্ট তাঁহার সাক্ষ্যে ইহার কথা অস্বীকার করিয়াছেন, উহা আপনি জানেন? উ—না, জানি না। আমি কখনও ডাঃ ক্যালভার্টের সাক্ষ্য পাঠ করি নাই। তবে সংবাদ-পত্রে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। আমি জানি যে, কমিশনে ডাঃ ক্যালভার্টের জবানবন্দী লইবার জন্য রায় বাহাদুর শশাঙ্ক ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট হইতে কোন উপদেশ গ্রহণ করেন নাই।

প্র—আপনি স্বীকার করেন কি যে, এই ব্যবস্থাপত্রে "এলয়ন" আছে এবং উদরাময়ের রোগীকে উহা দিলে উদরাময় বৃদ্ধি পায় বলিয়া উদরাময় ও পিত্তশূল বেদনায় রোগীর জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় না? উ—হাঁ কিন্তু ম্যালেরিয়া ঘটিত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ঔষধ নেওয়া যায়। প্র—ডাক্তারী শাস্ত্রে আপনার এই পর্য্যন্ত যতদূর জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে ৬ই, ৭ই ও ৮ই তারিখে আপনি কুমারের জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি বেশ জানেন যে, মেজরাণী এই কোর্টে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, শ্রীপুর মামলায় আপনার সাক্ষ্য দ্বারা তাহা মিথ্যা হইয়া যায়? উ—হাঁ। সাক্ষী বলেন, তিনি যখন মেজরাণীর সাক্ষ্য পাঠ করেন, তখন তিনি

এই গরমিল বুঝিতে পারেন এবং এই সম্পর্কে ভাবিতে থাকেন শ্রীপুর মামলায় সাক্ষী বলিয়া থাকিতে পারেন যে, মেজকুমার বেদনায় এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিলেন। সাক্ষীর এই উক্তি এবং মেজরাণীর সাক্ষ্যের মধ্যেও গরমিল আছে কি না, সাক্ষী তাহা বলিতে পারেন না। প্র—৮ই তারিখে ভোর ৭টার কি ৮টার সময় ডাঃ কালভার্ট আসিয়াছিলেন এই কথা কি সত্য? উ—হইতে পারে। যদি শ্রীপুর মামলায় এ কথা বলিয়া থাকি তবে সত্যই কিন্তু আমার স্মরণ নাই।

* * * *

প্র—বৃষ্টি হইলে ঐ টিনের চালায় আশ্রয় নেওয়া যায়? উ—আমি বলিতে পারি না। টিনগুলো রং করা ছিল কি না সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই। প্র—আপনি রাত্রিতে গিয়াছিলেন; সুতরাং আপনার স্মরণ থাকিতে পারে কি করিয়া? উ—আমি রাত্রিতে যাই নাই। প্র—আপনি সারদা ঘোষকে বলিয়াছিলেন যে শ্মশান-ক্ষেত্র হইতে টিনের চালা ২।৩ মিনিটের রাস্তা। বৃষ্টির সময়ে লোকজন যাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে তারই জন্য ঐ টিনের চালা। উ—হাঁ। সাক্ষী যখন উহা বলেন তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বৃষ্টিতে আশ্রয় লইবার জন্য ঐ টিনের চালা ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্র—আপনি কি এখন বলিতে চান যে, ৯ই দার্জ্জিলিং শ্মশান-ক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল? উ—না। কুমারের শব পাকা চুলায় কি কাঁচা চুলায় দাহ করা হইয়াছিল সাক্ষী তাহা মনে করিতে পারিতেছে না।

প্র—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ১৯১০ সালে কুমারের অনুসন্ধানে আপনি সত্যবাবুর খরচে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন? উ—নিশ্চয়ই নহে। প্র—যদি আপনি মেজকুমারকে পাইতেন, তাহা হইলে তখন তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত? উ—না। প্র—তাহা না হইলে সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকা ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে ৫ জন সাধুর ফটো তুলিবেন কেন? উ—জানি না। ১৯১০ সালে ভ্রমণ করিবার সময় সাক্ষীর সহিত কোন সাধুর সাক্ষাৎ হয় নাই। প্র—সাধু দেখিলে কি আপনি চোখ বুঝিয়া থাকিতেন? (হাস্য) উ—না। ১৯০৯ সালের পূর্ব্বে সাক্ষী প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন কি না সাক্ষী তাহা জানেন না। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ৯ই তারিখ ষ্টেপ এসাইডে গিয়াছিলেন কি না সাক্ষী আজ পর্য্যন্ত তাহা শুনেন নাই। কৌন্সুলী চৌধুরীর উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই।

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, মেজকুমার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কথা কহিয়াছিলেন। সাক্ষী মেজকুমারকে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। মেজকুমারের শেষ কথা সাক্ষীর মনে নাই। এই মামলার শুনানি আরম্ভ হওয়ার পরে সাক্ষী শুনিয়াছেন যে, সত্যবাবুর ডাকনাম আল্লাপদ। সাক্ষী পূর্ব্বে ইহা জানিতেন না। ৭ই রাত্রিতে কুমারের যখন ব্যথা হইয়াছিল তখন মেজরাণী অথবা সত্যবাবু অথবা সাক্ষী অথবা অন্য কেহ কুমারের ঘরে ছিলেন কি না সাক্ষীর তাহা মনে

নাই। ৭ই প্রাতঃকালের ঘটনার কথা সাক্ষীর মনে নাই। কিন্তু দুপুর বেলায় যে মেজকুমারের জ্বর হইয়াছিল, তাহা সাক্ষীর মনে আছে। তখন মেজরাণী বা অন্য কোন লোক ক্যালভার্টকে ডাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিনা সাক্ষীর তাহা মনে নাই। মেজরাণী তখন পতিপরায়ণা ছিলেন। প্র—আমি বলিতেছি মানহানির মামলায় আপনি বলিয়াছিলেন যে, কুমারের মৃত্যু আসন্ন এই কারণে লোকেরা লোকজন ডাকিতে গিয়াছিল. সুতরাং সন্ধ্যার সময় বহু লোক ষ্টেপ এসাইডে সমবেত হইয়াছিল? উ—না।

প্র—ডাঃ ক্যালভার্ট বিলিয়ারী কলিকের জন্য ঔষধ দেন। তিনি নিজে প্রেসক্রিপশন লেখেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত আমি ২১ খানা প্রেসক্রিপশন লিখেছিলাম এই কথা আপনি বলেছিলেন? উ—হাঁ। প্র—বীরেনবাবুর কাছে বলেছিলেন কিনা সেদিন ১২।১টার সময় নিবারণ সেন কুমারকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, ক্যালভার্ট যখন ২টার সময় আসিলেন তখন নিবারণ সেন সেখানে ছিলেন? উ—হাঁ। প্র—এস, সি, ঘোষের কাছে বলেছেন—৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বিলিয়ারী কলিকে ভুগিতেছিলেন ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা ও পাতলা বাহ্য হইত। একবার বাহ্যের সঙ্গে রক্ত পড়েছিল? উ—হাঁ। (মিঃ চাটার্জ্জী—ইহা নূতন কথা। আমার ধারণা ছিল যে উহারা এইদিক বাদ দিয়াছেন। এই পয়েণ্টে আমি তাকে জেরা করিব।)

প্র—বিলিয়ারী কলিকে কি করে রক্ত দাস্ত হয় তাহা

আজ বলতে পারবেন কি? উ—না। প্র—"৪।৫ বৎসর আগে যে বল্লেন তাহা তো লিউকিসের চিকিৎসার সময়ের কথা? উ—হাঁ। তবে আমি জানি না। প্র—টিপ্‌টেসের বোতলে যে লেখা আছে এমেলিশাস ডিস্‌পেপসিয়া ইহা কি বিলিয়ারী কলিক? উ—না। প্র—বিলিয়ারী কলিকের রক্তদাস্ত হওয়ার উদাহরণ যখন দিতে বলেছিলাম তখন কি মেজকুমারের কথা ভুলে গিয়েছিলেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি কখনো রক্তদাস্তের জন্য মেজকুমারের চিকিৎসা করেছেন? উ—না। প্র—দার্জ্জিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে কুমারের যখন রক্তদাস্ত হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন? উ—আমি জয়দেবপুরে ছিলাম। প্র—দার্জ্জিলিং যাওয়ার কত বৎসর পূর্ব্বে উহা হয়েছিল? উ—মনে নাই। আমি তখন কুমারের চিকিৎসা করি নাই বা তাঁহার আলোচনা করিতাম না।

প্র—যদি রক্ত অন্ত্রে পড়িয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বের হয়ে যায় তবে তাহা অবশ্য 'কাল রং' হবে তাহা জানেন কি? উ—আমি জানি না। আমি জানি না ঐরূপে রক্ত আসিতে তাহার সঙ্গে অন্য কিছু মিশে কি না। কুমারের ঐ অসুখের সময় রাণী বিলাসমণি জীবিত ছিলেন। একবার না বেশীবার রক্ত পড়েছিল মনে নাই। তিনি বেড্‌প্যানে না পায়খানায় গিয়াছিলেন মনে নাই। তখন শীতকাল না গ্রীষ্মকাল ছিল তাহা মনে পড়ে না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া রক্ত দেখাইলেন না 'আশু আমার রক্ত পড়েছে' বলে কুমারই আমাকে ডেকে দেখাইলেন মনে নাই। প্র—চোখ বুজলে

কি দেখেন খালি আপনি এবং রক্ত? উ—হঁা। রক্ত দেখি, মনে পড়ে তাঁর রক্ত পড়ছে আর আমি দাঁড়িয়ে আছি। প্র—(একটা পোষ্টকার্ডে সই দেখাইয়া) এটা কি আপনার সই? উ—হঁা। "প্রণতঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত" লেখা আমার হাতের।

প্র—৪ঠা মে (আত্ম পরিচয়ের দিন) আপনি বাড়ী ছিলেন? উ—ছিলাম। সে দিন আত্ম পরিচয়ের কথা শুনিয়াছি কিনা মনে নাই পরদিন শুনিয়াছি। তখন বাদী "অলকা ঝির" নাম করিয়াছেন ইহা শুনিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। প্র—আপনার কানে এই কথা গিয়াছিল কি না যে আত্মপরিচয়ের দিন তিনি বলেছিলেন—"আমি মধ্যমকুমার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়"। উ—মনে নাই। প্রত্যহ ৪।৫ হাজার করিয়া লোক সাধুকে আসিয়া দেখিতেছে" ইহা শুনিয়া ছিলাম কি না মনে নাই। কেহ কেহ আসিয়া নজর দিতেছে এ কথা ৫ তারিখে শুনেছিলাম কি না মনে নাই। প্র—৪।৫ তারিখে আপনার অভিমত ছিল কি না "প্রত্যেক নরনারীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে মধ্যমকুমারই আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই"? উ—মনে নাই। প্র—প্রজারা দুই লাখ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবে একথা ৫ই তারিখে জানিতেন কি? উ—মনে নাই। প্র—৫ই তারিখে এ বিষয়ে হৈ চৈ হইয়াছিল তাহা মনে আছে? উ—নাই। এই কথা সত্য হইবে কি না বলিতে পারিব না। প্র—আত্মপরিচয়ের পর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিতে যাওয়ার

আগে বলেছিলেন কি না যে ইনি "মধ্যমকুমার" নয়? উ—আগে বলি নাই। আত্মপরিচয়ের পর বলিয়াছিলাম যে তিনি মধ্যমকুমার নহেন। প্র—বাদী নিজেকে রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া পরিচয় দিবার পর আপনি অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন কি? উ—হাঁ, অশান্তিতে পথ দিয়ে চলা যায় না। প্র—দেখুন! এই চিঠিখানি আপনি শৈলেন্দ্র মতিলালের কাছে লিখিয়াছেন কি না? উ—হাঁ আমি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়াছিলাম। 'আমি শুনিয়া লিখিয়াছিলাম' ইহা চিঠিতে নাই। (চিঠিখানা দাখিল করা হইল।)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মতিলালের নিকট লিখিত।

ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্তের পত্র

"জয়দেবপুর ৫ই মে ২১

শ্রীচরণেষু—

ভাওয়ালে একটা অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে যাহা কখনও উপন্যাসে শুনি নাই। এখানে বুদ্ধু বাবুদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী সাধু আসিয়াছে, তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'আমি মধ্যমকুমার নাম রমেন্দ্র নারায়ণ রায়' এবং অলকা ঝির নাম বলিয়াছে। প্রজারা ২০০০০০৲ দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে। প্রত্যহ ৫।৬ হাজার টাকা নজরও দিতেছে এবং ভাওয়ালের প্রত্যেক নরনারীর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে মধ্যমকুমারই আসিয়াছে। এই বিষয়ে

সন্দেহ নাই। এই ব্যাপার নিয়া মহা হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে। আমি আসিয়া মিথ্যা বলিয়াছি এইজন্য ভাওয়ালের লক্ষ লক্ষ লোক আমাকে দোষারোপ করিতেছে। বড়ই অশান্তিতে দিন কাটাইতেছি।

প্রণতঃ—আশুতোষ দাশগুপ্ত

বাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার

মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জীর সওয়াল

সওয়াল প্রসঙ্গে মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জী বলেন,—

সত্যবাবুর রোজনামচা অনুসারে দেখা যায় যে, ৬ই রাত্রিতে কুমারের নিদ্রা হয় নাই।

কোর্ট—তার অনুসারে দেখা যায় যে, ৬ই রাত্রিতে কুমারের অবস্থা খুব ভাল ছিল।

মিঃ চাটার্জ্জি—হাঁ। সুতরাং ঐ সব তার মিথ্যা। সত্যেন বানার্জ্জি জানিতেন যে, তাহার রোজনামচা দ্বারা ঐ সব তার মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে এইজন্য জেরায় তিনি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গত রাত্রিতে ঘুম হয় নাই ইহা তাহার নিজের সম্পর্কেও বলা হইতেও পারে। সত্যবাবুর এই উক্তি মিথ্যা। কারণ রোজনামচার ঐ পৃষ্ঠার অন্যান্য প্রত্যেক ছত্র কুমার

আশু ডাক্তার

সম্পর্কেই বলা হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালীমোহন সেন ও ডাঃ শশিমোহন দাস এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ডাঃ নিবারণ সেন তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, কুমারকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ তিনি করিয়াছিলেন। * *

৯ই প্রাতঃকালে শব কি করিয়া দাহ করা হয় তাহা আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ৯ই প্রাতঃকালে ষ্টেপ এসাইড হইতে যে শব লইয়া যাওয়া হয় তাহা যে মেজকুমারের শব নহে তৎসম্পর্কে আমার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। * * * *

সুশীলা দেবী বলিয়াছেন যে, তিনি শুনিয়াছেন যে, ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল হইতে শব সংগ্রহ করা হয়। * * *

৯ই প্রাতঃকালে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে ডাকা হয়। মৃতদেহ পরীক্ষা করিবার জন্যই যদি তাঁহাকে ডাকা হইয়া থাকে, তাহা হইলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইবে যে, ঐ শব কুমারের ছিল না। কারণ কুমারের মধ্য রাত্রিতে মৃত্যু হয় এবং ৩ জন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ডাঃ আচার্য্যকে শব পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ উহা কুমারের শব ছিল না। উহা যদি কুমারের শবই হইবে, তাহা হইলে ডাঃ আচার্য্যকে উহা স্পর্শ কবিতে দিতে আপত্তি হইবে কেন? * *

মিঃ চাটার্জ্জি পুনরায় সওয়াল প্রসঙ্গে প্রাতঃকালে যে

যে রাস্তা দিয়া শবযাত্রা লইয়া যাওয়া হইয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভিক্টোরিয়া রোড দিয়া শ্মশানে যাইবার যে রাস্তা, তাহা কমার্শিয়াল রোড এবং লয়েড রোড অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ রাস্তা দিয়া তাঁহারা কেন যাইবেন? গীতাদেবীর সাক্ষ্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাদীপক্ষ এই রাস্তা সম্পর্কে একেবারে নীরব ছিল। গতকল্য আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, ঐ রাস্তা দিয়া যদিও শব শোভাযাত্রা যাইয়া থাকে, গীতাদেবী তাঁহার বাড়ী হইতে তাহা দেখিতে পারেন না। যে খাটে শব রাখা হইয়াছিল, সেই খাট সম্পর্কেও বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের পরস্পর বিরোধী উক্তি রহিয়াছে। * * *

এণ্টনি মোরেল বলিয়াছেন যে, নীচের তলায় বারান্দার খাটে শব ছিল। সুতরাং ডাঃ আচার্য্যের সাক্ষ্য এড়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই সব প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, নীচের তলায় একটী ঘরে খাটের উপর শব ছিল এবং তথা হইতে আঙ্গিনায় খাটের উপর রাখা হয়। বিবাদী পক্ষের কোন কোন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, উপর তলা হইতে শব আনিয়া নীচে বারান্দায় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাদী পক্ষের অন্যান্য সাক্ষী বলিয়াছেন যে, শব কখনও বারান্দায় ছিল না। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, শব উপরের তলা হইতে সোজা নীচের তলায় আঙ্গিনায় খাটের উপর রাখা হয়। বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য মতিয়ার রহমান বলিয়াছেন যে, শবের মুখ হইতে তিনি লালা বাহির হইতে দেখিয়াছেন। অপর কেহ ইহা

বলে নাই। মতিয়ার রহমান এইরূপ কথার সৃষ্টি করিলেন কেন? তারাপদ ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন যে, পোষাক পরিচ্ছদ রাখিবার ঘরের ২।৩ গজ দক্ষিণে শব রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে দেখা যায় যে, ১৯০৯ সালে ষ্টেপ এসাইডে ঐরূপ কোন ঘর ছিল না। সম্ভবত: তিনি সম্প্রতি ষ্টেপ এসাইডে যাইয়া দেখিতে পান যে, ষ্টেপ এসাইডে বর্ত্তমান অধিবাসীবৃন্দ একটি কোঠা পোষাক রাখিবার জন্য ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তারাপদ ব্যানার্জ্জি কখনও ১৯০৯ সালে ষ্টেপ এসাইডে যান নাই। * *

মিঃ চ্যাটার্জ্জি অতঃপর বলেন, রবীন ব্যানার্জ্জী বলিয়াছেন যে, যে খাটে শব রাখা হইয়াছিল, তাহা সিমেণ্ট করা সিঁড়ির নিকট ছিল। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে দেখা যায় যে, ঐ বাড়ীতে কোন সিমেণ্ট করা সিঁড়ি ছিল না। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী দুর্গাচরণ পাল বলিয়াছেন যে, কাঠের সিঁড়ির নিকট খাটিয়া ছিল। তাঁহারা সিঁড়ি না থাকা সত্বেও সিঁড়ি কোথায় পাইলেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ষ্টেপ এসাইডে কখনও যান নাই। তেজবীর লেম্বু বলিয়াছে যে, সে এবং আরও ১২ জনকে একজন বাবু দার্জ্জিলিং হইতে লইয়া আসে এবং সেই বাবু বলেন যে, তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অপর কথায় সে বলিয়াছে যে, ঐ বাবু তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছে। মতিয়ার রহমান ঋণে জর্জ্জরিত। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় রামলক্ষ্মণ মোদীর পূর্ব্বে দণ্ড হইয়াছিল। সে মহাজনদিগকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে দেউলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য

আদালতে দরখাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়া যায়। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী কালু কারাদণ্ডের কথা অস্বীকার করে। কিন্তু দার্জ্জিলিংএর দণ্ডিত কয়েদীদের রেজেষ্ট্রি হইতে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, চুরি ও অসদুদ্দেশ্যে রাত্রিকালে পরগৃহের প্রবেশের অপরাধে তাহার ৩ বৎসর কারাদণ্ড ও ৩০ ঘা বেত্রদণ্ড হয়।

কোর্ট—১৯০৯ সালে সে জেলে ছিল, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি—হাঁ।

কোর্ট—এই লোকটী অনেক বিষয় সাক্ষ্য দেয় এবং কুমারের আগমন, তাঁহার পীড়া ও দাহ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে সাক্ষ্য দেয়।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি—হাঁ। এখন মাননীয় আদালত বুঝিতে পারিতেছেন যে, বিবাদী পক্ষ সব কিছুই করিতে পারেন। তাঁহারা একটী জেলঘুঘুকে সাক্ষীরূপে হাজির করিয়াছেন ! *

তারাপদ ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন যে, তিনি যখন প্রাতঃভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি ষ্টেপ এসাইডে যান। কেহ তাঁহাকে ষ্টেপ এসাইডে যাইতে বলে নাই। তথাপি তিনি তথায় গেলেন কেন ? সি, আর, দাশের মত বড় বড় লোকের মৃত্যু হইলে, লোকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যাইয়া থাকে ; কিন্তু কুমার একজন নামকরা লোক ছিলেন না এবং তারাপদবাবু তাঁহাকে চিনিতেন। তারাপদবাবু বলিয়াছেন যে, সকলে যখন হাত বাড়াইয়া উপরের তলা হইতে শব নীচে নামা-

ইতেছিল, তখনও তিনি এদিক সেদিক বেড়াইতেছিলেন। এই কর্ম্মঠ ভদ্রলোকটী সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে নির্ব্বাক দর্শক হিসাবে তথায় শবদাহের ব্যবস্থা কেন দেখিতে যাইবেন ? দার্জ্জিলিং ঘটনা সম্পর্কে সওয়ালের উপসংহারে মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন, ৭ই তারিখের মূল ঘটনা এই যে, ঐদিন সন্ধ্যাকালে কুমারের এইরূপ তীব্র বেদনা হয়, তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করা আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ। আশু ডাক্তারের সাক্ষ্য অনুসারে ঐদিন কুমারের কোন চিকিৎসা হয় নাই এবং তাঁহার নিকট কেহ ছিল না। ৮ই তারিখের অবস্থা সম্পর্কে মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন, ডাঃ রাধাকুমুদ মূখার্জ্জি প্রভৃতি এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ৮ই তারিখ রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় কুমারের শব সৎকারের জন্য লোক ডাকিতে কোন লোক স্যানিটরিয়ামে যায়। সত্যবাবুর রোজনামচা দ্বারা তাহাদের উক্তি সমর্থিত হয়। সুতরাং সন্ধ্যার কিছু পরেই কুমারের মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

৯ই তারিখে ডাঃ আচার্য্যকে ডাকা হয়, কিন্তু শবের মুখ অনাবৃত করিয়া তাঁহাকে শব দেখান হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা কুমারের শব ছিল না। বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, শবের মুখ ষ্টেপ এসাইডে অনাবৃত ছিল ; কিন্তু ডাঃ আচার্য্যকে শব না দেখাইয়া অপরকে শব দেখাইবে ইহা হাস্যকর। কুমারের আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ পাইয়াছিল। ৭ই রাত্রিতে কুমারের অত্যন্ত বেদনা ও বুকে জ্বালা-পোড়া হয়।

৮ই তাঁহার বমি, ঘাম ও তলপেটে জ্বালা-পোড়া ছিল।

তিনি বার বার তরল রক্তদাস্ত করিতেছিলেন। এই সমস্ত আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ। কুমারের রক্তদাস্ত ক্যালভার্টকে দেখান হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে ক্যালভার্ট আর্সেনিক বিষ বলিয়া সন্দেহ করিতেন। আশু ডাক্তারের যে ব্যবস্থা-পত্রে আর্সেনিক বিষ ছিল, তাহা গোপন করা হইয়াছে। কোন ডাক্তারই সাক্ষ্যদান কালে পিত্তশূল বেদনায় ঐরূপ ব্যবস্থাপত্র সমর্থন করেন নাই।

কুমারের জ্বর হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা তার পাঠান হইয়াছে কিন্তু জ্বরের একখানি ব্যবস্থা-পত্রও নাই। শুধু আশুবাবুর যে ব্যবস্থা-পত্রে আর্সেনিক আছে, সেই ব্যবস্থা-পত্র রহিয়াছে। কিন্তু তাহাও সাধারণ জ্বরের জন্য নহে। বহুদিনের ম্যালেরিয়া থাকিলে তাহা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, কুমারকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সুতরাং আমি দেখাইয়াছি যে, কুমারের দেহ রাত্রিতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহা দাহ করা হয় না। পরদিন প্রাতঃকালে যে শব দাহ করা হইয়াছে, তাহা কুমারের শব নহে। কুমারের শব দাহ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলা হইয়াছে; বিবাদীপক্ষ তাহা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। * * * *

মিঃ চৌধুরী বাদীর স্মৃতিলোপ বিজ্ঞানসম্মত নহে অথবা এইরূপ কোন ঘটনার কথা জানা নাই বলিয়া যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাহা খণ্ডন করেন। তিনি বলেন: সাধুদের সঙ্গে থাকিয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর

তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিশ্লেষণ করা বাদীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। কৌঁসুলী মেড়ুগাসএর বহি হইতে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। ঐ ঘটনায় প্রকাশ; এক-জন সৈনিক গুলীর আঘাতের ফলে তাঁহার অতীত ভুলিয়া যান; কিন্তু তাঁহার সাধারণ জ্ঞান লোপ হয় নাই এবং কাল ও স্থান সম্পর্কেও তাহার ধারণা বজায় থাকে। সুতরাং বাদীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর যদিও তিনি অতীতের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান তথাপি সময় ও স্থান সম্পর্কে তাঁহার ধারণা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী আরও বলেন, বাদীর চৈতন্য হইবার পর তিনি যদি ১২ বৎসর কাল সন্ন্যাসীদের সহিত ঘুরিয়া না বেড়াইতেন, তাহা হইলে পরিচিত পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি হয়ত আরও অনেক পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিত। বাদী অমরনাথ গিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহাকে যখন বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করা হয় তখন বাদী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার গুরু নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই বাদীকে সন্ন্যাসী করা হয় নাই। তাঁহাকে শুধু মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। বরাহছত্রে বাদী যে ঢাকা জিলবাসী শুধু ইহাই তাঁহার স্মরণ ছিল। এইজন্য গুরু তাঁহাকে বাড়ী যাইতে অনুমতি দেন। * * * *

সওয়াল প্রসঙ্গে চাটার্জ্জী বলেন, বিবাদিগণের বক্তব্য এই যে, মেজকুমার পশুপাখী উভয়ই শিকার করিতেন কিন্তু তাহা-দের নিজেদের সাক্ষী এণ্টনী মোরাল বলিয়াছেন যে, মেজকুমার

পশু শিকার করিতেন। অতএব বাদী কেবল পশু শিকার করিতেন বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ চৌধুরী বাদীর সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বাদী 'কৈলাস' শব্দের উচ্চারণ 'কেলাস' করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে বাদী হিন্দুস্থানীদের মত হিন্দিতে 'কেলাস' উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ চৌধুরী মাত্র সাড়ে তিন বৎসর কাল বিলাতে থাকিয়া 'ভাওয়াল' উচ্চারণ করিতে পারেন নাই; তিনি ইংরেজদিগের মত ভাওয়ালকে 'বাওয়াল' বলেন ইংরেজগণ 'ভা'কে 'বা' উচ্চারণ করেন। যদি সাড়ে তিন বৎসর কাল ইংরেজদিগের সহিত মেলা-মেশা করিয়া মিঃ চৌধুরীর ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরও উচ্চারণ বদলাইয়া যায়, তবে বাদীর ন্যায় একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির উচ্চারণ যে বদলাইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

বাদী 'পনেরো' (১৫) কে 'পন্দেরো' বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন প্রফুল্ল মিত্র বলিয়াছেন; জয়দেবপুরের লোক 'পনেরোকে' অনেকটা 'পন্দেরো' বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। বাদী 'কোর্ট'কে 'কুট' বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোক চোরকে 'চুর' বলিয়া থাকে। বাদী বলিয়াছেন, কোর্ট অব ওয়ার্ডসএর হাত হইতে তাহাদের এষ্টেট মুক্ত করিবার জন্য যখন তাঁহার মা হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন, তখন ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদেব কৌশুলী ছিলেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, বাদীর 'ব্যোমকেশ'কে ব্যোমকেশর বলিয়া উচ্চারণ করিবার কারণ, তিনি তাঁহার নামই ভুলিয়া

গিয়াছিলেন ; উচ্চারণের ত্রুটীর জন্য তিনি উহা বলেন নাই। সে যাহাই হউক, পাঞ্জাবে 'ব্যোমকেশ'কে ব্যোমকেশর বলে ইহা বলিতে পারা যায় না। বাদী 'কুমীরকে' কুমর বলায় মিঃ চৌধুরী তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের লোকে 'কুমীর'কে কুমইর বলিয়া থাকে।

বাদী 'গন্তি' (গণনা) কে 'গিন্তি' বলায় বিবাদীপক্ষের কৌন্সুলীগণ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বিবাদী পক্ষের উকীল পঙ্কজ ঘোষ সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় নিজেই 'গিন্তি' শব্দ ব্যবহার করেন। বাদী 'সতীন'কে 'সন্থি' বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন, পাঞ্জাবে 'সন্থি' বলিয়া কোন শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে ইহা আমাদের জানা নাই। সুতরাং বাদী পাঞ্জাবী বলিয়া 'সন্থি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এ কথা বলা যায় না। বাদী 'অন্নদাপ্রসাদ'কে 'আন্দাপ্রসাদ' বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন। আমি বলিতে চাই যে, বাদীর অসুখের ফলেই উচ্চারণে ঐরূপ দোষ ঘটিয়াছে।

মিঃ চৌধুরী বাদীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি 'কাঁটা' কাহাকে বলে জানেন কি না। বাদী তদুত্তরে বলেন যে, ইহা পায়ে বিদ্ধ হয়। পরমুহূর্ত্তেই মিঃ চৌধুরী কাঁটা চামচের কথা বাদীকে জিজ্ঞাসা করেন। বাদী বলেন, তিনি 'চামুচ' চিনেন।

বাদীর কথায় হিন্দী টান থাকা সম্পর্কে মিঃ চাটার্জ্জী বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিবার পর ১২ বৎসরকাল হিন্দীতে কথা বলে এবং হিন্দীভাষীদের সঙ্গে মেলামিশা করে তাহার কথায় হিন্দী টান থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। বাঙ্গালী বহুদিন

পশ্চিমদেশে থাকিলে তাহাদের কথায় হিন্দী টান জন্মে এই সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। * * *

মিঃ চ্যাটার্জ্জী বলেন, ফণি ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের সহিত রাইফেল ব্যবহার করিবার তাঁহার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি আদালতে তাঁহাকে যখন একটী রাইফেল ও একটি কার্ত্তুজ দিয়া, ঐ কার্ত্তুজ রাইফেলে ভরিতে বলিলাম, তখন বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা ভরিতে সক্ষম হইলেন না।

ফণিবাবু বলিয়াছেন যে, মেজকুমার কার্ত্তুজের বেল্ট পরিয়া শিকারে যাইতেন এবং ফণিবাবু নিজেও শিকারের সময় কার্ত্তুজের বেল্ট পরিতেন। কিন্তু আমি যখন আদালতে কার্ত্তুজের বেল্ট পরিতে বলিলাম তখন তিনি উহা ভুল পরিলেন। তিনি যদি সর্ব্বদা কার্ত্তুজ বেল্ট পরিতেন তাহা হইলে দুইবারই কি তাহা ভুল পবিতেন? সুতরাং কুমার শিকারের সময় কার্ত্তুজ বেল্ট পরিতেন না বলিয়া বাদীপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই সত্য। কুমারের মৃত্যুর জন্য ১৩১৬ সালে পূজার সময় জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে গানবাদ্য হয় নাই—ফণিবাবু ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ আমাদের সাক্ষীগণ ঐ মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ফণিবাবুর উক্তি সত্যবাবুর রোজনামচা দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সত্যবাবুর রোজনামচায় ঐ বৎসর রাজবাড়ীতে গানবাজনা হয় নাই ইহা লেখা আছে।

কোর্ট—১৩১৬ সাল কুমারের মৃত্যুর বৎসর, রাজবাড়ীতে গানবাজনা হইবে ইহা কল্পনা করা কঠিন। * *

মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, মিথ্যা উক্তি করা সম্পর্কে সত্যেন বানার্জ্জি ও রায় সাহেব যোগেন বানার্জ্জি মাস্‌তুতো ভাই।

সত্যবাবু খুব জোরের সহিত অস্বীকার করেন যে, মনমোহন ভট্টাচার্যের ভাই তাঁহাদের কলিকাতার বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে পত্র দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মেজকুমারের মৃত্যুর পর তিনি ঘোড়ায় চড়িতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, ইহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রোজনামচায় তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে। দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সত্যবাবু ও বিভাবতীর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তিনি বহু মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। বড়কুমার ও ছোটকুমার সত্যবাবুর প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু সত্যবাবুর রোজনামচা হইতে দেখা যায় তাঁহারা যতই তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, তিনি ততই তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সত্যবাবুর রোজনামচার মূলমন্ত্রই হইল এই যে, বিভাবতী দেবীর উপর তাঁহার আধিপত্য হইল না এবং বিভাবতী এখনও বড়কুমারের পরামর্শ অনুসারে চলে। এইভাবে তিনি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন এবং ইহার পর তাঁহার এক সুদিন উপস্থিত হইল (ভাওয়াল এষ্টেটের পক্ষে দুর্দ্দিন) বিভাবতী দেবী সত্যবাবুর হাতে আসিলেন এবং সত্যবাবুর বরাবরেই তিনি আম্মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছিলেন. তাঁহার রোজনামচায় যে সব বিষয় সম্পর্কে তিনি আদালতে সাক্ষ্য দেন, রোজনামচা

দ্বারা তাহা সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে তিনি শিলং গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মার চিঠির দ্বারা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বড়কুমারের সুপারিশিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অথবা পুলিশের চাকরীর জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে জয়দেবপুর আসিয়াছিলেন। পুলিশ বিভাগে তিনি প্রবেশ করিতে না পারায় আমি পুলিশ বিভাগকে অভিনন্দন জানাইতেছি (হাস্য)। তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ও তাঁহার মাতা তাঁহার জন্য যে টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তিনি অসংখ্য মিথ্যা উক্তি করেন। টাকার অঙ্ক দেখাবার জন্য তিনি কাগজ-পত্র দাখিল করিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন কাগজপত্র দাখিল হয় নাই।

তিনি বলেন যে, বড়কুমারের সুপারিশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদলাভের চেষ্টার জন্য তিনি জয়দেবপুর আসেন; কিন্তু তাঁহার মায়ের চিঠিতে দেখা যায় যে, জয়দেবপুরের আবহাওয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছে এবং সেই কারণেই মিথ্যা অজুহাতে তিনি জয়দেবপুর আসিয়া আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইবেন। তাঁহার আরাম ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখিয়া মনে হইত, তিনিই যেন মেজকুমার। তাঁহাব মা ইহাতে এত বিরক্ত হন যে, একখানি চিঠিতে তিনি লিখেন, সত্যের মত কুপুত্রকে গর্ভে ধারণ করায় তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, আত্মহত্যার দ্বারা তিনি উহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

দেখা যায়, সত্যবাবু মেজকুমারের সহিত দার্জ্জিলিং যান। সেখানে গিয়া মেজকুমার সাজিবার জন্য তাঁহার এত সখ হয় যে, মেজকুমারের টুপী পরিয়া তিনি বাহির হইতেন। ৭ই মে রাত্রিতে হঠাৎ মেজকুমার বেদনায় গড়াগড়ি যাইতে থাকেন, কিন্তু সত্যবাবু তখন ঘুমাইতে যান। ৮ই মে সন্ধ্যায় মেজকুমা-

রের অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন, তখন সত্যবাবুকে মনে বেড়াইতে দেখা যায়। ৮ই মে তারিখে মেজকুমারের অবস্থা খারাপ ছিল বলিয়া সকলে উপবাসে থাকে; কিন্তু সত্যবাবুকে সেই রাত্রে চা, টোষ্ট এবং খুব সম্ভব মাখন খাইতে দেখা যায়। মেজকুমারের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেজকুমারের নামে জীবন-বীমার ৩০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা। কাজেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া হরিমোহন চন্দ এবং মহেন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হয়। মেজকুমারের জীবন-বীমার টাকার উপর দাবী ত্যাগ করিতে বড়কুমার এবং ছোটকুমারকে রাজী করা হয় এবং বলা হয় যে, এই টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। অবশেষে তিনি সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেন। মেজকুমারের তথাকথিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরদিন বর্দ্ধমানের মহারাজের পাল্কীতে করিয়া বিভাবতী দেবীকে যখন ষ্টেশনে লইয়া আসা হয়, তখন সত্যবাবু খুব উৎফুল্ল ছিলেন, ইহা তাঁহার রোজনামচায় দেখা যায়। মেজকুমারের তথাকথিত মৃত্যুর এক বৎসর পর সত্যবাবুর মেজকুমার সাজিবার সাধ সম্পূর্ণরূপে মিটিল। বিভাবতী দেবীর উপর তাঁহার আধিপত্য হইল এবং কার্য্যতঃ তিনিই ভাওয়াল এষ্টেটের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন বিভাবতী দেবীকে হাজার টাকা করিয়া মাসোহারা দেওয়ার প্রস্তাবে সত্যবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহার ঐরূপ হওয়ার কারণ কি? একজন হিন্দু বিধবার ভরণপোষণের পক্ষে হাজার টাকা কি যথেষ্ট নহে? কিন্তু সত্যবাবু তাঁহাকে হিন্দু বিধবা বলিয়া মনে করেন না। তিনি বিভাবতী দেবীকে দেখেন, মধু-মক্ষিকার মত। তিনি সত্যবাবুকে সমস্ত মধু যোগাইবেন এবং তাহাতে সত্যবাবুর জীবন মধুর হইয়া উঠিবে (হাস্য)। * *

অতঃপর মিঃ চাটার্জ্জি ফণী বাড়ুয্যের সাক্ষ্য সম্পর্কে বলেন যে, ফণী বাড়ুয্যেকে তাঁহার বন্ধুরা "ঝুটকা বাদশা"

(মিথ্যার রাজা) বলিয়া ডাকিত, এ কথা ফণীবাবু অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, তিনি সত্যই "ঝুটকা বাদশা"। বাদীকে যে সব ভুল জেরা করা হইয়াছে, উহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যেন মিঃ এ, এন, চৌধুরীর পেটোয়া লোকের মত এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার ইংরেজী জ্ঞান মেজকুমারেবই মত এবং মেজকুমারের নিকটই তিনি ইংরেজী কতকগুলি বাছাই করা শব্দ শিখিযাছিলেন।

আদালত—কিন্তু ফণী বাড়ুয্যে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ম্যাট্রিক মান পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন (হাস্য)। * *

মিঃ চাটার্জ্জি মিঃ মায়ারের সাক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, মিঃ মায়ার বলিয়াছেন যে, ১৯১১ সালে তিনি বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধে খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, তিনি মেজকুমার নহেন। কিন্তু ১৯ ২ সালে শ্রীপুর মামলায় তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। সুতরাং বাদী মেজকুমার কিনা তাহা তিনি ঠিকমত বলিতে পারেন না। মিসেস মায়ার বলিয়াছেন যে, মিঃ হোয়ার্টন যখন কুমারের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি হোয়ার্টনকে দেখেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, মিঃ মায়ার যখন ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া আসেন, তাহার বহু পূর্ব্বেই মিঃ হোয়ার্টন জয়দেবপুর হইতে চলিয়া গিয়াছেন। * * * *

ছোটরাণী আনন্দকুমারী দেবীর সাক্ষ্য সম্পর্কে মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, তাঁহার সাক্ষ্যে তিনি এত মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন যে, একবার দেখিলেই তাহা ধরা পড়িবে। আমি যখন তাঁহাকে কয়েকখানি চিঠি দেখাইলাম, তিনি বলিলেন যে, চিঠির ভিতরকার সমস্ত বিষয় পাঠ না করিয়া ঐ সব চিঠি তাঁহার

লিখা কিনা তাহা বলিবেন না। উহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি জানিতেন যে, ঐ চিঠির দ্বারা তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করা হইবে। * * * *

মেজকুমারের শব দাহ করা হয় নাই এবং মেজকুমার জীবিত আছেন এইরূপ গুজবের কথা বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় ৮০০ সাক্ষী বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ গুজবের কথা শুনিয়াছেন। মিঃ মায়ার স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে ছিলেন. তখন হইতেই লোকে বাদীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেছিল। ১ ১৭ সনে সত্যভামা দেবী বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা দাখিল করিবার পর বিবাদীপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৩১৭ সনে মৌন সন্ন্যাসীর আগমনের পর ঐ গুজব রটে। প্রথমাবধি যদি ঐরূপ কোন গুজব না রটিত, তাহা হইলে কি একজন মৌন সন্ন্যাসীর বিবৃতির ফলেই একপ গুজব রটিতে পারিত? পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ কোন গুজব না থাকিলে রাণী সত্যভামা দেবীর ন্যায় একজন মহিলা কি হঠাৎ বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট ঐরূপ গুজব সম্পর্কে চিঠি লিখিতেন? * * * *

উপসংহারে মিঃ চ্যাটার্জ্জী বলেন, সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল এই বিরাট মামলা চলিয়াছে। এতবড় বিরাট মামলা পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। * * *

বাদী যে মেজকুমার ইহা আমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারিয়াছি। মহামান্য জজ বাহাদুরকে আমি বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি, বাদী সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। আশাকরি সুবিজ্ঞ জজ-বাহাদুর এমন রায় দিবেন, যাহা মিলটনের ভাষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা হয়।

বিচারকের রায়

জজ—শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু।

প্রবীণ সুবিজ্ঞ

জজ পান্নালাল বসু

তাঁহার সুদীর্ঘ রায়ে মন্তব্য

প্রকাশ করিয়াছেন,

বাদী সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের

দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়।

জজ তাঁহার অনুকূলে

খরচাসহ ডিক্রী দিয়াছেন।

তিনি ভাওয়ালের সম্পত্তির

এক তৃতীয়াংশ মালিক।

ডঃ—পান্নালাল বসু।

বিচারকের

মন্তব্য

আমি সাব্যস্ত করিতেছি, বাদীর এই মামলা রুজ্ করিবার পক্ষে কারণ আছে।

তৃতীয় বিষয়টি এস্থলে উঠিতে পারে না, কারণ ইহা "ডিক্লেয়ারেটরী" মামলা নহে। সুতরাং স্পেসিফিক রিলিফ এক্টের ৪২ ধারার কমে উঠে না।

৪র্থ ও ৫ম বিষয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত করিয়া তৎপর আমি ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বিচার্য্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বাদী মেজকুমার কি না?

এই মামলায় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কি-না? আমি পঞ্চম বিষয়টি অগ্রাহ্য করি নাই; কারণ যে সকল বিবাদী মামলায় জবাব দিয়াছেন, তাঁহারা উহা রক্ষা করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের অভিপ্রায়ের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্তই আমি উহা অগ্রাহ্য করি নাই। এই দুইটি বিষয় রক্ষা করিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে,—বাদীরই প্রমাণ করিতে হইবে, তিনি মেজকুমার। তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনিই মেজকুমার, তবেই মামলার পরিসমাপ্তি হইবে—মেজকুমার জীবিত থাকুন আর মারা গিয়া থাকুন। কিন্তু মৃত্যু ঘটিয়া থাকিলে তাহাতেই বাদীর দাবীর উত্তর মিলিবে। বাদী যাহা

বলিতেছেন তাহাতে মৃত্যুর এতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় যে এবং কুমারের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবার পর হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা ক্রমাগত এরূপ দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, মেজকুমারের মৃত্যুর কথাই সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং কুমারের যে মৃত্যু হয় নাই, তাহা প্রমাণের ভার বাদীর উপর কিন্তু তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনিই মেজকুমার, তবে মৃত্যুর কথা মিথ্যা হইয়া যায়। যদি কেহ তাহার বন্ধুকে দেখিতে পায় এবং তাহার পরিচয় সম্পর্কে ভুল না করে, তবে প্রমাণ হয় যে, তাহার বন্ধুর মৃত্যু হয় নাই।

সুতরাং প্রশ্ন এই—বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কি না ?

এই বিষয়টি অত্যন্ত সরল। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে শুনানী আরম্ভ হইয়া একাদিক্রমে শুনানী চলিয়াছে ; কেবল ছুটির দিনে, যে ১৫ দিন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম বা অসুস্থ ছিলাম বলিয়া এই মামলার শুনানী গ্রহণ করিতে পারি নাই, অথবা সাক্ষীদের অসুস্থতা প্রভৃতি যে সকল কারণে এজলাস বসে নাই, সেই কয়দিন শুনানী হইতেপারে নাই।

বাদীপক্ষে ১০৪২ জন এবং বিবাদী পক্ষে ৪৩৩ জন লোক সাক্ষ্য দিয়াছেন। উভয় পক্ষই বহু দলিল দাখিল করিয়াছেন। একদল সাক্ষী বাদীকে কুমার বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন এবং অপর একদল বাদী কুমার নহে বলিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, বিবাদী পক্ষ বাদীকে সকল প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। কয়েকজন মতলববাজ লোক বাদীকে কুমার বলিয়া দাঁড়

করাইয়াছে বিবাদীপক্ষ বরাবর এই যুক্তিই দেখাইয়া আসিয়াছেন এবং বিচারের সময় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাদীর সহিত মেজকুমারের চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই! যে সব সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বাদীর সহিত মেজকুমারের চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই ইহা তাহাদের অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। বিবাদীপক্ষের কৌশুলী ইচ্ছা করিয়া সাক্ষীদিগকে ঐ সব প্রশ্ন করিয়াছেন এবং বাদীর চেহারার সহিত মেজকুমারের চেহারার একেবারেই সাদৃশ্য নাই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সেইভাবেই সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থিত করা হইয়াছে—যদিও সাধারণভাবে বলিতে গেলে সাক্ষীগণ অনেক দ্বিধা সঙ্কুচিতচিত্তে শুধু মুখমণ্ডল, শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য কয়েকটী বিষয় সম্পর্কেই অসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমি তাহা এখনই উল্লেখ করিব। বাদীকে পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে, কুমারের শারিরীক গঠন সম্পর্কে এবং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর কুমার বাস করিতেন এবং চলাফিরা করিতেন তৎসম্পর্কে বহু প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে (বাদীকে) কুমারের শিক্ষা, কুমারের স্বভাব, কুমারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, কুমারের নৈতিক চরিত্র, তাহার সঙ্গী, তাঁহার স্ত্রী, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাঁহার কি রোগ ছিল, কি রকম পরিবারে তিনি বাস করিতেন, কিরূপ লোকের সহিত তিনি মেলামিশা করিতেন, কিরূপ পোষাক তিনি পরিধান করিতেন। তাঁহার কিরূপ চালচলন ছিল,—এমন কি তিনি কিরূপ খাদ্য খাইতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কি

ভাবে তাহা খাইতেন—এই সব সম্পর্কে বাদীকে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। যদিও এই ধরণের মামলায় ঐ সব বিষয় অতিশয় প্রয়োজনীয় তথাপি বাদীকে যেভাবে জেরা করা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে ঐ সব বিষয় আরও প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মেজকুমারের স্মৃতি সম্পর্কে বেশী জেরা না করিয়া তাঁহার সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কেই বেশীর ভাগ জেরা করা হইয়াছে।

মেজকুমারের জীবনের ঘটনা অথবা পরিবারের ঘটনা সম্পর্কে তত জেরা করা হয় নাই। অথবা তাঁহার কথাবার্ত্তা, কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে অথবা কাহাকে চিনিতেন, অথবা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন ঘটনা সম্পর্কে জেরা করা হয় নাই। শুধু কি কি জিনিষ তিনি চিনিতেন এবং তাহার ইংরেজী নাম সম্পর্কেই জেরা করা হইয়াছে। আমাকে এই সব জেরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এই সব সম্পর্কে কতদূর পর্য্যন্ত বিবেচনা করা দরকার তাহা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বাদী 'ক্রুয়েট' শব্দ জানিতেন কি না তাহার উল্লেখ এখানে করিতেছি। ইহাতে কুমারের বর্ণজ্ঞান এবং ইংরেজী জ্ঞানের প্রশ্নই শুধু আসে না; কারণ কুমার শুধু ইংরেজী ও বাঙ্গলায় তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন তিনি একেবারেই নিরক্ষর। ইহাতে এই প্রশ্নও আসে যে, কুমার এমন ধরণের জীবন যাপন করিতেন কি না যাহাতে তাঁহার পক্ষে 'ক্রুয়েট' অথবা 'মেনু' অথবা 'ফর্ক' অথবা 'লাউঞ্চ সুট' অথবা 'মিস ইন বাক্স' প্রভৃতি শব্দ আয়ত্ত করা সম্ভব হইতে পারে। খেলাধূলা এবং আমোদ প্রমোদ

সম্পর্কেও ঐ প্রশ্নই আসে যে তিনি কতদূর পর্য্যন্ত ঐ সব বিষয় শুধু জানিতেন, না, তাহাদের ইংরেজী নামও জানিতেন।

পারিবারিক ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে ভিন্ন (কারণ বর্ণজ্ঞানের কথা একটী বৃহৎ ব্যাপার) বাদীর ঢাকায় আগমনের পর তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির ফলে বিবাদীগণের কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে বহু প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সব সাক্ষ্যপ্রমাণে একটী অর্থপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে এবং কিছুই অস্পষ্ট নাই। কুমারের দার্জ্জিলিং যাত্রা সম্পর্কে এবং কুমারের অসুখ, কুমারের চিকিৎসা, কুমারের মৃত্যু এবং শবদাহ (যাহা বিতর্কের বিষয়) সম্পর্কেও বহু সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। বাদী একজন হিন্দুস্থানী, কি না অথবা ওজালার মাল সিংহ (যে ব্যক্তি বাল্যকালে রাখাল ছিল) কি না—যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর সুন্দর সিং নাম ধারণ করে তৎসম্পর্কেও আর এক দফা সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে—যদিও দরখাস্তে তাহার উল্লেখ না করিয়া বিচারের সময় তাহা বলা হইয়াছে। বাদীর তথাকথিত নিখোঁজ—অবশ্য বাদী কুমার ইহা অনুমান করিয়া লইয়া—হইবার সময়েরও সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য উভয় পক্ষ হস্তাক্ষর বিশারদ উপস্থিত করিয়াছেন। কুমারের অসুখ, কুমারের মৃত্যু (যাহা বিতর্কের বিষয়) বাদীর কথিত স্মৃতি লোপ এবং বাদীর চেহারার সাদৃশ্য অথবা অসাদৃশ্য সম্পর্কে ফটোগ্রাফ হইতে যতদূর সম্ভব স্থির করা যায় তৎসম্পর্কেও উভয় পক্ষে বিশেষজ্ঞ ডাকা

হইয়াছে। সর্ব্বশেষে বাদীর চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে উভয় পক্ষে পরস্পরবিরোধী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ কুমারের পারিবারিক ইতিহাস এবং কুমারের জীবনের অনেক ঘটনার কথাই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেক ঘটনা প্রমাণিত হইবার পর নীরবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিচারের এক সময় বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী কোন একটী বিতর্কমূলক বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ না করিবার জন্য বারবার আদালতকে অনুরোধ করিতেছিলেন। ঐ বিতর্কমূলক বিষয়ে আদালত কোন মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিবাদী-পক্ষের কৌঁসুলী সাক্ষীকে সমন দিতে আপত্তি করেন। আদালতে সাক্ষী উপস্থিত থাকাবস্থায় সাক্ষীর সঙ্গে তিনি আলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

বাদীর প্রতি সাধারণের সহানুভূতি

ইহা বেশ পরিষ্কার দেখা গিয়াছে যে, বাদীর প্রতি সাধারণের সহানুভূতি রহিয়াছে। আদালতে যেরূপ জনতা হইত এবং যেভাবে তাহারা মামলা শুনিত তাহাতে ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে বাদীর তাহাতে কোন লাভ নাই। কারণ আদালতে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইবে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। জনমত অথবা অপর কিছুর উপর তাহা নির্ভর করে না। জনসাধারণের এই সহানুভূতি বরং বাদীর প্রতিকূলেই গিয়াছে। কারণ যে সব সাক্ষী বাদীকে

চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া বলিয়াছে, আদালতকে তাহাদের সাক্ষ্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

যখন বলা হইয়া থাকে যে, জনসাধারণের এই সহানুভূতি মিঃ চৌধুরী যাহাকে জনতার অভিমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—বাদীর প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে তখন সত্যিকার কুমার প্রকৃতপক্ষে ফিরিয়া আসিলে এরূপ উৎসাহের সঞ্চার হইত না অথবা কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, একথা মানিয়া লওয়া কঠিন। আড়াই বৎসরকাল কুমারের বিষয় শুনিয়া একথা কেহ বলিবে না—যাহা এক সময় বলা হইয়াছে—যে এই যুবক (কুমার) একজন গর্ব্বিত অভিজাত শ্রেণীর লোক, সাধারণ লোক যাহার কদাচিত দর্শন পাইত এবং যাহাকে দেখিবার জন্য লোকের কোনই আগ্রহ ছিল না।

বাদীর কাহিনী রূপকথার ন্যায় মনে হয় এবং যাহা রূপকথার ন্যায় মনে হয় সাধারণতঃ তাহাই ঘটে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পদস্থ শত শত লোক এমন কি তাহার আত্মীয়স্বজনও (বিবাদীগণসহ ৬ জন ব্যতীত) তাহার সাদৃশ্য সম্পর্কে হলপ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই সব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কুমারের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ভ্রাতৃবধূ বড়রাণী, এমন কি মেজরাণীর মামীমা সরোজিনী দেবীও (একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত মহিলা) রহিয়াছেন সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্ত করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন।

বাদীকে সনাক্ত করা সম্পর্কে যে সব বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা আমি যেভাবে আলোচনা করিতে

চাই তাহার উল্লেখ করা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে করি।

(১) পরিবার, পৈত্রিক ভদ্রাসন, ১৯০৯ সালের ৮ই মে মেজকুমারের তথাকথিত মৃত্যু পর্য্যন্ত পারিবারিক ইতিহাস, ঐ তারিখের পূর্ব্বে মেজকুমার যেমনটি ছিলেন, তাঁহার শিক্ষা, স্বভাব, কথা, নৈতিক জীবন, স্ত্রী ও ভগ্নীদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক।

(২) ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর কাহিনী (যখন বাদী ঢাকায় আগমন করেন)

(৩) এই মামলা দায়ের হওয়া পর্য্যন্ত বাদী ও বিবাদী পক্ষের কার্য্যপদ্ধতি।

(৪) বাদীর সনাক্ত করা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(৫) বাদীর শরীরের সহিত মেজকুমারের শরীরের তুলনা।

(৬) ফটো হইতে শরীরেব বৈশিষ্ট্য।

(৭) বাদীর শরীরের চিহ্নসমূহ।

(৮) চলনভঙ্গী, হাবভাব, স্বর।

(৯) বাদীর মানসিক অবস্থা।

(১০) কুমার নিরক্ষর ছিলেন কি না ?

(১১) স্বীকারোক্তি এবং আচরণ।

(১২) দার্জ্জিলিং।

(১৩) বাদী ঔজলাল মাল সিং কি না এবং সে অ-বাঙ্গালী কি না ?

(১৪) সনাক্ত করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত।

স্বর্ণময়ীর শাখা

ভাওয়াল রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ গোলকচন্দ্র সম্পর্কে বর্ত্তমান মামলার সাক্ষ্য প্রমাণে বিশেষ কিছুর উল্লেখ নাই। তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ী রাজা কালীনারায়ণের বৈমাত্র ভগ্নী ছিলেন। স্বর্ণময়ী বিবাহিত হইলেও ভাওয়াল রাজবাড়ীতেই বাস করিতেন। ভাওয়াল পরিবার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বংশের ঘর-জামাই হইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছুক দুঃস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া আনিয়া এই বংশের দুহিতাদের বিবাহ দিবার প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। ভাওয়াল পরিবারের স্বর্ণময়ীর শাখা—স্বর্ণময়ী, তাঁহার দুই কন্যা এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ১৩০০ বা ১৩০৩ সালে কুমারদের জন্মের পর পৃথক বাড়ীতে উঠিয়া যান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা কমলকামিনী বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। স্বর্ণময়ীর অপর কন্যা মোক্ষদা লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র ফণীবাবু ও কন্যা শৈবলিনী বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন। এই সকল সাক্ষী ভাওয়াল রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০০ বা ১৩০৩ সাল পর্য্যন্ত রাজপরিবার-ভুক্ত বলিয়াই গণ্য ছিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে অবশ্য স্বর্ণময়ী পৃথক অন্নে স্বতন্ত্রভাবে রাজবাড়ীর এক অংশে বাস করিতেছিলেন। ফণীবাবু ছোটকুমারের জন্মের ২৬ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা কালীনারায়ণ রায়

এক্ষণে আমরা রাজা কালীনারায়ণের কথা উল্লেখ করিব। যে সকল সাক্ষী রাজা কালীনারায়ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, রাজা কালীনারায়ণের রং ফর্সা, কেশ লালচে বা পিঙ্গলা এবং চক্ষু কটা রংয়ের ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ সাক্ষী উমানাথ ঘোষাল বলিয়াছেন, রাজা কালীনারায়ণের চক্ষু ও চুলের রং পিঙ্গলা এবং দেহের রং খুব ফর্সা ছিল। এই জিলায় পিঙ্গলা কথাটী বিশেষ চলিত শব্দ। পিঙ্গলা শব্দের অর্থে বাদামি বা তামাটে বুঝায়। বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী এক সময় বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মামলার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পিঙ্গলা শব্দটী আবিষ্কার করা হইয়াছে ; কিন্তু বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরাও তাহাদের জবানবন্দীতে এই শব্দ ব্যবহার করায় এই সম্পর্কে সকল বিতর্কের অবসান হয়। রাজা কালীনারায়ণের ফটো দেখিলেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁহার চেহারা খাঁটী বাঙ্গালী ধরণের এবং তিনি চতুর ও হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। রাজা কালীনারায়ণের দেহের ও মাথার চুলের রং ব্যতীত শরীরের এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার সহিত দ্বিতীয় কুমারের দেহের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাজা কালীনারায়ণ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' খেতাব লাভ করেন, তৎকালে পূর্ব্ব বাঙ্গলার গর্ব্বের বস্তু ঢাকার প্রসিদ্ধ থিয়েটার হলে লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং রাজা কালীনারায়ণকে 'রাজা' সনন্দ প্রদান করেন। রাজা কালী-নারায়ণ ১২৮৫ বঙ্গাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

রাণী সত্যভামা

রাজা কালীনারায়ণ তুই পত্নী—জয়মণি ও সত্যভামা, এক পুত্র রাজা রাজেন্দ্র ও এক কন্যা কৃপাময়ীকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন। উপরোক্ত তুই বিধবা পত্নী ব্যতীত, ব্রহ্মময়ী নামে রাজার অপর এক পত্নী ছিল, ব্রহ্মময়ীর কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। জয়মণি রাজা কালীনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী, সত্যভামা কনিষ্ঠা এই কারণে রাণী সত্যভামার ছোট্ঠাকুরমা নাম, চিঠিপত্রে এবং এই মামলার সাক্ষ্যে বহুবার উল্লেখ রহিয়াছে। রাণী সত্যভামা রাজা রাজেন্দ্রের জননী এবং কুমারদের পিতামহী। বাদী যখন ফিরিয়া আসেন তখন সত্যভামা জীবিতা ছিলেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং ঢাকায় আসিয়া বাদীর সহিত বাস করিতে থাকেন, রাণী সত্যভামা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর বাদীর বাড়ীতেই দেহত্যাগ করেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি যখন উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ২১ বৎসর ছিল ইহার পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বিলাসমণিকে বিবাহ করেন। রাণী বিলাসমণির বয়স তৎকালে ১৪ বৎসর ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে রাণী বিলাসমণি পরলোকগমন করেন। বরিশাল জিলার বানরীপাড়া গ্রামে রাণী বিলাসমণি এক দুঃস্থ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার দুই ভগ্নী ও দুই ভ্রাতা জীবিত আছেন। দুই ভগ্নী ও এক ভ্রাতা বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অপর ভ্রাতা বসন্ত ভট্টাচার্য্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের লাইসেন্সপ্রাপ্ত। তিনি রাজবাড়ীতে বাস করেন। কোন পক্ষই তাঁহাকে সাক্ষী আহ্বান করেন নাই।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা কালীনারায়ণ রায় ভাওয়াল এষ্টেটের একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া যান। এই ভদ্রলোক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজারী করেন। এই মামলায় বহুবার এই ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের নামোল্লেখ হইয়াছে। রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ লেখক হিসাবে তাঁহার মনিব অপেক্ষাও জনসমাজে অধিক পরিচিত।

কুমারদের জন্মকাল

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সন্তানদের জন্মকাল নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—ইন্দুময়ী দেবী—১২৮৫ সালের কার্ত্তিক (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর): জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—১২৮৭

সালের ভাদ্র (১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর); কুমার রণেন্দ্র (বড়কুমার)—১২৮৯ সাল, ৪ঠা আশ্বিন, (১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর); কুমার রমেন্দ্র (মেজকুমার—১২৯১ সাল ১৪ই শ্রাবণ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই); কুমার রবীন্দ্র (ছোটকুমার—১২৯৩ সাল, ২৯শে শ্রাবণ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট); তড়িন্ময়ী (কনিষ্ঠা কন্যা—১৩০০, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ)। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সন্তানদের উপরোক্ত জন্মকাল সম্বন্ধে দুই পক্ষে কোন মতভেদ দেখা যায় নাই।

জয়দেবপুর ভাওয়াল রাজবাড়ী

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ঢাকা হইতে বিশ মাইল দূরে জয়দেবপুর গ্রামে রাজবাড়ীতে বাস করিতেন। জয়দেবপুরস্থ ভাওয়াল রাজবাড়ীতে যেখানে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রকন্যা আবাল্য বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তথাকার বিবরণ উল্লেখ করার সার্থকতা আছে। কারণ তাহা হইতে কিরূপ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহারা দিন যাপন করিতেন, তাঁহারা কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি-শক্তি কি রকম ছিল, তাঁহারা কি কি জানিতেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, এ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিলে বাদী প্রতারক তাহা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া, কি আসল কুমারকে পরাভূত করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাদীকে জেরা করা হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অনেকটা সহজ হইবে।

ঢাকার বিশ মাইল দূরে জয়দেবপুর একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। ঢাকা হইতে ট্রেণযোগে এক ঘণ্টার পথ। রেল লাইন জয়দেবপুর গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ভাওয়াল রাজবাড়ী রেল লাইনের পূর্ব্ব পার্শ্বে কিঞ্চিদধিক সিকি মাইল দূরে অবস্থিত। রেল ষ্টেশন হইতে রাজবাড়ী হাঁটাপথে প্রায় মাইল হইবে। এই মামলা সংশ্লিষ্ট কোন কোন ঘটনা বুঝিবার পক্ষে জয়দেবপুর গ্রামের ভূসংস্থানের বর্ণনা একান্ত আবশ্যক। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া খানিক উত্তর মুখে গেলে গ্রামের প্রধান রাস্তা বা রাজ-বাড়ী রোড পাওয়া যায়, এই রাস্তা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে লম্বিত। এই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে সিকি মাইলের একটু অধিক অগ্রসর হইলে বাম পার্শ্বে রাজবাড়ী পাওয়া যায়। রাজ-বাড়ীর পূর্ব্বদিক দিয়া এক রাস্তা উত্তরমুখী যাইয়া পূর্ব্বদিকে মোড় ঘুরিয়াছে। খানিক উত্তর পূর্ব্বে যাইয়া এই রাস্তা অপর এক রাস্তার সহিত মিলিয়াছে। এই সম্মিলিত রাস্তা শ্মশান-বাড়ী বা চিলাই নদীর তীরস্থ ভাওয়াল রাজ পরিবারের শ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। যে স্থানে উপরোক্ত দুইটী রাস্তা মিশিয়াছে, তথায় স্বর্ণময়ীর বাসস্থান 'নয়াবাড়ী' অবস্থিত।

এই বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর দৌহিত্র ফণিভূষণ ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার ভাগিনেয়দের বাস।

'নয়াবাড়ী' রাজবাড়ী হইতে অর্দ্ধ মাইলের কিছু বেশী ও শ্মশান বাড়ী হইতে প্রায় একশত বিশ গজ দূরে উত্তরে রাজবাড়ী হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত চিলাই নদীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম অংশ পোয়া মাইল দূর এবং এইখানে কালাই

সরদারের ঘাট রহিয়াছে। চিলাই নদীর সর্ব্বোচ্চ বিস্তার অনধিক ৫০ গজ মাত্র, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় নৌকা চলে না। অন্যান্য ঋতুতে হাতে ঠেলিয়া বা রশি টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়।

রাজবাড়ীর বর্ণনা

প্রাঙ্গণসহ ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিস্তার—দৈর্ঘ্যে ২২ গজ চেনের সাড়ে তের চেন ও প্রস্থে পাঁচ চেন, রাজবাড়ীর মাঝখানের বিস্তার একটু বেশী। রাজার সময়ে ভাওয়াল রাজ বাড়ীতে দশটী মহল ছিল। প্রত্যেক মহল আড়ম্বর বর্জ্জিত বহু কক্ষ সমন্বিত দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। গেটের সম্মুখে সদর মহল বা বড় দালান। গেট ও বড় দালানের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত ডিম্বাকৃতি প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া গাড়ীর রাস্তা দেউড়ীতে যাইয়া মিশিয়াছে, রাজ পরিজন বড় দালানে থাকিতেন না। বাদীর জেরা সম্পর্কে পুনরায় এই বড় দালানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে। সাধারণতঃ রাজার, জঙ্গলে শিকারের সখ লইয়া যে সকল শ্বেতাঙ্গ অতিথি রাজবাড়ীতে আসিতেন, তাঁহারা বড় দালানে থাকিতেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মায়ার সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর ইহা ম্যানেজারের কোয়ার্টার্স রূপে পরিগণিত হইতে থাকে।

বড় দালানের পিছনের আঙ্গিনায় কাঠের শিলিংয়ে টিনে ছাওয়া বিরাট নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরে বাইনাচ, থিয়েটার, যাত্রা বা কবি-গান হইত। নাট-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে চৌতালা

বাড়ী। উভয় তলায় অনেকগুলি ঘর। এই সকল ঘর সংলগ্ন অলিন্দে বসিয়া মহিলারা নাট-মন্দিরের গান শুনিতেন ও আমোদ উৎসব দেখিতেন।

নাট-মন্দিরের উত্তরে আর একটি দোতলা দালান ছিল। ঐ দালানের নীচে যে তিনটী ঘর ছিল তাহার একটি ঠাকুর ঘর; সেখানে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত। সেই উপলক্ষে গান হইত। আর একটা উপলক্ষ ছিল পুণ্যাহ—জমিদারী বৎসরারম্ভ ও নূতন খাতা আরম্ভ। এই উপলক্ষে ছোট বড় প্রজারা আসিয়া মিলিত হইত, টাকা পয়সাদি দিত এবং গান শুনিত। অন্য দুইটি ঘরের একটিতে ছিল সাজঘর এবং আর একটি পূজার ভাঁড়ার ঘর। উপরতলায় রাজার বসিবার ঘর ছিল এবং আরও কয়েকটি ঘর ছিল।

এই দালানের পিছনে ছিল অন্দর মহল। ঐ সকল লইয়া একটি ব্লক ছিল। উহা এখন পুরাণ বাড়ী বলিয়া পরিচিত। উহা এখনও আছে। উহার পশ্চিমে আর একটি ব্লক ছিল। উহাকে পশ্চিম খণ্ড বলা হইত। উহাতে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের ভগিনী স্বর্ণময়ী বাস করিতেন। স্বর্ণময়ীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাজবাড়ীর পিছনে একটা বাগান ছিল। উহা এখনও আছে। পূর্ব্বদিকে একটী রাস্তা নদী অভিমুখে গিয়াছে। পশ্চিমে একটি সুন্দর দাঘি। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫১ গজ এবং প্রস্থে ৬৬ গজ। উহা রাজবাড়ীর দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়াছে। উত্তরদিকে বাগানের দিকের দরজা খুলিয়

মেয়েরা দীঘিতে যাইতে পারিতেন। উহার পূর্ব্বতীরে বাড়ীর মধ্যে বড় দালানের প্রায় ত্রিশ গজ উত্তর পশ্চিমে মাধববাড়ী (গৃহ দেবতাদের গৃহ) অবস্থিত। মাধববাড়ী দক্ষিণ দরজা গৃহ, উহাতে একটি দেওয়াল ঘেরা ছোট উঠান আছে। উঠানের দক্ষিণদিকে একটি দরজা আছে। মাধববাড়ীর প্রধান মূর্ত্তি মাধব। উহা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি। অন্য একটি মূর্ত্তির নাম জয়দুর্গা; উহা কোন ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি। আরও একটি মূর্ত্তি আছে। তাহা তারা মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির গৃহ মাধববাড়ীর উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। উহাকে মাধববাড়ীর অংশই বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার পৃথক উঠান আছে। দীঘির পূর্ব্বতীরে যে রাস্তা আছে, সেই দিকে ঐ উঠান খোলা। পরে যে বিস্ময়কর ব্যাপার বিবৃত হইবে তাহার কতকটা এই মাধববাড়ীতে হইয়াছিল। মাধববাড়ীর পিছনে একটি খোলা প্রাঙ্গণ আছে। উহার অন্যদিকে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পরে 'রাজবিলাস' (একটী আধুনিক ধরণের বাড়ী) নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা যখন মারা যান, তখন বাড়ী নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল বা কেবল মাত্র শেষ হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পরে পরিবারস্থ লোকেরা রাজবিলাসে বাস করিতেন। এতৎ-সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

রাজা যে বাড়ীতে বাস করিতেন এবং যে বাড়ীতে তাঁহার সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও বহু বিভাগ ছিল, ভৃত্য ও কর্ম্মচারীর অন্তই

ছিল না। রাজবাড়ীর মধ্যে নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকের একটি ঘরে একটি পারিবারিক ডিস্পেন্সারী ছিল। উহাতে একজন ডাক্তার থাকিতেন। রাজবাড়ীর মধ্যে খাজাঞ্চিখানা বা ধনাগারও ছিল। রাজবাড়ীর পূর্ব্বের একটি ঘরে ফরাসখানা ছিল। অন্দরের অবস্থিত রন্ধনগৃহ ছাড়া, বড় দালানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি বাবুর্চ্চিখানা ছিল ও রাজার জীবিতকালে অন্ততঃ ধনঞ্জয় নামক একজন অহিন্দু বাবুর্চ্চি ছিল। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, প্রত্যাগত ইউরোপীয় অথবা সাহেবী ভাবাপন্ন অতিথিদের জন্য উহা রাখা হইয়াছিল। প্রথম বাহির বাড়ীতে এবং পরে পুরাণ বাড়ীর ছাদে একটি ষ্টুডিও ছিল। নাট-মন্দিরে নাট্যাভিনয়ের জন্য একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল।

রাজবাড়ীর বাহিরে—তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেই সম্মুখে একটি ময়দান পড়ে। স্থানীয় ভাষায় উহাকে 'চটান' বলা হয়। উহা রাজার সময় একটি জঙ্গলা ও অসমতল ফাঁকা জায়গা ছিল। পরে পোলো খেলার জন্য পরিষ্কার করা ও সমতল করা হয়। উহার উত্তর দিকে রাজবাড়ীর রাস্তা। উহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেও রাস্তা। বাদী জয়দেবপুর যাওয়ার পরে ১৯২১ সালের ১৫ই মে যে বিরাট সভা হয়, (বিবাদী পক্ষ উহাকে বহুলোক সমাগম বলিয়াছেন), তাহা এই ময়দানেই হইয়াছিল।

রাজবাড়ীর সঙ্গে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ছিল :—

ঠিক রাজবাড়ীর উত্তরে রাস্তার পরে চীফ অথবা ম্যানেজারের অফিস; পশ্চিমদিকে দীঘির দক্ষিণে দেওয়ান-

খানা। উহার দরজা রাজবাড়ীর রাস্তার দিকে ছিল। পরে ১৯০৫ সালে উহা মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়টিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয় এবং উহার নামকরণ করা হয় "রাণী বিলাসমণি স্কুল।" উহার দক্ষিণে রাস্তার অপর দিকে স্কুল-বোর্ডিং। উহাতে একটি বাঁধা পুষ্করিণী ছিল। উহার দক্ষিণস্থ একটি জায়গায় যে আস্তাবলগুলি ছিল এবং রাজার মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় কুমার চটানের দক্ষিণে যে আস্তাবল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ৪০টি ঘোড়া থাকিত এবং সব রকমের গাড়ী থাকিত, তন্মধ্যে একটী রৌপ্যমণ্ডিত গাড়ীও ছিল। চটানের পূর্ব্বের রাস্তার একটি স্থানে জয়দেবপুর ডিহি অফিস, দীঘির পশ্চিম পাড়ে খাস অফিস। রাজার সময়কার ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাসভবন ঐখানে ছিল। রেল ষ্টেশনের নিকটে দাতব্য চিকিৎসালয়। হাটের দক্ষিণে রেল লাইনের অন্য পার্শ্বে অতিথিশালা, হাটটি ও রাজার সম্পত্তি উপরে। সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। ঐখানে সাধারণতঃ যেরূপ থাকে সেইরূপ দোকান, হোটেল, আবগারী দোকান ও থানা ছিল। পরিবারস্থ শব দাহ করিবার স্থান 'শ্মশান-বাড়ী'তে রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি। 'বুড়া বুড়ী' নামে পরিচিত এক জোড়া গাছের নিকট রাজবাড়ীর উপরেই জল সরবরাহের কারখানা। সেখানে দীঘি হইতে জল পাম্প করিয়া পুরাণ বাড়ীর ছাদের উপর অবস্থিত সাতটি ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি করা হইত। রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে পিলখানা,

রাজবাড়ী হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী বোরদহতে অবস্থিত ছিল। পরে চটানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটা স্থানে পিলখানা করা হয়। পিলখানার নিকটে মাহুতদের জন্য চালা ছিল। পিলখানাটি ছিল একটি খোলা ইটবাঁধা জায়গা। ১৯০৭ সালে সেখানে ২০টি হাতী ছিল। ১৯০৯ সালে যখন দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন, তখন সেখানে ছিল প্রায় ১৬টি হাতী। প্রত্যেকটি হাতীরই নাম ছিল এবং প্রত্যেকটিরই একজন করিয়া মাহুত, একজন মেট এবং দুইজন ঘেসেল ছিল। রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিঃ ট্রান্সবেরী নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি চা-বাগান (রাজার সম্পত্তি) ছিল এবং প্রায় মাইল দূরে একটি বাগান ছিল। পরিবারের বাসস্থানের সঙ্গে যে বিভাগ ও গৃহাদি ছিল তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান। এ পর্য্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা সেই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, যাহা খণ্ডন করিবার কিছুই নাই এবং যাহা সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে দিয়া সমস্ত সম্বন্ধেই প্রমাণ উপস্থিত করাইয়াছেন। যখন বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় কেবলমাত্র তাহার পরেই রাজবাড়ীর দালানগুলির একটি নক্সা তাঁহারা দাখিল করেন এবং ৯৭৭নং সাক্ষীকে দিয়া কতকগুলি ঘরের পারস্পরিক অবস্থান বলান। সাক্ষী যাহা স্বীকার করিয়াছে, তাহা ছাড়া উপর তলা ও নীচের তলার নক্সা প্রমাণিত হয় নাই। এই নক্সাগুলি স্বাক্ষরশূন্য, উহাতে কোন তারিখ নাই। কে উহা করিয়াছে তাহাও কেহ জানে না। পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনগুলি

উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া উহা স্পষ্ট; অল্পদিন পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

জয়দেবপুরের কর্ম্মচারীবর্গ

সে সমস্ত বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে মফঃস্বলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা গণনার মধ্যে না আনিয়াও কেবল জয়দেবপুরের কর্ম্মচারীর সংখ্যার একটা আঁচ পাওয়া যাইবে। জয়দেবপুরের বহুসংখ্যক কেরাণী, ভৃত্য, রক্ষী, আরদালী, দারোয়ান, মালী, পাচক, অতিথিশালাব কর্ম্মচারী, বড়দালানের কর্ম্মচারী, ডিস্পেন্সারীর কর্ম্মচারী, ফরাসখানা ও অফিসসমূহের কর্ম্মচারী, গানবাজনার ওস্তাদ (রাজা সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন) পালোয়ান, সহিস, মাহুত, পূজারী, শিক্ষক, ডাক্তার ও অন্যান্য বহু বিষয় যাহার সমস্ত উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে, তৎসম্পর্কিত লোকজন ছিল। মফঃস্বলে ৪৪টি ডিহি ছিল প্রত্যেক ডিহিতে একজন নায়েব, একজন কেরাণী, কখনও কখনও একজন ঠিকা কেরাণী এবং একজন বা দুইজন পিয়ন। কুমারকে যাহারা জানে এরূপ অসংখ্য লোক এখনও নিশ্চয়ই জীবিত আছে আমি নিম্নে দেখাইব যে, সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সাক্ষী সংগ্রহ করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সংখ্যা যদি সীমাবদ্ধ করিয়া না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এরূপ আরও সাক্ষী উপস্থিত হইতে পারিত। তাহারা সত্য কথা (বলিয়াছে কি না সে অন্য কথা) কিন্তু বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী

সমস্ত মামলা শুনিয়াও প্রজা সাক্ষীদের জেরার সময় এ ইঙ্গিত কখনও করেন নাই যে, কুমার দুর্লভদর্শন বা অনধিগম্য অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রজারা কদাচিৎ তাঁহাকে দেখিয়াছে। যখন সনাক্তকরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির আলোচনা করিব তখন এই ইঙ্গিত সম্বন্ধে আমি পুনরায় উল্লেখ করিব।

নলগোলার বাড়ী

এই পরিবারের ঢাকা নলগোলাতে বুড়ীগঙ্গার উত্তরে একটি বাড়ী ছিল। রাজা এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কুমারেরা যখন সহরে আসিতেন তখন ঐ বাড়ীতে থাকিতেন। সহরে তাঁহারা প্রায়ই আসিতেন। ঐ বাড়ীর রোখ উত্তরদিকে, নদী উহার পিছনে। ঐ বাড়ীর প্রায় বিপরীত দিকে একটী আস্তাবল ও 'মোক্তার অফিস' নামক একটি অফিস অবস্থিত। ঐ মোক্তার অফিস ঐ পরিবারের আইন অফিস। নদীতে একটি বজরা ও 'মাতিয়' নামক একটী ষ্টিমলঞ্চ থাকিত। সাক্ষ্যে এই বাড়ীর বহু উল্লেখ আছে।

কুমারদের পিতার বর্ণনা

কুমারেরা যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বাড়ী সম্বন্ধে এইখানেই থামা যাক। এখন তাঁহাদের পিতার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার এবং ১৯০৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি বিবৃত

করা দরকার। নথিতে ৫৪নং ও ৩৯নং একজিবিট রাজার দুইখানা ফটোগ্রাফ। তিনি ফর্সা ছিলেন না, একটু ময়লা বা যাহাকে শ্যামবর্ণ বলে তাহাই ছিলেন (বাদীপক্ষের ৩৮৮, ৫১৪, ৪৯৭, ৮৪নং সাক্ষী)। মনে হয় তাঁহার বড় ছেলে, 'বড়কুমার' এর চেয়েও তাঁহার রং ময়লা ছিল।

তাঁহার দাড়ি ছিল এবং গম্ভীর রাসভারী চেহারা ছিল। তাঁহার ছেলে দ্বিতীয়কুমার তাঁহার মত 'কাণ' পাইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। যখন কুমারের দেহের বিষয়ে আসিব তখন আমি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা বলা যথেষ্ট নহে যে, এই বৈশিষ্ট্যটুকু ও আর একটি চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন সাদৃশ্যের কথার কেহ ইঙ্গিত করে নাই। যাহাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যায়, রাজা তাহা ছিলেন না। যদিও একজন সাক্ষী তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছে; কিন্তু তিনি ইউরোপীয়দের সহিত দেখাশুনা করিতে ও মিশিতে পারিতেন। তাঁহার কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু খুব শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষা সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁহার কতকগুলি চিঠি দেখিয়া বুঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজী লিখিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল হইবে যে, তিনি সাহেবী ধরণের লোক ছিলেন অথবা সাহেবদের বাড়ীর মত তাঁহার বাড়ী ছিল অথবা তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী সাহেবদের মত ছিল। একটি ফটোতে তাঁহার খালি

গা তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাঝে মাঝে যদি তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়াও থাকেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাঙ্গালীর মত জীবন যাপন করিয়াছেন। আমি তাঁহার বাটীর বর্ণনা দিয়াছি। বড় দালান নিশ্চয়ই ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত করা হইয়াছে কিন্তু বাড়ীর অনান্য অংশে কোন প্রকারের ইউরোপীয় ধরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজ-বাড়ীর আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত 'কাপ বোর্ড', 'সাইড বোর্ড' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে বাদীর অজ্ঞতাতে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছে যে, উক্ত বাড়ীর লোকদের অথবা কুমারদের আসবাবপত্রের ইংরেজী নাম জানা ছিল কিনা ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু এই বলাই যথেষ্ট যে, রাজবাড়ীতে কি কি আসবাবপত্র ছিল সে সম্বন্ধে পক্ষদ্বয়ের কথায় কোন গুরুতর পার্থক্য নাই। একজন মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, যিনি ২০টি হাতী তো দূরের কথা একটি গাড়ীও রাখিতে পারেন না, তাঁহার বাড়ীতে যে সব আসাবপত্র দেখা যায়, তদপেক্ষা বেশী কিছু সেখানে ছিল না।

মহিলারা অন্দরেই থাকিতেন, তাঁহারা পর্দ্দানশীন, অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন। রেল ষ্টেশনে গেলে তাঁহাদের পর্দ্দার আড়ালে রাখা হইত, ষ্টীমারে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে পাল্কীতে ঘাটে পৌঁছাইয়া দিতে হইত; এমন কি দার্জ্জিলিংয়ের মত স্থানে যেখানে পর্দ্দাপ্রথার হাঙ্গামা নাই, তথায়ও মেজরাণী বড একটা বাহির হইতেন না। একান্ত বাড়ীর বাহির হইলেও

তাহা রাত্রিতে এবং রিক্সাযোগে ছাড়া নহে। একখানি ফটোগ্রাফে ছোটকুমারকে এবং আর একখানিতে বড়কুমারকে খালি গায়ে দেখা যায়। বাড়ীর মেয়েদের বার বৎসর পার না হইতেই বিবাহ দেওয়া হইত এবং তাহাও ভাল কুলীনের সঙ্গে। ছেলেরা গুরুমহাশয়ের নিকট ফরাসে বসিয়া শিক্ষালাভ করিত; তাহাদের টেবিলের কাজ চলিত একটী বাক্সদ্বারা এবং তাহারা পাতায় লিখিতে শিখিত (বাদী পক্ষের সাক্ষী বিল্লু, ৯৩৮ নং) এই পরিবারের চাল-চলন সাধারণ হিন্দু ভদ্রলোকদের মতই ছিল। বৃদ্ধ দেওয়ান রসিক রায়, ইন্দুময়ী দেবীর পুত্র বিল্লু, জ্যোতির্ময়ী দেবী, এমন কি মেজরাণী নিজে এবং উভয় পক্ষের যে সমস্ত সাক্ষী ঐ পরিবারের বিবরণ দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। এই পরিবারের বিলাতী হাল-চাল ছিল, এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। তাঁহাদের বাবুর্চি ছিল: সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিবার সময় বা কোন উৎসবে রাজা বাহাদুর নিজে ও তাঁহার মৃত্যুর পরে কুমারেরা বিলাতী পোষাক পরিতেন; কখনও কখনও শিকারের পোষাক পরিয়া তাঁহারা শিকারে বাহিত হইতেন; কিম্বা রাজাবাহাদুর একবার কলিকাতায় গিয়া বিলাতী হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন—এই সমস্ত ধরিয়া লইলেও ঐরূপ ধারণা করা ঠিক হইবে না।

স্বর্ণময়ী দেবীর নাতী ফণীবাবু (বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী) ১৮৯৩ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে ছিলেন এবং তাঁহার কথায় জানা যায় যে, কুমারের জীবদ্দশায় এই পরিবারের সহিত তাঁহার মেলামেশাও ছিল। তিনি

সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, রাজা বাহাদুর ইউরোপীয় পোষাকে থাকিতেন ও কদাচিৎ বাঙ্গালী পোষাক পরিতেন, তাঁহার হাবভাব চাল-চলন সবই বিলাতী কায়দায় ছিল। বাদীকে যেরূপভাবে জেরা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, এই সাক্ষীর উদ্দেশ্য ছিল তাহার জন্য মাল-মশলা যোগান দেওয়া। ফণীবাবুর মত কোন সাক্ষীকেই এত নাকাল হইতে হয় নাই এবং তাঁহার সাক্ষ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে। এই রায়ে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে এর শুনানীর সময় বিবৃত নানা ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার জবানবন্দী যে সত্য নহে তাহা বলা যাইবে।

রাজা বাহাদুরের চরিত্রের দুইটি লক্ষণের কথা জানা যায়. এই লক্ষণ দুইটি মেজকুমারকে চিনিয়া লইতে সাহায্য করিবে। রাজা বাহাদুর খব ভাল শিকারী ছিলেন এবং তিনি গান বাজনা ভালবাসিতেন। তিনি গান গাহিতে পারিতেন না, তবে ভাল তবলা বাজাইতে পারিতেন। অল্প অল্প সেতার ও ক্লারিওনেট বাজাইতে পারিতেন; অনেক ওস্তাদ বেতন দিয়া রাখিতেন। ইন্দ্র সেতারী, বিল্লু ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য হইতে এই সমস্ত কথা জানা যায়। রাজা বাহাদুর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের ছিলেন; ফলে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ এই :—

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও ইন্দুময়ী দেবীর ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে কি ২৬শে ফাল্গুন (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই কি ৯ই মার্চ্চ)

বিহাহ হয়। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বয়স তখন নয় বৎসরের একটু বেশী ছিল; ইন্দুময়ী তাঁহার দুই বৎসরের বড় ছিলেন। এই জিলার রোয়াইল গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণ জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সহিত (তখনও তাঁহর ছাত্রাবস্থা) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিবাহ হয়। ইন্দূময়ী দেবীর বিবাহ হয় গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত। এই দুইজনে কেহই স্বামীর ঘর করিতে যান নাই। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ জ্যোতির্ম্ময়ী বিধবা হন। এই মামলায় তাঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। বিবাদী পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার সমর্থন পাইয়াই বাদী এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। জয়দেবপুরে দ্বিতীয়বার গমনের পর হইতে বাদী ইঁহার গৃহেই বাস করিয়াছে। বাদী জয়দেবপুরে ইহার আশ্রয়ে ৩৭ দিন এবং পরে ঢাকায় (কলিকাতায় অবস্থান সময় বাদ দিয়া) এক বাড়ীতেই বাস করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের যুক্তি এই যে, এই মহিলাই পিছনে থাকিয়া মামলা চালাইতেছেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এক পুত্র জলদ ওরফে বিধুবাবু এবং দুই কন্যা প্রমোদবালা (মণি ও বিভুবালাকে (হেনী) লইয়া বিধবা হন। ১৯৩৩ সালে মামলার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বেই বিধুর মৃত্যু হয়।

১৮৯০ সালের ৮ই কি ৯ই মার্চ্চ রাজা বাহাদুরের দুই কন্যার বিবাহ এবং তৎপরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর স্বামীর মৃত্যু—এই ঘটনাদ্বয়ের পরেই ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ্চ) বড়কুমারের বিবাহের কথা উল্লেখ

করা যাইতে পারে। সরযূবালা দেবীর সহিত বড়কুমারের বিবাহ হয়, ইঁহার পিত্রালয় কলিকাতায়। তিনি এই মামলার ২নং বিবাদিনী। বিবাহের সময় বড়কুমারের বয়স ছিল কিঞ্চিদধিক আঠার এবং সরযূবালা দেবীর বয়স ছিল প্রায় বার। সরযূবালা দেবীর পিতা সুরেন্দ্রলাল মতিলাল কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন; সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার কিছু সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু জয়দেবপুর রাজবাটীতে এই বিবাহ হয়, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজকে রাজা বাহাদুরের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন মনে করিতেন না। সমান মর্য্যাদা-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে বর ক'নের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়, ক'নে বরের বাড়ীতে যায় না (বিবাদী পক্ষের ১২০নং সাক্ষী শরদিন্দুবাবুর সাক্ষ্য)

এই বিবাহের পূর্ব্বে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর 'রাজ-বিলাসে'র নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। উহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় রাজা পীড়িত হইয়া ঢাকা যান এবং তথায় নলগোলা রাজবাড়ীতে ১৯০১ সালের ২৬শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শব স্পেশ্যাল ট্রেণে জয়দেবপুরে লইয়া গিয়া চিলাই নদীর তীরে শ্মশানবাড়ীতে দাহ করা হয়।

রাজার মৃত্যুর পর রাণী বিলাসমণি পুত্রগণের অছিস্বরূপ জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তখন বড়কুমারের বয়স ১৮ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন, মেজকুমারের বয়স ১৬ বৎসর ৮ মাস ২১ দিন এবং ছোটকুমারের বয়স ১৪ বৎসর ৮ মাস ১৪ দিন ছিল। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই তখন প্রায় বালক

ছিলেন। ১৯১০ সালে ২৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বড়কুমার মারা যান। এই মামলা সম্পর্কে যে সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে তাহাতে কুমারদের বয়সের কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। রাজার জ্যৈষ্ঠপুত্র 'বড়কুমার', সুতরাং কর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ছিল না।

রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে কুমারদের দুইজন গৃহ-শিক্ষক ছিল। কুমারদিগকে শিক্ষাদানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। কুমারেরা যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা বাড়ীতেই লাভ করিয়াছিলেন; তবে মধ্যে এক বৎসরের কম সময় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে গিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত নহে। ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, গৃহ-শিক্ষকের নিকট কুমারেরা যে শিক্ষা পাইতেছিলেন, তাহা রাজার মৃত্যুর পরে অথবা বড়কুমারের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছিল যদিও বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় অন্যরূপ প্রমাণের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। বিবাদীপক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবুও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং বাদীপক্ষের সাক্ষী কুমারদের ভাগিনেয় বিল্লুর সাক্ষ্য বিচার করিলে দেখা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমারের সম্বন্ধে উভয় পক্ষই এই কথা মানিয়া লইয়াছে। অবশ্য বিল্লু বলিয়াছেন, বড়কুমার ১৩০৭ সালের কিছু পূর্ব্ব হইতে আর গৃহশিক্ষকদের নিকট পড়িতেন না।

গৃহশিক্ষকদের নাম দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় ও অনুকূল বাবু। কুমারদিগের শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার ফলাফল বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বাদী

বলেন, তিনি এবং তৃতীয় কুমার ইংরাজী ও বাঙ্গলা বর্ণমালা এবং সামান্য বানান্ ছাড়া আর কিছুই শিখেন নাই এবং সেই বিদ্যার মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র নিজ নাম স্বাক্ষর করা ছাড়া আর সবই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাদী সম্পর্কে বলা যায় যে, শুনানীর সময়ও দেখা গিয়াছে, তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে যে সব ইংরেজী অক্ষর লাগে, অবশ্য তিনি কুমার হইলে,—একমাত্র 'N' ছাড়া আর কোন অক্ষর তাঁহার মনে নাই; কিন্তু এ বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে।

কমিশনে যখন মিঃ এস ঘোষাল ব্যারিষ্টারের সাক্ষ্য লওয়া হয় তখন তিনি বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য সম্পর্কে শপথ করেন। সেই সময় সুবিজ্ঞ কৌঁশুলী বিবাদী পক্ষের বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছিলেন। মিঃ ঘোষাল তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে কলিকাতায় কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় তিনি কুমারের কথাবার্ত্তায় ও আচার-ব্যবহারে কুমারকে তাঁহার নিজের মতই একজন বলিয়া দেখিতে পান। মিঃ চৌধুরী কথাটা ঠিক এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন:—"আপনি তাঁহাকে একজন সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত বাঙ্গালী যুবক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কি?" মামলার শুনানী চলিবার সময় ক্রমে ক্রমে এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি খাটো করা হইয়াছিল। কুমারের বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আমি যখন আলোচনা করিব, তখন ইহা দেখা যাইবে। বর্ণ-জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয়। তাই বর্ত্তমান কাহিনীর মধ্যস্থলে তাহার আলোচনা না করিয়া পৃথকভাবে

এক স্থলে এই বিষয়টির আলোচনা করাই আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তবে বিবাদী পক্ষ আগাগোড়াই ইহা বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কুমার ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন এবং তিনি ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তাও চালাইতেন যদি কুমার তাহা করিতে পারিতেন এবং যদি তাঁহার বর্ণজ্ঞান এতটা অগ্রসর হইয়া থাকিত যে, সেই অবস্থা হইতে আর তাঁহার নিরক্ষর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা হইলে এই মামলার বাদী কুমার হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি ইংরাজী না জানিতেন এবং ইারাজী না জানা সত্ত্বেও জেরার সময় কোন কোন ইংরাজী শব্দ শিখিয়া লইতে পারেন বলিয়া অনুমান করা না যাইত, তাহা হইলে তিনিই স্বয়ং কুমার বলিয়া ধরিলে তিনি নিশ্চয়ই জেরায় সমস্ত প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেন।

এস্থলে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে. যেটুকু শিক্ষা কুমারেরা পাইতেছিলেন, তাহাও ১৩০৭ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত অপর শিক্ষক মিঃ হোয়ারটন যদি কুমারদের জন্য কিছুই করিয়া থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের শিক্ষা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিতে পারা যায়। এই ঘটনার পর বহু ব্যাপারই ঘটিতে লাগিল। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কিছু পূর্ব্বে কুমারগণকে কথ্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মিঃ হোয়ারটন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। তাহার পর সেপ্টেম্বর মাসে কিম্বা তাহার কাছাকাছি

সময়ে রাণী বিলাসমণি তাঁহাদেব ম্যানেজার রায় বাহাত্বর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বরখাস্ত করেন। ইনি রাজা কালীনারায়ণের সময় হইতে ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহাকে ডিস্‌মিস্ করার যে তারিখ আমি দিয়াছি, তাহাব কোন প্রতিবাদ হয় নাই। রায়বাহাত্বব কালীপ্রসন্ন ঘোষের পুত্র বায়বাহাত্বব সারদাপ্রসন্ন ঘোষ এখন বাঙ্গলাদেশের অন্যতম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি এই মামলায় কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাব জবানবন্দীতে তাঁহাব পিতাকে ম্যানেজারী হইতে ববখাস্ত কবাব উল্লেখ আছে। মিঃ হোয়াবটন ১৯০২ সালেব ৩১শে জুলাই তাবিখে পদত্যাগ কবেন। ১৯০২ সালেব ২৫শে জুলাই তাবিখে তিনি যে পদত্যাগপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি বলেন,—

"মাননীয়া মহাশয়া,—আগামী ১লা আগষ্ট হইতে আমি আপনাব চাকুবী ছাড়িয়া দিতে চাই, এজন্য এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আমি নিজেই তুঃখিত। কিন্তু আপনাব অধীনে চাকুবীতে প্রবেশ কবাব পব হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমাব সঙ্গে যেরূপ ব্যবহাব কবা হইযাছে, তাহাতে আমাব অভিপ্রাযেব কথা শুনিযা বোধ হয আপনি বিস্মিত হইবেন না; কারণ একজন ভদ্রলোক হিসাবে আমাব সম্মুখে আব দ্বিতীয় পথ খোলা নাই।

"আমি আপনাকে পুনবায স্মবণ কবাইয়া দিতে চাই যে, বিভাগীয় কমিশনাব ও মিঃ গার্থ যখন আমাকে আপনার অধীনে চাকুবী লইতে বলেন, তখন আমাকে পরিষ্কার করিয়াই বলা

বামা বিদ্যাসন্ধি

হইয়াছিল যে, আপনার বালক তিনটি সম্পূর্ণরূপে আমারই তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং আমিই সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কাজকর্ম্ম এবং দৈনিক সাধারণ অভ্যাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিব। আমাকে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, আপনার ম্যানেজার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞাধীনে আমাকে থাকিতে হইবে। এই সকল সর্ত্ত স্বীকার করিয়াই আমি আপনার চাকুরী গ্রহণ করি। কিন্তু আপনি জানেন, আমার চাকুরী গ্রহণের অল্প সময় পরেই আপনি রায় বাহাদুরকে বরখাস্ত করেন। তখন একমাত্র মিঃ স্যাভেজের অনুরোধেই আমি আপনার বালকদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতে রাজী হই। আমার আশা ছিল যে, আমার শিক্ষার গুণে তাহারা ভদ্র ব্যবহার করিতে শিখিবে এবং পড়াশুনায় মনোযোগী হইবে। বিভাগীয় কমিশনারের অনুরোধেই আমি আপনার ঘোড়াশালার পরিচালন-ভার গ্রহণ করি। আপনার ঘোড়া ও গাড়ীগুলিকে যেরূপ কদর্য্য অবস্থায় রাখা হইত, সম্ভবপর হইলে তাহার প্রতিকার ও উন্নতিবিধান করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পরিষ্কারভাবে এই সর্ত্তে আমি ঘোড়াশালার পরিচালনভার গ্রহণ করি যে, এ কার্য্যের জন্য আমাকে মাসিক ৯০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে।

"আপনার ছেলেরা যত প্রকারে সম্ভব পড়াশুনায় অবহেলা করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, অতি শোচনীয় বদ্ অভ্যাসগুলি পরিত্যাগের জন্যও তাহারা কোন প্রকার চেষ্টা করে নাই। অতএব ইহা অতি পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, আমার

উপদেশ অথবা শিক্ষা গ্রহণ করার কোন অভিপ্রায়ই তাহাদের নাই।”

মিঃ হোয়ারটনের পত্রের অবশিষ্টাংশে তাঁহার প্রাপ্য বেতন ইত্যাদির কথা রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, এই পত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজার মৃত্যুর পর মিঃ হোয়ারটনকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং রাণীই তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আদালতে এই পত্রখানি প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, রাজাই মিঃ হোয়ারটনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, যে সাক্ষীর নিকট এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তিনি (বাদীপক্ষের ৩৫ নং সাক্ষী) বলেন,—রাণী অথবা বড়কুমারই সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তবে তিনি কুমারদিগকে শিক্ষা-দানের পরিবর্ত্তে পিলখানা এবং অন্যান্য জিনিষের তত্ত্বাবধান করিতেন। মিঃ হোয়ারটনের পত্র, অন্যান্য প্রমাণ, ঘোড়াশালা তত্ত্বাবধান বিষয়ক চিরকুট (১৬নং হইতে ১৬ (১০) নং একজিবিট) ইত্যাদি হইতে মনে হয় যে, সাক্ষীর উক্তিই সত্য।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কিম্বা কাছাকাছি সময়ে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং তাহার পর তাঁহার বিরুদ্ধে হিসাব দাখিলের মামলা করা হয়। তাঁহার স্থলে বাবু সুরেন্দ্রলাল মতিলালকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। মিঃ মতিলাল ছিলেন বড়কুমারের শ্যালক।

ইতিমধ্যে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় কুমারের বিবাহ হয়। ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের

তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ স্থির করিয়া ১নং বিবাদীর মাতার আত্মীয়-গণের নিকট পত্র ও তার (একজিবিট ২৯৬ ও ২৯৭) প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখই বলিয়াছিলেন ; কিন্তু জেরার সময় যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তারিখটা ৮ই হইতে পারে কি না, তখন তিনি বলেন যে এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে তাঁহার ধারণা এই যে, ১৭ই তারিখেই বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর তাঁহাকে রাণী জয়মণির তার এবং রাণী বিলাসমণির পত্র দেখান হয়। তাহাতে তিনি এই পত্রের কিম্বা পত্রে উল্লিখিত ৮ই আষাঢ় তারিখের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। অতঃপর তিনি এমন কতকগুলি উত্তর দেন, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, ১৭ই তারিখের কথাই তাঁহার স্মরণ হইতেছে না। ইহা কতকটা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে, মেজরাণী তাঁহার বিবাহের তারিখ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবেন। ইহাতে এরূপ সমালোচনা-সূত্র ঘটে যে, মেজরাণী তাঁহার মামীমার উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্যই নিজের বিবাহের তারিখটা একটু পিছাইয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মামীমা সরোজিনী দেবী বিবাহের যাত্রীদলের সঙ্গে আসিয়া প্রায় ২২ দিন জয়দেবপুরে ছিলেন, তাঁহার সাক্ষ্যে এ কথা আছে। দ্বিতীয় কুমারকে তিনি সেইবারেই যে প্রথম দেখিলেন, তাহা নহে। অতএব বিবাহ উপলক্ষে তিনি কতদিন ছিলেন, তাহা তেমন গুরুত্বব্যঞ্জক নহে। বিবাহ উপলক্ষে তিনি ২২ দিন ছিলেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ১নং বিবাদীর বেলায়ও বর তাঁহার বাড়ীতে

যান নাই, তিনিই বিবাহের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইবার পর বরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মামা প্রতাপ-নারায়ণ রায় ও তাঁহার পত্নী সরোজিনী দেবী (পূর্ব্বোক্ত বাদী পক্ষের ১০২৬ নং সাক্ষী), মেজরাণীর নিজের মাতা ফুলকুমারী দেবী, ভ্রাতা সত্যেন্দ্র এবং কতিপয় ভৃত্য আসিয়াছিল। বিবাহের সময় মেজরাণীর বয়স ১৩ বৎসর ছিল। মেজরাণীর ভ্রাতা সত্যেন্দ্র এই মামলায় বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবেন এবং বর্ত্তমান কাহিনীর এক অংশেও বিশেষভাবে তাঁহার কথা বিবৃত হইবে। বিবাহের সময় সত্যেন্দ্রের বয়স প্রায় ১৭ বৎসর ছিল—অর্থাৎ দ্বিতীয় কুমার হইতে তখন তিনি এক বৎসরের ছোট ছিলেন।

সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ভদ্রলোক এখন ধনী হইয়াছেন। বাদীর বক্তব্য এই যে, এই ভদ্রলোকই বর্ত্তমানে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাওয়ালের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ভোগ করিতেছেন। নামে অবশ্য সত্যেন্দ্রের ভগিনীই এই এক-তৃতীয়াংশের মালিক, প্রকৃতপক্ষে সত্যেন্দ্রই এই মামলা চালাইতেছেন। ভ্রাতার আধিপত্যের কথা বিচার করিতে গেলে ভগিনীর নিজস্ব কোন মতামত নাই। ভ্রাতা অথবা ভগিনীর মধ্যে কেহই কুমারের অভ্যুদয়কে একটা অনর্থ-পাত ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারিবেন না।

এই মহিলার পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিবেচ্য। সাক্ষ্য প্রমাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার সহায়তা হইবে, এই

কারণেই মেজরাণীর পিতৃপরিবারের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি তাঁহার মাতা ফুলকুমারীর চারিটি সন্তানের অন্যতমা। এই ফুলকুমারী ছিলেন হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার পরিবারের বাবু নবকৃষ্ণ মুখুয্যের কন্যা। মেজরাণীর পিতা বিষ্ণুপদ বাড়ুয্যে হুগলী জেলারই নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মেজরাণীর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, মেজরাণীর মাতা তাঁহার সন্তানগণসহ ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার অপর ভ্রাতা রামনারায়ণের বাড়ীতে ছিলেন। ১নং বিবাদী বলেন,—তাঁহার মাতা বিধবা হইবার পর সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতার বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। ১নং বিবাদীর ভ্রাতা সত্যেন্দ্রও তাহাই বলিয়াছেন। সত্যেন্দ্র আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, সত্যেন্দ্রের পিতার কিছুই ছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে ফুলকুমারী নিশ্চয়ই স্বামীর বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু ফুলকুমারী কখনও স্বামীর গৃহে থাকেন নাই—এমন কি স্বামীর জীবদ্দশায়ও তিনি স্বামীগৃহে বাস করেন নাই। কারণ সত্যেন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন,—উত্তরপাড়ায়ই তাঁহার লেখাপড়া সুরু হয়। শ্যামাপদ বাঁড়ুয্যের মাতা ছিলেন ফুলকুমারীর সম্পর্কিতা ভগিনী। এই শ্যামাপদ বাঁড়ুয্যের সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছে। তিনি বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সারাজীবনই ফুলকুমারী

তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়াছেন। তবে কোন কোন সময় স্বামীর বাড়ীতেও তিনি গিয়াছেন; কিন্তু সাক্ষীর এ বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। সঙ্গতিসম্পন্ন কোন লোকের স্ত্রী সারাজীবন তাঁহার ভ্রাতার বাড়ীতে বাস করেন না। সত্যেন্দ্র বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা সম্পত্তি রাখিয়া মারা গিয়াছিলেন, ইহা কেবল জনশ্রুতি ছাড়া আর কোন প্রমাণের দ্বারাই সমর্থিত নহে। তবে দেখা যায় যে, তাঁহার মাতা মৃত্যুকালে কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তবে ইতিমধ্যে তাঁহার কন্যা মেজরাণী ভাওয়াল এষ্টেট হইতে যে টাকা পাইতে-ছিলেন, সেই টাকাই ফুলকুমারী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার পত্রগুলির মধ্যে একখানি পত্রে তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ছেলে অনর্থক জয়দেবপুরে সময় নষ্ট করিতেছেন। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'সত্যেন্দ্র যদি এইভাবেই পড়াশুনায় অবহেলা করে তবে কি ভাবে তাহার জীবিকার্জ্জনের উপায় হইবে।' (একজিবিট নং ২৯৩ (ভ)।) অন্যান্য দিক হইতেও মনে হয় যে, প্রকৃত অবস্থাটা এইরূপই ছিল, বিষ্ণুপদ বাঁড়ুয্যের চারিটি সন্তানই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। তাহাদের মধ্যে ১নং বিবাদী অন্যতম সত্যেন্দ্রবাবুই একমাত্র ছেলে, অপর তিনটিই মেয়ে, এই মেয়েদের মধ্যে মলিনার বিবাহ হয় কান্তিচন্দ্র মুখুয্যের পুত্রের সঙ্গে। কান্তিচন্দ্র ছিলেন জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী। বিভাবতীকে ভাওয়ালের মেজকুমারের সহিত বিবাহ দেওয়া হয় এবং প্রভাবতীকে

উমাকালী মুখার্জ্জির পুত্র হাইকোর্টের উকীল সুশীলের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহাদের মাতুলগণ উচ্চপদস্থ লোক ছিলেন, এইজন্য এবং তাহাদের কৌলিন্য ও বালিকাদের সৌন্দর্য্যের জন্যই এই সব সম্পর্ক সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিবাদী ভাওয়াল এষ্টেটের তাহার অংশের ভার গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি জানাইয়া বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট যে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেকে উত্তরপাড়ার মুখার্জ্জি বংশের লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা এষ্টেট পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার যোগ্যতার অন্যতম কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ঐ দরখাস্তে তাঁহার পিতার কথা উল্লেখ করেন নাই।

মেজরাণীর তিন মাতুলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মাতুল প্রতাপনারায়ণ বিভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে বিভাবতীকে সঙ্গে করিয়া জয়দেবপুর আসেন। প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী এবং বিভাবতীর ভ্রাতা সত্যবাবুও আসিয়াছিলেন। সত্যবাবু ঐ সময় ছাত্র ছিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যাপক্ষ চলিয়া যায়; কিন্তু বিভাবতী দেবী থাকেন। ১৯০২ সালের মে মাসে মিঃ সুরেন্দ্র মতিলাল ম্যানেজার ছিলেন ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাণী (বিভাবতীর শাশুড়ী) ঐ সময় জীবিতা ছিলেন এবং গৃহকর্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পূরাপূরী ভাবে নহে। কারণ ঐ সময় রাণী সত্যভামা (বিলাসমণির শাশুড়ী) ও জয়মণি দেবীও জীবিত ছিলেন।

বিবাহের প্রায় একমাস পর মেজরাণী, বড়কুমার, রাণী সত্যভামা এবং জয়মণি ও কৃপাময়ীর সঙ্গে কলিকাতা যান।

তথা হইতে তিনি তাঁহার মার নিকট উত্তরপাড়া যান এবং তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি জয়দেবপুর আসার পথে এক সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকিয়া জয়দেবপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহা ৭ই শ্রাবণ হইবে—মেজরাণীর উক্তিতেই তাহা দেখা যায়।

১৯০২ সালের ১০ই আগষ্ট মেজকুমার তাঁহাকে বাঙ্গলা একখানি চিঠি লিখেন বলিয়া বলা হইয়াছে। বিভাবতী দেবীর উক্তিতে দেখা যায়, মেজকুমার তাঁহাকে মোট ৯খানি চিঠি লিখিয়াছেন, অবশ্য প্রভাবতীর নিকট যে চিঠি লেখা হইয়াছে সেইখানা বাদে এবং ইহা (ঐ বাঙ্গলা চিঠি) তাহার মধ্যে অন্যতম।

মেজকুমারের বর্ণজ্ঞান যে মোটেই ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাদীপক্ষে বলা হইয়াছে যে, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঐ সব চিঠি জাল করা হইয়াছে। কুমারের বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার সময় ইহার উল্লেখ করা হইবে।

জয়দেবপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথম বিবাদী, যাহাকে আমি দ্বিতীয় রাণী বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি, বাঙ্গলা ১৩১১ সনের (১৯০৪ সালের অক্টোবর) আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জয়দেবপুরই অবস্থান করেন। ঐ সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ১৯০২ সালের নবেম্বর মাসে মিঃ মায়ার, (যিনি বিবাদীপক্ষে কমিশনে জবানবন্দী দিয়াছেন) ম্যানেজার নিযুক্ত হন (একজিবিট ২৮৩)। ১৩০৯ সনের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর অক্টোবর) বড়কুমারের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তিনমাস বয়সেই তাহার

মৃত্যু হয়। ১৩০৯ সনের পৌষ মাসে (১৯০২ সালের ডিসেম্বর) মেজরাণীর মাতা শিশু-সন্তানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একখানি চিঠি লিখেন। এই শিশু 'জকি' বলিয়া পরিচিত ছিল। এবং জয়দেবপুরে তাহার নামানুসারে জকি প্রাইমারী স্কুল নামে একটী স্কুল আছে।

১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে বড়কুমার দিল্লী দরবারে যোগদান করেন। মিঃ মায়ার বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাঁহাকে (বড়কুমারকে) রাজা করিবার কথা হয়।

১৩১০ সনের ১০ই মাঘ (১৯০৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী) একই তারিখে ছোটকুমার ও কনিষ্ঠা ভগ্নি তড়িন্ময়ীর (ডাক নাম মটর) বিবাহ হয়। ছোটকুমারের সহিত ৪র্থ বিবাদিনী আনন্দকুমারীর বিবাহ হয়। আনন্দকুমারীর বয়স তখন ১৩ বৎসরের কিছু বেশী ছিল এবং ঢাকা জেলার হারিয়া নামক কোন গ্রামের এক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন রাণীর মধ্যে আনন্দকুমারীই ঢাকা জেলার মেয়ে, অপর দুইজনের মধ্যে একজনকে কলিকাতার মেয়েই বলা যায়। কারণ উত্তরপাড়া কলিকাতা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। বাবু ব্রজলাল ব্যানার্জ্জির সহিত মটরের বিবাহ হয় এবং বর্ত্তমানে তিনি ঢাকার উকীল। তিনি আধা-ঘরজামাই ছিলেন। কারণ তিনি প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী থাকিতেন না, যদিও পরে তাঁহার স্ত্রী মটর, ঢাকা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। ১৩১০ সালের ১০ই ফাল্গুন ইন্দুময়ীর কন্যা মণিকে সাগরের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

সুতরাং ১৯০৪ সালের প্রথমভাগে রাজ-পরিবারে তিন কুমার। তাঁহাদের তিন ভগ্নী, ছেলে, মেয়ে এবং দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর দুই স্বামী। ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, জয়মণি ও রাজার ভগ্নী কৃপাময়ী এবং তাঁহার স্বামী বিলাসবাবু ছিলেন। বিলাস-বাবুর বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। তাঁহার আর একটী স্ত্রী ছিল এবং তাঁহাব গর্ভজাত পুত্র-কন্যাও ছিল। তাঁহার পুত্র-কন্যার মধ্যে দুইজন বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমি যখন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আলোচনা করিব তখন এই সব বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে। কৃপাময়ীর কোন সন্তান ছিল না। রাজার মৃত্যুর পর রাজবাড়ীতে দুইটি জিনিষ সংযোজিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার ছাতানের দক্ষিণ দিকে একটি নূতন অশ্বশালা প্রতিষ্ঠা করেন। আমি বলিয়াছি যে, ইহার ফলে পিলখানা অনেকটা নিকটে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন। এই চিড়িয়াখানায় দুইটি বাঘ, দুইটি চিতা বাঘ এবং অন্যান্য একদল পশু ছিল। এইগুলির মধ্যে একটি সাদা রংএর শিয়াল, যাহার কথা বাদী উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ শিয়াল সম্বন্ধে এই মামলায় আলোচনা হওয়াতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় কুমারকে চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছে, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কারণ এই লোকটি উপরোক্ত সাদা শিয়ালটিকেও দেখিয়াছিল। বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষীও (বিবাদীপক্ষের সাক্ষী নং ১৬৭) এই পশুটিকে দেখিয়াছে।

১৯০৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯০৪ সালের ১৫ই জুন তারিখে মিঃ মায়ার ঢাকার কালেক্টরের নিকটে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। (একজিবিট ১৮৪) এই রিপোর্টে কুমারদের জননী রাণীর খাস কর্ম্মচারী মিঃ মায়ার ষ্টেট পরিচালনে তাঁহার মনিব হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া অভিযোগ করেন; রাণী অর্থের অপব্যয় করিতেছেন এবং ষ্টেটের পক্ষে ক্ষতিকর অনেক কার্য্য করিতেছেন বলিয়াও ঐ অভিযোগে বর্ণনা করেন। বড়কুমারের প্রশংসা করিয়া বড়কুমারও এ বিষয়ে তাঁহার অভিযোগ সমর্থন করিতে-ছেন বলিয়া মিঃ মায়ার কালেক্টরকে জানান; কিন্তু তিনি ঐ অভিযোগে ছোট দুই কুমারের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা বিবাদীগণ কুমারের যে চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা হইতে এরূপ বিভিন্ন যে, মায়ার ঐরূপ রিপোর্ট পাঠাইবার কথা স্বীকার করিলেও তিনি বাদী কর্ত্তৃক ঐ রিপোর্টের যে নকল প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা হইয়াছে তাহা মানিয়া লন নাই। মূল রিপোর্ট কালেক্টরীতে চাহিয়া পাঠাইলেও দাখিল করা হয় নাই। যাহা হউক, ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর র‍্যাঙ্কিন কর্ত্তৃক ঐ রিপোর্ট প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ উক্ত রিপোর্টখানা তাঁহার নিকটেই প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ থাকিবারই কথা এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী হিসাবে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। এই রিপোর্টের ব্যাপারে মিঃ মায়ার এবং বড়-কুমার এক পক্ষে ছিলেন এবং রাণী ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়

এক পক্ষে ছিলেন, মিঃ র‍্যাঙ্কিন এবং যামিনীর (বাদী পক্ষের ৩৪নং সাক্ষী) সাক্ষ্য হইতে তাহা জানা যায়। যামিনী মায়ারের অধীনে কেরাণীর কাজ করিত এবং তাহার কথা মায়ারের এখনও স্মরণ রহিয়াছে। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাণী মায়ার সাহেবকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিলে, মায়ার বড়কুমার এবং এই যামিনী কেরাণী ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নিকট হইতে একখানি চিঠি লইয়া দার্জ্জিলিং গমন করেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিনও এইরূপ মনে করেন যে, ইতিমধ্যে তিনি মায়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই যে, উহারই ফলে রেভিনিউ বোর্ড হইতে এই আদেশ হয় যে, বোর্ড ষ্টেটের ভার গ্রহণ করিবেন। বোর্ড মায়ার সাহেবকে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত না করিয়া মিঃ হার্ড নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। অক্টোবর মাসের কোনও একদিন মিঃ র‍্যাঙ্কিন এবং ষ্টেটের তদানীন্তন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মিঃ হিলিগান ষ্টেট দখল করিবার জন্য জয়দেবপুর গমন করেন। মায়ারের কোন কাজ না থাকিলেও সেই সঙ্গে তিনিও জয়দেবপুর গিয়াছিলেন। মিঃ মায়ার বলেন, সমস্ত ব্যাপারটাই রাণীকে তাক লাগাইয়া দিবার জন্য করা হইয়াছিল। মিঃ র‍্যাঙ্কিন ষ্টেট এবং রাজবাটী দখল করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহারা যাহাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাগজ-পত্র তল্লাস করিতে পারেন তজ্জন্য স্ত্রীলোকদিগকে একটি ঘরে লইয়া যাইবার জন্য রাণীকে মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়া-

দেখাইয়া দিবার জন্য বেয়ারাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন কিন্তু মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলিয়াছেন, মায়ার কাগজপত্র কোথায় আছে বাস্তবিকপক্ষে কিছু জানিত না। যেই মনিব তাঁহাকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন, মায়ার তাঁহার এই অবস্থা উপভোগ করিতেই শুধু সেখানে গিয়াছিলেন। সেই সময়কার ঘটনাবলীর স্মৃতি যেরূপ তিক্ত হওয়ার কথা তাহাতে ঐ সমস্ত কথা মায়ারের কম মনে থাকিবে বা র‍্যাঙ্কিনের চেয়েও এই সব কথা তিনি কম স্মরণ করিতে পারেন, উহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এবং পরে যে সব ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, বড়কুমার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশে আসিয়াছিলেন এবং র‍্যাঙ্কিনের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কুমার এ বিবাদে রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা যে মায়ারের পক্ষে খুব তিক্ত হইয়াছিল, মায়ারের সাক্ষ্য হইতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

কলিকাতায় রাজ-পরিবারের অবস্থিতি

মিঃ র‍্যাঙ্কিন যখন সম্পত্তির দখল লয়েন, তখন মধ্যমকুমার জয়দেবপুরে ছিলেন না। তখন তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীনে দিবার জন্য মিঃ মায়ারের সহিত বড়কুমারের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা প্রতিরোধকল্পে মধ্যমকুমার কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, সেই কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত

হইবার উদ্দেশ্যেই মেজকুমার কলিকাতায় গিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ অনুমিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া মেজকুমার পার্ক ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে অবস্থান করেন। পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকাকালে, তাঁহাদের সম্পত্তির ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌কে দেওয়া হয়।

এই সময় মেজরাণী জয়দেবপুরে ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি রাণী সত্যভামা, রাণীর ভ্রাতা যিনি পূর্ব্বে জয়দেবপুরে গিয়াছিলেন এবং ছোট রাণীর এক ভ্রাতার সহিত মধ্যমকুমার পার্ক ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। রাণীর উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, ঐ ঘটনা ১৩১১ সালে আশ্বিন মাসে ঘটিয়াছিল। মেজো রাণী আরও বলেন,—এক মাস পরে রাণী কলিকাতায় আসেন। উভয় পক্ষের স্বীকৃত সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, ছোটকুমার আরও পরে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। মেজকুমার পার্ক ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাড়ী ছোট বলিয়া, রাণী ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে রাজ-পরিবারে রাণী, তাঁহার কন্যাগণ, তিন কুমার এবং কুমারদের তিন রাণী ১৯০৪ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বসবাস করেন।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাত হইতে উদ্ধার

কলিকাতায় আগমনের পর রাণী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে ভাওয়ালের রাজ এষ্টেট দখল পাওয়া সম্বন্ধে এক

নালিশ দায়ের করেন। হাইকোর্টের নালিশের আর্জ্জিতে বলা হয়,—কোর্ট অব ওয়ার্ডস যে ভাবে সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে চান যে, সম্পত্তিতে বাদিনী রাণীর কোনও বিষয় স্বত্ব-দখল নাই। সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে বাদিনীকে সম্পত্তি দখল দেওয়া হউক; এই মামলা দায়ের হইবার পর, ১৯০৫ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। বাদীর ৯৭৭নং সাক্ষী সাগরবাবুর সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়, ঐ সময় বড়কুমার মঠ লেনের এক বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তখন বড়কুমারের স্ত্রী এবং পরিবারের অপরাপর সকলে ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতেই থাকিতেন।

রাজ-পরিবারের কলিকাতা ত্যাগ

মধ্যমকুমার এই সময়ে কিরূপভাবে গতি-বিধি করিতেন, কিরূপ লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতেন, কিরূপ খেয়ালে চলিতেন এবং সময় সময় কি ভাবে কি করিতেন, তৎসংক্রান্ত সাক্ষ্যের আলোচনা পরে করা যাইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ২৩।৩।১৯০৫ তারিখের পূর্ব্বেই বড়কুমার এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্য সকলে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১৩।৩।১৯০৫ তারিখে বড়কুমার কর্ত্তৃক লিখিত পত্র (একজিবিট ৩৩৫) হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু মধ্যমকুমার যে অন্যান্য সকলের সহিত

ঐ সময় জয়দেবপুরে ফিরেন নাই, তিনি যে সকলে চলিয়া আসিবার পরও কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। কারণ, রাজ-পরিবারের সকলে চলিয়া আসার পর মেজকুমার কয়েকদিন কলিকাতায় থাকা কালে যে ব্যাপার সম্পন্ন হয়, এই মামলায় তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং মামলা সম্পর্কে তাহার যোগ্যতা অপরিসীম।

মধ্যমকুমারের জীবন বীমার কথা

১৯০৫ সালের ২৫শে মার্চ্চ মধ্যমকুমার এক বীমার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল, হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার মিঃ আর্ণল্ড কে ডি মধ্যম-কুমারকে পরীক্ষা করেন। সেই ডাক্তারী রিপোর্টে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, রাজ-পরিবার সংক্রান্ত কতকগুলি বিবরণ বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে কুমারের জন্মের তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের মধ্যকার কতকগুলি দাগ-চিহ্নের উল্লেখ ছিল। এখন দেখিতে হইবে, বাদীর শরীরের চিহ্নের সহিত ঐ সকল চিহ্নের মিল আছে কি না এবং ঐ সকল চিহ্ন বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া সনাক্ত করিবার পক্ষে কতটা সহায়তা করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, বিবাদীগণ ইন্‌সিওরেন্সের যে সকল কাগজ-পত্র তলব করিয়া-ছিলেন, এবং তাহার যেগুলি আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন,

তাহার মধ্যে পলিসির টাকা (ত্রিশ হাজার টাকার পলিসি করা হয়) লইবার সময় মধ্যমকুমারের মৃত্যুর যে এফিডেফিট করা হইয়াছিল এবং যে মৃত্যু সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছিল, সেই এফিডেফিট ভিন্ন বিবাদী পক্ষ কোম্পানীর মেডিকেল রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। কিন্তু আমি পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, ১০ই মে অর্থাৎ বাদী আপনাকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া ঘোষণা করিবার ছয় দিন পরে, রেভিনিউ বোর্ড উক্ত মেডিকেল রিপোর্ট তলব করেন এবং ১৯২১ সালের ১৫ই জুলাই রেভিনিউ বোর্ড উক্ত মেডিকেল রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বাদীপক্ষের সনাক্তকারী সাক্ষীদিগের অধিকাংশের সাক্ষ্য হইয়া যাওয়ার পর এবং বাদীপক্ষের ৯৭৭ নং সাক্ষী যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতেছিলেন, সেই সময় বাদীই স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এডিনবরা আফিস হইতে উক্ত মেডিকেল রিপোর্ট তলব দিয়া আনেন এবং আদালতে দাখিল করেন।

যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জির প্রসঙ্গ

রাজ-পরিবারের কলিকাতা থাকা কালে রাণী দুইজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের একজন এই মামলার কাহিনীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি বাবু (এখন রায় সাহেব) যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার উক্তি অনুসারে তিনি তিন কুমারের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু

প্রথম হইতেই যোগেন্দ্রবাবু ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বিচার সাপেক্ষ হইলেও তিনি 'ভাওয়াল রাজ্যের 'সেক্রেটারী' বলিয়াই নিজের পরিচয় দিতেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা বাবু সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সাগরবাবু বলিয়াই ভালরূপ পরিচিত) ভ্রাতা। সাগরবাবু, ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা প্রমোদ-বালা ওরফে মণিকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষেই যোগেনবাবু সর্ব্বপ্রথম জয়দেবপুরে আসেন। যোগেন্দ্রবাবুর উক্তিতেই এ সকল প্রকাশ; তারপর যোগেন্দ্রবাবু ভাওয়াল রাজার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালের মার্চ্চ মাসে অথবা ঐরূপ সময়ে যোগেন্দ্রবাবু স্থায়ীভাবে জয়দেবপুরে বাস করিতে আরম্ভ করে। অপর যে একজন কর্ম্মচারী রাণীর কলিকাতা থাকাকালে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র; তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। তিনি ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কুমারদিগের শিক্ষা

শেষোক্ত ভদ্রলোক, কুমারদিগের ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বিনোদবাবু নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিনোদবাবু কুমারদিগকে কিছুতেই নিকটে আনিতে পারেন নাই। কুমারদিগের লেখাপড়া-শিক্ষা এই শিক্ষকের দ্বারাই কতকটা হইয়াছিল বলিয়া সময় সময় প্রমাণের চেষ্টা হইলেও,

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষক বিনোদবাবু কুমারদিগকে কিছুই শিখাইতে পারেন নাই। ইহাও সকলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, একমাত্র হোয়ার্টন কর্ত্তৃক শিক্ষার চেষ্টা হওয়া ভিন্ন (মিঃ হোয়ার্টন শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও) রাজার মৃত্যুর পর কুমারদিগের শিক্ষার পক্ষে কেহই কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বিনোদবাবু প্রথমে মাইনর স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর বিদ্যালয়টী ৯।১১।১৯০৫ তারিখে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে, তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার (বিবাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চিঠি-পত্রের প্রসঙ্গ

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। ডিসেম্বরের কোন এক তারিখে, (অবশ্য তারিখ সম্বন্ধে মতান্তর আছে) কুমারগণ কলিকাতায় গমন করেন। মধ্যমকুমার প্রকৃতপক্ষে কতকাল কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময়ের সহিত বিবাদী পক্ষ কর্ত্তৃক মধ্যমকুমারের লিখিত বলিয়া উল্লিখিত অপিচ বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ব্যারিষ্টার মিঃ আর, সি, সেন কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া প্রমাণিত এবং বাদী কর্ত্তৃক জাল বলিয়া অস্বীকৃত, নয়খানি পত্রের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এখানে যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, তাহা

এই—কি করিয়া ইহা স্বীকার করা যায় যে, কুমারেরা সকলে এবং বিশেষভাবে মধ্যমকুমার, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইবার তাঁহারা ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে অবস্থান করেন। মধ্যম রাণী বলেন—তাঁহার নিজের টাকায় মধ্যম রাণীর ভ্রাতা ঐ বাড়ীর সংস্কার এবং জায়গা-জমির উন্নতি করেন। কুমারদের কলিকাতা থাকা সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় উপস্থিত হন। যুবরাজের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন জন্য ২রা ও ৩রা জানুয়ারী ছুটি থাকে। বিবাদীপক্ষের জনৈক সাক্ষীর বর্ণনানুসারে প্রতিপন্ন হয়—ঐ উপলক্ষে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী সাজান হইয়াছিল। বিবাদী পক্ষের ৩৯৬নং সাক্ষী গৌরচন্দ্র মজুমদারের সাক্ষ্য।

সর্ব্বপ্রকারে বিচার করিয়া দেখা যায়, কুমারগণ অথবা দ্বিতীয়কুমার ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতায় ছিলেন। প্রকাশ, ঐ দিন তিনি একখানি চিঠি স্বাক্ষর করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। (বিবাদীপক্ষ কর্ত্তৃক দাখিলী ৪৭০নং একজিবিট) কুমারগণ কোন সময় জয়দেবপুরে ফিরিয়া যান, সে তারিখ ঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ২৫।১২।১৯০৬ তারিখে দেখা যায়, রাজ-পরিবারের কয়েকজন কলিকাতায় আছেন। রাণীর নিকট ইন্দুময়ী দেবী কর্ত্তৃক ১৫ই পৌষ অর্থাৎ ৩০।১২। ১৯০৬ তারিখে লিখিত পত্র (একজিবিট ২৩৬) হইতে বুঝা যায়, কুমারের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইন্দুময়ী, দ্বিতীয়া রাণী, বড়কুমার এবং তাঁহাদের সঙ্গের প্রায় ৬৫ জন লোক ঐদিন ভাওয়ালে

পৌঁছিয়াছেন। অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, ঐ বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। রাজ-পরিবার ঐ সময় কলিকাতায় আসিয়া মিঃ এ, এম বসুর ১৫৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ছিলেন। সাক্ষ্যপ্রমাণে তাহা পাওয়া যায়। মধ্যম রাণী রক্তশূন্যতায় ভুগিতেছিলেন বলিয়া ঐ সময় তাঁহারা কলিকাতায় আসেন। অনেকে রাণীর রক্ত দূষিত হইয়াছে বলিয়াও অনুমান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া রাণী তাঁহার কলিকাতা পরিদর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে রাণীর মাতা কর্ত্তৃক লিখিত তিনখানি পত্র আছে (একজিবিট ৩০২, ৩০৪, ৩০৫)। ঐ তিন পত্রের একখানি হইতে জানা যায়, ১৯০৭ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্তও রাণী বিলাসমণি কলিকাতায় পৌঁছেন নাই। ঐ দিন দ্বিতীয় কুমারের কলিকাতার আসার কথা ছিল; কিন্তু তিনিও পৌঁছেন নাই। তিনি ঐ দিনের পরে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাণী বিলাসমণি, মধ্যমকুমারের সহিত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা পৌঁছেন। কিন্তু এই বিষয়টী আমার পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাদীর নয়খানি পত্রের সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই দেখা যায়, রাণী বিলাসমণি কলিকাতায় আসিয়া-ছিলেন। কেবল তিনি নহেন; অন্যান্য মহিলাগণ এবং আত্মীয় স্বজন, ১৯০৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী অর্দ্ধোদয়-যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

বিলাসমণির লোকান্তরে

১৯শে জানুয়ারী রাণী বিলাসমণি কলেরায় আক্রান্ত হন। ২১শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মধ্যম রাণীর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য হইতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। কোনও পক্ষই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। এই সময়ে রাজ-পরিবারের সহিত রাণীর তিন পুত্র, তিন কন্যা, বড় দুই কন্যার স্বামী, কৃপাময়ী, সত্যভামা, কৃপাময়ীর স্বামী (এই মামলার সাক্ষী), তাঁহার ভ্রাতা বসন্ত মুখার্জ্জির স্ত্রী প্রভৃতি আসিয়াছিলেন.—তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাঁহারা সকলে ১৫৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ছিলেন। কিন্তু বড়কুমার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটেরই স্বতন্ত্র এক বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকট থাকিতেন না।

রাণী বিলাসমণির মৃত্যুর পরদিন, ২২শে জানুয়ারী (১৯০৭) রাজ-পরিবারের সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন কুমারেরাই সম্পত্তির সর্ব্বময় মালিক হইলেন এবং রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র ম্যানেজার রহিলেন। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি ম্যানেজার ছিলেন। তারপর তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন (বাদী পক্ষের ৯৫২ নং সাক্ষী—যোগেশবাবুর কেরাণী)। ১৬ই অক্টোবর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্ঞানশঙ্কর সেন ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত গেজেটেড অফিসারদিগের

চাকুরীকালের ইতিবৃত্তের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-কালের নির্দ্দেশ আছে। এ বৎসর কুমারগণ কলিকাতায় যান নাই। এ বৎসরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এ বৎসর ফাল্গুন মাসে জ্যোতির্ম্ময়ীর কন্যা হেনীর এবং ইন্দুময়ীর কন্যা কেনীর বিবাহ হয়। কালমৃধার বীরেন্দ্র ব্যানার্জ্জির সহিত কেনীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৩২৬ সালের ভাদ্র মাসে কেনী বিধবা হয়। চন্দ্রশেখর ব্যানার্জ্জির সহিত হেনীর বিবাহ হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু বর্ত্তমানে ঢাকার উকীল এই মামলায় তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। চন্দ্রশেখরবাবু, সাগরবাবুর নিকট আত্মীয় ভ্রাতা। সাগরবাবু, আর এক জামাতা এবং রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জির ভ্রাতা। পাবনা জেলার এক পল্লীতে ইঁহাদের তিন জনের বাড়ী।

মধ্যমকুমারের ব্যাধি

১৯০৭ সালে কুমারেরা কলিকাতা যান নাই কেন, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু মধ্যমকুমার যদিও যথাপূর্ব্বক সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন, ঐ সময় তিনি উপদংশে ভুগিতেছিলেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমার মৃত্যুর (যে মৃত্যু সম্বন্ধে নানা বিতর্কের বিষয় আছে) পূর্ব্ব হইতে উপদংশে ভুগিতেছিলেন। এ প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত। যখন কুমারের শরীরের চিহ্নগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব, সেই সময় এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা

সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারের উপদংশ ব্যাধি হইয়াছিল। সেই উপদংশ ক্রমে অর্ব্বুদে পরিণত—শরীরের গুটি বাহির হয় না, উপদংশজ অর্ব্বুদ জন্মে। কুমারের কনুই এবং কুমারের পায়ে উপদংশ অর্ব্বুদ জন্মে। সর্ব্বপ্রকারেই সপ্রমাণ হয় যে, কুমার ১৯০৮ সালে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ঠিক কোন্ সময়ে কুমার উপদংশে আক্রান্ত হন, যখন আমি পুনরায় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব, সেই সময়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। বাদী বলেন, দার্জ্জিলিং যাইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উপদংশ হইয়াছিল। বাদীর ৯১নং সাক্ষী ফণীবাবু,—যাঁহার এ বিষয় জানা খুবই উচিত ছিল এবং এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—বলেন, কুমারের দার্জ্জিলিং যাওয়ার তিন বৎসর পূর্ব্বে কুমারের উপদংশ হইয়াছিল। রাজ-পরিবারের ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্ত, যিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন এবং ঐ ব্যাধির ও তাহার চিকিৎসার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—বলেন, ১৯০৭ সালে যখন তিনি সহকারী পারিবারিক ডাক্তার নিযুক্ত হন, তখনই তিনি কুমারকে উপদংশ ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখেন। কখন্ কুমারের প্রথম উপদংশ হয়, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

বিবাদীর বক্তব্য

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, ঐ সময় হইতে কুমারের মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। পেটের যন্ত্রণাও তখন হইতেই হয়।

কিন্তু বাদীপক্ষে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। ১৯০৭ সালে অথবা অনুমিত মৃত্যুকাল পর্যন্ত, একমাত্র উপদংশ ছাড়া কুমার অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বাদীর বক্তব্য এই যে, দার্জ্জিলিংএ তাঁহার পীড়িতাবস্থায় ডাঃ আশুতোষ যে ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থা-পত্র সমর্থনের জন্যই ঐ সকল ব্যাধি বিবাদীপক্ষের উদ্ভাবনা নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, আশু ডাক্তারের ঐ ব্যবস্থা-পত্র সকলেই অস্বীকার করিয়াছেন। বাদীর বক্তব্য—আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং রহস্যপূর্ণ মৃত্যুর কারণ সমর্থনের জন্যই বিবাদীপক্ষে কুমারের আন্ত্রিক বেদনার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

মৃত্যু হইয়াছিল কিনা, সেই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় এই বিষয়টিও আলোচনা করিব। কিন্তু ১৯০৭ সালে তাঁহার শুধু উপদংশই থাকুক, আর তৎসহ অন্য দুইটি পীড়াই থাকুক, তখন তাঁহাকে চলচ্ছক্তি রহিতের ন্যায় দেখাইতও না এবং তিনি চলচ্ছক্তি রহিতের ন্যায় আচরণও করিতেন না। তিনি শীকার করিতে যাইতেন; তাঁহার স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সকল বিষয় একটু পরেই বর্ণনা করিতেছি। তখন তিনি গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেন, শীকারে যাইতেন, ঢাকা আসিতেন, এবং এই বৎসরই তিনি নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে ১০০০ টাকার বাজীতে টমটম চালাইয়া ঐ বাজী জিতেন (বাদী পক্ষের ৬৭৬ ও ৮১৩নং সাক্ষীর সাক্ষ্য)। বিবাদী পক্ষও এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন যে,

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অপরিচিত লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যবান লোক বলিয়া মনে করিত। ১৯০৮ সালে কতকগুলি ব্যাপার ঘটিতে থাকে; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা এবং উহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সম্যক্ বুঝিবার নিমিত্ত রাজ-পরিবারের ও কুমারদের তাৎকালিক অবস্থা এবং তাঁহাদের চাল-চলন, কাজকর্ম্ম এবং নৈতিক চরিত্র বর্ণনা করিব।

এই সময় রাজ-পরিবারে ছিলেন তিন কুমার ও তাঁহাদের পত্নীগণ, কুমারদের তিন ভগিনী, প্রথম দুই ভগিনীর সন্তানগণ এবং কুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা। তদুপরি কুমারদের পিসী কৃপাময়ী দেবী; তিনি তাঁহার স্বামীসহ কুমারদের আবাসস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী অংশে থাকিতেন। তখন রাজকুমারীদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বড়কুমারী ইন্দুময়ীর স্বামী গোবিন্দবাবু রাজবাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি এম, এ, বি, এল ছিলেন কিন্তু নির্জ্জনে থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে মেলামিশা করিতেন না। রাজবিলাসের দোতলা ছিল অন্দরমহল; তথায় রাজ-পরিবারের মহিলারা থাকিতেন ও শয়ন করিতেন। পর্দ্দাপ্রথা এমন কঠোর ছিল যে, নেহাৎ ছোট ছেলে না হইলে চাকর-বাকরেরাও উপর তলায় যাইতে পারিত না। অবশ্য কুমারেরাই ছিলেন মালিক; কিন্তু অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন, কুমারদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী দেবী, যেমন রাণী বিলাসমণি তাঁহার পূর্ব্বে অন্দর মহলের কর্ত্রী ছিলেন। ছোটরাণীর কোনও কোনও পত্র হইতে দেখা যায়, ইন্দুময়ীকে তাঁহারা শাশুড়ীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। (একজিবিট

৩২০ ও ৩২৯) ১৯০৯ সালেও ছোটরাণী ঢাকা হইতে ইন্দুময়ীকে চিঠি লেখার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাড়ী নেওয়া হউক। (একজিবিট ৩২৭) সমস্ত নজর মহিলাদিগকে দেওয়ার নিয়ম ছিল। ইন্দুময়ী উহা রাখিতেন (একজিবিট ৩৩৭)। তাঁহার নিকট আমানতখানার চাবি থাকিত, আমানতখানা অন্দরের একটি ঘর, তথায় মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হইত। বৌদেব গয়না-গাটি তিনিই তৈয়ার করাইতেন এবং উহার ব্যয় এষ্টেট হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। (একজিবিট ৩২৪)। কুমারেরা ভগিনীদিগকে ভালবাসিতেন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। (একজিবিট ৬৯ ও ৭১—বড়কুমারের পত্র); সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় ইন্দুময়ীই অন্দরের কর্ত্রী ছিলেন; রাণীরা সাক্ষ্য-দান প্রসঙ্গে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, উহার কোনও উক্তি দ্বারা এই বিষয়ক সাক্ষ্যের বিন্দুমাত্রও ইতরবিশেষ হয় নাই।

কুমারদের স্বভাব-চরিত্র

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মিঃ মায়ার যাহাকে বলেন "উচ্ছৃঙ্খল-জীবন", প্রত্যেক কুমার তদ্রুপ জীবন যাপন করিতেন। ১৯০৪ সালে যখন মিঃ মায়ার তাঁহার মনিব রাণী বিলাসমণির বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন, তখন বড়কুমারকে ভাললোক বলিয়া, মেজকুমার ও ছোটকুমারের সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"আপনি নিজেই জানেন মেজকুমার ও ছোটকুমারের সঙ্গে কিছু করা অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে থাকেন,

তাঁহাদের সঙ্গীরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দুষ্কার্য্য করিতে প্ররোচনা দেয়। মিঃ মায়ার বলেন, মেজ ও ছোটকুমারদের দ্বারা বিষয়কার্য্য করান সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহারা লেখাপড়া প্রায় কিছুই শিখেন নাই। মিঃ মায়ার ১৯০২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—বড়কুমার অত্যন্ত মদ্যপান করিতেন এবং বেশ্যাসক্ত ছিলেন। বড়কুমার নিশ্চয়ই খুব কম বয়সে ঐ সকল কু-ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, কারণ বড়কুমার আর বেশীদিন বাঁচিবেন না। সুতরাং উইল করা আবশ্যক মনে করিয়া মিঃ মায়ার ১৯০১ সালে কলিকাতায় তাঁহাকে পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। মিঃ মায়ার বলেন, মেজকুমার ও ছোটকুমার ঠিক বড়কুমারের মতই মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন—যদিও এই মামলায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের দুইজনের কেহই সুরাপান করিতেন না। সকলেই স্বীকার করেন, তাঁহাদের চরিত্র খারাপ ছিল এবং উপদংশ হইতে মেজকুমারের চরিত্র যত খারাপ ছিল বলিয়া মনে হয়, তাঁহার চরিত্র তাহা অপেক্ষাও খারাপ ছিল। ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর পরও জয়দেবপুরে ছিলেন। তাঁহার পুত্র রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বলেন, পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে মেজকুমার কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পর তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। পিতৃবিয়োগের সময় তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরেরও কম ছিল, তখনই তাঁহার চরিত্র খারাপ হয়।

কুমারের মামা কেদারেশ্বর (বাদীপক্ষের সাক্ষী) বলেন, ১৯০২ সালে বিবাহের পরও মেজকুমারের চরিত্র খারাপই ছিল। ১৯০২ সালের মে মাসে মেজকুমারের বিবাহ হয়। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে রাজবাড়ীর একটি ঘরেই তিনি এলোকেশী নাম্নী একটি রক্ষিতা রাখিয়াছিলেন। এই কথার অনেক প্রতিবাদ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রায় সাহেব আনন্দ গাঙ্গুলী ১৯০৩ সালে ঢাকা জেলের ডাক্তার ছিলেন। ঐ বৎসর তিনি চিকিৎসার জন্য আহূত হইয়া এলোকেশীকে দেখিতে ঢাকা জেলের নিকটস্থ বেগমগঞ্জে একে বাড়ীতে যান; তথায় তিনি দেখিতে পান, মেজকুমার এলোকেশীর শুশ্রূষা করিতেছেন। বলা হইয়াছে যে, এই স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু যাদব বসাক (বাদী পক্ষের ৯১০ নং সাক্ষী) বলেন, বাঙ্গলা ১৩১০ সনের মাঘ মাসে (ইংরাজী ১৯০৩, জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী) মেজকুমার ও ফণীবাবু (বিবাদীপক্ষের ৯২নং সাক্ষী) এক পতিতালয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন দোল উপলক্ষে তাঁহারা যাদব বসাকের রক্ষিতা কুসুমের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তারপর মেজকুমারও তাঁহাকে মেজকুমারের রক্ষিতা এলোকেশীর বেগমবাজারের বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যের পরও বলা হইতে থাকে যে, এলোকেশী সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। তৎপর এলোকেশীর একখানা ফটো প্রমাণ করা হয়; কিন্তু তথাপি বলা হইতে থাকে যে, এলোকেশী কাল্পনিক। তারপর এলোকেশীকে

হাজির করা হইল, কিন্তু বলা হইতে লাগিল, এলোকেশীর কাহিনী মিথ্যা। সর্ব্বশেষে বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষীই স্বীকার করিলেন যে, এলোকেশী রাজবাড়ীতে একবার নাচিতে গাহিতে গিয়াছিল। তারপর বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ফণীবাবুও স্বীকার করিলেন যে, এলোকেশী নামে একজন বাইজী ছিল; কিন্তু তাহাকে রাজবাড়ীতে রক্ষিতা রাখা হইয়াছিল, এই কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলিলেন, তিনি পতিতালয়ে যানই নাই, মেজকুমারও যান নাই। এই ফণীবাবু যে পুস্তক তৈয়ার করিয়াছিলেন, অথবা কিরূপ সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাহা শিখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় যে পুস্তক তৈয়ার করা হইয়াছিল, সেই পুস্তকে ফণীবাবু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এলোকেশী মেজকুমারের অন্যতম রক্ষিতা ছিল। এই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছে, বড়কুমারের পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তাহাকে রাজবাড়ীতে নাচ গান করিতে নেওয়া হইয়াছিল। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বড়কুমারের পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। এলোকেশী বলে, মেজকুমার তাহাকে নলঘরের পূর্ব্ব দিকে দোতলায় একঘরে গোপনে রাখিয়া দেন। ঐ ঘর রাজবাড়ীর উক্ত অংশের হাওয়াখানা নামে পরিচিত। তারপর ১৯০৩ সালে একদিন তাহাকে তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে বলিয়াছে যে, ছোটকুমারের বিবাহের কিছু পূর্ব্বে তাহাকে তথায় দেখা গিয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ১৯০৩ সালে তাহাকে তথায় দেখা গিয়াছিল। তারপর তাহাকে ঢাকা লইয়া গিয়া প্রথমে বেগমবাজারে এবং পরে চাঁদমারীতে এক

রাড়ীতে রাখা হয়। মেজকুমারকে তথায় পদব্রজে যাইতে দেখা যাইত।

উকীল নলিনীবাবুর সাক্ষ্য

মেজকুমারের শরীরের কতকগুলি চিহ্ন প্রমাণকল্পে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করিব। যাহা হউক, প্রায় ১৮ বৎসর বয়সেই এই যুবকের চরিত্র খারাপ ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার চরিত্র খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বিবাহের সামান্য পরই তিনি রক্ষিতা রাখিতে আরম্ভ করেন—যদি এই স্ত্রীলোকটি তাঁহার প্রথম রক্ষিতা হইয়া থাকে। ১৯০৩ সালে, ১৯০৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এবং ১৯০৫ সালের জুন হইতে ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বাজারের স্ত্রীলোক লইয়া নৌকাবিহারে যাইতেন। শুধু যে কয়দিন কলিকাতা ছিলেন সেই কয়দিন যান নাই। নৌকাবিহারে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, মিঃ এন নাগ (বাদীপক্ষের ৪৫৯নং সাক্ষী) এবং রাজেন্দ্র রায় (বাদীপক্ষের ৭৯২নং সাক্ষী) রাজেন্দ্র রায় গম্ভীর প্রকৃতির প্রাচীন লোক ঢাকার লক্ষপতি। তাঁহারা কিরূপে মেজকুমারের সহিত পরিচিত হইলেন, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের এই সকল কাহিণী বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। কলিকাতায়ও মেজকুমার ও ছোটকুমার এইরূপ ফুর্ত্তি করিতেন। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মেজকুমার ১০০০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহার অধিকাংশ মালকাজান নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে দেন (বীমার দালাল বাদীপক্ষের ৮৯ নং

সাক্ষী মিঃ জি, সি, সেনের সাক্ষ্য ; তিনিই ঐ কর্জ্জের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং খতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করেন)। মেজকুমাব প্রায়ই বাড়ীতে থাকিতেন না। ছোটকুমারেব চরিত্রও প্রায় ঐরূপ খারাপ ছিল। কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বড়কুমার ১৯০৫ সালেব ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সেক্রেটারী যোগেন্দ্রবাবুর নিকট লিখেন যে, তিনি যেন মেজ-কুমারের উপর নজর রাখেন ; কাবণ, তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, মেজকুমার "কাহাকেও"—স্পষ্ট বুঝা যায়। একটি স্ত্রীলোককে—জয়দেবপুব লইয়া যাইবেন। (একজিবিট ৩৭৫)।

১৯০৫ সালে শীতকালে কলিকাতা বেড়াইতে গিয়া তিনি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি করেন; ১৯০৭ সালের শীতকালে কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াও ঐরূপ স্ফূর্ত্তি কবেন। এইবাব কলিকাতায় গেলে তথায় তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। ঢাকাব বিশিষ্ট ভদ্রলোক মিঃ আবদুল মন্নানের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৯০৮ সালের শীতকালও ঐরূপে কাটিয়াছিল, এই সকল সাক্ষ্য খণ্ডিত হইতে পারে, বিবাদীপক্ষে এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই এবং এই সকল সাক্ষ্যে এমন কিছু অসঙ্গতি নাই যে, ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইতে পারে। মিঃ মায়ার যে 'স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত' কথা ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঢাকার তাৎকালিক কালেক্টর মিঃ রেঙ্কি যে তাঁহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়াছেন, উহা হইতেই ঐ দুইটী উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ঢাকার অন্যতম সিনিয়র উকিল রেবতীবাবু বলিয়াছেন, মেজকুমারের চরিত্র

তরুণ বয়সে—

বামদিক্ হইতে— রমেন্দ্রনারায়ণ, রণেন্দ্রনারায়ণ ও রবীন্দ্রনারায়ণ।

গৃহে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

তাঁহাদের চরিত্র ছিল এই। গৃহে তাঁহারা কিরূপ দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতেন, সাক্ষ্যে তাহাও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। মহিলারা উপরতলায় অন্দরে থাকিতেন। কুমারেরা তাঁহাদের বৈঠকখানায় থাকিতেন। রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পূর্ব্বদিকে মেজকুমারের বৈঠকখানা ছিল। উহার পিছনে একটি শয়ন-কক্ষ ছিল। উহার পিছনে একটি বারান্দা—মেজকুমার সাধারণতঃ তথায় আহার করিতেন। উহার উত্তরদিকে ছিল তাঁহার বাথরুম। তথায় ছিল দুইটি শৌচাগার এবং একটি জলের কল। ছোটকুমারের বৈঠকখানা ছিল রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পশ্চিমদিকের ঘর। উহার উত্তরের দিকের ঘরে ছোটকুমার আহার করিতেন। উহার উত্তরের দিকের ঘরে তাঁহার শুইবার ঘর ছিল এবং ঐ শয়ন-কক্ষের পিছনে ছিল বাথরুম। বিল্লু ও সাগর সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে এই বর্ণনা দিয়াছেন। (উভয়েই বাদীপক্ষের সাক্ষী) বিল্লু কুমারদের ভাগিনেয়; কুমারেরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই বিল্লু রাজবাড়ীতে ছিলেন। এবং ১৯০৩ সালে বিবাহের পর হইতে সাগরও জয়দেবপুরে গিয়া রাজবাড়ীতে বাস করিতেন। এই বর্ণনার কোনও বিষয় বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ণিত ঐ শয়ন-কক্ষ বাস্তবিক শয়ন-কক্ষ ছিল না, উহা শুধু বিশ্রামাগার ছিল। বিবাদীপক্ষ আরও বলিয়াছেন, মেজকুমারের বাথরুম

গৃহে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

তাঁহাদের চরিত্র ছিল এই। গৃহে তাঁহারা কিরূপ দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতেন, সাক্ষ্যে তাহাও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। মহিলারা উপরতলায় অন্দরে থাকিতেন। কুমারেরা তাঁহাদের বৈঠকখানায় থাকিতেন। রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পূর্ব্বদিকে মেজকুমারের বৈঠকখানা ছিল! উহার পিছনে একটি শয়ন-কক্ষ ছিল। উহার পিছনে একটি বারান্দা—মেজকুমার সাধারণতঃ তথায় আহার করিতেন। উহার উত্তরদিকে ছিল তাঁহার বাথরুম। তথায় ছিল দুইটি শৌচাগার এবং একটি জলের কল। ছোটকুমারের বৈঠকখানা ছিল রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পশ্চিমদিকের ঘর। উহার উত্তরের দিকের ঘরে ছোটকুমার আহার করিতেন। উহার উত্তরের দিকের ঘরে তাঁহার শুইবার ঘর ছিল এবং ঐ শয়ন-কক্ষের পিছনে ছিল বাথরুম। বিল্লু ও সাগর সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে এই বর্ণনা দিয়াছেন। (উভয়েই বাদীপক্ষের সাক্ষী) বিল্লু কুমারদের ভাগিনেয়; কুমারেরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই বিল্লু রাজবাড়ীতে ছিলেন। এবং ১৯০৩ সালে বিবাহের পর হইতে সাগরও জয়দেবপুরে গিয়া রাজবাড়ীতে বাস করিতেন। এই বর্ণনার কোনও বিষয় বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ণিত ঐ শয়ন-কক্ষ বাস্তবিক শয়ন-কক্ষ ছিল না, উহা শুধু বিশ্রামাগার ছিল। বিবাদীপক্ষ আরও বলিয়াছেন, মেজকুমারের বাথরুম

যেখানে ছিল বলিয়া বিল্লু ও সাগর বলিয়াছেন, উহা তথায় ছিল না। মেজরাণী বলিয়াছেন, রাজবিলাসের উপরের তলায় প্রত্যেক রাণীর শয়ন-কক্ষ ছিল. কুমারেরা রাত্রিতে তথায় রাণীদের সহিত শয়ন করিতেন এবং দুপুর বেলায়ও তথায় নিদ্রা যাইতেন, শুধু মধ্যে মধ্যে তাঁহারা বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী বিশ্রাম-ঘরে দিবা-নিদ্রা যাইতেন। বড়কুমারেরও ঐরূপ একটি বৈঠকখানা ছিল, বৈঠকখানার নিকট শুইবার ঘর ছিল, তাঁহারও ঐরূপ বাথরুম ছিল; এবং তাঁহার শুইবার ঘরের বিপরীত দিকে তাঁহার খাবার ঘর ছিল। এক কথায় বলা যায়, প্রত্যেক কুমারের নিজস্ব বৈঠকখানা, শুইবার ঘর, খাবার ঘর এবং বাহিরের বাড়ীতে নিজ নিজ চাকরদের থাকার ঘর ছিল। মেজরাণী যে বলিয়াছেন, কুমারেরা উপরতলায় শুইতেন, রাণীদের সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করিতেন, অর্থাৎ সুখময় দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। তাঁহার মা ও ভগিনী কর্ত্তৃক লিখিত কয়েকখানা পত্র তাঁহাকে দেখান হইলে তাঁহার অঙ্কিত ঐ চিত্র বিলীন হইয়া গিয়াছিল। (একজিবিট ৩০০, ৩০৩, ২৯৩, ৩০১, ৩০৪) মেজরাণীর বিবাহিত জীবনের আগাগোড়াই তাঁহার মা ও ভগিনী ঐরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে দেখা যায়, মাতা তাঁহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। পত্রে আরও দেখা যায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মেজকুমার মেজরাণীর সহিত ভাল ব্যবহার করেন কি না, (মেজকুমার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া ঐ সকল পত্রে দেখা যায়) দিনের বেলা

মেজকুমারের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে কিনা, যদিও মেজ-রাণীর মা জানিতেন যে, ভাওয়াল রাজবাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনের বেলা সাক্ষাৎ অত্যন্ত নির্লজ্জতা বলিয়া নিন্দিত ছিল। মেজরাণীর ভগিনী মেজরাণীকে একপত্রে উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন ভাল কাপড়-চোপড় পরেন, যেন হাসিমুখে থাকেন এবং মেজকুমার উপরে শুইতে না গেলে যেন নিজেই নীচে মেজকুমারের নিকট শুইতে যান।

মেজকুমারের পুরাতন খানসামা প্রতাপ, তাহাকে নস্থাও ডাকা হয়, (বাদীপক্ষের ৪৮নং সাক্ষী) এবং প্রভাত (বাদী-পক্ষের ৫১নং সাক্ষী) বলিয়াছে যে, কুমারদের প্রত্যেকেই বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন শয়ন-কক্ষে নিদ্রা যাইতেন। রাণী-দিগকে ডাকিলেই তাঁহারা তথায় যাইতেন—যদিও বড়কুমার কখনও কখনও উপরের তলায় তাঁহার স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতেন বলিয়া মনে হয়। প্রতাপ ও প্রভাত সত্য কথাই বলিয়াছে। মেজরাণী সম্পর্কে ঐ দুইজন পুরাণ খানসামা বলিয়াছে যে, তিনি মাঝে মাঝে স্বামীর নিকট আসিতেন এবং রাত্রিতে বালক বিপিন খানসামা (বিবাদীপক্ষের ১৫০নং সাক্ষী) দ্বারা ডাকাইয়া পাঠান হইলেই তিনি আসিতেন। একটী সিঁড়ি ছোটকুমারের বৈঠকখানার দিকে নামিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় রাণী ও তৃতীয় রাণী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী (২১নং) ছোটকুমারের খানসামা রুক্মিনী (বিবাদীপক্ষের ৪১নং সাক্ষী), পাখাওয়ালা মদন মোল্লা এবং ইন্দুময়ীর ভৃত্য হরেন্দ্র (বিবাদী-পক্ষের ৩৮৬নং সাক্ষী), বীরেন্দ্র (যিনি ১৯০৮ সালে মেজ-

কুমারের পার্সন্যাল ক্লার্ক নিযুক্ত হন এবং বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) এবং মেজরাণীর খানসামা বিপিন ইহা অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী শয়ন-কক্ষকে শুধু একটী বিশ্রামাগার বলিয়া বলিয়াছে। মেজরাণীর ভাই সত্যেন্দ্রবাবু ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি জয়দেবপুর আসিলে বৈঠকখানার সংলগ্ন শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতেন। কিন্তু বাদী-পক্ষের সাক্ষী ভগ্নী, বিল্লু, সাগর এবং কুমারের দুইজন খানসামা এই সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছে, তাহা অপর পক্ষের সাক্ষীদের উক্তি দ্বারা অনেকটা সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী (বিবাদী-পক্ষের ৪১নং সাক্ষী—যে নীচের শয়ন-কক্ষে পাখা টানিত) স্বীকার করিয়াছে যে, দিনের বেলা মেজকুমার কদাচিৎ উপরের তলায় যাইতেন। দার্জ্জিলিং যাত্রীদের অন্যতম বীরেনবাবু—যাঁহার উক্তি অত্যন্ত সন্দেহজনক,—(পরে তাহা দেখান হইবে) তিনি বলিয়াছেন যে, মেজকুমার কখনও নীচের শয়ন-কক্ষে কখনও উপরে শয়ন করিতেন। বিবাদীপক্ষের ৪১নং সাক্ষী ইহাকে কুমারের শয়ন-কক্ষ বলিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন যে, কুমার সাধারণতঃ তথায় শয়ন করিতেন না, উপরের তলায় শয়ন করিতেন। বড়কুমারের একজন বৃদ্ধ খানসামা বলিয়াছে যে, তিনি কখনও তাঁহার বৈঠকখানার সংলগ্ন শয়ন-কক্ষে কখনও অন্দরে শয়ন করিতেন। একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, বর্ত্তমানে মেজকুমারের এই ঘর এবং বড়কুমারের শয়ন-কক্ষ তাঁহাদের স্মরণার্থে রাত্রিতে আলো ও ধূপধুনা দেওয়া হয়,

আসবাব-পত্রের ধূলা ঝাড়া হয়, ঘর ঝাট দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, এই সব ঘর তাঁহাদের স্মৃতির সহিত জড়িত, কিন্তু উপরের কোন ঘর নহে।

কুমারেরা বাহিরের বাড়ীতে বাস করিতেন, বাহিরের বাড়ীতে শয়ন করিতেন এবং বাহিরের বাড়ীতে আহার করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রীদের অথবা অন্য কোন মহিলাদের খাওয়ার সহিত কোন সংস্রব ছিল না। পুরাতন খানসামা (বাদীপক্ষের ৪৮নং সাক্ষী) বলিয়াছে যে, বাড়ীর মহিলারা কুমারদের আহারের তদ্বির করিতেন না। খানসামারাই করিত। কিন্তু ইহা স্বীকার করা হয় নাই। বিবাদীপক্ষে যে সব ভৃত্য সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারাও ঐ কথাই বলিয়াছে। প্রত্যেক কুমারের ১৫।২০ জন করিয়া খানসামা, দুইজন করিয়া বেয়ারা, ৪ জন করিয়া পাখা-ওয়ালা এবং একজন করিয়া আর্দ্দালী ছিল। খানসামাগণ চা তৈরী করিত, পান, তামাক সাজাইয়া দিত, (কুমারেরা তামাক খাইতেন) কুমারদের আহারের জন্য আসন পাতিয়া দিত, তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দিত, কাপড় ধুইয়া দিত এবং বেয়ারাগণ তাঁহাদিগকে পোষাক পরিতে সাহায্য করিত। মেজকুমার তাঁহার শয়ন-কক্ষের উত্তর দিকস্থ বারান্দার মেজেতে বসিয়া আহার করিতেন। অন্দরের পাক-শালা, বাবুর্চিখানা এবং অস্থায়ী কি স্থায়ী গোছের একটি রান্নাঘর হইতে (যেখানে খানসামারাও পাক করিত) মেজ-কুমারের জন্য খাবার আসিত। তিনি হাত দিয়া খাইতেন, কাঁটা চামচের সাহায্যে খাইতেন না। প্রত্যেক কুমারের সম্পর্কেই

উহা সত্য। উভয় পক্ষের সাক্ষীদের (বিবাদীপক্ষের ৯৮, ১৪০, ২৯০, ৩৭৭, ৩৮৬, ২১, ৪১, ৪৩, ৩১০নং সাক্ষী এবং বাদীপক্ষের ৯৩৮, ৪৭৭, ৬৬০ এবং ৯১৭নং সাক্ষী) উক্তি হইতেই ঐ সব কাহিনী এই পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে কোন বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু যখন বাদী পক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী কাঠগড়ায় ওঠে, তখন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খাবার ঘরের পরিবর্ত্তে (যেখানে কুমার মেজেতে বসিয়া হাত দিয়া খাইতেন) ডাইনিং রুম কথাটী আসে— যেখানে কুমার হাত দিয়া খাইতেন না, কাঁটা চামচে দিয়া সাহেবী খানা খাইতেন। সঙ্গে সঙ্গে 'কাটলারী', 'ক্রোকারি', 'নেপারি' এবং 'মেনু' শব্দের আমদানী হয় এবং ঘড়ি লইয়া খানসামাগণ ঘুরা-ফিরা করিতেছে, এমন কি "লিভারী" ও 'সান্ধ্য পোষাকের' অস্পষ্ট ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। কুমারেরা সাহেবী খানা জানিতেন কি না এবং সাহেবী ধরণে তাহা খাইতেন কি না তৎসম্পর্কে আমি পরে বাদীর জেরা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব এবং ঐ সব জিনিষ সম্পর্কে কুমারের জ্ঞানের মাত্রা কতটা ছিল শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার ইংরেজী নাম জানিতেন কি না তৎসম্পর্কেও আমি ঐ সব আলোচনা করিব।

কুমারদের সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে এখন স্বীকার করা হইয়াছে যে, মেজকুমার সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মত পোষাক পরিতেন। তিনি কাপড় দোভাঁজ করিয়া লুঙ্গির মত তাহা পরিতেন। অথবা বাহিরে যাইবার সময় তিনি ব্যানিয়ানও পরিতেন। তাঁহার ভগ্নী বলিয়াছেন যে, তিনি লাল, হলুদ ও

বেগুণী রংএর চটকদার পোষাক ব্যবহার করিতে পছন্দ করিতেন এবং চন্দ্রশেখরবাবুও (বাদীপক্ষের ৯৫৯নং সাক্ষী) লুঙ্গির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেজরাণী কখনও তাঁহাকে লুঙ্গি পরিতে দেখেন নাই বলিয়াছেন। ফণীবাবু (বিবাদী পক্ষের ৯১নং সাক্ষী) বর্ম্মী অথবা রেশমী লুঙ্গির কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং যখন দর্জ্জির বিল উপস্থিত করা হইল, তখন অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে রায়সাহেবও (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী) বেগুণী রংয়ের লুঙ্গির কথা স্বীকার করেন। অনিচ্ছা-সত্ত্বে একথা বলিবার কারণ এই—লুঙ্গি পরার কথা সাহেবী পোষাকের সহিত খাপ খায় না। তৃতীয় কুমার ঢিলা পায়জামা পছন্দ করিতেন এবং বড়কুমার সাধারণভাবে ধুতি পরিতেন। শুধু সাহেব অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তাঁহারা সাহেবী পোষাক পরিতেন, এ পর্যান্ত কোন বিতর্ক নাই। (বিবাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষী রাণী, বিবাদী পক্ষের ১৯০ সাক্ষী বীরেন্দ্র, ১১নং সাক্ষী রুক্মিণী এবং ৭১নং সাক্ষী পাখাওলার সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

বিবাদী পক্ষ শুধু এই কথা বলিতে চাহিতেছেন যে, শীকারে বাহির হইবার সময় কুমার সাহেবী পোষাক পরিতেন, অথবা খাকী শীকারের পোষাক পরিতেন। বাদীপক্ষ ইহা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন যে, সব শীকারের সময়ই কুমার এইরূপ পোষাক পরিতেন না, শুধু ব্যাঘ্র শীকার অথবা ঐরূপ কোন শীকারের সময় ঐ পোষাক পরিতেন। কুমারের সাহেবী পোষাক অথবা বিভিন্ন পোষাক সম্পর্কে কিরূপ

জ্ঞান ছিল অথবা ঐ সবের নাম তিনি জানিতেন কি না তৎসম্পর্কে আমাকে আলোচনা করিতে হইবে ; কিন্তু ব্যাঘ্রসহ একটী ফটোতে আমি তাঁহাকে ধুতি পরিহিত অবস্থায় দেখিতেছি।

মেজকুমারের দৈনন্দিন অভ্যাস ও সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বাদীপক্ষ যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। উহাতে একমাত্র রাণীর উক্তি ভিন্ন আর কিছুই খণ্ডন করিবার নাই।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কুমারের বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী জীবনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—

বাল্যকালে দ্বিতীয় কুমার দুর্দ্দান্ত ও একগুঁয়ে ছিলেন, কিন্তু বড়কুমার ও ছোটকুমার সেইরূপ ছিলেন না। পাঁচ বৎসরের সময় তাঁহার হাতে-খড়ি হয় এবং দ্বারকানাথ মুখার্জ্জির অধীনে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। দুই বৎসর পরও ঐ শিক্ষকের অধীনেই তিনি পড়াশুনা করেন। মাঝখানে আব একজন শিক্ষকও ছিলেন এবং ইহা দেখা দরকার এই সব শিক্ষকদের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছিল। ঐ সব শিক্ষকের শিক্ষাকার্য্য যখন চলিতেছিল, তখন অন্যান্য বালকদের মত তিনি ছাগল, পাঁতি-হাঁস, ভেড়া, কবুতর ইত্যাদি লইয়া খেলা করিতেন, ফলে ১৯০১ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দুইটী ব্যাঘ্র, দুইটী চিতাবাঘ, দুইটি ভল্লুক, একটী সাদা শিয়াল, একটী উটপাখী, তিনটী তিতির পাখী এবং দুইটী ওরাংওটাং সংগ্রহ করেন। ১৯০৪ সালে এষ্টেট প্রথম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে গেলে মিঃ হার্ড উহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটর গাড়ী চালাইতেন, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, টমটম চালাইতেন, হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়া বেড়াইতেন, তিনি শীকার ভালবাসিতেন, ইহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। ভাওয়ালে বনের অভাব ছিল না এবং যথেষ্ট শীকার মিলিত। তিনি প্রতিদিন অযথা প্রায়ই হস্তিপৃষ্ঠে বন্দুক লইয়া বাহির হইতেন এবং শূকর, হরিণ, শিয়াল, খরগোস এবং ব্যাঘ্রও শীকার করিতেন। তিনি ভাল শীকারী একথা উভয়পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে ভাল ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন বাদীপক্ষ তাহা বলিয়াছেন।

তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে চা পান করিতেন এবং সঙ্গে বিস্কুট ও রুটি খাইতেন। ইহার পর আস্তাবলে যাইয়া ঘোড়া, পিলখানায় যাইয়া হাতী, এবং গো-শালায় যাইয়া গরুর তদ্বির করিতেন। বহু সাক্ষী কুমারকে আস্তাবলে অথবা পিলখানায় দেখিয়াছে, তাঁহাকে সাধারণতঃ ঐ সব স্থানে পাওয়া যাইত। (বাদীপক্ষের ১৮, ৩৯, ২, ৪, ৮, ৫৭৩, ৯৫৯ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) এই সম্পর্কে সমস্ত সাক্ষীর তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ কেহ ইহা অস্বীকার করেন নাই এবং আশুতোষ ডাক্তারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের ৬১ নং সাক্ষী মাহুত আমানুল্লা স্বীকার করিয়াছে যে, সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোক কুমারের সঙ্গী ছিল না; মেজকুমার প্রাতঃকালে পিলখানায় আসিতেন এবং মাহুত হাতীর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের জন্য টাকা পয়সার আদেশ আনিতে যাইত অথবা কোন হাতীর অসুখ হইলে তাহা বলিতে যাইত।

যদি দ্বিতীয় কুমার পিলখানা, অশ্বশালা ও বাথান প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিতেছিলেন, যদি ২০টি হাতীর মাহুত, ৪০টি ঘোড়ার সহিস, কোচম্যান, কর্ম্মকার এবং যতদিন চিড়িয়াখানা ছিল ততদিন চিড়িয়াখানার কর্ম্মচারীবৃন্দ আদেশ লইবার জন্য কুমারের নিকট আসিতেছিল, তাহা হইলে কুমার নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এই প্রমাণের মধ্যে সত্য আছে বলিতে হইবে, এই সমস্ত লোককে কুমারের সঙ্গী বলা যাউক কিম্বা না যাউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই সমস্ত লোককে বাদ দিলে কুমারের স্বাভাবিক সঙ্গী কাহারা ছিল? নিম্নস্তরের একদল যুবক, যাহারা নিজদিগকে কুমারের কেরাণী বলিয়া পরিচয় দিত। ইহাদের মধ্যে মাত্র একজন লোক (বীরেন্দ্র, বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) কুমারের ব্যক্তিগত কেরাণী বলিয়া ভাওয়াল এষ্টেট হইতে বেতন পাইত। ফণীবাবু বলেন,—দ্বিতীয় কুমার জয়দেবপুরের কতিপয় ভদ্রলোক, তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং এষ্টেটের কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত মিশিতেন। বিবাদীপক্ষের ৩৮৬নং সাক্ষী হরেন্দ্র কর্ত্তৃক উল্লিখিত কর্ম্মচারীদের মধ্যে বীরেন্দ্র (বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী), সাক্ষীগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালী সাহেব বলিয়া বর্ণিত তিনজন দেশীয় খৃষ্টান এণ্টনি মরেল, এডুইন ফ্রেজার, ম্যাকবিন এবং মনি সাহেব নামক আরও একজন বাঙ্গালী সাহেব, কেরাণীবাবু-গণ বলিয়া বর্ণিত অন্যান্য লোকগণ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও দুইজন—নিক্কার পুত্র অবনী এবং পোলসানার নিশি ডাক্তারের পুত্র অবনীর নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা দুইজন হইতেছে

বিবাদীপক্ষের ৩৩৮নং এবং ৩৮৫নং সাক্ষী। প্রথমোক্ত অবনী জয়দেবপুরের অধিবাসী। সে তাহার নিজের শিক্ষা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, পিতার মৃত্যুর পর আর সে দ্বিতীয় কুমারের সহিত মেলামিশা করিতে পারিত না। বর্ত্তমানে সে ভাওয়াল এষ্টেটের অন্যতম নায়েব; বীরেন্দ্র এখন রেকর্ড কিপার। অবনীদ্বয়ের মধ্যে উভয়েই ২৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ছিল। বীরেন্দ্র জয়দেবপুরেরই লোক। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সে দ্বিতীয় কুমারের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করে। সে বলিয়াছে যে, তাহার বেতন ৩০ টাকা ছিল, কুমারই এই টাকা দিতেন, এষ্টেট হইতে ইহা দেওয়া হইত না। কুমারের আশে-পাশে যে সকল যুবক থাকিত, তাহাদের মধ্যে একমাত্র ম্যাকবিনই এষ্টেট হইতে মাহিনা পাইত। সে কুমারের হিসাব-পত্র রাখিত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৯০৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাকবিনের মৃত্যু হইলে মুকুন্দ গুণ কুমারের ব্যক্তিগত কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়। দার্জ্জিলিংএ কিন্তু মুকুন্দ গুণ কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদবী গ্রহণ করিয়াছিল।

কুমারের সঙ্গীবৃন্দের কথা

এই সমস্ত যুবকই কুমারের সঙ্গী ছিল। সত্যেনবাবু বলেন, ইহারা কুমারের উপর নির্ভরশীল পরগাছা বিশেষ। তাহারা কুমারের ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত।

ইহারা সহিস অথবা মাহুত ছিল না,—নিম্নস্তরের এক দল যুবক, যাহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় "মোসাহেব" বলা যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ ধনী যুবকের আশে-পাশে আসিয়া সমবেত হয়। মিঃ মায়ার তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন,—"কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট একদল সঙ্গী সর্ব্বদা তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বদা তাহাদিগকে বঞ্চনা করে এবং সর্ব্ব প্রকারের বোকামির কাজ করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করে।" প্রকৃত পক্ষে মিঃ মায়ার এই সকল সঙ্গীর কথাই বলিয়াছিলেন।

কুমারের সঙ্গীবৃন্দের স্বরূপ। এই বিবাদীপক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবু ব্যতীত আর কোন ভদ্রলোকের নাম কুমারের সঙ্গীবৃন্দের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি যখন ফণীবাবুর সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন দেখা যাইবে, কুমারের প্রকৃতি কিরূপ ছিল এবং এই মামলায় তাহার দ্বারা কিরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

১৯০৮ সালে কুমারগণ সকলেই ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে ছিলেন; কিন্তু তখনই তাঁহারা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল যুবকে পরিণত হইয়াছিলেন। বড়কুমার ছিলেন বদ্ধ মাতাল, তৃতীয় কুমার মদ্যপান না করিলেও এতদপেক্ষা বড় ভাল ছিলেন না এবং দ্বিতীয় কুমার ১৯ বৎসব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই লাম্পট্যে পরিপক্ক, দুশ্চরিত্র এবং উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই উপদংশ আবার দুষ্ট ক্ষতে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয় রাণী নিজেই বলিয়াছেন, ১৯০৬ সালে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়।

ইন্দুমতী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই ইন্দুমতীর পত্রে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় রাণী তখনও উপদংশের সংক্রামতা বিমুক্ত ছিলেন এবং রক্তাল্পতা রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া ডাক্তারগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিবাদীপক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী মিঃ চৌধুরী এই পত্রের বিষয় ও চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিশ্চয়ই কুমারের উপদংশের কথা জানিতেন এবং সাক্ষ্যে তিনি বলিয়াছেন, কুমার দার্জ্জিলিং গেলে পর সত্যই তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, ক্ষতগুলি সাধারণ ক্ষত নয়, বিষাক্ত দুষ্ট ক্ষত; ইহা ছলনা মাত্র। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এমন কথা বলেন নাই যে, তিনি উপদংশ রোগের কথা জানিতেন না; তবে এই উপদংশের ফলেই ক্ষত দেখা দিয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় আরও অনেকেরই এ বিষয়ে অজ্ঞতা ছিল।

অতএব ১৯০৮ সালে পূর্ব্বের ন্যায়ই তিন রাণী কঠোর পর্দ্দা প্রথার মধ্যে অন্দরমহলে বাস করিতেছিলেন; কেহ তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতে পারিত না; তাঁহারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বয়স্থা মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়ীর আত্মীয় স্বজনের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিলেন। এদিকে তাঁহাদের স্বামীগণ বাহিরেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের শয়ন, ভোজন, রাত্রিযাপন—সমস্তই বাহিরে চলিতেছিল। কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট মোসাহেব শ্রেণীর একদল লোক সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত; বহু নোকর চাকর তাঁহাদের ফরমাইস খাটিত; যেমন খুসী আমোদ-প্রমোদের

ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রচুর অর্থ তাহাদিগকে দেওয়া হইত। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে জেরা করিবার সময় মিঃ চৌধুরী বলেন,—১৯০৯ সালে কুমারগণ তাঁহাদের পরিবারের জন্য ৮০ হাজার টাকার গহনা-পত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই গহনা-পত্র ক্রয় করা হইয়াছিল; তবে এই গহনা ক্রয়ের ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত একটা মামলায় ডিক্রী হইয়াছিল। এই গহনা কিন্তু কুমারদের পত্নীগণ পান নাই। রাণী নিজেই এ কথা বলিবেন। গহনা যদি রাণীদের হস্তগত হইত, তাহা হইলে বড়রাণী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইত না, বিবাদীগণ স্বয়ং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাদের কথা উত্থাপন করিতেন না। এই বালিকাদের জন্য ৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন প্রমাণই নাই যাহাতে বলা যায় যে, দ্বিতীয় কুমার কখন তাঁহার স্ত্রীকে কোন কিছু উপহার দিয়াছেন। সর্ব্বোপরি দ্বিতীয় কুমারের উপদংশ রোগ হইল; এই রোগ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং কুমারের দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হইল, সন্তানহীনা এই ভদ্র-মহিলার (মেজরাণীর) নাতিদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যে আমি এমন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যাহার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিবার পর হইতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত আমি কোন দিক দিয়াই এমন কোন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, যাহার সংসর্গ অথবা স্মৃতি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর গৃহের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

তিনি তাঁহার বিবাহিত জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। যে সমস্ত তথ্য কাহারও বিশ্বাসপ্রবণতার উপর নির্ভর করে না, এমন কি তাঁহার ভগিনীর পত্রে প্রদত্ত মর্ম্মস্পর্শী উপদেশাবলীরও অপেক্ষা রাখে না, সেই সমস্ত তথ্য দ্বারাই এই চিত্র অপসারিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেই কুমারদের অপরিমিত অভ্যাস ও অমিতব্যয়িতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের আয় এক লক্ষ টাকা হইলেও অমিতব্যয়িতার ফলে ভাওয়াল এষ্টেট ঋণগ্রস্ত হইতেছে।

কুমারদের অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্র ছাড়াও তাঁহাদের আচরণ এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রমাণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তবে যখন তিনি ভদ্রলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তখন কিরূপ আচরণ করিতে হয় তাহা জানিতেন। (বাদীপক্ষের ৩১৬নং, ১৬৭ নং, ২৬১ নং এবং ৩০১ নং সাক্ষী) এই বন্ধনীর মধ্যে যে সকল সাক্ষীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা হইতেছেন ২৪ পরগণার কোনও গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত, ময়মনসিংহের জমিদার হরেন্দ্র-কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী হেডমাষ্টার যোগেশচন্দ্র রায়, ঢাকার একজন সম্মানিত নাগরিক রমেশচন্দ্র চৌধুরী এই প্রশ্নটি সম্পর্কে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইঁহারা হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন, আমি আরও

দুইজন সাক্ষীর উক্তির বিষয় এখানে উল্লেখ করিব। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন মিঃ ষ্টিফেন, ঢাকার পাট ব্যবসায়ী; ঢাকাতে ইনি কুমারদের প্রতিবেশী ছিলেন।

কুমারের চাল-চলন

তিনি সাক্ষ্যে বলেন,—দ্বিতীয় কুমারকে বুদ্ধিমান বলিতে পারেন না, তবে কুমার নির্ব্বোধ ব্যক্তিও ছিলেন না। তাঁহাকে একটুখানি বোকা বলা যাইত বটে, তবে তাঁহার চাল-চলন রাজার ছেলের মতই ছিল। এ কথা সত্য যে, রাজার ছেলের চাল-চলন আরও একটু ভাল হওয়াই উচিত ছিল। বাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী রমেশচন্দ্র চৌধুরী বলেন,—কুমার নির্ব্বোধ ছিলেন না; কোন কোন বিষয়ে—যেমন সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলা চলিত; কিন্তু অশ্বারোহণ, গাড়ী চালনা, হস্তী-আরোহণে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। ফরিয়াদীপক্ষের ৪৬১নং সাক্ষী মিঃ পি, সি, গুপ্ত বিলাতে শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, মর্য্যাদাসম্পন্ন লোক। তিনি বলেন, দ্বিতীয় কুমার বুদ্ধিমান লোক ছিলেন না, তিনি বোকাও ছিলেন না; মার্জ্জিত-রুচির লোক না হইলেও দিল্‌-দরিয়া মেজাজের লোক ছিলেন। সমাজে মিশিবার যোগ্যতা না থাকিলেও সাধারণ ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। রাজার ছেলের মত শিষ্টতা তাঁহার ছিল না। কোনও ভদ্রলোককে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন না। এরূপ ভব্যতা আমি তাঁহার নিকট

প্রত্যাশা করিতাম না। তিনি অনেকটা লাজুক ছিলেন। সাধারণতঃ রাজপ্রাসাদের ভিতরেই থাকিতেন; ভৃত্য, কোচম্যান্, মাহুত ও সহিস প্রভৃতির সঙ্গে মিশিতেন। দ্বিতীয় কুমার ভদ্র-লোকের নিকট যাইতে লজ্জাবোধ করিতেন এবং তাঁহাদের এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। এই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের সহিত দ্বিতীয় কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের পরিবার মধ্যে পরস্পরের যাওয়া-আসা চলিত। বয়সের পার্থক্য থাকিলেও কেবল তাঁহারই সাক্ষ্যের উপর এ বিষয়ে নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে এবং তাঁহার সম্পর্কে পরিজ্ঞাত অন্যান্য তথ্য হইতে ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কুমার যদি শিক্ষিত হইতেন, তিনি যদি ইংরাজী জানিতেন এবং (কমিশনে সাক্ষ্য লইবার সময় মিঃ চৌধুরী যেমন মিঃ ঘোষালকে বলিয়াছিলেন) শিক্ষিত ভদ্রলোকের ন্যায় অমায়িকতা যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত ভুল হইত। আমি যখন কুমারের আক্ষরিক জ্ঞান ও ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন আমি দেখাইব যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ—বিবাদীগণের নিজেদের সাক্ষ্যাদির উপরও নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে তর্ক করা চলে না।

কুমারকে কেমন দেখাইত

কুমারের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও অবয়ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ আমি তাঁহার অবয়ব সম্পর্কে

সমস্ত বিশ্লেষণ ক্ষান্ত রাখিয়া দ্বিতীয় কুমারকে কিরূপ দেখাইত, তাহাই সাধারণভাবে উল্লেখ করিব। সর্ব্বশেষে গৃহীত তাঁহার ফটো হইতেছে একজিবিট এ—১০ দার্জ্জিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে গৃহীত ইহাই সর্ব্বশেষ ফটো। জলারপার শীকারের পর ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে এই ফটো তোলা হয়, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একজিবিট এ(২) হইতেছে এই ফটোর ঠিক আগেকার ফটো। এখন আমি কোন বর্ণনার প্রয়াস পাইব না, তবে ফটোতে যাহা দেখা যাইতেছে না এমন কয়েকটি কথা বলিতে পারি। প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারের দেহ সুগঠিত এবং পেশী-বহুল ছিল। বিবাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল পুলির মতে কুমারের চুল ছিল স্বর্ণাভ পিঙ্গল—একটা সুস্পষ্ট রক্তাভবিশিষ্ট। বহু সংখ্যক সাক্ষী ইহাকে বলিয়াছেন, পিঙ্গলা অথবা বাদামী। তাঁহার গোঁফও এই রংএরই ছিল, তবে কিছুটা পাতলা রং বিশিষ্ট ছিল। তাঁহার চক্ষু ছিল কটা—অর্থাৎ সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের যে কালো চক্ষু থাকে তাহা নহে। তবে কুমারের চক্ষের সঠিক রং সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ আছে। বাদীর মতে কুমারের চক্ষু ছিল বাদামী, অথবা বাদামী ধরণের, কিন্তু বিবাদীপক্ষের মতে তাঁহার চক্ষু ছিল নীলাভ। কুমারের গাত্র-চর্ম্মের রংই সাক্ষীদিগকে সর্ব্বাধিক অভিভূত করিয়াছে। এই রংটা কিরূপ ছিল, নির্দ্দিষ্টভাবে আমি তাহার উল্লেখ করিব না। তবে উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই বলিয়াছেন যে, ইহা সাহেবী রং অথবা ইউরোপীয়ানের রংএর কাছাকাছি রং। মিঃ র‍্যাঙ্কিন একজন

ইংরাজ, তিনি বলেন যে, কুমারের মুখমণ্ডলের বর্ণ ফর্সা। লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল পুলি বলেন, বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যন্ত ফর্সা। বিবাদীপক্ষের ২৯২নং সাক্ষী একজন বিশিষ্ট সম্মানিত লোক। তিনি বলেন যে, কুমারের রং ছিল অদ্ভুত রকমের ফর্সা বাদী-পক্ষের সাক্ষীগণ যে ভাষায় কুমারের রং বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি কথা হইতেছে "ইংরাজের মত ফর্সা" "সাহেবের মত সাদা" "অত্যন্ত ফর্সা" "নরওয়েবাসীর রংএর মত।" কিন্তু বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, কুমারের শরীরের রংএর মধ্যে একটু হরিদ্রাভ ছিল। সঠিক বর্ণপ্রভা কিরূপ ছিল, তাহার কথায় আমি যাইব না ; তবে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি অত্যন্ত ফর্সা ছিলেন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। শরীরের রং এবং চুলের রং বিবেচনা করিলে (আমি সঠিক বর্ণাভা কি ছিল তাহার আলোচনা করিতেছি না) দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমারের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। তৃতীয় কুমারের চক্ষুও কটা ছিল এবং দ্বিতীয় কুমারের বেলায় সঠিক রংটা ছিল নীলাভ।

চেহারার সাদৃশ্য

বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধু-বাবুর সহিত এই দুইটি কুমারের চেহারার সাদৃশ্য আছে। তাহাদের একরকম গায়ের রং, একরকম চুল এবং একরকম কটা চোখ অর্থাৎ স্বাভাবিক কালবর্ণের নহে, অন্য রকম। এই তিনজনের গায়ের রং, চুল এবং চক্ষু (অর্থাৎ কটা) যে একরকম

সে সম্পর্কে একক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং আমি পরে তাহা উল্লেখ করিব, কিন্তু বিবাদীগণ এবং তাহাদের সাক্ষীদের জবানবন্দী হইবার পূর্ব্বেই বাদীপক্ষের শত শত সাক্ষী এই বিষয়ে একরকম বলিয়াছে এবং সওয়ালের সময় মিঃ চৌধুরী এই তিনজনের চেহারারর সাদৃশ্য এবং বুদ্ধু বাবুর সহিত তাহার চেহারার আর একজন লোককে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া লোকের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহার উপর বিশেষ জোর দেন। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে দেখা যায়, বাদী সেই একই ব্যক্তি। বাদীর ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর গায়ের রংও খুব ফর্সা, পিঙ্গল চক্ষু এবং কটা চুল। বড়কুমার এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর চেহারা একরকম। তাহাদের গায়ের রং কালো অথবা কৃষ্ণাভ। বড়-কুমার ছিল লম্বা, ৫ ফুট, ১০ ইঞ্চি, মাথায় চুল ছিল না, মোটা. সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের যেরূপ চোখ থাকে সেরূপ কালো চোখ, টেরা চাহনি এবং মুখ একদিকে মোচড়ান। ছোটকুমারও মোটা ছিল, কিন্তু মধ্যমকুমার অপেক্ষা খাট। ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল জীবন-বীমার জন্য ডাঃ কে ডি যে মেডিক্যাল রিপোর্ট লেখেন, তাহাতে দেখা যায় তখন মধ্যমকুমারের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। বিবাদীপক্ষের ৮২নং সাক্ষী একজন গ্রামিক তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলে যে, মধ্যমকুমার দেখিতে আমাদের দেশী লোকের (সাধারণ লোকের) মত ছিল না ; তাহার চেহারা ছিল 'সাহেব-সুবা'র মত। এক কথায় বলিতে গেলে তাহার চেহারা,—গায়ের রং, চোখ এবং চুল—অতীব

অসাধারণ ছিল এবং চেহারায় এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দেখিলেই নজরে পড়ে বিশেষ করিয়া তাহার গায়ের রং সম্বন্ধে একজন সাক্ষী বলিয়াছে, "এমন দুধে আল্তা রংয়ের মানুষ আর আমি দেখি নাই।" (বাদীপক্ষের ৫১নং সাক্ষী) কুমারকে সনাক্ত করণের পক্ষে এই সাক্ষী বিশেষ কোন কাজে আসে না। সে শুধু রাস্তায় কুমারকে দেখিয়াছিল; কিন্তু রাজবাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইয়া সে যেদিন প্রথম কুমারকে দেখিয়াছিল— সেই দিনের কথাই সে বলিতেছিল। এখানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, সে কুমারকে ভুলিয়া যায় নাই। তাঁহাকে একবার দেখিলে ভুলিয়া যাওয়া সহজ নয়। তাঁহাকে যাহারা চিনিত, তাহাদের সামনে কুমার বলিয়া আর একজনকে দাঁড় করানও সহজ নয়।

বাদীর জীবন-যাত্রার ধরণ

এই আশ্চর্য্য গায়ের রং, অস্বাভাবিক চক্ষু এবং চুল ও সুদৃঢ় মাংসপেশী বিশিষ্ট; ২৩ বৎসরের এই যুবক ১৯০৮ সালে যে ভাবে জীবন যাপন করিত তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। তখন তখন দেখা যায়, সে ঘোড়ায় চড়িত, শিকার করিত, মোটর চালাইত, বেশ্যাগমন করিত, তাহার প্রিয় হাতী ফুলমালায় সাজাইয়া চড়িয়া বেড়াইত, আমোদের জন্য বড়দিনের ছুটি অথবা ঐরূপ কোন পর্ব্বোপলক্ষে কলিকতা আসিত, প্রায়ই ঢাকায় যাতায়াত করিত, মোসাহেব এবং চাকরবাকর পরিবেষ্টিত

হইয়া থাকিত, জলের মত টাকা খরচ করিত, যাহার ফলে এষ্টেটের বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, সঙ্গীরা তাঁহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া গিয়াছিল এবং অর্থের দ্বারা যতরকম ভোগবিলাস করা, সম্ভব সে করিত সে আর কি ছিল, এবং আর কি কি জানিত, সে শিক্ষিত ছিল কি না এবং সে ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিত কিনা; সে গান-বাজনা জানিত কি না অথবা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস পোলো বা বিলিয়ার্ড খেলিতে পারিত কি না, ক্যামেরা সে চিনিত কি না বা ফটো তুলিতে পারিত কি না, ইংরাজী পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সে কিছু জানিত কি না বা বহুতর ইংরেজী বুলি তাহার জানা ছিল কি না—প্রভৃতি যে সকল প্রশ্ন বাদী সম্পর্কে এই মামলায় উঠিয়াছে, সে বিষয়ে বহু বাদবিতণ্ডা রহিয়াছে—কারণ জেরার সময় সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, যাহা একমাত্র কুমার কিংবা তাহার পরিবারের কাহারও পক্ষে স্মরণ থাকা সম্ভব নয়। তাহার বিদ্যার সীমা ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে জেরার যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা পরীক্ষা করার পর এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। এ পর্য্যন্ত আমি সাধারণভাবে ঘটনার পূর্ব্বাভাষ এবং বাদী যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল ও যে ভাবে কাহিনীটির সূত্রপাত হইল তাহা বলিয়াছি; কারণ ইহার পশ্চাতে যে অভিসন্ধি রহিয়াছে যাহারা এ নাটকের প্রধান নট এবং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আসিয়া বাদী আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার কার্য্যকারণ এবং যে উত্তেজনা সে সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই সব ইহাতে বুঝা

যাইবে। সনাক্তকরণের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণে যাওয়ার পূর্ব্বে ঘটনার ইতিবৃত্ত বর্ণনা প্রয়োজন।

সত্যবাবুর বিবাহ

বাঙ্গলা ১৩১৫ সালের ২১শে বৈশাখ (ইং তাং ৪।৫।০৮) মেজরাণীর ভাই সত্যবাবুর বিবাহ এবং ২৮শে বৈশাখ ইন্দুদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিল্লুর বিবাহ হয়। এই তারিখ রাণী নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি জয়দেবপুর হইতে ভাইয়ের সঙ্গে উত্তরপাড়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে তিন সপ্তাহ থাকিয়া তিনি ২৯শে বৈশাখ উত্তরপাড়া হইতে জয়দেবপুর রওনা হন। রাণী বলেন যে, মধ্যমকুমার ৬ই মে উত্তরপাড়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা একসঙ্গে জয়দেবপুর ফিরিয়াছিলেন। মধ্যমকুমারের এই উত্তরপাড়া গমন লইয়া মতদ্বৈধ আছে,—কিন্তু তাহার এইবার উত্তরপাড়া যাওয়ার পূর্ব্বে সে ১৩১৫ সাল, ১৩ই বৈশাখ (ইং তাং ২৬।৪।০৮) তারিখে তাহার স্ত্রীর নিকট নাকি একখানি চিঠি লিখে এই চিঠি লইয়াও মত বিরোধ আছে।

কুমারদের ঋণ গ্রহণ

১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল তিন কুমার ২৫ হাজার টাকা ধার করে এবং এই "প্রমিসরি নোটে" তাহাদের যে স্বাক্ষর আছে, তাহা অন্যান্য দলিল-পত্রের মত সনাক্তকরণের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

চাকুরীর সন্ধানে সত্যবাবু

সত্যেনবাবু সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভগ্নীর সহিত মধ্যমকুমারের বিবাহের পর তিনি প্রায় কলিকাতা, ঢাকা, উত্তরপাড়া এবং জয়দেবপুর যাইয়া তিন কুমারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, কুমারদের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে বি-এ পাশ করেন এবং অক্টোবর মাসে বি-এল পড়িতে থাকেন। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি জয়দেবপুর আসেন এবং তৎপর একটা সরকারী চাকরীর সন্ধানে শিলং যান। ২২।১০।০৮ তারিখে তাঁহার মা মেজরাণীকে একখানি পত্র লিখেন। উহাতে বলা হয় যে, তিনি সত্যের নিকট হইতে একটা তার পাইয়াছেন, সে শিলং গিয়াছে এবং সত্য একটা চাকুরী চাহিতেছে এবং বড়কুমারের সুপারিশে সে পাইবে বলিয়া আশা করে এই পত্রে [একজিবিট ২৯৩ (৪)] ইহাও উল্লেখ ছিল যে, সে যে পুলিসের চাকুরী চাহিতেছে, উহা তাহার খাপ খাইবে না, বড়কুমার যেন তাহার জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরীর চেষ্টা করেন। সত্যবাবু বাড়ী যাইতেছেন না এবং লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া জয়দেবপুরে অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার মা তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়া যান। তাঁহার ১৭শে নবেম্বর, ১লা ও ২রা ডিসেম্বর, একজিবিট ২৯৩ (৮) ২৯৩ (৬) ২৯৩ (৯) পত্র হইতে উহা বুঝা যায়। শিলং গিয়াছেন বলিয়া সত্যেন্দ্র বাবুও স্বীকার করিয়াছেন এবং ২০শে অক্টোবরের

চিঠিতে উহা উল্লেখ আছে। যদিও উক্ত মহিলাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, জয়দেবপুরে মধ্যমকুমার অসুস্থ আছেন এবং জ্বরে ভুগিতেছেন। কিন্তু ঐ সকল পত্র হইতে উহাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উক্ত মহিলা ঐগুলি ছল বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রের জয়দেবপুর অবস্থান ভাল বলিয়া তিনি মনে করিতেন না।

সত্যবাবুর মায়ের শেষ পত্র অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বরের পত্রের পূর্ব্বেও তিনি উত্তরপাড়া ফিরিয়া যান নাই। তিনি ৫ই ডিসেম্বর রওনা হইয়া ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি বড়কুমার ও মধ্যমকুমারের জয়দেবপুর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার দিকে রওনা হইয়াছেন, বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার একটা জুয়েলারী ফারমের লাবচাঁদ মতিচাঁদের নিকট প্রেরিত একটা তার হইতে এই তারিখ [একজিবিট জেড ১৯৫ এবং জেড ১৯৫ (২)] জানা যায় উক্ত তারে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য এবং ৬ই তারিখ ষ্টেশনে লোক পাঠাইবার জন্য বলা হইয়াছিল।

দুই কুমার কলিকাতায় পৌঁছিয়া পুলিশ হসপিটাল ষ্ট্রীটস্থ লাবচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন, বিবাদী-পক্ষের ৮৭ নং সাক্ষী লাবচাঁদের পুত্র সৌভাগ্যচাঁদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে তাঁহারা দুই রাণীকে লইয়া তথায় পনর দিন ছিলেন। এই বাড়ীটী তাঁহাদের গেষ্ট (অতিথিশালা) হাউস ছিল। তারপর তাঁহারা ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহার কিছুদিন পর ছোটকুমার তাঁহার

দলবলসহ আসেন এবং ওয়েলসলী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন, অতঃপর বড়কুমার তাঁহার ধাত অনুযায়ী ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ ওয়াটার ওয়ার্কাসের নিকট আর একটা বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহা বাদীপক্ষের ১৩৮নং সাক্ষী বিল্লু, ২৬২নং সাক্ষী যোগেশ রায় এবং বিবাদীপক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগা, ৩৬৫নং সাক্ষী আশু ডাক্তার, ১৪০নং সাক্ষী মেজরাণীর খানসামা বিপিন, ২১নং সাক্ষী ছোটকুমারের খানসামা রুক্মিণী এবং ৮৯ নং সাক্ষী ছোটরাণীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। কোন দলে কে গিয়াছিল, সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে তাহা সঠিক বুঝা যায় না, সকল কুমার একসঙ্গে গিয়াছে বলিয়া রুক্মিণী বলিয়াছে, কিন্তু অন্য কেহ তাহা স্বীকার করেন না। ছোটরাণী বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম দলের সহিত গিয়াছিলেন এবং বড়রাণী ও মেজরাণী দ্বিতীয় দলের সহিত গিয়াছিলেন। তবে উক্ত পরিবার যে দুইভাগে গিয়াছিলেন, উহা ঠিকই, দ্বিতীয় দলে ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জয়দেবপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ২৬২নং সাক্ষী যোগেশ রায় গিয়াছিলেন, আশু ডাক্তার তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

মেজকুমারের চিকিৎসা

এইবার মেজকুমারের চিকিৎসার জন্যই তাঁহারা কলিকাতা গিয়াছিলেন। উভয়পক্ষই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাঁহার উপদংশ ইতিমধ্যে অর্ব্বুদে

পরিণত হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে জ্বরও ছিল তাঁহারা তাঁহার উপদংশ ছিল বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। বাদীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কুমারের কল্পিত মৃত্যুর পর তাঁহার পিত্তশূল রোগ হইয়াছিল বলিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং উহা এখন প্রয়োগ করা হইতেছে। ১৯০৮ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে মেজকুমারের শাশুড়ী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাতে কুমারের জ্বর হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা এখন ব্যবহার করা হইতেছে। আর ইহা খুবই সত্য যে, জ্বর হইয়াও থাকিলে তিনি জ্বরের চিকিৎসার জন্য আর কলিকাতা যান নাই। আমি যখন তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এই সময়কার সহিত জড়িত দুইজন সাক্ষীর অন্যতম এণ্টনি মরেলের সাক্ষ্য এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই লোকটী বাঙ্গালী খৃষ্টান, বাড়ী ভাওয়াল সে সময় সে ৩০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিত ও ঘোড়া হাতী প্রভৃতির খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখিত, কমিশনে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। সে বিবাদীপক্ষেই সাক্ষ্য দিয়াছে। তাহার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে কুমার টমটমে সন্ধ্যার পর এদিকে সেদিকে ঘুরাঘুরি করিত। মেসার্স লালচাঁদ মতিচাঁদের শো-রুমে একটী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতীকে দেখা গিয়াছিল এবং তাহার জন্য মূল্যবান জিনিষপত্র আনা হইয়াছিল। বিবাদীপক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সোভাগ্যচাঁদের সাক্ষ্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে।

কুমারের নৈতিক চরিত্র খারাপ ছিল, উহা বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু এই সকল সাক্ষ্য হইতে কুমার যে ইংরেজী জানেন তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কুমারের হাতে পায়ে উপদংশজনিত ক্ষতের জন্য পটি বাঁধা ছিল। এই অবস্থায় একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতী তাহার নিকট গিয়াছিল কি না তৎসম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এইজন্যই এই এ্যালো-ইণ্ডিয়ান যুবতী লইয়া যাওয়ার কাহিনী অলীক বলিয়া মনে হয়।

লর্ড কিচেমার ফেব্রুয়ারী মাসে জয়দেবপুর যাইবেন বলিয়া স্থির হয়। তজ্জন্য রাজ-পরিবার ১০ই তারিখে জয়দেব চলিয়া যান। লর্ড কিচেনারও ১৫ই অথবা ১৬ই তারিখ তথায় যান। বাদীপক্ষের ৯০৭, ৯৫২নং সাক্ষী এবং বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী রায় সাহেব যোগেন্দ্রও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ৬৮নং একজিবিট দেখিয়া মনে হয়, তিনি ১৪ই তারিখ গিয়াছেন, তিনি যে তথায় গিয়াছেন, উহা কোন পক্ষই অস্বীকার করেন নাই। বাদীপক্ষের ৯৫২নং সাক্ষী ম্যানেজারের কেরাণী বলিয়াছেন যে, তিনি নারায়ণগঞ্জ হইতে স্পেশাল ট্রেণযোগে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ণেল বার্ডউড, ক্যাপ্টেন ফিটজ জার লর্ড এবং একজন ইংরেজ ডাক্তার ছিল। ষ্টেশনে বড়-কুমার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং বৈকাল বেলায় একখানি রৌপ্য-নির্ম্মিত গাড়ী করিয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। লর্ড কিচেনার ও তাঁহার সঙ্গিগণ বড় দালানে ছিলেন এবং তথায় আহারাদি করিয়াছিলেন। কলিকাতার মেসার্স পেলিটি খাওয়ার জিনিষ সরবরাহ করিয়া-

ছিল। তৎপর দিবস লর্ড কিচেনার ও তাঁহার সঙ্গিগণ হাতীতে কোদায় যান এবং বাগবাড়ীর জঙ্গলে ঢুকেন। মেজকুমারও অপর একটি হাতীতে উক্ত দলের সঙ্গে ছিলেন। লর্ড কিচেনার একটা শম্বর শিকার করিয়া জয়দেবপুর ফিরিয়া আসেন এবং উক্ত দিনই জয়দেবপুর ত্যাগ করেন।

যে সব কর্ম্মচারীর উপর ঐ সব কাজের ভার ছিল এবং হাতীর সঙ্গে যে সব মাহুত গিয়াছিল তাহাদের সাক্ষ্য হইতে ঐ কাহিনী সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাজীর গঙ্গাচরণ বাদীপক্ষের ৬৭নং সাক্ষী, দিলবর (জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়া এই ব্যক্তি শীকারীদিগের জন্য শীকার বাহির করে) এবং আবদুল জমাদার বাদীপক্ষের ৯৯, ৯৭৩, ৯০৮, ৯১১নং সাক্ষী এবং বিবাদীপক্ষের ৩১০, ৩৭, ৪৩, ৬১নং সাক্ষী (সকলেই মাহুত) এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে।

মেজকুমার ও অপর দুইজন কুমার মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন ও সুশিক্ষিত অভিজাতশ্রেণীর লোক ছিলেন, ইহা দেখাইবার জন্য যদি বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণ এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ না দিতেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যে কাহিনী সম্পর্কে সকলেই একমত অথবা যে কাহিনী সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ হয় নাই তাহার এবং লর্ড কিচেনারের আগমনের সহিত আদালতের বিচার্য্য বিষয়ের কোন সম্পর্কই থাকিত না। বলা হইয়াছে যে, লর্ড কিচেনারের আগমনের দিন তাঁহারা লর্ড কিচেনার ও তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গের সহিত খানা খাইয়াছেন; তাঁহাদের ম্যানেজার মিঃ জি, এস, সেনও (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) লর্ড

কিচেনারের সহিত খানা খান। শিকারে বাহির হইলে তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাতরাশ ও খানা খাইয়াছেন। ইহা রায় সাহেব যোগেন্দ্র (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), মাহুত (বিবাদীপক্ষের ৪৩নং সাক্ষী) এবং পাচক আলেক দেওকস্তের উক্তি। এই সব সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিতর যে অসত্যের ছাপ রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মেলামিশা দ্বারা কুমারদের ইংরেজী-জ্ঞানের পরিচয় কতদূর পাওয়া যায়, তাহা পরে আলোচনা করা হইবে ; সমস্ত একত্র করা হইলে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ পাইবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ড কিচেনার ভাওয়াল আসেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে সত্যবাবু জয়দেবপুর আসেন। অক্টোবর ও নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত (কুমারের কলিকাতা আগমন পর্য্যন্ত) তিনি কুমারের সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতায়ও তিনি কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, তিনি আসিয়া কুমারকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহাকে দার্জ্জিলিং যাইতে প্রলুব্ধ করেন। গৃহ-চিকিৎসক আশু ডাক্তারের সাহায্যে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন—যদিও বাদী রক্ষা পান। বাদী নিজেকে মেজকুমার বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রায় অব্যবহিত পরেই সত্যবাবু ও আশু ডাক্তারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, ডাক্তারগণ শীতপ্রধান স্থানে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দেওয়ায় কলিকাতায় মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা স্থির হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকারী চাকুরী সংগ্রহের জন্য তিনি

জয়দেবপুর গিয়াছিলেন এবং প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া শিলং প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর তাঁহাকে মেজকুমারের কর্ম্মচারী মুকুন্দ গুপ্তের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাইয়া বাসা ঠিক করিতে বলা হয়। ১৯০৮ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে তাঁহার (সত্য-বাবুর) মাতার একখানি চিঠি তাহাকে দেখান হয়। ঐ চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে—সে ইতিমধ্যে শিলং চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এক তার পাইয়াছেন। সত্যবাবু স্বীকার করেন যে, তখন তিনি শিলং গিয়াছিলেন, কিন্তু এই উপলক্ষে নহে। তিনি রাণীর সাক্ষ্য পাঠ করিতে-ছিলেন এবং খুব সম্ভব ইহা তাঁহার নজরে পড়ে নাই যে, রাণী তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ডাক্তার মেজকুমারকে দার্জ্জিলিং অথবা মুসৌরী যাইবার পরামর্শ দিলে বড়কুমার স্থির করেন যে, মেজকুমার দার্জ্জিলিংই যাইবেন এবং রাণীর ভাইকে চিঠি লেখা হইলে তিনি আসেন। ইহাকে যদি আলাদা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে অবশ্য ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নাই। ইহা বিসদৃশ যে, সত্যবাবু এই বিষয়ে মিথ্যা উক্তি দ্বারা আরম্ভ করিবেন। সত্যবাবুই যে দার্জ্জিলিং যাইবার প্রস্তাব করেন এবং বাসা ঠিক করিবার জন্য তিনি মেজকুমারের কেরাণী অথবা সেক্রেটারী মুকুন্দ গুপ্তের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যান, ইহা আমি সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করি এবং সত্যবাবু তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বিল্লু, পুরাতন দেওয়ান রসিক রায় এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং আমি সত্যবাবুর উক্তি অপেক্ষা ইহাদের উক্তিই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি।

সত্যবাবুর দার্জ্জিলিংএ বাসা ঠিক করিতে যাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ মেজকুমারের দার্জ্জিলিং রওনা হইবার প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে শেষবারের জন্য মেজকুমারের বৃহৎ শীকার অনুষ্ঠান হয়। শালনা কাছারীর নিকট জোলার পাড়ে ঐ শীকার হয় এবং মেজকুমার একটী রয়েল বেঙ্গল টাইগার শীকার করেন। ইহা কুমারের দ্বিতীয়বারের ব্যাঘ্র শীকার। কারণ বিবাদীপক্ষের ২৪নং সাক্ষী কলিমুদ্দি হাজি বলিয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে নাগরগড়ে কুমার প্রথমবার ব্যাঘ্র শীকার করেন। সাক্ষীর এই শীকারের কথা স্মরণ আছে। সাক্ষী জোলারপাড়ের শীকারও দেখিয়াছে। এই সাক্ষী বলিয়াছে যে, জোলারপাড়ের শীকার ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে হইবে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে। অপর সাক্ষিগণও ইহাই বলিয়াছে। উভয় শিকারেরই ব্যাঘ্রসহ কুমারের ফটো তোলা হইয়াছে। একজিবিট 'এল' নগরগড় শীকারের পর তোলা ফটো। এই এই ফটোতে কুমারের পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবী ; দ্বিতীয়বারের ফটোতে কুমারের পরিধানে পায়জামা ও পট্টি। দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু অথবা তথাকথিত মৃত্যুর পূর্ব্বের ইহাই শেষ ফটো। শেষবারের শীকারের সময় ঐ দলের সহিত সত্যবাবু যে ছিলেন তাহা অতর্কিত। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, সত্যবাবু ভীত হওয়ায় তাহাকে কোন একস্থানে রাখিয়া যাইতে হইয়া ছিল। এই শীকার সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে। এই মামলা সম্পর্কে ইহার ফটোই প্রয়োজনীয়। এই শীকার এবং অন্যান্য শীকারের দ্বারা দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে কুমারের স্বাস্থ্য

কিরূপ ছিল তাহাই বুঝা যায়। তিনি ক্রমাগত শীকারে যাইতে-ছিলেন। তিনি কাসিমপুর গিয়াছিলেন (বিবাদীপক্ষের সাক্ষী এ, পি, রায় চৌধুরীর কমিশন জবানবন্দী দ্রষ্টব্য)। তিনি কোড্ড বারুণী স্নানে গিয়াছিলেন (বিবাদীপক্ষের ৩৮৩নং সাক্ষী) তিনি ঢাকা আসিতেছিলেন এবং ১লা এপ্রিল তাঁহার ভাইদের সঙ্গে ৫০০০৲ টাকার একটী হ্যাণ্ডনোট পরিবর্ত্তন করিয়া দেন এবং ভাইদের সঙ্গে একত্র হইয়া ৯ই এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা ধার করেন। (একজিবিট 'ও' হইতে 'ও' (৪) পর্য্যন্ত ১৬ই প্রপ্রিল তিনি গৃহ-চিকিৎসক মোহিনীবাবুর বাড়ীতে আহার করেন এবং ১৭ই প্রপ্রিল মোহিনীবাবুর পুত্র আশুবাবুকে গোয়ালন্দে খাবার ব্যবস্থা রাখিবার জন্য ৩০৲ দিবার আদেশ দেন। ১২ই এপ্রিল দার্জ্জিলিং রওনা হইবার পূর্ব্বে বাবু দিগিন্দ্র ঘোষের বরাবরে তিনি একটি দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। এই সব অবিসম্বাদিত ঘটনার দিকে দৃষ্টি করিলে এবং এই সম্পর্কে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, দার্জ্জিলিং রওনা হইবার সময় কুমারের কোন অসুখ ছিল না। বড়রাণী বলিয়াছেন যে, 'তিনি (কুমার) হাসিমুখে চলিয়া যান। কোন ব্যক্তি ফিরিয়া না আসিলে এই সব খুটী-নাটি ব্যাপার মনে থাকে। কুমার প্রকৃতপক্ষে ১৮ই তারিখ দার্জ্জিলিং রওনা হন।

ফরাসখানার নিশি (বাদীপক্ষের ১৮৯নং সাক্ষী) তাঁহার বিছানা-পত্র বাঁধে। জয়দেবপুর রেল ষ্টেশনে তিনি ষ্টেশনমাষ্টার

আশুবাবুকে (বাদীপক্ষের ৫৭নং সাক্ষী)। বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করেন, "মাষ্টার, আমার গাড়ী কই ?" ষ্টেশনে বাদীপক্ষের ২২০, ৮৮১, ৯৪৯নং সাক্ষী, ৯নং সাক্ষী যতীন, সাগর, মানুক, একজন রেলকর্ম্মচারী (বাদীপক্ষের ২৩১নং সাক্ষী) এষ্টেটের মোক্তার সর্ব্বমোহনেব সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। যতীনবাবু তাঁহার সঙ্গে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত, সাগর ও মানুক ঢাকা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ট্রেণ ফতুল্লায় থামিলে ২৩১নং সাক্ষী তাঁহাকে অভিবাদন জানাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বমোহন নারায়ণগঞ্জে তাঁহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

তিনি নারায়ণগঞ্জে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করেন। এই সকল সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তখন কুমারের একমাত্র উপদংশ ছাড়া আর কোনও পীড়া ছিল না ; এখন বিবাদীপক্ষ এই কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু বিবাদীপক্ষের সাক্ষী এণ্টনী মোরেল এবং মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জী কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, মামলা শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক সময় বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই ছিল যে, কুমার যখন দার্জ্জিলিং পৌঁছেন, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন, এবং দার্জ্জিলিংএও আগাগোড়া তিনি পীড়িত ছিলেন। কিন্তু বাদীপক্ষের এই সকল সাক্ষ্যের পর বিবাদীপক্ষের ঐ উক্তি আর টিকিল না—যতটুকু টিকিল তাহাও মাত্র একখানা ডাক্তারী সার্টিফিকেট অবলম্বনে। তারপর বিবাদীপক্ষই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে ১৯০৯ সালের ৫ই মে শেষ রাত্রিতে পীড়িত হইবার

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমার দার্জ্জিলিংএ প্রায় সুস্থই ছিলেন। কুমারকে দার্জ্জিলিংএ বাড়ীর বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল ইহা প্রমাণের কোনও উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই যে বিবাদীপক্ষ এই সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কোনও কোনও সাক্ষী তাঁহার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান লোকের ন্যায় দেখাইয়াছিল। মৃত্যু হইয়াছিল কি না তাহা আলোচনার সময় এই বিষয়টিও আলোচনা করিব। কিন্তু সাক্ষ্যে দেখা যায় ১৮ই এপ্রিল তারিখে কুমার যখন দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন, তখন উপদংশের ঘা ছাড়া দৃশ্যতঃ কুমারের আর কোনও পীড়া ছিল না এবং কুনুইয়ের ও পায়ের ঘা অন্ততঃ বাহুর ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। বিবাদীপক্ষ এই সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে পারেন নাই। দার্জ্জিলিং যাত্রার পথে তাঁহার পরনের লুঙ্গি অথবা লুঙ্গির মত ভাঁজ-করা কাপড় ও গায়ে পাঞ্জাবী ছিল। (বাদী পক্ষের ৮৮১নং সাক্ষী এবং বিবাদীপক্ষের ১৯০নং সাক্ষী বীরেন্দ্র বাবুর সাক্ষ্যে—বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন)।

১৯০৯ সালের ২০শে এপ্রিল কুমার সদলবলে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। তিনি চৌরাস্তার নিকটবর্ত্তী "ষ্টেপ এসাইড নামক বাড়ীতে উঠেন। সত্যবাবু ও মুকুন্দ তাঁহার জন্য ঐ বাড়ী ভাড়া করিতে গিয়াছিলেন সত্য জয়দেবপুর ফিরিয়া গিয়া কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং যান; কিন্তু মুকুন্দ দার্জ্জিলিংএই থাকিয়া যান। ঐ বাড়ীর মালিক মিঃ ওয়ার্ণিকলের কর্ম্মচারী রামসিং সুভার সাক্ষ্যে দেখা যায়, উহার পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল।

কুমার ও তাঁহার দলবল এই বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন; ৫ই মে তারিখে শেষ রাত্রিতে তাঁহার পীড়া হয় এবং ৮ই তারিখে তিনি মারা যান অথবা মারা যান বলিয়া ধরা হয়। "পীড়া" "চিকিৎসা" "মৃত্যু" এবং "সংকার" সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু বাদীর বক্তব্য এই যে, সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে এই হিসাবে তাঁহার মৃত্যু হয় যে, তাঁহাকে মৃত বলিয়া ধরা হয়; ঐ রাত্রিতেই ৯টার পর তাঁহাকে শ্মশানে নেওয়া হয় এবং তাঁহার বর্ণিত অলৌকিক উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। এদিকে বিবাদীপক্ষ বলেন এবং দার্জ্জিলিংএর তৎকালিক সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল ক্যালভাটের এফিডেভিট দিয়া বিবাদীপক্ষ সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন যে, রাত্রি পৌণে বারটার সময় কুমারের মৃত্যু হয়; শব সারারাত্র বাড়ীতেই রাখা হয় এবং পরদিন প্রাতঃকালে মিছিল করিয়া শব শ্মশানে লইয়া গিয়া যথারীতি সংকার করা হয়। মিছিলের কথা বাদীপক্ষও স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐদিন শ্মশানে যাহা দাহ করা হইয়াছিল তাহা যে মানুষের শব তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাদী বলেন, তাঁহার দেহ দাহ করা হয় নাই, অপর কাহারও দেহ দাহ করা হইয়াছিল; তাঁহার শব শ্মশান হইতে উধাও হইবার পর, ঐ রাত্রিতেই উক্ত শব সংগ্রহ করা হয়, বীমার টাকা আদায় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে না হউক, অন্ততঃ কেলেঙ্কারী এড়াইবার জন্য উহা দাহ করা হয়, কারণ নতুবা জয়দেবপুরে সকলে মনে করিত, কুমারের কর্ম্মচারীরা তাঁহার শব দাহ করাও

আবশ্যক মনে করে নাই; হিন্দুদের মতে ইহা গুরুতর অপরাধ।

কুমারের সঙ্গের লোকজন

কুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ ইঁহারা ছিলেন:—

কুমারের পত্নী (তখন ২০ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই এবং নাই এবং কুমারের বয়স তখন ১৫ বৎসরও হয় নাই)।

কুমারের শ্যালক সত্যবাবু (বয়স প্রায় ২৪ বৎসর); ডাঃ আশুতোশ দাসগুপ্ত (বয়স প্রায় ১৫ বৎসর), মুকুন্দ গুণ, (তখন বয়স প্রায় ৩০ বৎসর এখন মৃত), বীরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী (কেরাণী, বয়স প্রায় ২১ বৎসর, তাঁহার কাকা কুমারদের কোনও আত্মীয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন), সি, জে, ক্যাব্রাল (একজন দর্জ্জি: মাঝে মাঝে কুমারদের ঢাকার বাড়ীর তদারক করিত, ক্যাব্রাল একজন দেশী খৃষ্টান, সাক্ষ্যে দেখা যায় সে নিরক্ষর ছিল; এখন মারা গিয়াছে, বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে); এণ্টনি মোরেল (এই ব্যক্তিও দেশী খৃষ্টান, বয়স তখন প্রায় ৪১ বৎসর), জলধর যামিনী (মারা গিয়াছে), অখিল, প্রসন্ন (মারা গিয়াছে), বিপিন (বিবাদী পক্ষের ১৪০নং সাক্ষী) ইঁহারা সকলেই খানসামা অথবা ব্যক্তিত ভৃত্য শরিখ খাঁ (আর্দ্দালী, হিন্দুস্থানী মুসলমান), পাচক অম্বিকা চক্রবর্ত্তী; নরবীর, ফালান সিং, হরি সিং—ইহার গুরখা প্রহরী, জিনলাল ও ঝংড়ী—, ইহারা বেয়ারা; একজন বাবুর্চ্চী (বাদী পক্ষ বলেন, ইহার নাম আলামুদ্দি এবং বিবাদীপক্ষ বলেন, ইহার

নাম আবদুল), তীর্থ দাই (দাসী এখন মারা গিয়াছে) কামিনী (আর একজন দাসী এখন জয়দেবপুরে থাকে), বাবুর্চ্চীর একজন মেট। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ চৌধুরী সত্যই বলিয়াছেন, কুমারের সঙ্গে ছিল নানা ধরণের লোকের এক বিরাট জনতা।

৮ই মে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে অথবা রাত্রি পৌণে বারটার সময় কুমারের মৃত্যু হয় বা তিনি মারা যান বলিয়া বুঝা যায়। পরদিন প্রাতঃকালে কৃত্রিমই হউক বা বাস্তবিকই হউক একটী মিছিল হয়। উহার পরদিন অর্থাৎ ১০ই মে মেজরাণী তাঁহার ভ্রাতা এবং অন্যান্য লোকজনসহ মেল-ট্রেণে দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করেন। তখন বেলা আড়াইটার সময় মেল ট্রেণ দার্জ্জিলিং ছাড়িত। কুমারের মৃত্যু সংবাদ তারযোগে জয়দেবপুরে জানান হইয়াছিল ; যদিও ৯ই তারিখে বেলা ৯টার পূর্ব্বে ছোটকুমারকে ঐ টেলিগ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐ টেলিগ্রাম দার্জ্জিলিং হইতে কখন করা হইয়াছিল, সে সম্পর্কে গুরুতর মতদ্বৈত আছে ; পূর্ব্বদিন জয়দেবপুরে তার গিয়াছিল যে, মেজকুমারের পীড়া অত্যন্ত গুরুতর ঐ সংবাদ পাইয়া ছোটকুমার দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিতে ষ্টেশনে যাইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার হাতে মেজকুমারের মৃত্যু-সংবাদের তার দেওয়া হয়। যে সকল কার্য্যের ফলে দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, তাহা আলোচনার সময় আমি এই টেলিগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করিব।

মেজরাণী প্রভৃতি ট্রেণে দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা পোড়াদহে আসিয়া অন্য ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় জয়দেবপুর হইতে আগত একদল লোকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই দলে ছিলেন ইন্দুময়ীর পুত্র বিল্লু, প্রাইভেট সেক্রেটারী যোগেনবাবু, নিক্ক নামক আর একজন কর্ম্মচারী, দ্বারিক মাষ্টার, বৃদ্ধ দ্বারিক মাষ্টার তখনও রাজ-পরিবারের কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন, তিনি তখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে পড়াইতেন অথবা রাজ-পরিবারের মহিলারা তীর্থ গমন করিলে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন। বিল্লুবাবু বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিক্কার স্ত্রী, আর একটি স্ত্রীলোক এবং কয়েকজন দ্বারোয়ানও ছিল, এত লোক পাঠাইবার কারণ এই যে, দার্জ্জিলিং অথবা উত্তরপাড়া হইতে একখানি তার পাইয়া বড়কুমারের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, সত্যবাবু মেজরাণীকে সোজা কলিকাতা লইয়া যাইবেন। ঐরূপ লোকজন যে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে ও গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথায় যে দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল, তাহা সত্যবাবুর একখানি রোজনামচায় বর্ণিত হইয়াছে। বাদী অথবা তাঁহার পক্ষের কেহ ঐ রোজনামচা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ রোজনামচা ৭ই মে অর্থাৎ কুমারের অসুখের দ্বিতীয় দিন ও তাঁহার তথাকথিত মৃত্যুর পূর্ব্বদিনের ঘটনা হইতে সুরু হইয়াছে; সত্যবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ঐ ডায়েরী লিখিয়াছিলেন, এবং উহাতে সত্য ঘটনা ও তাঁহার মতামত লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, জয়দেবপুরে ১৯শে বা ২০শে মে তারিখে তিনি স্মৃতি হইতে

৭ই মে তারিখের ঘটনা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং জয়দেবপুরে তিনি যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তজ্জন্যই তাঁহার ডায়েরী লিখিতে হইয়াছিল। পরে আমি এই ডায়েরী সম্পর্কে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব।

সত্যবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায়, দার্জ্জিলিং হইতে আগত লোকজনদের সহিত জয়দেবপুর হইতে আগত লোকজনদের পোড়াদহে সাক্ষাৎ হইলে ক্রন্দনের রোল ওঠে। ডায়েরীতে বলা হইয়াছে যে, "আমি যাহাতে বিভাকে কলিকাতা না লইয়া যাই, তজ্জন্যই জয়দেবপুর হইতে অত লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে পোড়াদহে রাখা হইয়াছিল।" সত্যবাবু নিজেকে অত্যন্ত উপেক্ষিত মনে করেন, কারণ, তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া অপর এক ব্যক্তি (সত্যবাবু তাঁহার ডায়েরীতে এই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন)। মেজরাণীকে বাড়ী লইয়া যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহা হস্তগত করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। তাঁহাকে ধরিবার জন্য পোড়াদহে যে লোকজন পাঠান হইয়াছিল তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে রাজ-পরিবারের লোকেরা তাহাকে বিশ্বাস করিতেন না এবং তাঁহারা বুঝিয়া-ছিলেন যে রাণীকে হাত করার অর্থ—জমিদারী হাত করা—রাণীর অংশের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা হাত করা। তাঁহার নিজ ডায়েরী হইতে এবং তাঁহার ডায়েরী দ্বারা সমর্থিত অন্যান্য সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, এবং কলেজের ছাত্র এই দরিদ্র যুবকের হৃদয়ে যৌবনোচিত

কোন ঔদার্য্য ছিল না, বরং তাঁহার মগজে এমন চালবাজি ধূর্ত্তামি ও হীনতা ছিল—যাহা ষাট বৎসর বয়সের ঝানুর পক্ষেই সম্ভব।

জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন

পোড়াদহ হইতে প্রেরিত একখানা টেলিগ্রাম এবং দামুকদিয়াঘাট হইতে প্রেরিত আর একখানা টেলিগ্রামে দেখা যায়, পোড়াদহ হইতে তাঁহারা চাঁদপুর মেলে যাত্রা করেন ও ১১ই মে দুপুর রাত্রিতে জয়দেবপুর পৌছেন। নারায়ণগঞ্জ হইতে তাঁহাদের গাড়ী ঢাকা হইয়া যায়, এদিকে বড়কুমারও ডাউন ট্রেণে ঢাকা আসিতেছিলেন। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, উহাতে বড়কুমারের ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, মেজরাণী বাড়া পৌছিয়া অন্যান্য মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎকালে যে কান্নার রোল উঠিবে, তাহা যাহাতে না শুনিতে হয়; তজ্জন্যই বড়কুমার ঢাকা আসিতেছিলেন।

সত্যবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায়, ১১ই মে রাত্রিতে তিনি ছোটকুমারের সঙ্গে বড়দালানে ছিলেন।

পরদিন প্রাতে সত্যবাবু, ম্যানেজার মিঃ সেনের সহিত দেখা করেন এবং তৃতীয় কুমারের সাক্ষাতেই বলেন,—দ্বিতীয় কুমার কোন উইল করিয়া যান নাই, তবে তাঁহার স্ত্রীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন, ইহা মিথ্যাকথা। উভয় পক্ষের স্বীকৃতি অনুসারেই ইহা মিথ্যা বলিয়া দেখা যাইতেছে। সত্যবাবু বলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক

লক্ষ্য করিয়া তিনি পরিহাসচ্ছলে দত্তকের কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুকে পরিবারের লোকেরা একটা মহা অনর্থপাত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাহাদের মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা দূর হইবার পূর্ব্বেই সত্যবাবু এই ক্ষুদ্র পরিহাসটুকু করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দ্বিতীয় রাণীর আচরণ ঠিক সদ্য-বিধবা হিন্দু স্ত্রীর মতই দেখা গিয়াছিল। তিনি উপরের তলার শয়ন-গৃহে পড়িয়া থাকিয়া অবিরত ক্রন্দন করিতেন। সত্যবাবুর ডায়েরীর এক স্থলে যাহা লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় রাণী এতই শোকগ্রস্তা হইয়াছিলেন যে, তিনি অনেকটা উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিলেন; এই সময় তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত চিনিতে পারিতেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বিল্লু এবং অপর কয়েকজন বয়স্থা মহিলা—যাঁহারা এই সময়ে রাণীকে দেখিতে আসিতেন,—তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় রাণী এই সময় বিশেষ শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবু সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। কিন্তু রাণী তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইতেন এবং বলিতেন,—আমার নিকট আসিও না। তুমি আমাকে রাণী করিয়াছিলে এবং তুমিই আমাকে ভিখারিণী করিয়াছ।" এতদ্বারা অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে ইহাতে প্রয়োজনীয় কথা এইটুকু আছে যে, দ্বিতীয় রাণী ঠিক সদ্য-বিধবার ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে এমন কোনই ইঙ্গিত নাই যে, যে ষড়যন্ত্রের ফলে বিষ-প্রয়োগে কুমারকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছান

হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, রাণী সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন কথা জানিতেন অথবা তিনি নিজেই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে রাণীর আচরণ সম্পর্কে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একটা কথায় একমত হইয়াছেন। কথাটা এই যে, কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী প্রায়ই বলিতেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কুমারকে ভাল করিয়া দেখিতে কিম্বা শুশ্রূষা করিতেও পান নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,— কি ঘটিয়াছে এই সম্পর্কে সামান্য একটু কথা জিজ্ঞাসা করিলেই রাণী কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যাইত না। রাণী নিজেই তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, বিধবা অথবা কাল্পনিক বিধবা হইবার পর তিনি যখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মাতার সহিত দেখা করেন, তখন তাঁহার কি ঘটিয়াছিল, এই সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নাই; কারণ এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। দার্জ্জিলিংএ কি ঘটিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত বিবরণ দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। দার্জ্জিলিংএর ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলে এই বিস্তৃত বিবরণের যে মূল্য হয়, তাহা আর কিছুতেই হয় না। বাদীর আত্ম-পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর, তাঁহাকে সত্য সত্যই যদি দ্বিতীয় কুমার বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্মৃতির রাজ্যে আলোড়ন আরম্ভ হয়, পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে এবং এই বিস্তৃত বিবরণকে অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে থাকে।

পরিকল্পিত মৃত্যুর পর ১১ দিবসে দ্বিতীয় কুমারের শ্রাদ্ধ

সম্পন্ন হয়। তবে ইহাকে কুমারের মৃত্যুর চূড়ান্ত প্রমাণ বলা যায় না; ইহাকে কুমারের মৃত্যু সম্পর্কে লোকের বিশ্বাসের একটা প্রমাণ বলা চলে। ১৮ই মে তারিখে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। এই শ্রাদ্ধের একাংশ হইতেছে একোদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় রাণী তারা-বাড়ীতে ইহা সম্পন্ন করেন। রাজবাড়ীর মাধববাড়ীতে তৃতীয় কুমার শ্রাদ্ধের যে অংশের নাম বৃষোৎসর্গ তাহা সম্পাদন করেন।

বাদী যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই এইরূপ গুজব রটে যে, দ্বিতীয় কুমারের শব দাহ হয় নাই; অতএব কুশপুত্তলিকা দাহ না করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে কি না। ইহার প্রায় চারি মাস কাল পরে কেবল ভাওয়ালের সর্ব্বত্র নয়—বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ জনরব উঠে যে, ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন।

দ্বিতীয় কুমার সম্পর্কে জনরব

একটা জনরব কেবল জনরবের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করিতে পারে না। জনরবে যাহা বর্ণিত হয় তাহা জনরব দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তবে অন্যান্য তথ্যের ন্যায় জনরবও এমন কি তথ্য, যাহা দ্বারা প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমাণের সহায়তা হইতে পারে। এই দুইটি জনরব প্রমাণ করিবার জন্য আমি সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছি; জনরবে বর্ণিত তথ্যের প্রমাণ হিসাবে তাহা করি নাই; অন্য কোন উপায়ে যাহার ব্যাখ্যা

করা যায় না, সেইরূপ একটা তথ্যের ব্যাখ্যা করার জন্য এই শ্রেণীর প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাদীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্যই এরূপ প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে।

বাদী যেরূপ দৃঢ়তার সহিত এই দুইটি জনরব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, বিবাদীও সেইরূপ সমান সমান দৃঢ়তার সহিত ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তবে আমি এস্থলে একখানি পত্রের কথা উল্লেখ করিব। এই পত্র বিবাদীকে স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে, ১৯১৭ সালের বাদীব অভ্যুদয়ে চারি বৎসর পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য একটা গুজব রটিয়াছিল যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১৭ সালেই যে এরূপ একটা গুজব রাষ্ট্র হইয়াছিল, বাদীপক্ষ তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

এই কুশপুত্তলিকা দাহ সম্পর্কে জেরায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, এই প্রথা অজ্ঞাত, অপ্রচলিত অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। জেরা দ্বারা ইহা প্রমাণের চেষ্টা সম্পূর্ণ-রূপেই ব্যর্থ হইয়াছে। শাস্ত্রে কুশপুত্তলিকার কথা আছে, এই প্রথা রক্ষাও করা হয়; তবে কদাচিৎ এরূপ ব্যাপার ঘটে কোনও লোক মারা গিয়াছে অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ ঘটিয়াছে অথচ তাহার শব সৎকার হয় নাই কিম্বা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই,—এরূপ স্থলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে তাহার শবের অনুকল্প কুশ (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা নির্ম্মিত আকৃতি দাহ

না করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে না। যথারীতি শব দাহের অনুকল্প এই অনুষ্ঠান তাহার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে করিতে হয়। বিবাদীপক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন,—তাহার ভ্রাতা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির মৃতদেহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাঁহার ভ্রাতাব শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে কুশপুত্তলিকা দাহ করিতে হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দ্বিতীয় কুমারের কুশপুত্তলিকার প্রস্তাব হইয়াছিল, এই বিষয়ে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেব-পুরেই ছিলেন। এই সাক্ষীদের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাঁহার জামাতা, কুমারের ভাগিনেয় বিল্লু (বাদীপক্ষের ৯৩৮নং সাক্ষী) ব্যতীত পুরাতন ভৃত্য, কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়গণ আছেন। ইহাঁরা ঘটনার সময়ে জয়দেবপুরে ছিলেন। (বাদী-পক্ষের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ৩৫, ৩১, ৪৮, ৫১, ৩৭, ৮৭, ১৫৫, ২৬১, ৮৫২, ৫১১, ৫৫৭, ৮৯১, ৯৫৮, ৯৫২নং সাক্ষী)। ইহাদের মধ্যে স্থলের জমিদার এবং বিল্লুর শ্বশুর অখিলবাবু ছিলেন। শ্রাদ্ধের সময় তিনি নিশ্চয়ই সেখানে ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১১ই মে তারিখে প্রেরিত তাঁহার তারে (২৬১নং একজিবিট) তিনি বলিয়াছিলেন যে, ১৩ই মে তারিখে তিনি আসিতেছেন ইহা হইতেই তাঁহার উপস্থিতির কথা প্রমাণিত হয়। ১৮ই মে তারিখে শ্রাদ্ধ হয়। মৃত্যুর দিনকে প্রথম দিন ধরিয়া হিসাব করিয়া ১১শ দিবসে শ্রাদ্ধানু-ষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই সাক্ষী বলেন, তিনি আসিয়া সত্যবাবুকে জয়দেবপুরে দেখিতে পান এবং তাঁহার আগমনের ২ কিম্বা

৩ দিন পরে সত্যবাবু কলিকাতা চলিয়া যান। অতএব সত্যবাবু যখন বলেন যে, তিনি শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, ১৬ই তারিখে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা সত্য। শ্রাদ্ধের কাছাকাছি সময়ে সত্যবাবু সেখানে ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তথাপি সত্যবাবু নিজেই কুমারের শব দাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান এবং কেলেঙ্কারী এড়াইবার আগ্রহ হইতেই কুশপুত্তলিকা দাহের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ার যে প্রমাণ, তাহার মধ্যে বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু নাই। কোন কোন সাক্ষী ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, সত্যবাবু শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে শ্রাদ্ধের সময় হাজির ছিলেন না, এ কথা এমন কি রাণীর পর্য্যন্ত মনে উঠে নাই; সত্যবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় না আসা পর্য্যন্ত এই কথাটি বলার বিষয় কাহারও মনে স্থান পায় নাই।

অপরদিকে সাক্ষীদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, কুশপুত্তলিকা সম্বন্ধে এই আলোচনা হয় নাই। এই সকল সাক্ষী হইতেছেন রাণী এবং সত্যবাবু ব্যতীত রায় সাহেব যোগেন্দ্র বাঁড়ুয্যে (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), ফণীবাবু এবং এষ্টেটের আরও কয়েকজন বর্ত্তমান কর্ম্মচারী। বাহিরের সাক্ষী বলিয়া একমাত্র যে ব্যক্তিকে ধরা যায়, সে হইতেছে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে ব্রাহ্মণকে আনা হইয়াছিল, সে অর্থাৎ বিবাদীপক্ষের ২৮৩নং সাক্ষী। সে বলিয়াছে যে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং টঙ্গী হইতে সে ট্রেণে গিয়াছিল এবং তাহাকে ট্রেণের ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল;

কিন্তু দেখা যায় যে, তখনও ভৈরব লাইন খোলা হয় নাই। অবিসংবাদিত তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের কিম্বা কোনও সাক্ষী বিশেষের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিয়া এই মামলায় কোন কিছু নির্দ্ধারণ না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই কুশপুত্তলিকার যে প্রস্তাব, তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও অন্যান্য উপায়ে ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা কোনই প্রমাণের ভিত্তিতে উপনীত হওয়া যায় না। কুমারের শব দাহ হইয়াছে কি না, তাহাই এ স্থলে আসল প্রশ্ন। যদি প্রমাণিত হয় যে, শব দাহ হইয়াছে, তাহা হইলে কুশ-পুত্তলিকার প্রস্তাব দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। আর যদি শব দাহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কুশ-পুত্তলিকার কথা হইয়াছে। দার্জ্জিলিংয়ে সমবেত জনতার মধ্যে কেহ কেহ বলিতে সুরু করিয়াছিল যে, শব দাহ হয় নাই, এই বিষয়ে যে প্রমাণ আছে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখি না।

মধ্যমকুমার সম্পর্কে গুজব

দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছে এই গুজবের দ্বারা কিছু প্রমাণিত না হইলেও একথা ঠিক যে, ইহা রটিয়াছিল। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন এই গুজব ১৯১৭ সালে রটিয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। ১৯০৯ সালেই এই গুজব রটিয়াছিল। কেবল শত শত সাক্ষীই ইহা শুনিয়াছিল এমন নয়। ইহা যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের

মধ্যে ঢাকার আর্ম্মেনিয়ান ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় আর্ম্মেনিয়ন গীর্জ্জার সভাপতি মিঃ ষ্টীফেন (বাদী-পক্ষের ১১২নং সাক্ষী), এই পরিবারের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত ময়মনসিংহের জমিদার হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ১৯০৯ সালে জয়দেবপুর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ রায় (বাদীপক্ষের ২৬২নং সাক্ষী), কলিকাতার লক্ষপতি শ্রীযুক্ত হলধর রায় (বাদীপক্ষের ২৪৮নং সাক্ষী), সরকারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, ঢাকার জমিদার নবেন্দু বসাক (বাদীপক্ষের ৪১৬নং সাক্ষী), ঢাকা-প্রকাশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক পূর্ণবাবু (বাদীপক্ষের ৩০৫নং সাক্ষী), গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সোমেশ বসু (বাদীপক্ষের ৪৩৫নং সাক্ষী), ঢাকার প্রবীণ উকিল রেবতীবাবু (বাদীপক্ষের ৬২নং সাক্ষী), অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ (বাদীপক্ষের ৭৮৯নং সাক্ষী), অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীমোহন ঘোষ, প্রবীণ উকিল এবং ঢাকা সহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং বিত্তশালী হারাণময় বিশ্বাস, অবসর-প্রাপ্ত মহকুমা হাকিম বাবু হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার মিঃ এল, কে, নাগ, জমিদার ও ব্যাঙ্কার রাজেন্দ্রকুমার রায়, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রায় সাহেব আনন্দকুমার গাঙ্গুলী, জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র বসু, ঢাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দেবেন্দ্র বসু, কলিকাতার বিশিষ্ট বিত্তশালী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি সি গুপ্ত, ঢাকার জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল

বসাক প্রভৃতির ন্যায় লোকও আছেন। আমি যাঁহাদের নাম করি নাই, তাঁহাদের মধ্যে আরও এমন বহু বিশিষ্ট, পদস্থ ও প্রবীণ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্র কারণও নাই। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করি। কেবল যে তাঁহাদের বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়াই সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হইতেছে এমন নহে। ১৯১৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাদীর আত্মপ্রকাশের তিন বৎসরেরও পূর্ব্বে কুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের নিকট নিম্নের চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন ঃ—

রাণী সত্যভামার চিঠি

জয়দেবপুর রাজবাটী,
ভাওয়াল, ঢাকা,
১৮ই ভাদ্র, ১৩২৪

"কল্যাণভাজনেষু"

"আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ জানাশুনা থাকা সত্ত্বেও ইহার পূর্ব্বে আর আমরা কোনদিন চিঠি পত্র লিখি-নাই। আমি স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায়ের পত্নী। কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রমেন্দ্রণারায়ণ রায়, কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় নামে আমার তিন পৌত্র ছিল। তাহারা আমার পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ছিল। তিনটি পৌত্রই সাবালক হইয়া অকালে মারা যায়। তিনজনেরই বিবাহ

হইয়াছিল। তাহাদের কাহারও কোন পুত্র-কন্যা হয় নাই, কাজেই পরিবারটি নির্ব্বংশ হইল।

"আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র জয়দেবপুর তাহার নিজ বাড়ীতে মারা যায় এবং দ্বিতীয়টি দার্জ্জিলিংয়ে ও কনিষ্ঠটি ঢাকায় মারা যায়। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে আমার দ্বিতীয় পৌত্র তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাইকে লইয়া দার্জ্জিলিং যায়, সে সেখানে রক্তাতি-সারে মারা যায়।"

"গত তুই মাস যাবৎ একটি গুজব রটিয়াছে যে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার জীবিতা আছে। মৃত্যুর পর তাহাকে নাকি একটি গুহার নিকটে দাহ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সে সময় তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাহার শব দাহ হয় নাই! মুখাগ্নি করিয়া তাহাকে সেখানে ফেলিয়া আসা হয়। ইহার পর সদলবলে একজন সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করে। বর্ত্তমানে নাকি সে সেই সন্ন্যাসীদের সহিত আছে সংসারের প্রতি সে উদাসীন এবং সংসারক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, সে যে ঠিক কোথায় আছে; আমি জানি না; নানান লোকে নানান স্থানের কথা বলিতেছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় এই গুজব রটিয়াছে। এ সম্বন্ধে অসংখ্য লোক আমার নিকট সংবাদ জানিতে চাহিতেছে। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছি।

"যাহারা স্বর্গীয় দ্বিতীয় কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিল

তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে, আপনি তাহার মৃত্যুর সময় দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং আপনিই গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কথা সত্য কি না তাহা জানিবার জন্য আমি আপনার নিকট চিঠি লিখিতেছি। সত্যই কি দ্বিতীয় কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল ? আপনি যতদূর সত্যঘটনা জানেন, আমাকে যদি তাহা জানান, তবে আমি কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। আমি আশা করি, আপনার সুবিধামত আমাকে এ বিষয় জানাইতে আপনি শৈথিল্য করিবেন না। আমার আর কিছু লিখিবার নাই।"

বিবাদীপক্ষও এই পত্রের উপরই প্রধানতঃ জোর দিয়াছেন। তাঁহারাও এই পত্রের লিখিত বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। মধ্যমকুমারের সত্য সত্যই যে মৃত্যু হইয়াছিল এবং কুমারের জীবিত থাকা সম্বন্ধে যে গুজব রটিয়াছিল, ঐ পত্রে তাহা উল্লিখিত আছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, এই চিঠি লিখিবার কিছু দিন পূর্ব্বে এক মৌনী সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে আসেন। যে সন্ন্যাসী বাক্য বন্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সন্ন্যাসীর আগমন উপলক্ষ করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাব নিকট পত্র লিখিবার আবশ্যক হইয়াছিল। মধ্যমকুমার জীবিত আছেন কি না, সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে উক্ত সন্ন্যাসী তদুত্তরে কাগজের উপর কি যেন লিখিয়া দেন। তাহাতে আশার সঞ্চার হয়। তবে ঐ লেখার ফলেই যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা নহে বরং সন্ন্যাসীর লেখার জন্য সে গুজবের ভিত্তি অধিক দৃঢ় হইয়াছিল।

কুমারের জীবিত থাকা সম্বন্ধে গুজব

দ্বিতীয় কুমারের কাল্পনিক মৃত্যুর চারিমাস পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে সেই গুজবের সৃষ্টি হয়। কারণ, কোনও এক সন্ন্যাসী ঐ সময় মাধববাড়ীতে আসেন এবং মধ্যমকুমারের সম্বন্ধে কি যেন বলিয়া যান। ১৯১৭ সালে এই সন্ন্যাসীর আগমনের বিষয় বিবাদীপক্ষ স্বীকার করেন। সন্ন্যাসীর আগমনের পরই যে গুজব রটিয়াছিল, বিবাদীপক্ষ তাহা অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ঐ গুজবের জন্য জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীই উক্ত সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমার বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজা ১০।৯।১৭ তারিখের পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনি দার্জ্জিলিংএর শ্মশান-ঘাটে কতকগুলি লোকের জনতা দেখিয়াছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেখানে দ্বিতীয় কুমারের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইতেছে, তবে তাহা সন্ধ্যায় কি প্রাতঃকালে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই (২৫৬নং একজিবিট), উক্ত পত্রের প্রামাণ্যের উপর জোর দিয়াই বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ঐ ঘটনার পর মধ্যম-কুমারের জীবিত থাকার গুজব লোপ পায়।

কিন্তু একবার যে রটনা হয়, অকস্মাৎ তাহা বিলুপ্ত হয় না। মানুষ সহজে তাহা ভুলিতে পারে না। মধ্যম রাণী ঐ রটনার আধুনিকতার বিষয় বর্ণনা করিলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, পূর্ব্ব

হইতে যদি ঐ ধরণের কোনও গুজব প্রচারিত না থাকিত, তাহা হইলে ১৯১৭ সালের মৌনী সন্ন্যাসীসংক্রান্ত কাহিনী এবং দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন কি না—এরূপ প্রশ্ন কখনও কাহারও মনে আসিত না। এ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন বলিয়া তখন ভাওয়ালে জোর গুজব চলিয়াছিল এবং কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কীয় প্রশ্ন কেবল যে বাদীর আত্ম-প্রকাশের পরই উঠিয়াছিল, তাহা নহে। সে প্রশ্নের আলোচনা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল।

সত্যবাবু কি করিলেন ?

মধ্যমকুমারের শ্রাদ্ধ-বাসরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাই, সে এক শোচনীয় ব্যাপার। সে শ্রাদ্ধে কোনও আড়ম্বর নাই। ১৮ই মে কুমারের শ্রাদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৬ই মে অথবা প্রায় ঐ সময়ে সত্যবাবু কলিকাতায় চলিয়া যান। মুকুন্দ গুণও সত্যবাবুর সহিত ঐ সময় কলিকাতায় যায়। প্রকাশ থাকে যে, এই মুকুন্দ গুণ কুমারের লোকজনের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিল। সত্যবাবু বলেন, তাঁহার মা তখন পীড়িতা ছিলেন সেইজন্য এবং উকিলের সহিত পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা গিয়াছিলেন। যে কারণে তাঁহার উকিলের পরামর্শ লইবার আবশ্যক হয় এবং মধ্যমকুমারের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই এত তাড়াতাড়ি তাহা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা এই যে, বড়কুমার সম্পত্তি শাসন-সংরক্ষণের জন্য একখানি দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সেই দলিল অনুসারে সম্পত্তি

পরিচালনায় সত্যবাবুর ভগ্নী রাণী বিভাবতী দেবীর কোনও হাত ছিল না। মাসিক তাঁহার জন্য হাজার টাকা হিসাবে মাসোহারা বরাদ্দ হইয়াছিল। ঐ প্রকারের এক দলিল যে প্রস্তুত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ দলিলের উদ্দেশ্য ছিল, মধ্যমরাণীর ভ্রাতাকে দূরে রাখা; কারণ, তাঁহার মনোভাব সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সত্যবাবুর নিজের 'ডাইরীতে' (দৈনন্দিন কার্য্য-সূচী) লিখিত তাঁহার কার্য্য-কলাপ হইতে বেশ বুঝা যাইবে, তিনি ভাওয়াল এষ্টেটের এক বিষম আপদ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বড়কুমার যে দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও স্বত্ব বা অধিকার নষ্ট হওয়ার কিছুই ছিল না। এষ্টেটের তদানীন্তন আর্থিক অনটনের অবস্থায়, এষ্টেটের প্রত্যেক মালিককে কি পরিমাণ মাসোহারা দেওয়া যাইতে পারে, দলিলে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৯১১ সালে ভাওয়াল এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে যাওয়ার পর হইতে পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের মালিকানদিগের প্রত্যেককে মাসিক ১১০০৲ হিসাবে মাসোহারা দিয়াছেন, দেখা যায়। এই অঙ্কের অনুপাতে বড়কুমারের কৃত দলিলে উল্লিখিত মাসোহারার পরিমাণ প্রায় সমান দেখা যায়। অতঃপর সে দলিল সহসা উবিয়া যায়।

মধ্যমরাণীকে হাত করিবার ব্যবস্থা

কলিকাতা হইতে ভাওয়ালে ফিরিবার পর, আপনার ভগ্নীকে

আয়ত্ত করিবার জন্য, সত্যবাবু তাৎকালিক ম্যানেজার মিঃ সেনের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন মিঃ সেনের হিসাব নিকাশের মামলায় পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। মিঃ সেনকে পাওয়া সত্যবাবুর পক্ষে সহজ হইয়াছিল। কারণ মিঃ সেন বুঝিয়াছিলেন, সত্যবাবুর সহযোগে তাঁহার ভগ্নীকে হাত করিতে পারিলে, তিনি অনেকটা নিরাপদ হইতে পারেন। ১৯০৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সত্যসত্যই মধ্যমরাণীর নিকট হইতে ছাড়পত্রের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (একজিবিট ৩৯৯ (১৪) ১৯০৭ সালের ১১ জুলাই তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবুকে এই অনুরোধ জানান যে, কুমারেরা মিঃ সেনকে যাহাতে "অল্পে ছাড়িয়া দেন", সত্যবাবু যেন সে ব্যবস্থা করেন। ৬।৮।১৯০৯ তারিখে মিঃ সেন, সত্যবাবুকে জানান যে, তহবিল তছরুপের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার আছে (১৯০৯ সালের ১৬ই আগষ্টের হিসাব দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে না হইলেও জুন মাস হইতে মিঃ সেনের কার্য্যকালের অবসান ঘটে। কারণ, প্রমাণে দেখা যায়—মিঃ সেন ঐ সময় ঢাকায় আসিয়া বাস করিতেছেন, সূত্রাপুরে এক বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন এবং তাঁহার কেরাণী (বাদীপক্ষের ৯৫২নং সাক্ষী) মনোমোহনের সহায়তায় হিসাবপত্র মিলাইতেছেন এবং ১লা শে জুলাই হইতে তিনি ম্যানেজারের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে মিঃ সেন এবং সত্যবাবু, সত্যবাবুর মাতাকে ভাওয়ালে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মধ্যম

রাণীকে রাজপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্যবাবুর আয়ত্তাধীনে আনা। সত্যবাবু মিঃ সেনের নিকট হইতেই মাতার আগমনের তারিখ জানিতে পারেন। ১৩ই জুন সত্যবাবুর মাতার পৌঁছিবার কথা। কলুটোলার এক বাড়ী ভাড়া করা হয়। এই সময় মিঃ সেন তাঁহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। ২রা জুন ঐ পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় (২২শে জুনের লেখা দ্রষ্টব্য) সত্যবাবুর মাতা ঢাকায় পৌঁছিয়া কলুটোলার বাড়ীতে উঠেন। পরে তাঁহাকে সদরঘাটের এক বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঢাকার বাড়ীতে মধ্যমরাণী

১৯শে জুন মধ্যমরাণী এই বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছেন। মধ্যমরাণীকে এই বাড়ীতে আনিবার সময় ঢাকা রেল ষ্টেশনে এক অতি লজ্জাকর ও কলঙ্কজনক দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল। রাজ-পরিবারের লোকেরা প্রস্তাব করেন, আহারাদির পর বিকালে মধ্যমরাণীকে ঐ বাড়ীতে পাঠান হইবে। কিন্তু সত্যবাবু বলপূর্ব্বক রাণীকে জাপটাইয়া ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন। এই জন্য দারোয়ানের দ্বারা গলাধাক্কা দিয়া সত্য-বাবুকে তাড়াইয়া দিবার আবশ্যক হয়; এই সকল ইতর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের আবশ্যক নাই। সত্যবাবু, সত্যবাবুর মাতা এবং সত্যবাবুর স্ত্রী, ঢাকায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কিন্তু পরে তাঁহারা নলগোলার এক বাড়ীতে আসেন। মধ্যম রাণী এই বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা বেশ

বুঝা যায়, মধ্যমরাণী বেশী সময় মার কাছে থাকা পচ্ছন্দ করিতেন না।

২রা অক্টোবর সত্যবাবু তাঁহার ডাইরীতে লেখেন,—"এখনও ভগ্নীর প্রতিপক্ষের দিকে ঝোঁক আছে।" তিনি এখানে থাকিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চুপ করিয়া থাকেন।" মধ্যমরাণী যখন ঢাকায় আসা-যাওয়া আরম্ভ করিলেন, রাণীর মন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বড়কুমার রাণীর সঙ্গে আসিতেন এবং যাইবার সময় রাণীর পদ-গৌরবের উপযুক্ত আরদালী এবং পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু সত্যবাবু বড়-কুমারের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন না। সত্যবাবু ঐ সকল আরদালি, এবং পরিচারিকাদিগকে গুপ্তচর বলিয়া মনে করিতেন। একবার বড়কুমার মধ্যমরাণীর সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে সত্যবাবু তাঁহার ডাইরীতে লেখেন,—"পাছে আমি এষ্টেটের কোন অনিষ্ট করি, এই আশঙ্কায় বড়-কুমার তাঁহার ভ্রাতার বিধবা পত্নীর প্রহরীরূপে আসিতে পারিলেন না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

(২১৷৯ তারিখের লেখা দ্রষ্টব্য)

২৩শে সেপ্টেম্বর সত্যবাবু সংবাদ পান,—ছোটকুমার সময় সময় বড়রাণীকে তিরস্কার করেন। সত্যবাবু আনন্দের সহিত ডাইরীতে লেখেন,—"পারিবারিক কলহ পাকাপাকি ভাবেই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে।" তারপর বড়রাণী ও ছোটরাণীর মধ্যে ঝগড়ার সংবাদ পাইয়া সত্যবাবু লিখেন,—"বড়ই শুভ

সূচনা।" (১৭-১০।১৯০৯) ইন্দুময়ী দেবী কি উপায়ে রাণীকে এমন আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাহা ভাবিয়া এক স্থানে সত্যবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। মাতাকে আনিবার কি প্রয়োজন হইল. সত্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে সত্যবাবু বলেন, তাঁহার ভগ্নী একাকী থাকিতে পারেন না বলিয়া তিনি তাঁহার মাতাকে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, মাতাকে ভগ্নীর নিকট না আনিলে রাজপরিবার হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর হয় না। মিঃ সেনের সহযোগে সত্যবাবুর কার্য্যকলাপ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার ভগ্নীর তখন অন্যান্য পরিবারের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল; ভগ্নীকে আত্মাধীন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি হাত করিবার জন্যই সত্যবাবু যত কিছু আয়োজন করিতেছিলেন। সত্যবাবুর লেখায় প্রকাশ,—এই বিপদের বিষয় অবগত হইয়াই সত্যবাবুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য অন্য পক্ষ চেষ্টা করিতেছিল। সত্যবাবু গৃহ সজ্জিত করিবার জন্য তাঁহারা সরঞ্জামাদি পাঠাইতেছিলেন, বিছানাপত্র সরবরাহ করিতেছিলেন; চড়িবার জন্য ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন।

ইনসিওরেন্সের টাকা

১৯০৯ সালের ১লা নবেম্বর মিঃ নীডহাম ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। মেজরাণী ৪ঠা নবেম্বর তাঁহার ভাইকে তাঁহার এজেণ্ট নিযুক্ত করেন এবং তৎপর দিবস ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট মেজকুমারের প্রাপ্য ত্রিশ হাজার টাকার

জন্য আবেদন করেন। এই সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই হিসাব দিয়াছি। ১৫ই তারিখে মিঃ লীডহাম বড়কুমারের নিকট এক পত্র লিখেন। উহাতে এষ্টেট হইতে প্রিমিয়ম দেওয়া হইয়াছে কি না এবং দেওয়া হইয়া থাকিলে বড়কুমার ও ছোটকুমার তাঁহাদের অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন কি না তাহা জানিতে চাহেন। ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, সত্যবাবু উত্তরাধিকারী গণ্য হওয়া সম্পর্কিত সার্টিফিকেট লইয়াছেন এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অপর দুই কুমার ইনসিওরেন্সের টাকার অংশের দাবী করেন নাই। এবং ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড়কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতাতেই টাকা তুলিয়াছেন। ডায়েরী উপস্থিত করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মামলায় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, এষ্টেটই টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি শুধু চেকখানি লইয়াছেন। এখন ইহা নিঃসন্দেহ যে, তিনিই টাকা তুলিবার জন্য ইনসিওরেন্স কোম্পানির নিকট মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম কর্ণেল ক্যালভার্টের নিকট হইতে এফিডেভিট নেওয়া হইয়াছিল। তিনিও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। কুমারের অসুখ এবং মৃত্যু সম্পর্কে এই এফিডেভিটটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল। কর্ণেল ক্যালভার্টের নিকট এফিডেভিটের জন্য কুমারের লোকগণ গিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে যে, ডাঃ শিশির পালের অনুরোধে তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চন্দের নিকট এফিডেভিট পাঠাইয়া-

ছিলেন, মিঃ চন্দ এখনও দার্জ্জিলিংএ বাস করিতেছেন। ডাঃ ক্যালভার্টের প্রদত্ত মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট নেওয়ার জন্য এষ্টেট হইতে কোনও লোককে দার্জ্জিলিং পাঠান হইয়াছে বলিয়া কোন সাক্ষী এমন কি রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথও বলেন নাই, এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ৪ঠা মে বাদী আত্ম-পরিচয় দেওয়ার পর ১০ই মে সত্যবাবু রেভিনিউ বোর্ডের অফিসে যান এবং তাঁহার নিকট যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির নিকট প্রেরিত এফিডেভিটের নকল ছিল, উহা তিনি তখন দাখিল করেন।

সত্যবাবুর আকাঙ্খা

কুমারদের দুইজনই সত্যবাবুর সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহার জন্য আসবাবপত্র, বিছানা, টাকা-পয়সা ও ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্সিওরেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা হইতে কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং নামমাত্র পনর শত টাকা সেলামী লইয়া এই সহরে এক বিঘার উপর জমি বন্দোবস্ত দিয়াছেন। এই পনর শত টাকাও তাঁহার ভগ্নীর তহবিল হইতে গিয়াছে। ১৯১৩ সালে সত্যবাবু এই জায়গার জন্য ১৪৫০০৲ টাকা দর পাইয়াছিলেন। (একজিবিট নং ৭৭) ডায়েরী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারগণই প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে এই সকল জিনিষ-পত্র, জায়গা-জমি দিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইত। ডায়েরী হইতে এইগুলি পরিষ্কার বুঝা যায় বয়স তখন সাতাশের মত ছিল এবং তিনি মদ্যাসক্ত ছিলেন, সত্যবাবুর সহিত তাঁহার ইয়ারকী চলিত না কারণ

তিনি বয়সে ছোট ছিলেন, সত্যবাবু সকল সময় রাণীদের মধ্যে একটা বিরোধ ইচ্ছা করিতেন এবং কুমারের মৃত্যুর পর সেই সুযোগও উপস্থিত হয়। সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তিনি ভগ্নীর নামে টাকার তাগিদ দিতে থাকেন। ৪ঠা নবেম্বর তিনি আট হাজার টাকা দাবী করেন। মনোমোহনের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাস হইতে মেজরাণীর জন্য মাসিক এক হাজার একশত টাকা ভাতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ১৫।৫।১১ তারিখে মেজরাণী রেভিনিউ বোর্ডের নিকট যে আবেদন করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি মাসিক ১১০০৲ টাকা করিয়া পাইতে-ছিলেন। ২৯১০ সালের ১১শে এপ্রিল তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত কলিকাতা যান। (একজিবিট ৬৪) তাঁহার পায়ে অসুখ হইয়াছিল। ডাঃ হলকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য মিঃ নীডহাম বলেন। তাঁহার যাইবার কালে মিঃ নীডহাম তাঁহাকে ৮০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। (একজিবিট ৬২) সত্যবাবু আরও টাকা চাহিয়াছিলেন। মিঃ নীডহাম আরও ৫০০৲ টাকা দিতে চাহেন। (একজিবিট ৬৩) তিনি কলিকাতাতে ৩০নং হ্যারিসন রোডস্থ একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে ছিলেন, ডাঃ ব্রাউন তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। আরোগ্যলাভ করার পর ১৪।৭।১০ তারিখে তাঁহার ভ্রাতার বাড়ী ঢাকাতে যান। (একজিবিট ৩০৭ মেজ-রাণীর পত্র) আমি বলিয়াছি যে, ৬।৮।১০ তারিখে সত্য ঢাকায় সম্পত্তি পাইয়াছিল। মেজরাণী কয়েকদিনের জন্য ঢাকা হইতে জয়দেবপুর যান। তখন বড়কুমার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন।

১৯১০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বড়কুমারের মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা চলিয়া আসেন। তিনি চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ঢাকায় থাকিয়া বরাবরের জন্য কলিকাতা চলিয়া যান। তিনি ১৯৩৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঢাকা ফিরিয়া আসেন নাই। বড়রাণীও স্বামীর মৃত্যুর দুই মাস পর চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই।

কলিকাতায় মেজরাণী

মেজরাণী কলিকাতাতে ৮৯নং হ্যারিসন রোডে একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। তিন তাঁহার মা, ভাই, ভ্রাতৃবধূর সহিত বাস করিতে থাকেন। তিনি মাসিক ১১০০৲ টাকা করিয়া পাইতে থাকেন। তিনি ইন্‌সিওরেন্স বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ১৯০৯ সালের নবেম্বর হইতে ১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইন্‌সিওরেন্সের টাকা ব্যতীত ছত্রিশ হাজার টাকা আনাইয়াছিলেন। ঐ অর্থের মধ্যে মেজকুমারের শ্রাদ্ধের ব্যয় বাবদ দুই হাজার টাকাও ছিল। তিনি ১৩২০ সনের পৌষ মাসে তাঁহার মাতার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১১০০৲ টাকা করিয়া পইতেছিলেন। ইন্‌সিওরেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা ধরিলে তিনি অথবা তাঁহার ভাই এক লক্ষ টাকার মত পাইয়াছেন। সত্যবাবু বলেন যে, তাঁহার মা তাঁহার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা রাখিয়াছেন। অথচ তিনি আজীবন তাঁহার কন্যা বা পুত্রের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি কোন টাকা রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। উত্তরাধিকারী গণ্য হওয়া সম্পর্কিত

সার্টিফিকেট নেওয়া সম্পর্কে অবাঞ্ছিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে এই আশঙ্কায় সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, তাঁহার মা জীবিতকালেই তাঁহাকে টাকা দিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি তাহা করিয়া থাকেন, বা তাঁহার কোন টাকা থাকে, তবে তাঁহার কন্যারাই ঐ টাকার মালিক হইবেন।

১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা চলিয়া যান, তাহার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার কলিকাতা যাত্রার পরই কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহার অংশের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কলিকাতা গমনের পূর্ব্বেই কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহার অংশের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই উক্তি মিথ্যা। আমার মনে হয়, মিঃ নীডহাম তার করিয়া সেই সংবাদ জানাইলে উহা যেন তাঁহাদের মধ্যে বোমার ন্যায় আপতিত হইয়াছিল। সত্যবাবুও তাহাই বলেন; যাহা হউক, ঐ সংবাদ বোমার মত হউক আর না হউক, মেজরাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার সলিসিটর মেসার্স ওর ডিগনাম এণ্ড কোম্পানী তাঁহার ভ্রাতার পরামর্শক্রমে তাঁহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে খালাস করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। লর্ড সিংহ (তৎকালে মিঃ এস, পি সিংহ) তাঁহার পক্ষে ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে সওয়াল করেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। উক্ত দরখাস্তের তারিখ ২৫।৫।১১। তাঁহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসেই রহিয়া গেল, এখনও উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে আছে।

ছোটকুমারের অংশ ১৯১১ সালের মে মাসে এবং বড়রাণীর অংশ প্রবেটের মামলার নিষ্পত্তি হইবার পরই ১৯১২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়। এইরূপে ১৯১২ সালে সমস্ত এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়, তখন ছোটকুমারের বয়স প্রায় ২৬ বৎসর। তাঁহার জীবন ফুরাইয়া আসিতেছিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাধারণতঃ নলগোলার বাড়ীতে থাকিতেন। ১৮ দিন রোগ-ভোগের পর ১৯১৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তথায় তিনি মারা যান। তখন তাঁহার তিন ভগিনী, পিতামহী ও পিসি কৃপাময়ী দেবী নল গেলা রাজবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারা ছোট-কুমারের মৃত্যুর পরক্ষণেই ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করেন। ছোটরাণী শত্রুতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন, তিনি পীড়িতা হইলেও এই সকল মহিলা তাঁহাকে একা ফেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, সিভিল সার্জ্জনের উপদেশে তিনিও ঐ দিনই নলগোলা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করেন। ছোট-রাণী স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কুমারদের ভগিনীদের সহিত ছোটরাণীর সদ্ভাব ছিল। ছোট-কুমারের মৃত্যুর সময় কি ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ছোটরাণীরও তাঁহার উপর নির্ভরশীল একদল দরিদ্র ও অশিক্ষিত ভাই ছিল; তাঁহারা তাঁহাকে হাত করিয়া ফেলে এবং ঢাকায় ভাড়াটীয়া বাড়ীতে, তৎপর আর একটী বাড়ীতে এবং তারপর কলিকাতা লইয়া যায়। ঢাকার কালেক্টর এবং রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ মাব তাঁহাকে ঢাকা ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেও তিনি ঢাকা ফিরেন নাই। এই সময় তিনি

রেভিনিউ বোর্ডের নিকট লিখিত এক পত্রে এক উইল করিবার অভিপ্রায় ও উহার মর্ম্ম প্রকাশ করেন; কিন্তু উহা কখনও সম্পাদিত হয় নাই। তিনি চারি বৎসরকাল নানা স্থানে ঘুরিতে থাকেন বা তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরান হইতে থাকে। তারপর তিনি ঢাকা ফিরিয়া আসিয়া এখানে অবস্থান করিতে থাকেন এবং বাঙ্গলা ১৩২৬ সনের ১৬ই জৈ্যষ্ঠ (ইংরাজী ১৯১৯ সালের ৩০শে মে) তাঁহার ভ্রাতা কুমুদের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বে কুমারদের ভগিনীরা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা নিজ নিজ সংসার পাতিয়া বসেন। তৃতীয় কুমারের যেদিন মৃত্যু হয় সেদিনই রাজকুমারীরা নলগোলা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তাঁহারা নলগোলা রাজবাড়ীতে বা জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে আর প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা প্রথমে কয়েকদিন ঢাকাতেই থাকেন; তৎপর জয়দেবপুর চলিয়া যান। ইন্দুময়ী দেবী চক্করে তাঁহার নিজ বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন, চক্কর জয়দেবপুরের একটি স্থান—বড়কুমারের জীবদ্দশায় তথায় ইন্দুময়ীর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীও নির্ম্মিত হইতেছিল। ২৯শে ফাল্গুন তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করেন। ছোটকুমারের মৃত্যুর পর তিনি প্রথমে ঢাকায় এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন, তারপর বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কৃপাময়ীর বাড়ীতে থাকেন। অতঃপর ১৯১৪সালের এপ্রিল মাসে নিজের বাড়ীতে যান। ইন্দুময়ী দেবী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর মধ্যে তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী তড়িন্ময়ী দেবীর বাড়ী, এইখানে

রাজকুমারীরা নিজ নিজ সংসার পাতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বিবরণ দিয়াছেন এবং ছোটরাণীর সাক্ষ্যেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। ছোটরাণী নিজেও বলেন নাই এবং রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বা ফণিবাবু প্রভৃতি বিবাদীপক্ষের অন্য কোন সাক্ষীও বলেন নাই যে, রাজকুমারীরা ছোটকুমারের মৃত্যুর পর রাজবাড়ী গিয়াছিলেন। বরং সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কালেক্টর তাঁহাদিগকে রাজবাড়ীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহাতে অসম্মতা হইয়া বলেন, বৌয়েরা যখন রাজবাড়ীতে থাকে না, তখন তিনিও রাজবাড়ীতে থাকিবেন না। ছোটরাণী যে বলিয়াছেন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ রাজকুমারীদিগকে রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য কথা এই যে, ইন্দুময়ী দেবী পূর্ব্বেই চক্করে তাঁহার বাড়ী তৈয়ার করাইয়া ছিলেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীও ছোটকুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে যে মতলব ঠিক হইয়াছিল, ছোট কুমারের মৃত্যুতে তাহা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইল মাত্র। ছোটরাণীর সাক্ষ্যে স্পষ্টই দেখা যায়, ছোটকুমারের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার ও ছোটরাণীর সঙ্গে রাজকুমারীদের খুব ভাল ভাবই ছিল। ছোটরাণীর লিখিত পত্র হইতেও দেখা যায়, তিনি কিরূপ ভালবাসাপূর্ণ ভাষায় ইন্দুময়ী দেবীর নিকট পত্র লিখিতেন। বৌয়েরা শাশুড়ীর নিকট যে ভাষায় পত্র লিখে, তিনিও ইন্দুময়ীর নিকট সেই ভাষায় পত্র লিখিতেন; তবে ইমন্দুয়ীর নিকট লিখিত ছোটরাণীর পত্র আরও ভালবাসাপূর্ণ। (একজিবিট

৩২০, ৩২২ এবং ৩২৬—৩৩৮)। ছোটকুমারের মৃত্যুর পর ছোটরাণীর ভ্রাতারা ছোটরাণীকে ধরিতে গেলে একেবারে উধাও করিয়া ফেলিলেন। জয়দেবপুরে ছোটকুমারের শ্রাদ্ধে তিনি যান নাই, কুমারদের ভগিনীরাও যান নাই। বুঝা যাইতেছে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে ডাকা হয় নাই এবং ছোটরাণীর ভ্রাতারাই কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিলেন। ছোটরাণী যখন দত্তক গ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ও রাজকুমারীদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নাই। দত্তক গ্রহণের সময় তাঁহার ও ইন্দুময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন (ছোটরাণীর সাক্ষ্য)। উহাতে প্রমাণ হয় না যে, ছোটরাণী ও তাঁহার ননদের মধ্যে কোনও অসদ্ভাব ছিল। অসদ্ভাব ঘটিবার কোনও সুযোগই হয় নাই কতকগুলি পত্র ছোটরাণীকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলা হয় যে, তিনি কলিকাতা বা অন্যত্র থাকিতেও ননদের সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল পত্র পুনঃ পুনঃ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখেন এবং বলেন, তিনি ঐ সকল পত্র লেখেন নাই, তবে তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত ঐ সকল পত্রের হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য আছে। যদি এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হইত, তবে তিনি যে সকল লেখা তাঁহার হস্তাক্ষর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত সেই সকল পত্রের হস্তাক্ষর তুলনা করিতাম। যাহা হউক, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার সহিত রাজকুমারীদের অসদ্ভাব ছিল, তাহা প্রমাণকল্পে কোনও সাক্ষ্য নাই এবং তাঁহাদের আচরণেও

তাহা প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে এমনও প্রমাণ নাই যে, তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল।

তৃতীয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনীবা চক্করে নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। কুমারদের পিসী কৃপাময়ীদেবী ছোটকুমারের মৃত্যুতে এমন শোক পাইয়াছিলেন যে, ১৯১৩ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি উইল করেন ও তৎপর অগ্রহায়ণ মাসে কাশী যাত্রা করেন; আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। সত্যভামা দেবীও ১১ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার উইল করিয়া কৃপাময়ী দেবীর সঙ্গে কাশী যাত্রা করেন। কৃপাময়ী দেবী ফিরলেন না; কিন্তু সত্যভামা দেবী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; ১৯২১ সালে যখন বাদী আসেন, তখন সত্যভামা দেবী জয়দেবপুরে ছিলেন। কৃপাময়ী দেবী ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল কাশীতে মারা যান।

বড়রাণী ও মেজরাণী কলিকাতায় ছিলেন। জয়দেবপুরে কি ঘটিত না ঘটিত, তাহার সঙ্গে তাঁহাদের কোন সংস্রবই ছিল না। বড়রাণী ৮নং মধুগুপ্ত লেনে তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন। বাঙ্গলা ১৩২০ সনের ৬ই আষাঢ় অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৩ সালের জুন মাসে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন—অবশ্যই উহা যদি শেষ পত্র হইয়া থাকে; কিন্তু তিনি যে তৎপর আরও পত্র লিখিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। এই পত্রখানা একটু কঠোর ধরণের। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বড়রাণীকে লিখিয়াছিলেন, বড়রাণী যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর বিবাহের খরচ দিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে অনুরোধ করেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ঐ পত্রের উত্তরে বড়রাণী উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। বড়রাণী ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত মধুগুপ্ত লেনে পিত্রালয়ে ছিলেন। তৎপর তিনি ১১২নং রিপন রোডের বাড়ীতে উঠিয়া যান, এখনও তিনি তথায় আছেন।

মেজরাণী কলিকাতা গিয়া ৮৯নং হ্যারিসন রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার সহিত বাস করিতে থাকেন। ১৯১৪ সালে তিনি ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে উঠিয়া যান, এখনও তিনি তথায় আছেন।

১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই দুই রাণীর সহিত রাজকুমারীদের কোনও অসদ্ভাব ছিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, বড়রাণীর ছিল ঔদাসীন্যের ভাব এবং তিনি কাছে ঘেঁসিতে চাহিতেন না। কিন্তু কখনও ঝগড়া হয় নাই। মেজরাণীর ভাব আরও হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে মনোভাব সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর উক্তি যে, তাঁহার সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা পরস্পরের নিকট পত্র লিখিতেন, এইরূপ একখানা পত্র বিবাদীপক্ষ আদালতে দাখিল করিয়াছেন। (একজিবিট জেড ৩২)। জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী ১৯১৬ সালের ২৫শে মার্চ্চ কাশী হইতে মেজরাণীর নিকট ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। মেজরাণীর এক পত্রের উত্তরে এই পত্র লেখা হইয়াছিল। এই পত্রে তাঁহার লিখিত অন্যান্য পত্রের উল্লেখ আছে। মেজরাণীকে কাশী গিয়া তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভ্রাতৃবধূকে মৃত ভ্রাতার স্মৃতি বলা হইয়াছে। অলকা দাইয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং

আরও বলা হইয়াছে যে, পিসিমা কৃপাময়ী দেবী মেজরাণীকে দেখিতে চাহিতেছেন; এককথায় বলা যায় ননদ ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে ভালবাসা থাকিলে ননদ ভ্রাতৃবধূর নিকট যেরূপ পত্র লিখিতে পারে, এই পত্রখানাও সেইরূপ। তাহা ছাড়া জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী যখনই কলিকাতা যাইতেন বা যখনই কলিকাতা হইয়া কাশী যাইতেন তখনই মেজরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী প্রায়ই কাশীতে কৃপাময়ীদেবীর নিকট যাইতেন। ছোটরাণী একবার বুদ্ধার স্ত্রীকে (জ্যোতির্ম্ময়ীদেবীর পুত্রবধূ) সামান্য কয়েকখানা গয়না দিয়াছিলেন এবং বধূ তাঁহার নিকট যাইবার পূর্ব্বেই তিনি উহা তৈয়ার করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্রূপ মেজরাণীও একবার বুদ্ধুর স্ত্রীকে একজোড়া ব্রেসলেট উপহার দিয়াছিলেন; জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী বলেন, সত্যবাবুর ভয়ে মেজরাণী উহা স্নানের ঘরে বুদ্ধুর স্ত্রীকে দিয়াছিলেন; কিন্তু মেজরাণী বলেন, তিনি প্রকাশ্যেই উহা দিয়াছিলেন। মেজরাণী অস্বীকার করেন না যে, বুদ্ধু কলিকাতায় তাহার বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত এবং তিনি একবার বুদ্ধুকে মেজকুমারের কোনও কোনও পুরাতন পোষাকও দিয়াছিলেন। এই সকল পোষাক কোর্টেও দাখিল করা হইয়াছে। এইগুলি যে মেজকুমারের তাহা অস্বীকার করা হয় নাই। বাদীর পরিচয় আলোচনায় এইগুলি বিশেষ কাজে লাগিবে। বুদ্ধু চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গেলে মেজরাণীও বুদ্ধুকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তাহার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকাও দিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, বাদীর আগমনের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও মেজরাণীর মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল ; তাঁহাদের মধ্যে যে অসদ্ভাব ছিল, এমন কথা কেহই বলে নাই। এই বিষয় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও প্রতিবাদ হয় নাই, শুধু মেজরাণী বুদ্ধুর স্ত্রীকে গোপনে ব্রেসলেট উপহার দিয়াছিলেন কি প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বলিয়াছেন, বড়রাণীর সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না, আবার হৃদ্যতাও ছিল না এবং পিতার উইল অনুসারে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে মাসোহারা পাইতেছিলেন, বাদী আসিবার পূর্ব্বে বড়রাণী একবার তাহাতে আপত্তি তুলিয়াছিলেন বা উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহার এই সকল কথা অবিশ্বাস করিবার পক্ষে আমি কোনও কারণ দেখি না। বড়রাণীর জেরা হইতে এমন কিছু দেখা যায় না যে, তাঁহাদের মধ্যে মনোভাব অন্যরূপ ছিল। বড়রাণীর যে পত্রগুলি বিবাদীপক্ষ দাখিল করিয়াছেন (অনেক গুলি পত্রই দাখিল করা হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব) তাহা হইতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার অধিকার এক চুলও ছাড়িবার পাত্রী নহেন ; সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যদি ১৯২১ সালে একটী প্রতারককে কুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর একটি স্বামী চাপাইয়া ভ্রাতৃজায়ার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেন এবং ছোটরাণীর পোষ্যদের না হউক তাঁহার পোষ্য পুত্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া পরোক্ষভাবে ছোটরাণীরও সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে রাণীদের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছাড়া

অন্য কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন এবং এখনও বলেন, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী একজন প্রতারককে সমর্থন করিয়াছেন, কারণ হিন্দু আইন অনুসারে কুমারদের ভাগিণেয়গণই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন, কিন্তু ছোটরাণী দত্তক গ্রহণ করায় তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়। রাজকুমারীরা যখন নিজ নিজ সংসার পাতেন তখন তাঁহাদের আয় কত ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু দেখা যায়, পিতাব উইল অনুসারে তাঁহারা বার্ষিক ২৪০০৲ টাকা, আর্থাৎ মাসিক ২০০৲ টাকা করিয়া পাইতেন, হয় ত তাঁহারা আরও কিছু বেশী পাইতেন কারণ ১৯২১ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর জরীগাড়ী ছিল। যাহা হউক পল্লীগ্রামে মাসিক দুইশত টাকা আয় বিশিষ্ট লোক ধনী বলিয়া গণ্য না হইলেও পল্লীগ্রামে মাসিক ২০০৲ টাকা আয় নিতান্ত কমও নহে। অবশ্যই ভাওয়াল এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনার সহিত তুলনা করিলে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

রাণীদের সম্পর্কে কথা এই যে, ছোটরাণী ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম রাণীও কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার ভাওয়ালের সহিত এক প্রকার অপরিচিতা হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় রাণীর মাতার মৃত্যু হয়; পৌষ মাসে—অর্থাৎ ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় রাণীর মাতৃবিয়োগ হয়। চিরতরে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় রাণী প্রায় এক লক্ষ টাকা

পাইয়াছিলেন। এই টাকা ছাড়া ১৯১১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তিনি মাসিক ১১০০৲ টাকা করিয়া পাইতে থাকেন। ২৯১৩ সালে এই টাকার পরিমাণ বাড়িয়া ২৫০০৲ টাকা হয়। ১৯১৫ সালের কাছাকাছি সময়ে এই টাকার পরিমাণ ৪০০০৲ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়, দুই বৎসর পরে ইহা বাড়িয়া ৫০০০৲ টাকা হয়। ১৯১৯ সালে এই টাকার পরিমান প্রতি মাসে ৭০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সেই বৎসর হইতে দ্বিতীয় রাণী মাসিক ৭০০০৲ টাকা করিয়া পাইতেছেন।

মেজরাণী কত টাকা পাইয়াছেন

এই মাসিক ভাতা ব্যতীত দ্বিতীয় রাণী অতিরিক্ত ও বাড়তি টাকাও পাইয়াছেন। তিনি নিজে যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, এই টাকার পরিমাণ গড়ে ৩॥ লক্ষ কিম্বা চারি লক্ষ হইবে। এই যে হিসাব, তাহা আমি দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্য হইতে এবং হিসাব সম্পর্কে উত্থাপিত যে কোন কাগজ-পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সত্যবাবু নিজে এই টাকার পরিমাণ এবং প্রাপ্তির সময় সম্পর্কে তাঁহার ভগিনী অপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তিনি অপেক্ষা তাঁহার ভগিনী বেশী কথা জানেন, এই যে ছলনা, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই সত্যবাবু এরূপ অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় রাণী টাকার অঙ্কগুলি জানেন; কিন্তু এই টাকার কি হইল, তাহা তিনি জানেন না। তিনি কলকাতায় ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে থাকেন এবং এই বাড়ীটি তাঁহার ভ্রাতার সম্পত্তি বলিয়াই বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, এই বাড়ী ক্রয় এবং ইহার উন্নতি বিধানের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা আমার ভ্রাতাকে আমি উপহার দিয়াছি। বাড়ীর জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় রাণী জানেন না। তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া বলেন, এই সম্পত্তি তাঁহারই; ইহার জন্য দুই লক্ষ হইতেও বেশী টাকা ব্যয় হইয়াছে। আরও মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে; কিন্তু সমস্তই সত্যবাবুর নামে। রাণী বলেন, এক লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে; তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার নিজের টাকা দ্বারাই এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। ভ্রাতা সত্যবাবু আসিয়াও এই কথাই বলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে রাণী একটা সাহায্য করিয়াছিলেন বটে; তবে ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী তিনি নিজের টাকা দিয়াই ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার ভগিনী বিধবা হইবার পর এই সমস্ত ক্রয় করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় রাণী এ পর্য্যন্ত নিজের হিসাব মতই ভাওয়াল এষ্টেট হইতে ১৯ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

ব্যাঙ্কে কোন হিসাব নাই

দ্বিতীয় রাণীর নামে ব্যাঙ্কে কোন হিসাব নাই। তিনি কখনও ইন্‌কাম ট্যাক্স দেন নাই। এই পরিমাণ অর্থ লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে হইলে কোন না কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন; তথাপি রাণীর টাকাকড়ির সম্পর্কে কোন হিসাব কিম্বা কোন কাগজ-পত্র নাই। ভারতবাসীর সাধারণ অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে সত্যসত্যই

কোন কাগজ-পত্র নাই। রাণী বলেন,—"আমি নিজেই নিজের টাকাকড়ি রাখি। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই আমি এরূপ করিয়া আসিতেছি।" উপরের তলায় একটি লোহার সিন্দুক আছে। তাহার চাবি আমিই রাখি।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যাঙ্কে মজুদ করা কিম্বা কোন প্রকার কাজে লাগানোর অর্থই ইন্‌কাম ট্যাক্স দেওয়া। জেরার সময় রাণী কতকগুলি কোম্পানীর কাগজ লোহার সিন্দুকে রাখিয়া দেওয়ার কথা বলেন। রাণীর সাক্ষের পর তাঁহার ভ্রাতা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া অনেকটা স্পষ্টভাবে ব্যাঙ্কে একটা হিসাব রাখার এবং তাহা সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, রাণীর উপর কোনও ইন্‌কাম ট্যাক্স ধার্য্য হয় নাই; তবে তিনি কোম্পানীর কাগজের সুদের উপর ইন্‌কাম ট্যাক্স দিয়াছেন। এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পরে রাণীর নামে একটী হিসাব ব্যাঙ্কে খোলার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব যে, এইরূপ মোটা টাকা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নামে কোন দলিল-পত্রের প্রয়োজন হইল না। এরূপ দলিল-পত্র থাকিলে তাহা এই মামলায় পেশ করা হইত। সত্যবাবু কখনও কোন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া রাণী বলেন, সত্যবাবু শেয়ারের কারবার করিতেন, তবে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নাই। রাণীর ভ্রাতা সত্যবাবু আসিয়া বলেন,—দুইটি বাদে কলিকাতার অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তিগুলি তাঁহার নিজের টাকায় করা হইয়াছে। সত্যবাবু বলেন, তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে ৪০ হাজার টাকা

পাইয়াছিলেন। ইহাকে মূলধন করিয়া ১৯১০ সালে তিনি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করেন। এইরূপেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। সত্যবাবুর মুখের কথায় মাত্র বিশ্বাস না করিলে বলিতে হয়, তাঁহার মাতার এমন কোন অর্থ ছিল না, যাহা তিনি ছেলেকে দিয়া যাইতে পারেন। কারণ বিবাহিত জীবনেও তিনি পুত্রকন্যাসহ তাঁহার ভ্রাতাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার লিখিত পত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাহাতে দুঃখ দারিদ্রের কথা কথা আছে, এই অবস্থায়ও যদি তিনি কোনও অর্থ রাখিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার হস্তস্থিত কন্যার অর্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। সত্যবাবুর নিজের বর্ণনা অনুসারেই ১৯১৩ সালের একলক্ষের অধিক টাকা সত্যবাবুর হাতে না আসিলেও তাঁহার মাতার হাতে (কন্যার সম্পত্তি হইতে) আসিয়াছে। সত্যবাবু এ কথা অস্বীকার করেন না যে, বাড়ীর সমস্ত ব্যয়ই তাঁহার ভগিনী বহন করেন; এমন কি দুইখানি মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত তাঁহার নামে লিখিত আছে।

রাণীর আয় কোথায় গেল

ইহা অতিশয় সুস্পষ্ট যে, দ্বিতীয় রাণীর আয়ের সমস্ত টাকাই তাঁহার ভ্রাতার পকেটে গিয়াছে। রাণী বলেন,—"আমার ইচ্ছাই আমার ভ্রাতার ইচ্ছা।" কিন্তু রাণীর অবস্থা বিবেচনায়—এই রাজোচিত আয়ের কোনও একটা অংশের উপর যে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য

তিনি একটু ছেঁড়া কাগজ পর্য্যন্ত দাখিল করিতে পারেন নাই—এই অবস্থা বিবেচনায় উল্টা কথাই প্রমাণিত হয়। ভ্রাতার ইচ্ছাই রাণীর ইচ্ছা বলিয়া প্রমাণিত হয়)

১৯২০ সাল আসিল। ২৭শে এপ্রিল তারিখে কাশীতে কৃপাময়ীর মৃত্যু হইলে কুমারদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী ২৯শে আগষ্ট তারিখে মারা গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নির্জ্জন রাজবাড়ীর এক অংশে কুমারদের পিতামহীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু প্রায়ই তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকটে আসিয়া থাকিতেন। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়াছিল। বিধবা পত্নী সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাজপরিবারের কোন বংশধর নাই বলিয়া বৃদ্ধা মহিলারা উইল করিয়াছিলেন। ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ সম্পত্তির দখল লইয়াছিলেন। যথোচিতরূপে পরিচালিত হওয়ার ফলে সম্পত্তির দেনা পরিষ্কার হইয়াছিল। ভাওয়ালের পুরাতন আমলে প্রচলিত বে-আইনী ট্যাক্স ও খাজনা গ্রহণের প্রথা (বাদীপক্ষের ১৫৫, ১৯০, ১৭৬ নং সাক্ষী) বিলুপ্ত হইয়াছিল। মো-সাহেবের দল অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভাওয়াল এষ্টেটের যে অংশ দ্বিতীয় কুমারের প্রাপ্য, তাহা তাঁহার বিধবা পত্নীর দখলীকৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাণীর

ভাই-ই এই সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় কুমার সম্পর্কে যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহা হইতেছে তাঁহার স্মৃতি। পুরাতন ভৃত্য আনন্দ খানসামা প্রত্যহ সন্ধ্যায় রাজবাড়ীতে দ্বিতীয় কুমারের শয়নগৃহে ধূপ-ধূনা জ্বালাইত এবং গুজব রটিত যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন। এবং তিনি সন্ন্যাসীদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; এই সমস্ত দ্বারাই কুমারের স্মৃতি জাগরূক রাখা হইয়াছিল। কেহই এই জনরবে বিশ্বাস করিত না। এই গুজবের ফলে কোন কাজেরই ব্যবস্থা হইত না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন বলেন, তিনি এই গুজব বিশ্বাস করিতেন, তখন তিনি তাঁহার আশাকেই বিশ্বাস বলিয়া ভ্রম করেন। পরলোকগত কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিম্বা জাহাজ ডুবিতে নিমগ্ন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রিয়জনের এরূপ আশাই জাগিয়া থাকে। এরূপ আশা যাহার মনে জাগে, সে ব্যক্তি কোন নাবিককে পাইলেই জিজ্ঞাসা করে। ঠিক সেই-রূপই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কিংবা কৃপাময়ী দেবী কুমারের কথা সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে এই জিজ্ঞাসার মধ্যেও প্রকৃত কোন বিশ্বাস ছিল না; আর যদিই বা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রমাণ হিসাবে তাহার কোন মূল্য নাই।

সন্ন্যাসীর ঢাকায় উপস্থিতি

এই মামলার বাদী, সন্ন্যাসী যখন ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখনকার অবস্থা এইরূপই ছিল।

সন্ন্যাসীর ঢাকায় আসার তারিখ সঠিক জানা যায় না।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের অথবা ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের কোনও একদিনে সন্ন্যাসী ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন। বাদী ঠিক কোন্ দিন ঢাকায় আসেন, বাদীও তাহা সঠিক বলিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল সাক্ষ্য সম্বন্ধে আদৌ কোন আপত্তি উঠে নাই, সেই সকল সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে সন্ন্যাসীর ঢাকায় উপস্থিতির একটা দিন অনুসন্ধান ঠিক করিয়া লওয়া যায়।

সন্ন্যাসীর সাহচর্য্যে

দার্জ্জিলিংএর ঘটনার পর হইতে নেপালের যে স্থান 'ব্রহ্মো সত্র' নামে পরিচিত, সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বাদী কোন্ কোন্ স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বাদী তাহার এক বিবৃতি দিয়াছেন। সেই বিবৃতি সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিশ্লেষণও প্রয়োজন হইবে। কিন্তু উপাখ্যানের এই স্থলে প্রধানতঃ যাহা বলা আবশ্যক, তাহা এই যে—বাদী বলিয়াছেন যে, 'ব্রোহ্মো সত্রে' উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্মরণ হয় নাই—তিনি কে; তবে তাঁহার বাড়ী যে ঢাকায়, সে কথা তাঁহার স্মৃতি-পথে আসিয়াছিল। তখনও বাদী তাঁহার গুরু ধর্ম্মদাস নাগা সমেত চারি জন সাধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু এইখানেই বাদীকে তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হয়।

'ব্রহ্মো সত্রে' আসিয়া আমার স্মরণ হয় যে, আমার বাড়ী ঢাকায়। আমি আমার গুরুকে সে কথা বলি। গুরু আদেশ

দেন,—"বাড়ী যাও তোমার বাড়ী যাইবার সময় আসিয়াছে। তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।" তিনি তখন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, পুনরায় কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে? তাহাতে গুরু উত্তর দেন,—হরিদ্বারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

গুরু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই বুঝিয়াছেন যে, যদি তিনি মায়াকে (সংসারে আসক্তি) পরাভব করিতে পারেন তবেই তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া যাইবে। তখন তিনি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী যাত্রা করেন। বহু দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন।

ঢাকায় আসিয়া কি করিলেন

রাত্রি ১২টায় কি ১টায় সন্ন্যাসী (বাদী) ঢাকা রেলষ্টেশনে পৌঁছেন এবং ষ্টেশনেই রাত্রিযাপন করেন। বাদী বলেন,— "যখন আমি ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম, আমার মনে হইতে লাগিল, পূর্ব্বে সেখানে বহুবার যাওয়া-আসা করিয়াছিলাম।" রেল-ষ্টেশনে সারারাত্রি কাটাইয়া, তিনি সদর ঘাটের দিকে রওনা হন। নদীব অপর পার হইতে চর অতিক্রম করিয়া বেলা ১০টায় তিনি নদীর এপারে আসেন এবং রূপ বাবুর বাড়ীর দরজার সম্মুখে বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর উপবেশন করেন।

বাকল্যাণ্ড বাঁধ

বাদীর পূর্ব্বোক্ত উক্তিসমূহ, অর্থাৎ আলোচ্য উপাখ্যানের

এতটা অংশ বাদীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। তাঁহার নিরুদ্দেশ কালের অবশিষ্ট অংশের যে কাহিনী তিনি বিবৃত করিয়াছেন, যদি তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বাদীর পূর্ব্বোক্ত উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। বাকল্যাণ্ড বাঁধে যখন তিনি উপবিষ্ট হইলেন, সেইখান হইতে এই কাহিনীর (যেখানে আমি অন্য প্রকার বর্ণনা করিব তাহা ছাড়া) আর সকলই সাধারণের বলিয়া স্বীকৃত। তিনি দিবারাত্রি সেখানে বসিয়া থাকিতেন। রৌদ্র বৃষ্টিতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ক্রমাগত তিন চারি মাস—প্রায় ৫ই এপ্রিল অথবা ১৩২৭ সালের চৈত্র মাস শেষ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি একভাবে সেখানে বসিয়াছিলেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, চৈত্র মাস শেষ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বাদী কাশিমপুরে গিয়াছিলেন এবং বিবাদীপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াই বলেন যে, তিনি বারুণীর দিন কাশিমপুর অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু বাদীর কাশিমপুর যাওয়ার যে কাহিনী বিবাদীপক্ষ বর্ণনা করেন, বাদী তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—৫ই এপ্রিল বা ঐরূপ সময়ে তিনি কাশিমপুরে গিয়াছিলেন। সুতরাং বাদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অনুসারে, বাদী বাকল্যাণ্ড বাঁধে তিন চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলে প্রতিপন্ন হয়—বাদী অবশ্যই ডিসেম্বর মাসের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মিঃ নিডহামও তাঁহার রিপোর্টে (একজিবিট ৫৯) সেই কথাই বলিয়াছেন।

প্রায় চারিমাসকাল বাদী দিবা-রাত্রি বাকল্যাণ্ড বাঁধে বসিয়াছিলেন। তাহাকে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখাইত। লেংটি ছাড়া তাঁহার পরণে আর কিছু ছিল না। তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ; মাথার চুল জটা বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে বহুদূর বিলম্বিত—প্রায় জানু পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে (১৯ (এ) নং একজিবিটের ফটো দ্রষ্টব্য)। জ্বলন্ত ধূনির সম্মুখে তিনি অহরহঃ উপবিষ্ট। আপাদমস্তক সন্ন্যাসীর সমস্ত শরীর বিভূতি (ভস্ম) বিলেপিত। শত শত লোক, যাঁহারা বাকল্যাণ্ড বাঁধ দিয়া যাতায়াত করেন, অবশ্যই সেখানে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া থাকিবেন।

দেবব্রত বাবুর প্রসঙ্গ

সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে বাবু দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি সাব-জজ ছিলেন। এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত; কিন্তু তখন তিনি ঢাকার আদালতের বিচারাসনে সমাসীন ছিলেন। বাঁধ হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে সামান্য কয়েক মিনিট লাগিত। প্রত্যহ সকালে এবং বিকালে তিনি বাঁধে বেড়াইতে যাইতেন। বাঁধের উপর সন্ন্যাসী যতদিন ছিলেন (অবশ্য দেবব্রতবাবুর হিসাবে তাহা দুই মাস বা চারি মাস) ততদিন তিনি প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে সেখানে দেখিতেন।

বিবাদীপক্ষে কমিশনে দেবব্রতবাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। বাকল্যাণ্ড বাঁধে উপবিষ্ট থাকা কালে তিনি সন্ন্যাসীকে যেমন দেখিয়াছিলেন, দেবব্রতবাবু তাহার বর্ণনা দিয়েছেন। ফটোর সহিত সে বর্ণনা মিলাইলে, (সে অবশ্য ফটো দেবব্রত বাবুর থাকা কালে লওয়া

হয় নাই। পরন্তু তাহার পরে লওয়া হইয়াছিল এবং তখনও সন্ন্যাসী লেংটি পরিয়াই থাকিত) তখন সন্ন্যাসী যেমন ছিল, তাহার এক সুন্দর এবং সঠিক চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন,—"আমি ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম যে, এমন সুন্দর সুপুরুষ, রৌদ্র বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কি করিয়া দিবারাত্রি একই ভাবে একই যায়গায়, বসিয়া থাকিতে পারে! সর্ব্বপ্রথম তাহার মার্জ্জিত এবং মহত্ত্বব্যঞ্জক আকৃতির প্রতি আমার প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। আমি প্রত্যহ যাইবার ও আসিবার সময় তাহার চেহারার প্রতিই লক্ষ্য করিতাম। দুপুরবেলা যখন আমি একাকী যাইতাম, তখনও আমি তাহাকে একই অবস্থায় একই জায়গায় বসিয়া থাকিতে দেখিতাম।

মিঃ মুখার্জ্জি বলেন,—একদিন রাত্রিতে ফিনফিনে বৃষ্টি হইতেছিল এবং প্রবল ঝড় বহিতেছিল। সেদিন অত্যন্ত ঠাণ্ডাও বোধ হইতেছিল। রাত্রি ২॥টা কি ৩টার সময়, সাধু কি করিতেছে দেখিবার জন্য মিঃ মুখার্জ্জি বাহিরে যান। তখন সাধুর ধূনি জ্বলিতেছিল। সাধু তখনও উপবিষ্ট। শান্ত সৌম্য—যেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার স্মরণ হয় না—আমি আর কখনও ঢাকায় এমন সুন্দর সুপুরুষ জটাধারী সন্ন্যাসী দেখিয়াছি কি না।

মিঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন, তিনি দুই চারিবার সাধুর সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। বাঙ্গলা পদ্ধতিতে বলিতে হইলে ৩।৪ বার বলিতে হয়। একদিন সাধুর নিকট মিঃ মুখার্জ্জি কতকগুলি

লোক দেখিতে পান। তাঁহারা সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি কেমন করিয়া রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করেন?" সাধু ১০।১২ বৎসরের একটী বালকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দীতে বলেন,—

"যব হুম ইতনা বড়া থা হামরা মুলুক পাঞ্জাব ছোড় দিস ঔর সাহা···সীসা হো গয়া হৈকা বংগলা মূল্লুককা পানী বহুত খরাপ হৈ।" তারপর সাধু তাঁহার নিজের মাথা হাত দুইটী দিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"শির দুখতা হৈ য়া জগা খরাপ হৈ। আমি এই বালকের মত বয়সে, আমি আমার দেশ পাঞ্জাব ছাড়িয়া আসি। সকলই অভ্যাসেব উপর নির্ভর করে। বাঙ্গলার জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ আমার মাথা ব্যথা করে। এ জায়গা বড় খারাপ যতদূর স্মরণ হয়, মিঃ মুখার্জ্জি সাধুর নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই। অথবা তাহার বাড়ী কোথায় তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি যে পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহূত হন, সেই পক্ষ তাঁহাকে কতকগুলি জবানবন্দী না হওয়া পর্য্যন্ত, মিঃ মুখার্জ্জির স্মরণ হয় নাই যে, সাধু কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার গুরু কে, তাহা তিনি বলিয়াছিলেন কি-না। ১৯২১ সালের ২৬শে মে ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের নিকট তিনি যে জবানবন্দী দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল।

মিঃ মুখাৰ্জ্জীর সাক্ষ্যের সমালোচনা

ঐ দিন বাদী জয়দেবপুরে ছিলেন। ৪ঠা মে বাদী তাঁহার

পরিচয় প্রকাশ করেন, অথবা ঐ দিন বাদী নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ২৬শে মে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ঠিক কোন দিন যে বিতর্ক উঠে, নিম্নে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। অপিচ মিঃ মুখার্জ্জি যখন জবানবন্দী দিতেছিলেন, তিনি পূর্ব্বে যে মাস দিন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সময়ও তাহার উপরই জোর দেন এবং নন-জুডিশিয়েল তদন্তে তিনি সে জবানবন্দী দিয়াছিলেন নিম্নে আমাকে এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। কমিশনারের নিকট মিঃ মুখার্জ্জি যে জবানবন্দী দেন সাক্ষ্য গ্রহণ আইনের ১৫৭ ও ১৫৯ ধারা অনুসারে সে জবানবন্দী তাঁহার আদালতের সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য অথবা তাঁহার স্মৃতির সাহায্য কল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যে ভাবেই বিচার করা হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই সেই জবানবন্দী দেখিয়াও মিঃ মুখার্জ্জি স্মরণ করিতে পারেন নাই যে, বাদী গুরু নানকেব শিষ্য বলিয়া তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল কি না। মিঃ মুখার্জ্জি ঐ জবানবন্দী দেখিয়া এই মাত্র স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিল, আমার পিতামাতা কেহ নাই। সুতরাং আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। মিঃ মুখার্জ্জি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন,—একদিন সাধু কয়েকজন "পশ্চিমাকে তোমরা আমাকে কি দিতে পার? আমি আমার পিতা মাতা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছি, আমি বাস করিবার জন্য একখানি ঘরও পাই না।" এই কথা বলিতে শুনিয়াছি।

তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তিনি

এখন বলেন যে, সাধুর পিতা মাতা নাই এ কথা বলেন নাই। যাহা হউক, বাদী পাঞ্জাবী কি হিন্দুস্থানী তৎসম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। মিঃ মুখুয্যে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন যে, সাধু পাঞ্জাবী বা দুর্ব্বোধ্য হিন্দী বলেন নাই, সাধুকে কয়েকজন বাঙ্গালীর সহিতও হিন্দীতেই কথা বার্ত্তা বলিতে তিনি শুনিয়াছেন, বাঙ্গালীরা কিন্তু বাঙ্গলাতে কথা বলিয়াছে, তাহারা সন্ন্যাসীর নিকট ঔষধ চাহিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ঔষধ দিয়াছেন কি না তাহা তাঁহার মনে নাই, বিবাদীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, মে মাসে যখন বাদী আত্ম-পরিচয় দেন তখন তিনি বাঙ্গলা বলিতে পারেন নাই। অতুলবাবু কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন ঐ সময় বাদী অদ্ভুত রকমের হিন্দুস্থানীতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন।

বাদীর স্মৃতিশক্তি

বাদী নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধে যে সকল লোক তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছে, তাহাদের সহিত তিনি হিন্দীতেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

আমার নিকট বহুলোক আসিয়াছে। তাহারা তাহাদের মধ্যে বলাবলি করিত—এই ভাওয়ালের কুমার ইনিই মেজ-কুমার। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের অনেককেই আমি চিনিতাম। তাহারা কিছু না বলিলে আমি কিছুই জানিতাম না। তাহারা বাঙ্গলাতে কথা বলিত এবং আমি

হিন্দীতে বলিতাম, আমার গুরু আত্ম-পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমি হিন্দী বলিতাম।”

জেরার উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমি ঢাকা পৌঁছি এবং যখন আমি জয়দেবপুরে যাই তখন আমি বুঝিতে পারি যে, আমি বাঙ্গালী, ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন আমার নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কি ভাবে আমি জায়গাটা চিনিলাম, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। আমার সন্ন্যাস নেওয়ার পর আমি কখনও ঢাকা আসি নাই, রেলওয়ে ষ্টেশনে আমি রাজার পুত্র বলিয়া ভাবিতেও পারি নাই, স্মরণেও আনিতে পারি নাই। পরদিন আমি বাকল্যাণ্ড বাঁধে গিয়া বসি। আমার কাছ দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহাদিগকে আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। তাহাদের নাম মনে পড়িতে লাগিল, ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে আমি গরু, মানুষ ও জিনিষ-পত্র চিনিতাম, আমি যে রাজার পুত্র তাহা জানিতাম না।

তিনি বাকল্যাণ্ডে বাঁধে খোলা জায়গায় তিন মাস বাস করিয়াছেন, বলিয়া বলেন, অতঃপর তিনি বলেন, আমি যে এই অঞ্চলের লোক এই কথা আমার ক্রমে ক্রমে স্মরণে আসিতে লাগিল।

প্র—আপনি যে মেজকুমার এ কথা কি তখন আপনার স্মরণে আসিয়াছিল?

উ—আমার মনে নাই। (পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়) যে সকল লোক আমার পাশ দিয়া যাইত, তাহাদিগকে আমি চিনি পারি। আমি যে মেজকুমার তখন ইহা আমার স্মরণে

আসে, প্রথমে ইহা আমার মনে পড়ে, তারপর লোকে বলাবলি করিত, ইনিই ভাওয়ালের কুমার।

প্র—আপনি বুঝি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, আপনার মায়া কাটিয়া যাইতেছে। উহা কি একটি কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছে ?

উঃ—না এখানে আমার পুরাণ স্মৃতি ফিরিয়া আছিয়াছে। আমার বাড়ী আমার আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। যখন আমি কাশিমপুর যাই, তখন বাড়ী ঘর দুয়ার আত্মীয়-স্বজনের কথা আমার মনে পড়িল।

প্রঃ—যখন আপনি জয়দেবপুর গেলেন, তখন মায়ার মোহ কাটিয়া যাওয়াতেই কি সকলের কথা মনে পড়িয়াছিল ?

উঃ—হাঁ, তাহা গুরুর আদেশেই হইয়াছে। তখন কেহ মনে করাইয়া দেয় নাই। আমি দেখিলাম যে, আমিই মনে করিতে পারিতেছি। এই উত্তরগুলি শুনিতে অবিশ্বাস্য বলিয়া বলিয়া মনে হয় কিন্তু বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, দার্জ্জিলিংএ যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তখন তিনি তাঁহাকে চারি জন নাগার মধ্যে দেখিতে পান, এবং তিনি যে কে ছিলেন তিনি আর সেকথা মনে করিতেই পারেন নাই, একটু আবছা আবছা মনে পড়িতেছিল, তবে তিনি যখন ব্রহ্মসত্রে পৌঁছেন তখন তাঁহার মনে পড়ে যে তাঁহার বাড়ী ঢাকা, ইহার বেশী আর কিছুই মনে পড়ে নাই। তারপর তিনি যখন ঢাকা পৌঁছেন, তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে থাকে। বাদীর উক্তি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

বার বৎসরের জন্য স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহা সম্ভব কি-না, তাহাও দেখিতে হইবে।

এই সম্পর্কে আদালতকে বিশেষজ্ঞদের মতামত সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। এই রকম অবস্থায় বাদীর পক্ষে তাঁহার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভব কি না, তাহা দেখিবার জন্য আইন এবং এই সম্পর্কিত বই-পত্রের সাহায্য গ্রহণ গ্রহণ করিতে হইবে, এই ব্যাপারটা অযৌক্তিক তর্কালোচনার বিষয় নহে। যুদ্ধের পর বোমা ফাটার ফলে যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেই সকল লোকের ঘটনাগুলিও এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। মৃত্যুর পর জীবনলাভ করা যে প্রকার অসম্ভব, সেই প্রকার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া পাওয়াটাও অসম্ভব এই প্রকার ধারণা করা ঠিক নহে। কিছু সময়ের জন্য এই প্রকার জটিল আলোচনা বন্ধ রাখিয়া আমি বাকল্যাণ্ড বাঁধের ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা করিতে চাহি এবং যে সকল ঘটনা স্বীকার করা হইয়াছে এবং যে সকল ঘটনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিবে না বা যে সকল ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ আছে অথচ যে সকল ঘটনা সম্পর্কে সত্যতা সহজেই বুঝা যায় এই সকল ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।

জনসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা

বাদী তিন মাসের অধিক সময় বাকল্যাণ্ড বাঁধে ছিলেন, তথায় শত শত লোক তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাঁহার অঙ্গুলী, চুল এবং গলার স্বরের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

যাহারা আসিয়া বাদীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিত, শুধু তাহাদের সহিতই তিনি হিন্দিতে কথা বলিতেন। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী দেখিয়া লোক যেমন করিয়া থাকে, তেমনি সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট ঔষধ চাহিত এবং তিনি সময় সময় তাহাদিগকে কিছু ভস্ম দিয়া দিতেন। কখনও কাহাকে কবচ দেওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই। তিনি বরঞ্চ অধিক ক্ষেত্রেই আশীষ দিয়া থাকিতেন।

সন্ন্যাস বেশে কুমার

অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ দেবব্রতবাবুর সহিত রাজপরিবারের পরিচয় ছিল না এবং তিনি কুমারদিগকে চিনিতেন না। বাদী-পক্ষে এমন ২১ জন সাক্ষ্য দিয়াছে, যাহারা বলিয়াছে যে তাহারা কুমারকে চিনিত এবং আলোচ্য সময়ে বাদীকে বাক-ল্যাণ্ড বাঁধের উপর দেখিয়াছিল। বিবাদীপক্ষের যুক্তি এই যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীকে কেহ চিনিতে পারে নাই বা তাঁহাকে কেহ দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহও করে নাই। বিবাদীপক্ষে আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে জয়দেবপুরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদী তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া ঘোষণা না করা পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে মধ্যম কুমার বলে নাই বা সেরূপ কেহ সন্দেহ করে নাই। তাঁহার চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক রকমের ছিল এবং তিনি বাংলা একটী কথাও বুঝিতেন না বা বলিতে পারিতেন না। তিনি বিড় বিড় করিয়া এমন অবোধ্য কিছু বলিতেন যাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। এই মামলায়

বাকল্যাণ্ড বাঁধের ঘটনা সম্পর্কে বাদীপক্ষের ৩২৬, ৩৫৮, ৪৩৭, ৪৭২, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৯৯, ৬৩৫, ৬৩৪, ৬৬৬, ৬৮৩, ৭৭৯, ৮৫৮, ৮৮৮, ৮৯৩, এবং ৯১৯নং সাক্ষী বলিয়াছে যে, বাদীকে দেখিয়া তাহাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইনিই দ্বিতীয় কুমার কি না এই চিন্তা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিয়াছিল। কোন কোন সাক্ষীর মনে অবশ্য এই চিন্তার উদয় হয় নাই; কিন্তু মনে হয় সে সকল সাক্ষী কুমারকে খুব ভালভাবে চিনিত না। তাহারা হয়ত রাস্তায় বা ঘটনাচক্রে অন্য কোথাও কুমারকে কদাচিৎ দেখিয়া থাকিবে। আর বাকী সকল সাক্ষী যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। তাহারা দ্বিতীয় কুমারকে মুখ দেখিয়া চিনিত এবং বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীকে দেখিয়া তাহাদের অনেকের মনেই ইহাকে কুমার বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা ঠিক তখন চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। বাকল্যাণ্ড বাঁধে থাকিবার সময় বাদীকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকিলেও কুমারের সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু প্রমাণ হয় না। তবে তাঁহাকে যে কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল এ কথা কেবল বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই. বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নবাব এষ্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ মেয়ার বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর অবস্থিত ওয়াইজ হাউসে বাস করিতেন, বিবাদীপক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধে এই সাধুকে তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন। একটি কারণে সাধুর প্রতি তিনি

বিশেষ নজর রাখিতেন। সেই কারণটি হইতেছে এই যে, তাঁহাকে আসিয়া একজন বলিয়াছিল যে, এই সাধু নিজেকে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া বলিতেছে। মিঃ মেয়ার বলিয়াছেন, "এই কথা শুনিবার পর আমি যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে বা অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতাম, তখন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুসন্ধান করিতাম এবং আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সে একজন প্রতারক।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতে-ছিলেন. তখনই তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছিল। যে সকল সাক্ষী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছে এবং বাদী যাহা বলিয়াছেন তাহাই তাহাদের উক্তিতে সমর্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাদীপক্ষ বাকল্যাণ্ড বাঁধ সম্পর্কিত ব্যাপার লইয় আদালতে তুমুলভাবে লড়িবার ফলেও একমাত্র দেবব্রতবা ছাড়া ঢাকা হইতে এমন একজন সাক্ষীকে আনিতে পারে নাই যে ব্যক্তি বাদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছে। বাদী কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখান নাই; আর তা ছাড় দেবব্রতবাবুও কুমারকে চিনিতেন না। ঢাকায় কুমারকে লই যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা শত শত ঢাকাবাসী অবশ্যই মনে আছে; কিন্তু বিবাদীপক্ষ ঐ বিষয়ে সতীশ মি (বিবাদীপক্ষের ১২৪নং সাক্ষী) নামে এক ব্যক্তি ভিন্ন দ্বিতী সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিলেন না। তাহার বাড়ীও আব ঢাকায় নহে। তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়া আমার সন্দেহ

যে, সে কুমারকে আদৌ চিনিত কি না অথবা বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধে দেখিয়াছিল কি না ?

বুদ্ধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ

একদিন বুদ্ধবাবু, শ্রীযুক্ত রমেশ চৌধুরী এবং ভলুবাবু ওরফে অতুলপ্রসাদকে (কাশিমপুর) লইয়া বাদীকে দেখিতে যান ; কিন্তু তাঁহাকে তাঁহারা ঠিক চিনিতে পারেন না ; কিন্তু অতুল বাবু বলেন যে, বাদীকে দ্বিতীয় কুমারের মত দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে রাজপরিবারের আর কেহ বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধে দেখিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। এই কথা বিবাদীপক্ষ স্বীকার করেন না। বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীকে দেখিয়া কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল—এই কথা সত্য হইলে, ইহাতে বাদীর সাদৃশ্য প্রমাণে অবশ্য কিছু সুবিধা হয় না, কিন্তু তিনি জীবিত বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল এবং তাঁহার চেহারার যে মিল আছে—ইহা প্রমাণে উহা যথেষ্ট সাহায্য করে। যাহারা একজন প্রতারকের মুখোস খুলিয়া দিতে চায়; আমার মনে হয়, তাহারা বাদী ও কুমারের চেহারার মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে এবং যে গুজব রটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে পারে যে, বাদী কুমার নহেন কিন্তু বিবাদীপক্ষ এই দুইটির কোনটিই স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সাক্ষীর পর সাক্ষী আনিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, কোন গুজব রটে নাই এবং বাদী ও কুমারের চেহারায় এত পার্থক্য আছে যে,

পারিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আদালতে ডাকা হয় নাই এবং মামলা যখন শেষ হয়, তখন ঐ জবানবন্দী দাখিল করা হয় এবং প্রশ্ন উঠে যে, তাঁহার প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে কি না। এক ব্যক্তি সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া বলে যে, সে একজন ডাক্তার। অতুলবাবু পীড়িত হওয়ায় কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। পরে দেখা যায় যে, ঐ ডাক্তার অতুলপ্রসাদের একজন গোমস্তা। কিন্তু অতুলবাবু যে এলাকার বাহিরে চলিয়া যান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, অতুলবাবু পলায়ন করিয়া তাঁহার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য করেন। পলায়ন করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ ছিল। বাদীর চেহারার সহিত মেজকুমারের চেহারার সাদৃশ্য আছে কি না, তৎসম্পর্কে বিবাদীপক্ষে যে ১০ জন সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছে, অতুলবাবু তাহাদের অন্যতম। তাহাদের সকলেরই বাড়ী ঢাকা জেলায়। ঐ সময় কোন কোন বিষয়ে কমিশন সাক্ষিগণ যে সব কথা বলিয়াছেন মামলা আরম্ভ হইবার পর মামলার ক্ষতি না করিয়া কিছুতেই তাঁহাদের ঐ সব উক্তি সমর্থন করিবার উপায় ছিল না। এই অতুলপ্রসাদ, বাদী ও মেজকুমারের চেহারার মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে, তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য এই দেখান হইয়াছে যে, কুমারের চুল কটা ছিল, কিন্তু বাদীর চুল কাল; কিন্তু বাদীর চুল কালো নহে, কটা বটে। কালো হওয়া দূরের কথা—এমন কি, মিঃ লিণ্ডসে ১৯২১ সালের মে মাসে বাদীর সুন্দর গায়ের চামড়া এবং সোনালী কটা চুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অতুলবাবুর কালো চুলের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লাহোরের দশজন সাক্ষীও বলিয়াছেন যে, মালসিংহের চুল—বাদীকে উজলার মালসিংহ বলা হইয়াছে—কালে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী এই কালো'র কাহিনী বাঁচাইবার পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টার পর যে সম্পর্কে তিনি অনেক সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন—বলেন যে, মেজকুমারের সহিত বাদীর চুলের মিল ভিন্ন আর কোন মিল নাই। অতুলবাবু আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার এই 'কালো' রংয়ের কাহিনীর কথা বলিতে পারেন নাই। ইহা একটী দৃষ্টান্ত মাত্র; কিন্তু কমিশন সাক্ষ্য দ্বারা ইহা বেশ ধরা যাইতেছে যে, সাক্ষীদের উক্তিতে এমন অনেক বিষয়ই আছে, যাহা তাহাদের পরবর্ত্তী চিন্তার ফল—বিশেষ করিয়া এই সাক্ষীর অতুলবাবুর) প্রায় প্রত্যেক উক্তিতেই সুস্পষ্ট-ভাবে মিথ্যার ছাপ রহিয়াছে। এই সম্পর্কে যখন আমি আলোচনা করিব, তখন ইহা আমি দেখাইব, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সম্পর্কে তিনি (অতুলপ্রসাদ) স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনিই সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া পাঠান। যে কর্ম্মচারী বাদীকে কাশিমপুর লইয়া যায়, তাহাকে হাজির করা হয় নাই। অতুলবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে জয়দেবপুর পাঠান; তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী গিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের মে মাসে বাদী তথায় বাস করিতে ছিলেন; তিনি স্বীকার করেন যে, বাদী ঢাকায় যে বাড়ীতে আসিয়া-ছিলেন, তিনি তথায় গিয়াছিলেন। বাদী আরও পরে এই বাসায় আসিয়া থাকেন। তিনি এই বাড়ীতে এত বেশী

যাতায়াত করিতেছিলেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী ঢাকার একজন উকীল তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট বাদীকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি কেন সাধুর জন্য এত বেশী ঘুরাফিরা করিতেছেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, সাধু কুমার স্বয়ং (বাদীপক্ষের ১০৩২নং সাক্ষী ভুবনমোহন পালিত) বাদী যখন কাশিমপুর যান তখন কাশিমপুর রাজপরিবারের কর্ত্তা সারদাবাবু তথায় ছিলেন। বাদী তাঁহার নামে সমন দেওয়া সত্ত্বেও তিনি হাজির হন না; বিবাদীপক্ষও তাঁহাকে হাজির করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু অতুলবাবুর শ্যালক উকীল বীরেন্দ্র বসু দরখাস্তদ্বারা বাদীপক্ষ ত্যাগ করিয়া নীরবে বিবাদীপক্ষে চলিয়া যান এবং মিঃ চৌধুরীর জুনিয়রদের সহিত যাইয়া বসেন। পরে সওয়ালের সময় দেখা যায় যে, ঐ উকীলটী ওকালতনামাই দাখিল করেন নাই। আমি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, এই অতুলবাবু বাকল্যাণ্ড বাঁধে সাধুকে দেখিতে আসেন এবং তিনি সাধুকে কাশিমপুর লইয়া যান ও পরে তিনিই ঢাকা হইতে তাঁহাকে জয়দেবপুর লইয়া যান। ১৯০১ সালে ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ নীডহাম তাঁহার রিপোর্টে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বাদীপক্ষের ৬৬৬নং সাক্ষী হেমেন্দ্র বাবু চৈত্র মাসের কোন একদিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় তিনি (অতুলবাবু) সাধুকে বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে লইয়া যাইতেছেন দেখিতে পান।

এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কাহিনী এবং এই সন্ন্যাসী পরিবর্ত্তনের কথা (যাহার ফলে বাদীকে জয়দেবপুর আনা) এত অসম্ভব

যে বিবাদীপক্ষ মামলা আরম্ভ করিবার পর আর এক কাহিনী সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। রায় সাহেব যোগেন্দ্র—যিনি ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে বিবাদীপক্ষের কর্ম্মচারী ছিলেন, এই মামলায় প্রধান তদ্বিরকারক। ইহার পুত্র বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের উপর আক্রমণ করায় তাঁহাকে ডিস্‌মিস্‌ করা হয়। তিনি যাহাতে পুনর্ব্বহাল হইতে পারেন, তজ্জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাহা এখনও মুলতুবী আছে। তিনি এই মামলা সম্পর্কে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক তদ্বির করিয়াছেন, আমি নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিব।

এই সাক্ষীটি (যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী) আসিয়া বলেন, তিনি বাদীকে বারুণী মেলার দিন কাশিমপুর যাইবার রাস্তায় হস্তীপৃষ্ঠে দেখেন এবং তাঁহার সঙ্গে সাব-ডেপুটী কালেক্টর মিঃ তমসারঞ্জন (মৃত) এবং কাশিমপুরের একজন কর্ম্মচারী (তাহাকে ডাকা হয় নাই) ছিলেন। মিঃ তমসারঞ্জন তাঁহাকে বলেন যে, সাধুকে যজ্ঞ করাইবার জন্য এবং সারদাবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। তিনি (যোগেনবাবু) সাধুকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দিতে বলেন। বাদীকে চিনিতে পারেন নাই, ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কুমারের ভাগিনেয় বুদ্ধু তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাদীকে এই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এই তদ্বিরকারকের বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলীদিগকে এই সব কথা বলিবার খেয়াল পূর্ব্বে হয় নাই। আমি ইহার একটী কথাও বিশ্বাস করি না। আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, অতুলবাবু

বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে লইয়া যান, বাদীপক্ষের এই উক্তি সত্য। কাশিমপুরে কি হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে বিতর্ক আছে। একদিকে বাদীর সাক্ষ্য এবং অপরদিকে অতুল বাবুর সাক্ষ্য ; কারণ এই সম্পর্কে মাত্র আর একজন সাক্ষী আছেন (বাদীপক্ষের ৮৫৭নং সাক্ষী) এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, তৎসম্পর্কে সন্দেহ আছে। এই সাক্ষীর উক্তিদ্বারা কাশিমপুরে বাদীকে যে কেহ চিনিতে পারিয়াছিল তাহা মনে হয় না। কারণ দেখা যায় যে, বাদী সারদাবাবুর সহিত সাক্ষাতের পর কাশিমপুরেও একটী গাছতলায় বাস করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার্য্য যে, বাদীকে কাশিমপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তথা হইতে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই, ততক্ষণ এই সাক্ষীর উক্তির উপর কিছু নির্ভর করে না। যে কারণে মিঃ মায়ার বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীর চেহারা বিশেষভাবে লক্ষ করেন, সেই কারণেই বাদীকে কাশিমপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং পরে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাশিমপুরে অতুলবাবু বাদীকে দিয়া কতকগুলি স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদী নানা প্রকার অবোধ্য হিন্দীতে কথা বলিতেছিলেন এবং তাহার অনুবাদ করিয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, বাদী তথায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ জানেন না, তাঁহার গুরু ধরমদাস ও তাঁহার বাড়ী পাঞ্জাবে এবং তাঁহার নাম সুন্দরদাস। বাদীর

এই সব উক্তি সমস্তই সত্য। বাদীকে এই সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করা হয় নাই। ১৯২১ সালের জুন মাসে পাঞ্জাবে তদন্তের পর সুন্দরদাসের নাম বাদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। যে কারণে বিবাদীপক্ষ, বাদী পাঞ্চাবী ইহার অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। বাদী সুন্দরদাস অথবা মাল সিং বর্ণনাতে তাহার উল্লেখ নাই—যদিও বাদী উজলার মাল সিং এবং দীক্ষা গ্রহণের পর সুন্দরদাস নামে পরিচিত—ইহা পরে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাদী বাকল্যাণ্ড বাঁধে হিন্দীতে কথা বলেন—যে হিন্দীতে কথা দেবব্রতবাবু বলিয়াছেন এবং এমন বহু প্রমাণ রহিয়াছে যে, ১৯২১ সালের মে মাসে বাদী তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবার পর—কাশিমপুর হইতে আগমনের প্রায় একমাস পর—তিনি বাঙ্গলাতে কথা বলিতে আরম্ভ করেন। এই সব প্রমাণ পরীক্ষা করা দরকার। বাদী একজন পাঞ্জাবী অথবা হিন্দুস্থানী মাল সিং অথবা সুন্দর সিং, এই সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে। কিন্তু এই সাক্ষী দ্বারা বাদীর যে সব স্বীকারোক্তির প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কোন কাজেই লাগিবে না। কারণ তাহার সাক্ষ্যের উপর ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যদি ঐ সাক্ষী এপ্রিল মাসে সুন্দরদাসের নাম জানিতেন এবং আত্মপরিচয় প্রকাশের পর মে মাসে জয়দেবপুর আসিয়া বাদীকে প্রতারক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিতেন এবং রায় সাহেব এবং অন্যান্য যে সব কর্ম্মচারী ঐ সময় বাদীর বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অতিশয় ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সুন্দরদাসের নাম আগুনের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত এবং পাঞ্জাবের সুদূর পল্লীতে অনুসন্ধানের পর ১৯২১ সালের ১৭শে জুন ঐ রিপোর্টে সুন্দরদাসের নাম প্রথম দেখা যাইত না।

আমি ইহাই সাব্যস্ত করিতেছি যে, বাদী অনুমান ৫ই এপ্রিল কশিমপুর যান এবং অতুলবাবু তাঁহাকে তথায় লইয়া যান এবং বাংলা ১৩২৭ সনের ৩০শে চৈত্র (১৯২১ সনের ১২ই এপ্রিল) তাঁহাকে হস্তীপৃষ্ঠে জয়দেবপুর আনা হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, বাদী ৩১শে চৈত্র জয়দেবপুর যান; তারিখের এই সামান্য গরমিল কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে আমি দেখাইব; কিন্তু ইহা স্বীকৃত যে, যেদিন বাদী জয়দেবপুর পৌঁছেন, সেদিন ৩০শে চৈত্র অথবা ৩১শে চৈত্র হউক—তিনি সন্ধ্যা ৬টার সময় তথায় পৌঁছেন। তিনি রাজবাড়ীতে অবতরণ করেন এবং মাধববাড়ীর কামিনী বৃক্ষের নিম্নে পোস্তার উপর বসেন। মাধববাড়ী রাজবাড়ীর ভিতরকার ঠাকুরবাড়ী। বাদী তখনও ভস্মমাখা জটাধারী ন্যাংটা সাধু। তাঁহার সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল, চিমটা ও কমণ্ডলু ছিল। রায়সাহেব যোগেন্দ্র ও মোহিনীবাবু এই কাহিনী বর্ণনা করেন। বাদীর আগমনের দিনই তাঁহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের উক্তি মিথ্যা ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, সাধু ঐ দিন রাত্রিতে

পরদিন এবং তার পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে ছিলেন। এই রাত্রে ঠিক কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে দুইটি বিষয় ব্যতীত গুরুতর বিতর্ক রহিয়াছে।

বাদীর এইবারের জয়দেবপুর আগমন সম্পর্কে কমিশন সাক্ষী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী (৭০), কুলদাসুন্দরী দেবী, বাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী রামকানাই শ্রীল, বাদীপক্ষের ৮৫২নং সাক্ষী লাল-মোহন গোস্বামী, বাদীপক্ষের ৯২২নং সাক্ষী সতীশ রায়, ৯৩৭নং সাক্ষী অবিনাশ মুখার্জ্জি, বিল্লুবাবু, বাদীপক্ষের ৯৫৮নং সাক্ষী প্রফুল্লকুমার মুখুটী, ৯৭৩নং সাক্ষী সীতানাথ মুখার্জ্জি এবং ৯৭৭নং সাক্ষী সাগরবাবু সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এই সব সাক্ষীদের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। মোক্ষদা-সুন্দরী চণ্ডী নিয়োগীর বিধবা পত্নী। চণ্ডী নিয়োগী এই এষ্টেটের নায়েব ছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। তিনি জয়দেবপুরেই থাকিতেন। তাঁহার স্বামী ডিহিতে গেলে তখন তিনি তাঁহার স্বামীর সঙ্গে যাইতেন। তিনি কুমারের মাতা বিলাসমণির সহিত প্রতিবেশিনী হিসাবে মেলামেশা করিতেন। কুলদাসুন্দরী রাজা রাজেন্দ্রের জ্ঞাতি ভাই প্রসন্ন ব্যানার্জ্জির বিধবা পত্নী প্রসন্নবাবু রাণী সত্যভামার (রাজার মাতা) এক ভগ্নীর পুত্র। এই প্রসন্নবাবুর নাম অনেকস্থলে উল্লেখ আছে। প্রসন্ন (ডাক নাম নিক্কা) নামক অপর এক ব্যক্তির নামের সহিত যাহাতে গোলমাল না হয়, এই জন্য তাহাকে জংবাহাদুর ডাকা হইত। এই মহিলা তাহার বিবাহের পর হইতে (১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়) সারাজীবন জয়দেবপুরেই বাস

করিতেছেন। তাহার বাড়ী রাজবাড়ীর সংলগ্ন উত্তরদিকে। তিনি ইন্দুময়ী ও অপরাপর শিশুদিগকে স্তন্য পান করাইয়াছেন। তাহার স্বামীকে যে জমিদান করা হইয়াছিল, তিনি এখনও সেই জমি ভোগ করেন। এই দুইজন মহিলা এবং একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর বিধবা পত্নী অনন্তকুমারীর কমিশনে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রামকানাই শীল (৭১) রাজ-পরিবারের নাপিত। রাজবাড়ী হইতে ৫ মিনিটের রাস্তা দূরে সে বাস করে। লালমোহন গোস্বামী রাণী সত্যভামার ভ্রাতুষ্পুত্র; সতীশ রায়, দিগিন্দ্র ঘোষের (হারবাইদের) একজন কর্ম্মচারী এবং বাদীপক্ষের একজন সমর্থক। অবিনাশ মুখার্জ্জি পূর্ব্বে ভাওয়াল এষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং পরে রাণী সত্যভামার (তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত) কেরাণী ছিলেন।

বাদীপক্ষের ৯৬৮নং সাক্ষী বিল্লু ইন্দুময়ীদেবীর পত্র।

বাদীপক্ষের ৯৫৮নং সাক্ষী প্রফুল্ল মুখুটী জয়দেবপুর রাজ-পরিবারের প্রতিবেশী ও বর্ত্তমান বাদীর একজন কর্ম্মচারী।

কুমারদের বৃদ্ধ গৃহ-শিক্ষক দ্বারিকের পুত্র সীতানাথ মুখর্জ্জি ১৯২৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এষ্টেটে চাকুরী করিয়াছে। ঐ সময় তাহাকে কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলার জন্য ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। (একজিবিট জেড্ ৫৭) ১৯২২ সালে একটি মামলায় বাদী নিজের যে পরিচয় দাবী করেন, সীতানাথ তখন বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল। সে তখন চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল।

বাদীপক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী সাগরবাবু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা।

তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ঃ—

সাধু ৩০শে চৈত্র (১২।৪।২১) তারিখে আসিয়াছিলেন। রাধিকা (বাদীপক্ষের ৮৫২নং সাক্ষী) ব্যতীত বাদীপক্ষের অপর কোন সাক্ষী ঐ দিন তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি প্রায় অপরাহ্ণ ৬টার সময় আসিয়াছিলেন। যেদিন বাদী আসিয়াছিলেন সেইদিনের একমাত্র এই বিবরণ পাওয়া যায় যে, (সে বিবরণের সহিত রাধিকার প্রদত্ত বিবরণের বিশেষ অমিল নাই) বাদী কামিনী গাছের নীচে বসিয়াছিলেন। তাঁহার লেংটি পরা ছিল এবং সর্ব্বশরীরে ছাই মাখা ছিল। রাধিকা বলিয়াছে যে, ঐ দিন বাদী সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন (বাদীর আগমনের যে সময় মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ সময়ের মিল আছে)। সে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল এবং তাঁহার হাত ও পা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, তিনি কুমার। বাকল্যাণ্ড বাঁধে মিঃ মায়ারের আচরণও অনেকটা এইরূপ। লালমোহন এই দিন সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহা চৈত্র-সংক্রান্তির ২।৩ দিন পূর্ব্বে। কিন্তু তিনি পরের দুই দিনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি তাঁহার আগমনের দিনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। পরের দিন ৩১শে সাগরবাবু ৩১শে তারিখের কথা বলিয়াছেন। উহা আপাততঃ মানিয়া লওয়া যাউক। ঐ দিন কি ঘটিয়াছিল সাগরবাবুর কথা হইতে তাহা দেখা যাউক।

প্রাতে সাগরবাবু তাঁহার ভ্রাতা রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য রাজবাড়ীতে যান। রায় সাহেবের বাসা রাজ-বাড়ীতে ছিল এবং কুমারের মাতুল বসন্তবাবু ব্যতীত তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঐ বাড়ীর একমাত্র বাসিন্দা ছিলেন। কুমারের মাতুল এখনও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের লাইসেন্সী হিসাবে সেখানে বাস করিতেছেন। কেহ বলে নাই যে তিনি ঐ সময়ে ঐ খানে বাস করিতেছিলেন। কোন ঘটনা সম্পর্কেও কেহ তাহার উল্লেখ করে নাই। যাহা হউক, সাগরবাবু তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা যোগেনবাবু বলিলেন যে, কাশিমপুর হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। লোকেরা তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। চল তাহাকে দেখিয়া আসা যাক্। তাঁহারা দুইজনেই গোল বারান্দায় (রাজ বিলাসের দক্ষিণ দিকের বারান্দার পূর্ব্বাংশ) যান এবং সেখানে সাধুকে উপবিষ্ট দেখিতে পান। তখন বেলা ৮টা।

"সাধু বসিয়াছিলেন। তাঁহার কোঁকড়ানো পিঙ্গলবর্ণ চুল হাঁটু পর্যান্ত পড়িয়াছিল। তাঁহার মুখে দাড়ী ও সর্ব্বশরীরে ভস্ম মাখা ছিল। তাঁহার দিকে মুখ করিয়া আমরা যখন দাঁড়াইয়া-ছিলাম তখন তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার চোখের রং দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার রং কটা ছিল। আমি তাঁহার শরীরের গঠন, বসিবার ভঙ্গী এবং তাহার চাইবার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, তিনি দ্বিতীয় কুমার। আমার সন্দেহের কথা

আমি যোগেনবাবুকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, ব্যাপারটা গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার কি মনে হয়। তিনি বলেন—"সোরগোল করিও না। অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে আরও দেখা যাক্।"

গোল বারান্দাতে এই কথাবার্ত্তা হয়। সাধু সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি সেখানে থাকিতে থাকিতেই বুদ্ধু ঐখানে আসেন।

আমার সম্মুখে বুদ্ধুবাবুর সহিত আমার ভ্রাতার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহারা একটি ঘরের ভিতরে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

অতঃপর বুদ্ধু চলিয়া গেলেন; কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার মাতা সাধুকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহেন। সাধুকে এ কথা বলা হইলে তিনি উত্তর দেন, এখন নয়, বৈকাল বেলায় যাইব। ইহার পর সাগরবাবু ও যোগেনবাবু আহার করিতে যান, ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখেন যে, সাধু তখনও সেখানে আছেন। আমি যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম ততই আমার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। যোগেন্দ্র বাবুও সেখানে ছিলেন তিনি এবং আমি প্রায় ৫টা কি ৫॥টা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম এই সময় বুদ্ধুবাবু আসিয়া তাঁহার গাড়ীতে করিয়া সাধুকে লইয়া গেলেন।

এই যে বিবরণ, ইহার সহিত লালমোহনের সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য আছে। লালমোহন বলেন যে, ঐ দিবস সূর্য্যোদয়ের সময় তিনি সাধুকে রাজবাড়ীর দিকে যাইতে দেখেন, গোল বারান্দায়

আরোহণ করিতে দেখেন এবং গায়ে ভস্ম মাখিতে দেখেন। লালমোহন আরও বলেন যে, মধ্যাহ্নকালে তিনি সাধুকে মাধব-বাড়ীতে দেখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ প্রদোষকালে সাধুকে দেখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সাক্ষীর উক্তির সহিত বর্ণিত কাহিনীর কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে প্রদোষকালে মাধববাড়ীতে সাধুকে দেখার যে কথা, তাহার সহিত বর্ণিত ঘটনার মিল নাই; কারণ সেই সময়ে বুদ্ধবাবু আসিয়া সাধুকে লইয়া গিয়াছিলেন। একটা স্বীকৃত তথ্যের সহিত সাগরবাবুর সাক্ষ্যেও মিল হয় না। সেই দিন—অর্থাৎ আগমনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে বাদী সরকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে গমন করেন। ইহা একটা সর্ব্বসম্মত ভিত্তি। ইহার সহিত যে বর্ণনার মিল নাই, তাহা গ্রহণ করা যায় না। সীতানাথ বলেন, তিনি সেদিন বাদীকে সহকারী ম্যানেজারের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডায়েরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, সেদিনের তারিখ ছিল ১৩।৪।২১ ইংরাজী এবং বাঙ্গলা ৩১শে চৈত্র। সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুও বলেন, বাদী সেদিন বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, ইহাও সর্ব্বসম্মত একটা ভিত্তি। সাক্ষী সতীশ রায়ের মতে, তথা হইতেই সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

বাদী ও জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষাৎ

একটা বিষয় অতি পরিষ্কার যে, আন্দাজ ৫টার সময় সাধু মাধববাড়ী হইতে কয়েক মিনিটের পথ দূরে সহকারী

ম্যানেজারের বাড়ীতে ছিলেন সহকারী ম্যানাজারের কথায় দেখা যায়, তাহাব পর তিনি মাধববাড়ীতে গিয়াছিমেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে গোল বারান্দায় এক চা-পাটিতে আনা হইয়াছিল ; তথায় তিনি কয়েকটী কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সাক্ষী, রায় সাহেব যোগেন্দ্র এবং ফণী বাবু (বিবাদীপক্ষের ৯২ নং সাক্ষী) এবং অপর তিন জন সাক্ষীর কথা আমি বলিব ; ইঁহারা সকলেই এই চা-পার্টির কথা সমর্থন করিয়াছেন। ১লা বৈশাখ বাঙ্গলা নববর্ষ উপলক্ষে এই চা-পার্টিব আয়োজন করা হইয়াছিল ; বাদীপক্ষের সাক্ষ্য এই যে, সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর বাড়ী হইতে বুদ্ধু বাবু কর্ত্তৃক বাদী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নীত হইয়াছিলেন। সেখানেই জ্যোতির্ম্ময়ীদেবীও বাদীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই শেষোক্ত ব্যাপারটিই সত্য ; কয়েকটী তথ্য দ্বারা চা-পার্টির কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারাই এই চা-পার্টির কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাই একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ পরীক্ষা করিলেই সত্য কথাটী প্রতিভাত হইবে ঃ—

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,—তিনি কোন বিষয় শুনিয়া সাধুকে আনিতে পাঠান। সাধুকে আনিবার জন্য তিনি টমটম লইয়া বাহির হন ; কিন্তু একাকী ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী আসেন। ইহা চৈত্র মাসের শেষ দিবসের কথা। তিনি দেখেন যে, তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় একখানি মাতুরের উপর সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকটে তাঁহার কন্যা, পিতামহী সত্যভামা দেবী, তাঁহার মৃতা ভগিনী ইন্দুময়ী

দেবীর তিন পুত্র এবং স্বামী গোবিন্দবাবু বসিয়াছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, তিন ভগিনীর বাড়ীই চক্করে পাশাপাশি জায়গায় অবস্থিত। পশ্চিমে অবস্থিত বাড়ীটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পূর্ব্বে অবস্থিত বাড়ীটি ইন্দুময়ীর এবং মধ্যস্থিত বাড়ীটি কনিষ্ঠা ভগিনীর তিনি এই সময়ে বাড়ী ছিলেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর দেয়াল কাদা মাটির, চালা ঢেউটিনের এবং একটা উঠান আছে। পরে এই বাড়ীর সম্পূর্ণ বর্ণনার প্রয়োজন হইবে। ইহা দক্ষিণ মুন্সী বাড়ী এবং রাজবাড়ী হইতে পোয়া মাইল দূরে অবস্থিত।

সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্ত্তা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাহিরে আসিয়া তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণ বারান্দায় সন্ন্যাসীকে একটা মাদুরের উপর আসীন দেখিতে পাইলেন এবং সমগ্র পরিবারই সন্ন্যাসীর চারিপাশে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলেন,—সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া এক পাশে দৃষ্টি দিয়া বহুদূর পর্যন্ত্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মেজকুমার যেভাবে লোকের দিকে চাহিতেন, তাহাই আমার মনে হইতে লাগিল। ইহাতে আমার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল। আমি অভিনিবেশ সহকারে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম—তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঠোঁট, হাতের আঙ্গুল, হাত, পা এবং মুখমণ্ডলের রেখাসমূহ—সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। আমার ন্যায় তাঁহাদের মনেও সন্দেহ জাগিল। তখন অন্ধকাব হইয়া গিয়াছিল। অতএব আমরা তাঁহাব চক্ষের বর্ণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। হিন্দী-ভাষায় তাঁহার সহিত কিছু কথাবার্ত্তা হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুম কই রোজ হিয়া রহেঙ্গা?"

তিনি বলিলেন—"হ্যাম কাল ব্রহ্মপুত্র স্নানমে চলা যায়েঙ্গা নাঙ্গলবন্ধ।

আমি তাহাকে কিছু ফল এবং দুধেব সব খাইতে দিলাম। তিনি কিছু সব খাইলেন; আব কিছুই খাইলেন না। খাওয়াব পর সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

আমি তাঁহাব গতিভঙ্গী লক্ষ্য কবিলাম;—দ্বিতীয় কুমাবের গতিভঙ্গীব সহিত মিলিয়া গেল। আমি তাঁহাব দেহের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করিলাম; মনে হইল যেন একটুখানি সবল হইয়াছে এবং কিছুটা বাড়িয়াছে; ১৯ ও ২০ বৈষম্য হইয়াছে। তাঁহার মুখে সেদিন ভস্মমাখা ছিল।

তিনি চলিয়া গেলে আমরা সন্ন্যাসীর বিষয়ে আলোচনা কবিলাম এবং স্থির করিলাম যে, পর দিবস তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইব। এই সুযোগে দিবালোকে আব একবার তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লইব। সেই রাত্রিতেই আমার কর্ম্মচারী যতীন ভট্টাচার্য্যকে আমি তাঁহার নিকট পাঠাইলাম এবং আমার বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কোন কথা বলিলেন না।

বাদী সন্ন্যাসী—

জয়দেবপুরে দাড়ি কামাইবার পর

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদী

মধ্যাহ্ন প্রায় ১২টার সময় সাধু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আসিলেন। এই পথে আসিবার শেষ দিন যে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, সাধু ভাওয়াল এষ্টেটের একখানি গাড়ীতে চড়িয়া সেখানে আসেন। তাঁহার সঙ্গে রায় সাহেব যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রাম ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্রের বৈঠকখানায় একখানি চেয়ারে সন্ন্যাসী বসেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ভগ্নীপতি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় একখানি চৌকির পাশে বসেন। সাক্ষী (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী) সত্যভামা দেবী চেয়ারে বসেন এবং বাকী সকলে দাঁড়াইয়া থাকে।

সাক্ষী বলেন, আমার পিতামহীকে চৌকির উপর উঠিয়া বসিবার জন্য সন্ন্যাসী হিন্দীতে বলেন। তিনি উঠিয়া চৌকির একধারে বসিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'ওঠকে বৈঠ' (উঠে বস) তিনি উঠিয়া সন্ন্যাসীর মুখামুখী হইয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আমার পিতামহীকে আরও কাছে যাইতে বলিলেন এবং তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নিজের সামনে টানিয়া লইলেন। ইহার পর তিনি বলিলেন :—

"বুড়ীকা বড় দুঃখ হৈ (বৃদ্ধার বড় দুঃখ) ইহার পর সন্ন্যাসী আমার দুই কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, এই তোমারা দোনো বেটি হৈ (ইহারা বুঝি তোমার দুই কন্যা?) এবং আমার

পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, এই বুঝি তোমার পুত্র? এবং আমার ভগ্নীর ছেলেদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, ইহারা তোমার বোনের ছেলে? এবং আমার ভগ্নীর কন্যা কেনিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এ কোন হৈ (এ কে)?' আমি বলিলাম, "সে আমার বড় বোনের মেয়ে।" আমি এই কথা বলামাত্রই সন্ন্যাসীর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অশ্রুতে তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। কেনি তখন বিধবা হইয়াছিল।

"বাদীকে কাঁদিতে দেখিয়া ইন্দুময়ীর পুত্র টেব্বু তখন তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয় কুমারের একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল। বাদীর ক্রন্দন যখন একটু থামিয়াছিল, ঠিক তখনই টেব্বু ফটোখানি তুলিয়া ধরিয়াছিল। বাদী তাহা দেখিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিল। টেব্বু তাঁহাকে ছোটকুমারের একখানি ফটোও দেখাইল। সেখানি দেখিয়া বাদী আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল এবং হাত দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। রাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। রাম কিছু বলিল। দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বেই কুমারকে সে খুব ভালভাবে চিনিত, সে বলিল; "ইনি যে দ্বিতীয় কুমার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহাকে যাইতে দিওনা দিদিমা।" বাদীকে কাঁদিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তুম তো ত্যাগী হৈ, তুম এতনা রোতে কিসিকা ওয়াস্তে? (তুমি একজন যোগী। এত কাঁদিতেছ কেন?)

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "হাম মায়াসে রোতে হৈ" (আমি মায়ায় কাঁদিতেছি)

সাক্ষী—কিন্তু তুমি তো একজন সাধু। মায়া কার জন্য ?

সন্ন্যাসী এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ইহার পর সাক্ষী হিন্দীতে বলিলেন,—

"আমি শুনি আমার দ্বিতীয় ভাই দার্জ্জিলিংয়ে মারা যায়। তাহাকে যখন দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়,—তখন নাকি তুমুল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সকলে তাহাকে সেখানে ফেলিয়া চলিয়া যায়। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আমার ভ্রাতার দেহ দেখিতে পায় না। দার্জ্জিলিং যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ বলে যে, কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলে, শব দাহ হয় নাই।

আমি আমার বক্তব্য শেষ না করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না—সে মিথ্যা কথা। তাহাকে পোড়ান হয় নাই, সে জীবিত আছে।"

ইহার পর সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকাইলেন। আমি দেখিলাম, আমার ভাইয়ের মতই তাঁহার কটাচক্ষু। আমি তখন তাঁহাকে বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার সমস্ত অবয়ব মেজভাইয়ের মত দেখি, তবে তুমি কি সেই ?

তিনি হিন্দীতে উত্তর করিলেন, না—না আমি তোমার কেহ নই।

তিনি বাঙ্গলা বুঝেন কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি তাঁহাকে বাঙ্গলায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি সেদিন আমার ওখানে আহার করিলেন। খাইবার সময় দেখিলাম, তাঁহার তর্জ্জনীটি আলগা থাকে এবং জিহ্বাটি কিছু বাহির হয়।

আমি তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার কণ্ঠমণি দেখিলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার চুলের রং রক্তাভ এবং কটা চক্ষু। আমি তাঁহার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, মুখের উপর কাটা দাগ এবং মুখাবয়ব—সবই বিশেষ নজর দিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার দাঁত দেখিলাম। সে-ও ঠিক দ্বিতীয় কুমারের দাঁতের মতই মিশান, মসৃণ ও সুন্দর। আমি তাঁহার হাত এবং প্রতিটি নখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার হাতের তালু এবং পিঠও নজর দিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার পা ও পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলও পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমার বেশ স্মরণে ছিল যে, আমার মেজ ভাইয়ের নখ এবং পায়ের আঙ্গুল কেমন ছিল। কি করিয়া ভুলিব—আমরা যে ছোটবেলা হইতে এক সঙ্গে থাকিয়াছি। তাঁহার সমস্ত দেহ—হাত, পা, মুখ এমন কি চোখের পাতাটী পর্য্যন্ত বিভূতিমণ্ডিত ছিল। তাঁহার চুল লম্বা ছিল। তখন তাঁহার মুখে দাড়ি ছিল। দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, তখন সে দাড়ি রাখিত না। আলোচ্যদিনে তাঁহার উচ্চারণ অস্পষ্ট ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় কুমারের মতই শুনাইতেছিল।

আর আর যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেদিন তাঁহারা সকলেই সাধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। কি আলাপ করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। তাঁহার খাওয়া হইলে, আমরা খাইতে বসি। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হইল, তখন বেলা অপরাহ্ণ ৩টা। অষ্টমীর স্নান উপলক্ষে ঢাকা যাইবার জন্য সন্ন্যাসী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সন্ন্যাসী যে

আমার সহোদর ভ্রাতা—এ ধারণা ক্রমেই আমার মনে বদ্ধমূল হয়। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আরও কয়েকদিন সন্ন্যাসীকে রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তাহাকে কয়েকদিন রাখিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল যে, তাহার গায়ে সেই সাবেক দাগগুলি আছে কি না। আমি তাহাকে বাঙ্গলা ভাষায়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"তুমি ঢাকায় যাইয়া কতদিন থাকিবে ?" সন্ন্যাসী বলিয়াছিল,—"সম্ভবতঃ দশদিন।" তারপর সন্ন্যাসী আমার ছেলের টমটমে চড়িয়া প্রস্থান করেন। চলিয়া যাইবার সময়, আমি আমার ছেলেকে গাড়ী চালাইতে দেখিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমার ছেলে আমাকে কি যেন কতকগুলি বলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী যে ঐ দিন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ছিল এবং অপরাহ্ণ ৪টার সময় সন্ন্যাসী ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই এ সম্বন্ধে কয়েকটী দলিল থাকার দরুণ (যথা মিঃ নিডহামের রিপোর্ট, ৫৯নং একজিবিট দ্রষ্টব্য), ইহা কোনক্রমেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ প্রসঙ্গ আমি অল্প পরেই আলোচনা করিব। বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য আরম্ভ হইবার পর, সে বিষয় তাঁহারা অস্বীকার করিতে থাকেন, তাহা এই যে,—সন্ন্যাসী ঐ দিনের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ, ৩১শে চৈত্র নহে, জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যান। এতদ্বারা বিবাদীপক্ষ ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সন্ন্যাসী ২রা বৈশাখ জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ছিলেন।

চন্দ্রনাথে বাদী

বাদী বলেন যে, তিনি জয়দেবপুর হইতে চট্টগ্রাম জেলাস্থ চন্দ্রনাথতীর্থে গমন করেন। তাঁহাকে বাদীপক্ষের ৬৪৫নং সাক্ষী অনাথবন্ধু বাঁড়ুয্যে তথায় দেখিয়াছেন, উক্ত সাক্ষী একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তথায় নিজ ব্যয়ে একটা পুল তৈরী করাইতেছিলেন, উহা দেখিবার জন্য তিনি তথায় গিয়াছিলেন। তিনি সাধুকে সীতাকুণ্ডেও দেখিয়াছেন, অতঃপর সাধু অদৃশ্য হইয়া যান। সাধু চন্দ্রনাথ হইতে পুনরায় বাকল্যাণ্ড বাঁধে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহা ২৫শে এপ্রিল বা তাহার কাছাকাছি একটা সময়। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে, একজন বলিয়াছেন যে, তিনি ঢাকার শৈবলিনী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিয়াছেন। শৈবলিনী দেবী পূর্ব্বোল্লিখিত ফণীবাবুর ভগ্নী। তিনি ঢাকাতে তাঁহার নিজ বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাকে এই বাড়ীটী তাঁহার মাতামহী স্বর্ণময়ী দিয়াছিলেন। যখন সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছিলেন, তখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার বাড়ীতে ছিলেন বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কেন সে বাড়ীতে ছিলেন, তাহার কারণ বলা হয় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ঢাকাতে কোন বাড়ী নাই। তিনি জয়দেবপুরেই থাকিতেন। এই সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,—

সন্ন্যাসী ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) জয়দেবপুর ত্যাগ করেন। তিনি তথায় ১০।১২ দিন ছিলেন. অতঃপর জ্যোতির্ম্ময়ী

দেবী তাঁহার পুত্র বুদ্ধ এবং কর্ম্মচারী জিতেনকে ঢাকাতে পাঠান, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পান না সুতরাং তিনি নিজেই ঢাকাতে আসেন এবং তাঁহার ভগ্নীপতি উকিল ব্রজবাবুর বাড়ীতে উঠেন। তাঁহার নিজের কোন বাসা নাই ব'লয়া তিনি তথায় উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভগ্নী মটরকে (তড়িণ্ময়ী দেবী) সন্ন্যাসী দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসীকে ব্রজবাবুর বাড়ীতে আনিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসীকে শৈবলিনীর বাড়ীতে আনিবার জন্য তাঁহার পুত্র বুদ্ধুকে বলেন, কালা, বুদ্ধু ও জিতেন সন্ন্যাসীকে শৈবলিনীর বাড়ীতে আনে। শৈবলিনী বিবাদীপক্ষে সাক্ষী দিয়াছেন। তিনি সবই স্বীকার করিয়াছেন, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কর্ম্মচারী জিতেনের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই।

শৈবলিনীর বাড়ীতে বাদী

ইহা সত্য যে, শৈবলিনীর পুত্র কালা এবং বুদ্ধ বাদীকে বাদীকে সন্ধ্যার পর শৈবলিনীর বাড়ীতে আনিয়াছিল। এখানে শৈবলিনী, ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী, কয়েকটী মেয়ে এবং কুমারের কনিষ্ঠা ভগ্নী মটর তাঁহাকে দেখিয়াছেন। শৈবলিনী এই সব স্বীকার করিয়াছেন, তবে মটর গিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে নাই বলিয়াছেন। আমি মনে করি, তিনি তথায় গিয়াছেন।

কেন সন্ন্যাসীকে তথায় নেওয়া হইয়াছে? শৈবলিনী বলিয়াছেন যে, কালার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্য তাঁহাকে

নেওয়া হইয়াছে। কালার এক পুত্র ছিল। স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর দুই বৎসর পর (১৮।৪।১৭ তারিখে স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়) অর্থাৎ ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে কালার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত মহিলাকে উহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তৎপর তিনি জরায়ু রোগের কথা তোলেন এবং বলেন যে সন্ন্যাসী কিছু করিতে পারেন নাই—এইগুলি সবই মিথ্যাকথা মটর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কেন তথায় গিয়াছিলেন? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেন ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেইজন্যই তাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন। স্বর্ণময়ীর কন্যা এবং ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তিনি শৈবলিনীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিয়াছেন, তিনিও সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী তথায় আধঘণ্টার মত ছিলেন, তাঁহার পরণে সেই পোষাক লেংটী ছিল এবং তাঁহার লম্বা জটা ও দাঁড়ি ছিল।

জয়দেবপুরে কে আনিয়াছে

ইহার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। ৩০শে এপ্রিল সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে পৌঁছেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। কে তাঁহাকে তথায় আনিয়াছে, তাহা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন যে, সন্ন্যাসীকে তাঁহার বাড়ীতে আনিবার জন্য তিনি অতুলবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন অতুলবাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনিও ঐ লোকটীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন এবং তজ্জন্যই

তিনি তাঁহাকে আনিতে স্বীকার করেন। তৎপর তিনি এবং বুদ্ধু ঢাকা যান এবং সন্ন্যাসীকে লইয়া লোকাল ট্রেণে সন্ধ্যা ৭টা বা ৭-৩০ মিনিটে জয়দেবপুর পৌঁছেন। অতুলবাবু আনিয়াছেন বলিয়া এখন অস্বীকার করেন। তবে আমি মনে করি, যিনি তাঁহাকে কাশিমপুর নিয়াছেন তিনি এবারও তাঁহাকে তথায় নিয়াছেন, তবে এইবার সঙ্গে বুদ্ধ ছিল। ইহার কিছুদিন পরে প্রত্যেকের মুখেই তাঁহার নাম শুনা যাইতেছিল। প্রত্যেকেই তাঁহার সম্বন্ধে নানা বলাবলি করিতেছিল। বাদীপক্ষের ৬০১নং সাক্ষী ভূতনাথ-বাবু ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনের পার্শ্বেল ক্লার্ক ছিলেন! তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গলার অধিবাসী নহেন, ৭নং আপ্ ট্রেণে সন্ন্যাসী যে জয়দেবপুর গিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে আছে। ষ্টেশনে বহু-লোক সমবেত হইয়াছিল। তিনিও জনতার মধ্য দিয়া একবার সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লইয়াছিলেন। বাদীপক্ষের ১৩৭নং সাক্ষী গোপাল বসাক বলিয়াছেন যে, তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বুদ্ধু এবং অপর একজন লোকও দেখিয়াছিলেন, তবে তিনি সময়টা জুন বা জুলাই বলিয়াছেন। ঐদিনও বাদীর গায়ে ভস্ম ছিল এবং তিনি সন্ন্যাসীর বেশেই ছিলেন। কিন্তু ৪ঠা মে'র পর আর তাহা দেখা যায় নাই। মিঃ আবদুল মন্নান তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং বুদ্ধু ও অতুলকে ষ্টেশনে একটা গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছেন। বাদীপক্ষের ৮০৬নং সাক্ষী নগেন্দ্র বাদীকে এবং অতুল ও বুদ্ধুকে জয়দেবপুর ষ্টেশনে দেখিয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে' অতুলবাবুর কর্ম্মচারী দুরন্তকেও দেখিয়াছিল। তাঁহারা সন্ধ্যার পর জ্যোতির্ম্ময়ী

দেবীর বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত সাক্ষী বলিয়াছে এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং মিঃ নীড্‌হামের রিপোর্ট (এক-জিবিট নং ৫৯) দেখিলে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, উক্ত দিবস বৃদ্ধ অতুলবাবু এবং তাঁহার কর্ম্মচারী তুরন্ত বাদীর সঙ্গে ছিলেন। এই উপলক্ষে বাদীর সঙ্গে বৃদ্ধ ও অতুলবাবু ছিলেন বলিয়া বাদী বলিয়াছেন ; তিনি ইহা সত্যই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়া-ছেন যে, ঐ দিন রাত্রিতে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন ; ইহা ৩০শে এপ্রিলের কথা তিনি ৪ঠা মে পর্য্যন্ত—যেদিন তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন—তথায় বাস করেন। ঐ দিন যে বাদী মেজকুমার বলিয়া তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন ইহা সর্ব্বসম্মতভাবে স্বীকৃত।

ইতিমধ্যে এই ঘটনার পূর্ব্বের তিন দিন কি ঘটিতেছিল ? ঐ তিন দিন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া বাদীপক্ষ বলিয়াছেন এবং তাঁহারা সোজা আত্মপরিচয় প্রকাশের দিনে আসিয়া পৌঁছেন। বাদী ঐ তিন দিন কি করিলেন তাহা তাঁহারা বলেন নাই ; কিন্তু ভগ্নী উহার একটী সম্পূর্ণ কাহিনী দিয়া-ছেন। তাঁহার কাহিনী কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তিনি যেরূপ কাহিনী দিয়াছেন আমি একটু সংক্ষেপে, অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ না দিয়া, তাহা উল্লেখ করিতেছি।

বাদীর আত্মপরিচয়ের কাহিনী

"তিনি (বাদী) সন্ধ্যা ৭টা কি ৭-৩০ মিনিটের সময় পৌঁছেন। তিনি বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন। ভুলুর কর্ম্মচারী

তুরন্ত তথায় ছিল। আমার কর্ম্মচারী, ভূলু (অতুলবাবু), জিতেনবাবু ও অপর কয়েকজন ভদ্রলোক, যাঁহারা প্রত্যহ তাস খেলিতে আমার ছেলের কাছে আসিতেন এবং ঐরূপ আরও কয়েকজন লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

"আমি অপর ঘরে ছিলাম এবং দরজার ফাঁকে দেখিতে-ছিলাম। আমি সন্ন্যাসীকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। আমি জিতেন ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করি যে, সন্ন্যাসী কাঁদিতেছে কেন? সে বলে যে, সে (জিতেন) ঢাকা হইতে কর্ত্তাদের যে ফটো বাঁধাইয়া আনিয়াছে, সন্ন্যাসী তাহার দিকে তাকাইয়া কাঁদিতেছে। কর্ত্তা অর্থে ভাইদের কথা বলা হইয়াছে। ঐ রাত্রিতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই।

"পরদিন অতি প্রত্যূষে সাধু চিলাই নদীতে স্নান করিতে করিতে যান এবং ভস্ম মাখিয়া ফিরিয়া আসেন। ঐদিন হেনী ও কেনীর মামলা সম্পর্কে ঢাকা হইতে কয়েকজন উকীল আসিয়াছিলেন। ঐসব উকীল এবং সেক্রেটারী রায় সাহেব যোগেন্দ্র তাঁহার বাড়ীতে আহার করেন। বাদী নিরামিষ খান এবং যে বারান্দায় বসিয়া তাহারা আহার করিতেছিলেন, সেই বারান্দার সংলগ্ন ঘরে বাদী বসেন। উকীলগণ চলিয়া গেলে বাদী যে ঘরে বসিয়াছিলেন, রায়সাহেব যোগেন্দ্র সেই ঘরে আসেন। বাদী তখন হিন্দীতে বলেন, "আমার বৈঠকখানা ঘর পরিষ্কার করিয়া দেও।" এই কথার পর সকলের মনেই আরও সন্দেহ হয়। তিনি কেন এই কথা বলিলেন?

"আমি সাধুকে গায়ে ভস্ম মাখিতে নিষেধ করি। তাঁহার গায়ের রং ঠিক দেখিতে না পাওয়ায় ঐকথা বলি। তিনি হিন্দীতে বলেন, 'কেন?' পরদিনও তিনি গায়ে ভস্ম মাখিয়া আসেন। তখন আমি বলি, 'আমি আপনাকে ভস্ম মাখিতে নিষেধ করা সত্বেও আপনি তাহা করিয়াছেন আগামীকল্য আপনি আর গায়ে ভস্ম মাখিবেন না।

"পরদিন (৩রা মে) যখন তিনি (বাদী) স্নান করিতে করিতে যান, তখন পুরান খানসামা আনন্দ ও নগেন ভট্টাচার্য্য (বাদীপক্ষের ৮০৬নং সাক্ষী) তাঁহার সঙ্গে যান। ঐ দিন তিনি ভস্ম মাখেন নাই। তখন আমি তাঁহার গায়ের রং লক্ষ্য করি। পূর্ব্বে মেজকুমারের গায়ের রং যেরূপ ছিল, বাদীর গায়ের রংও সেইরূপ লক্ষ্য করি, বরং ব্রহ্মচর্য্য পালন করায় তাঁহার রং আরও ফর্সা হইয়াছে। তারপর ভস্মমুক্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে রমেন্দ্রের মত মনে হইল। তাঁহার গায়ের রংএর অপেক্ষা চোখের পাতা কালো, ইহাও আমি লক্ষ্য করিলাম। গাড়ীর চাকা চলিয়া যাওয়ায় তাহার পায়ে যে দাগ হইয়াছিল, আমি তাহাও দেখিলাম: আমি তাহার কব্জির চামড়া খসখসে দেখিলাম। আমার ঠাকুর মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—যেমন আমি তাহাকে চিনিয়াছি।

সাক্ষী অতঃপর বলেন, যে সব প্রাচীনা স্ত্রীলোক কুমারকে চিনিতেন, তাঁহারা বহু প্রতিবেশী এবং নিকটবর্ত্তী প্রজাবৃন্দ অনেকেই ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলেন,

"সাধুই কুমার" যে সব প্রজা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সংখ্যা ১০০ কি ১৪০ হইবে।

৩রা মে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মেজকুমারের শরীরে যেসব চিহ্ন ছিল, সেই সব চিহ্ন সাধুর শরীরে পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিবার জন্য তিনি তাহার পুত্রকে বলেন ; কিন্তু সাধু তাহাতে রাজী হন না।

পরদিন ৪ঠা মে বুদ্ধু সন্ন্যাসীর শরীরের চিহ্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং ঐদিন তিনি কোন আপত্তি করেন না। তিনি তাঁহার পুত্র জব্বুকে তিনি যে সব চিহ্নের কথা বলেন, সেই সব চিহ্ন বাহির করিতে বলেন। প্রাতঃকাল ৭টার সময় এই সব কাজ হয় এবং তখন বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত ছিল না। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি যদি সন্ন্যাসীকে চিনিয়াই থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি আর চিহ্ন দেখিলেন কেন? তদুত্তরে তিনি বলেন যে, "আমি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ঐ সব চিহ্ন দেখিতে বলি।"

ঐ দিনই প্রাতঃকালে ৯টার সময় লোকজন আসিতে থাকে বাদীর সন্ধ্যাসমাপনান্তে যখন আঙ্গিনায় লোকজন আসিয়াছে তখন আমি বাদীর সহিত আলাপ করি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি—"আপনার গায়ের চিহ্ন সমূহ ও চেহারা আমার মেজ ভাইর মত। আপনি নিশ্চয় রমেন্দ্রনারায়ণ হইবেন আপনি আপনার পরিচয় প্রকাশ করুন।"

তিনি বলেন,—"না আমি রমেন্দ্রনারায়ণ নহি। কে আমাকে বিরক্ত করেন। আমি চলিয়া যাইব।' ইহাতে আ

বলি—"আপনি কে, ইহা আপনাকে বলিতেই হইবে। আপনার অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

আমি আমার পুত্রকে বলি, "উপস্থিত লোকদিগকে বল যে, মেজকুমারের শরীরের সমস্ত চিহ্নই এই সাধুর শরীরে রহিয়াছে আমার পুত্র ও আমার বোন-পো একথা সকলকে বলে। আমি চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম।

এদিন আমার ভাই—এই বাদী, প্রজাদের মধ্যে যাইয়া বসে এবং তাহারা তিনি কে ইহা প্রকাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। আমিও তাহাকে বলি, "তিনি কে, ইহা প্রকাশ না করিলে আমি আহার করিব না।" সাধু বলেন যে, তিনি রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তখন অপরাহ্ণ ৪ঠা কি ৫টা হইবে। জনতার নিকট তাঁহার (সাক্ষীর) ঘরের সম্মুখে চটানে বসিয়া বাদী কি ভাবে তাহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, সাক্ষী তাহা বর্ণনা করেন।

অন্যান্য বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি বারান্দায় বসিয়াছিলেন। বাদী বাহিরের উন্মুক্ত স্থানে বসিয়াছিলেন। কেহ বাদীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার নাম কি ?" তিনি বলেন—রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী পিতার নাম কি ?—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। মাতার নাম কি ?—রাণী বিলাসমণি।

জনতার ভিতর হইতে কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া থাকিবে এবং বাদী তাহার উত্তর দেন অতঃপর কেহ বলে—"রাজা ও রাণীর নাম সকলেই জানে—আপনাকে লালন পালন করিয়াছিল কে ?" বাদী উত্তরে বলেন অলোক।"

তখন জনতা "মধ্যম কুমারের জয়" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে এবং স্ত্রীলোকগণ "হুলুধ্বনি" করেন। বাদী একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন এবং তাহার 'ফিট' হইবার মত হয়। আমি দৌড়াইয়া তাহার নিকটে যাই। ঐ সময় অনুমান ১ হাজার কি ৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। আমি যখন বাদীর নিকট যাই, তখন মগ্নমালা আমার সঙ্গে ছিল। আমি বাদীকে পাখা দিয়া বাতাস করি এবং মাথায় গোলাপ জল দেই আমি প্রায় ১০ মিনিটকাল ঐরূপ করি। আমি একখানি চেয়ারে বসিয়া-ছিলাম। বাদীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মটরের বাড়ী (কনিষ্ঠা ভগ্নী) লইয়া যাওয়া হয়। জনতাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়।

মেজকুমারের ভগ্নী বাদীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে এই বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, রায়সাহেব আত্মপরিচয় প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যতদিন সাধু তথায় ছিলেন, ততদিনই তিনি একবার করিয়া তথায় যাইতেন। তিনি ইহাও বলেন যে, কুমারের মামা বসন্তবাবুও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোন পক্ষই এই লোকটাকে হাজির করেন নাই এবং অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কেও তাঁহার নামের কোন উল্লেখ নাই, যদিও তিনি বাদীর আয়ত্তাধীনেই ছিলেন এক্ষণে এই কাহিনী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার শুধু ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য নহে, ইহার ভিতরের তাৎপর্য্য বাহির করিবার জন্যও বটে কোন ব্যক্তি

তাহার ভাইকে চিনিতে পারিলে সে আর তাহার ভাইয়ের চিহ্ন খুঁজিতে যায় না। পক্ষান্তরে ঐ দিনের ভাবাবেগের কথা, ভস্ম, দাড়ি, জটার কথা এবং পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ মহিলাটী সেদিন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে ঐসব ব্যাপার কতদূর অতর্কিত, তাহাও দেখিতে হইবে।

ঐ দিনের যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহা মোটামুটিভাবে অনন্তকুমারী দেবী (কমিশন সাক্ষী) মোক্ষদা সুন্দরী (কমিশন সাক্ষী), বাদীপক্ষের ৮০৬নং সাক্ষী নগেন্দ্র, লালমোহন গোস্বামী, অবিনাশ, সাগর ও বিল্লুবাবুর উক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'আত্মপরিচয়' প্রকাশের সময় জনতা হইয়াছিল, প্রজারা উপস্থিত ছিল, তাহারা নজর দিয়াছিল এবং বাদী 'আত্মপরিচয়' প্রকাশ করিবার পর হইতে বাঙ্গলায় (যদিও হিন্দীটান ছিল) কথা বলিতে আরম্ভ করেন। বহু সাক্ষী তাহার (বাদীর) কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছে যে, তাহার কথা আটকা আটকা, ভার ভার "আড় আড়"—মুখে পাথরের টুকরা রাখিলে যেমন হয়, সেই ভাবে কথা বলিয়াছিলেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষ্যের সত্যাসত্যের উপর ঐ দিনের ঘটনা নির্ভর করিতেছে না।

ইহা সত্য যে, দুইজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও নগেন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য সাক্ষীই বাদীর স্বার্থ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নহেন; কিন্তু

অপর পক্ষের মামলা কি এবং তাঁহারা কিরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা এখন দেখা যাক্ ?

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য কি ?

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, ঐ দিনও বাদী ঔষধপত্র দিতেই গিয়াছিলেন এবং ঐ বাড়ীতে সন্ন্যাসীর ন্যায় ধুনী জ্বালাইয়া তিন দিন অবস্থান করিবার পর ৪ঠা মে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি মেজকুমার। বিবাদীপক্ষ ইহাও বলেন যে, তাঁহাকে দেখিতে সম্পূর্ণ অন্যরকম, একটী বাঙ্গলা কথাও বলিতে পারেন না, কিংবা বাঙ্গলা কথা বুঝিতে পারেন না।

ফণীবাবু ভিন্ন তাঁহারা এই সম্পর্কে আরও দুইজন সাক্ষী হাজির করিয়াছেন। ৪ঠা মের পূর্ব্বের ঘটনা সম্পর্কে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাদের একজনের নাম তসরদ্দি। সে বলে যে, সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আড়াই বৎসরকাল চাকুরী করে। সে ১৫ই তারিখের সভার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। সে ঐ বাড়ীতে ঘুমাইত না। সে ভোরে আসিত এবং রাত্রি ১০টার সময় চলিয়া যাইত। সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর বর্ণনা করিতে যাইয়া উহাকে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাদওয়ালা একটি বাংলো বলিয়া বর্ণনা করে। সে বলে, ঐ বাড়ীতে ৭টী ঘর, একটি হল ঘর এবং তাহার উত্তর দিকে বারান্দা, দক্ষিণ দিকে বারান্দা এবং প্রত্যেক বারান্দার উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া ঘর। বাড়ীটী দক্ষিণমুখী এবং তাহার সামনে বারান্দা আছে। পূর্ব্বদিকের ঘরে সাগরবাবু স্ত্রীসহ

ঘুমাইতেন। পশ্চিমদিকের ঘরে বুদ্ধুবাবু থাকিতেন। হলঘরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও ছেলে-মেয়েরা ঘুমাইতেন।

এখন এই সাক্ষীটি (তসরুদ্দিন) বলিয়াছে যে, ঐ তিনদিন বাদী বাড়ীর সম্মুখের চটানে (সাক্ষ্যদানকালে ২ অথবা ৩ দিন বলে এবং জেরার সময় ৩ দিনের কথা একেবারে বাদ দেয়) ভস্ম মাখিয়া ধুনী জ্বালাইয়া এবং লেংটি পরিয়া বসিয়া থাকিত। মাটিতে চিম্‌টা পোতা ছিল এবং কমণ্ডলুও ছিল। এই তিনদিন সাধু রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইতেন অর্থাৎ নদীর দিকে যাইতেন এবং সাক্ষীর সহিত ভোরে তাহার দেখা হইত। কারণ ভোরে সে বুদ্ধুবাবুর বাড়ীতে কাজে আসিত। এই তিন দিন বাইরের লোক কেহ তথায় আসে নাই। চতুর্থ দিবসে পরিবারের লোক তাহাকে মামা বলিয়া ডাকে এবং সন্ন্যাসী লেংটী ছাড়িয়া দেয়। তারপর হইতে সাধু সাগরবাবুর শয়ন-কক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা মণির ঘরে শয়ন করিতেন। সাক্ষী বলিয়াছে যে, এই মামা ডাক এবং মেজকুমার বলিয়া ডাকা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়। বাহিরের লোক কেহ ছিল না, অপরাহ্নে ১৫।২০ জন লোক মাত্র আসিয়াছিল। ইহার পর লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সাক্ষীর এই কাহিনীর সহিত ইহার আলঙ্কারিক অংশ বাদ দিলে, অপর পক্ষের কাহিনী মিলিয়া যায়। বাদী ঐ বাড়ীতে তিনদিন ছিলেন, প্রত্যহ চিলাই নদীতে স্নান করিতে যাইতেন এবং ৪র্থ দিন তিনি তাহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি লেংটী ত্যাগ করিয়া ধুতী পরেন (তপনের মত)

এবং তাহাকে মামা বলিয়া ডাকা হয়। সত্যভামা দেবী ঐ বাড়ীতে তখন ছিলেন। সাক্ষী তাহা অস্বীকার করে না এবং তিনি যে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না।

"ঔষধ দেওয়া সাধু"—এই মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একজন সাক্ষী আসিয়া বলে, সে একদিন ঐ সময় লেংটী পরা একজন সাধুকে চটানে বসিয়া থাকিতে দেখে এবং তাহার নিকট বাতের ঔষধ চাহে; কিন্তু সাধু বাঙ্গলা বুঝিতে না পারায় বুদ্ধু হিন্দীতে তাহাকে ঐ কথা বলিলে তিনি তাহাকে একটী ঔষধ দেন (বিবাদীপক্ষের ১০৮নং সাক্ষী) ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফণীবাবু বলেন, ঐ তিন দিনের কোন একদিন তিনি সাধুকে চটানে একটী আমগাছের নীচে বসিয়া থাকিতে দেখেন। সাধু নানা লোককে ঔষধ দিতেছিলেন। তাহাকে দুই একবার হিন্দীতে কথা বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল তিনি আরও বলেন যে, ঐ সময় বাদী মেজকুমার এই সন্দেহ কাহারো মনে জাগে নাই এবং লোকজন কেহ তাহাকে দেখিতে আসে নাই।

আমি শুধু শুনিয়াছিলাম যে, সন্ন্যাসী পুনরায় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়াছেন; তিনি যে পুনরায় তথায় গিয়াছেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমি মনে করিলাম, তিনি কাহারও পীড়ার চিকিৎসা করিতে গিয়াছেন, সন্ন্যাসীর পুনরাগমনকে আমি এমন কোনও সংবাদ বলিয়া মনে করি নাই, যাহা লোকের কাছে বলা আবশ্যক। এই দুইজন সাক্ষী আরও

বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মাত্র ৪ঠা তারিখ অপরাহ্ণে শুনিতে পান, সাধু নিজকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিতেছেন। এই মর্ম্মে আরও সাক্ষ্য দেওয়ান হইয়াছে যে, এই সংবাদে এমন কোনও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় নাই যাহা উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবাদীপক্ষ বলিতেছেন, বাকল্যাণ্ড বাঁধের এই সন্ন্যাসীকে ঔষধদাতাস্বরূপ কাশিমপুরে শৈবলিনী দেবীর বাড়ীতে, জয়দেবপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, কেহই তাঁহাকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার কাহাকেও চিকিৎসা করিবার জন্য জয়দেবপুরে গিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে তাঁহার বাড়ীর উঠানে বাস করিতে থাকেন। ঔষধ লইবার জন্য আসিয়া নানা লোকে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার পর জয়দেবপুর গমনের চতুর্থ দিন—৪ঠা মে তারিখে এই পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী যে ব্যক্তি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলে, যাহার আকৃতি মেজকুমার অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সে অকস্মাৎ ঘোষণা করিয়া বসিল, অথবা ঘোষণা করিতে তাহাকে বলা হইল কিংবা সে ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইল যে, সে মেজকুমার অথচ তখন সে জানিত না কুমার লম্বা ছিলেন কি খাটো ছিলেন, ফরসা ছিলেন কি ময়লা ছিলেন, বৃদ্ধ ছিলেন কি যুবক ছিলেন, বিবাহিত ছিলেন কি অকৃতদার ছিলেন, সে নিজেই যদি নিজকে মেজকুমার বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে, তবে সে নিজে, আর সে নিজে যদি ঐ ঘোষণা না করিয়া থাকে, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রভৃতি মেজরাণীর বৈধব্য সত্ত্বেও, এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরক্ষর

হওয়া সত্ত্বেও, সে বাঙ্গলা ভাষা আদৌ না জানিলেও কুমারের সহিত তাহার আকৃতিগত সম্পূর্ণ বৈষম্য সত্ত্বেও এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও তাহাকে মেজকুমার রূপে দাঁড় করাইলেন, তাহার পর সকলকে দেখাইবার জন্য তাহাকে জয়দেবপুরের মধ্যস্থলে প্রকাশ্যে আনা হইল, কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে ঢাকায় পাঠান হইল, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহারা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে এবং বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা আয় বিশিষ্ট একটী বিরাট জমিদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্কল্প করিলেন।

... ...

৫ই মে প্রাতঃকালে ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত বড়রাণীর ভ্রাতা শ্রীযুত শৈলেন্দ্র মতিলালের নিকট একখানা পত্র লিখেন। ঐ পত্রের তারিখ ৫ই মে ঐ দিন বেলা সাড়ে দশটার পূর্ব্বে ঐ পত্র ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত বিবাদীপক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্য আমি যথাসময়ে আলোচনা করিব; তাঁহার সাক্ষ্যের স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। তাঁহার পত্রখানা এই :—

আশু ডাক্তারের পত্র

"ভাওয়ালে এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা কোন নভেলেও পড়ি নাই। এখানে বুদ্ধুবাবুর বাড়ীতে এক সাধু আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি মেজকুমার এবং তাঁহার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি অলকা দাইয়ের নামও

বলিয়াছেন। প্রজারা দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিবে ও তাঁহার সম্পত্তি উদ্ধার করিবে। প্রত্যহ পাঁচ ছয় হাজার লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে এবং কেহ কেহ নজরও দিতেছে। প্রত্যেক নরনারীর দৃঢ়বিশ্বাস, তিনিই মেজকুমার—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এই ব্যাপারে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, সাধুর কথা মিথ্যা; তাই ভাওয়ালের লক্ষ লক্ষ লোক আমার নিন্দা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটাইতেছি।"

দেখা যাইতেছে যে, ঐ ব্যাপারে তুমুল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল, রিপোর্টেও তাহাই বলা হইয়াছে। ৫ই মে বেলা সাড়ে আটটা কি তাহার পর রিপোর্ট রচনা করা হইয়াছিল। "এষ্টেটের সর্ব্বত্র এবং এষ্টেটের বাহিরেও ঐ চাঞ্চল্য বিস্তৃত হইয়াছিল,"—এক রাত্রিতে তাহা সম্ভব হয় নাই, উহার চারি দিন পূর্ব্বই হইতেই অর্থাৎ তাঁহার আগমনের পর হইতেই শত শত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছিল বলিয়াই এষ্টেটের সর্ব্বত্র ও এষ্টেটের বাহিরে চাঞ্চল্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রিপোর্টে এবং থানার জেনারেল রেজিষ্টারেও তাহাই বলা হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্যে দেখা যায় এবং থানার ডায়েরীতেও দেখা যায়—৪ঠা তারিখ বেলা ৯টার সময় অর্থাৎ বাদীর আত্ম-পরিচয় দিবার পূর্ব্ব দিন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বহুলোক জমায়েৎ হইয়াছিল। ক্রমেই বেশী লোক জড় হইতে থাকে। কারণ আমার মনে হয় না যে, খঞ্জ ব্যতীত জয়দেবপুরে এমন কোন নার-নারী ছিল, যে ঐ চাঞ্চল্যকর দৃশ্য দেখিতে যায় নাই।

তারপর জনসাধারণ ও ভগিনী আত্মপরিচয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তিনি আত্মপরিচয় দেন এবং তারপর ক্রন্দনরোল উঠে, জয়ধ্বনি ও হুলুধ্বনি পড়িয়া যায়। ঐ দিনের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বলিয়াছেন—বাদীর শরীরে এই চিহ্ন ছিল। সেই সম্পর্কে মিঃ চৌধুরী, বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী উভয়কেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি বাদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এ কথা কি সত্য নয় যে আপনার শরীরের চিহ্নগুলি দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছিলেন, মেজকুমারের শরীরেও সেই সকল চিহ্ন ছিল? (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বাদীর সাক্ষ্য), বাদী যে একটি অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলিয়াছেন তখন বাহিরের কেহ উপস্থিত ছিল না, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বিবাদীপক্ষ এই আত্ম-পরিচয়দানের কথা উড়াইয়া দিতে পারেন না—ঠিক যেমন তাঁহারা সূর্য্যটিকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। ঐদিনের এবং উহার পরের দিনের অবিসংবাদিত ঘটনা সম্পর্কে যে সকল অবিসংবাদিত দলিলগত প্রমাণ আছে তাহা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, তখন বাড়ী লোকজনে পূর্ণ ছিল; যোগেন্দ্রবাবুও যে তথায় উপস্থিত ছিলেন তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কারণ শত শত লোক যদি তথায় গিয়া থাকে তবে যোগেন্দ্রবাবুও গিয়াছিলেন, কেননা উহার পূর্ব্বেও প্রত্যহ তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

এখন বিচার্য্য এই যে, বাদী যখন বলিলেন তিনি কুমার, তখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিজে এবং তাঁহার ও ইন্দুময়ী দেবীর

দেশের মেয়েরা বাদীকে সত্যই কুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন কি না, কিম্বা বিবাদীপক্ষ যে বলিতেছেন বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে আকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই—তদ্রূপ বাদীকে সম্পূর্ণ ভিন্নব্যক্তি জানিয়াও তাঁহারা বাদীকে কুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে প্ররোচনা দিয়াছিলেন অথবা বিবাদীপক্ষের উক্তির হাস্যকর অসারত্ব কিঞ্চিৎ লাঘবকল্পে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বাদী ও কুমারের মধ্যে আকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য আছে, তবে ঐ সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাকে কুমার বলিয়া চালাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপ আত্মপরিচয় দিতে প্ররোচনা দিয়াছিলেন কি না এবং ভ্রাতাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এমনই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন কি না; তিনি বাদীকে ভাই বলিয়া চিনিতে না পারিয়াও তাঁহাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রতারণা করিয়াছিলেন? বিবাদীপক্ষ যে বলিয়াছেন, বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে আকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই, তাহা ধরিয়া লইলে বলিতে হয়, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যে শ্মশ্রুল জটাজুটধারী ভস্মমাখা—মেজকুমার হইতেসম্পূর্ণ অন্যরূপ এক সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, যে ব্যক্তিকে কুমার বলিয়া চালান অত্যন্ত কঠিন এবং কিরূপ কঠিন ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে সেই সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—সেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া চালাইবার জন্য অকস্মাৎ অথবা দিন তিনেকের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল আমি তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি। সুতরাং বিচার করিতে হইবে, বিবাদীপক্ষ কেন বলিতেছেন না

যে, ভ্রম হইতে পারে এমন আকৃতিগত সাদৃশ্য বাদী ও মেজ-কুমারের মধ্যে আছে বলিয়াই বাদীর পরিচয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য উত্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। তারপর বাদীর কথা যদি অসত্য না হয়, তবে আত্মপ্রতারণা প্রভৃতি যে সকল যুক্তি দেখাইবার আছে, বিবেচনাক্রমে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আমার নিকট এমন আন্ত-রিকতার ও দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাহাতেই বুঝা যায়, আত্মপ্রতারণার যুক্তি টিকিতে পারে না।

রায় সাহেবের উক্তি

আত্মপ্রতারণা করিবার সম্ভাবনা রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর পক্ষে যত কম অন্য কাহারও পক্ষে তত কম নহে। তাঁহাকে দেখিয়া খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক লোক বলিয়াই মনে হয়। তিনি এই মামলায় যে তদ্বির করিয়াছেন (পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করিব) তাহাতেও বুঝা যায়. তাঁহাকে দেখিলে যাহা মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাহাই; নতুবা তাঁহাকে তদ্বিরকারক নিযুক্ত করিলে এষ্টেটের ক্ষতি হইতে পারে বিবে-চনায় তাঁহাকে তদ্বিরকারক নিযুক্ত করা হইত না। এই ভদ্র-লোককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি ও মোহিনীবাবু যখন একত্র বসিয়া মিঃ নীডহ্যানের চিঠি মুসাবিদা করেন, তখন তিনি তাঁহাদের মুসাবিদার বিবরণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না? তিনি বলেন, আমি এই অংশটি বিশ্বাস করিয়াছিলাম, মোহিনী-বাবু ইহা লিখিয়া দিলেন এবং আমিও লিখিবার সময় উপস্থিত ছিলাম। তখন যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদের সকলের মনেই

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি মেজকুমার ছাড়া আর কেহই নহেন। তিনি বলেন, যাহারা উপস্থিত ছিল বলিতে বাড়ীর লোকও ধরা হইয়াছে এবং বাড়ীর লোক বলিতে তিনি বুদ্ধু, জব্বু ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বুঝেন। তিনি বলেন, বাড়ীর লোক প্রভৃতি সকলেই সাধুকে মেজকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে ঐ মর্ম্মে তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি মেজকুমারকে অন্যান্যের মতই চিনিতেন। সাধু প্রথমবার যখন জয়দেবপুর গিয়াছিলেন, তখনও তিনি সাধুকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সাধুর চেহারাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষুর রং ছিল কটা। সাধুই মেজকুমার বলিয়া যে জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেই কথা তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজেও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, সাধুই মেজকুমার, যদিও তিনি তোত'-পাখীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবী বাদীকে মেজকুমার বলিয়া সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছেন, এই কথা যদি তিনি বিশ্বাস করিয়া থাকেন অথবা যদি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, বাদী ও মেজকুমারের কথাবার্ত্তা এবং মানসিক বৃত্তি পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ভুল করিয়া থাকিলেও তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বাদীই মেজকুমার। দেখা যায় যে, রিপোর্টে এমন কথা বলা হয় নাই যে, সাধুকে মেজকুমারের মত দেখা যায় না, অথবা তিনি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছিলেন।

সাধু যখন প্রথমবার জয়দেবপুরে যান তখন রায় সাহেব ও মোহিনীবাবু উভয়েই তাঁহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, রিপোর্টে বলা হয় নাই যে, বাদীকে মেজকুমারের ন্যায় দেখা যায় না, অথবা বিবাদীপক্ষের অধিকাংশ সাক্ষীই যেরূপ বলিয়াছে, বাদীকে দেখিয়াই বলা যায় তিনি মেজকুমার নহেন। তদ্রুপ প্রথম দৃষ্টিতেই বলা যায় তিনি মেজকুমার নহেন। রিপোর্টে শুধু বলা হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত আবশ্যক। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বা শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ আবশ্যক, এমন কথা রিপোর্টে বলা হয় নাই। মোহিনীবাবুকেও জিজ্ঞাসা করা হইযাছিল, রিপোর্টে বর্ণিত বিষয় তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না। তিনি মেজকুমারকে দেখেন নাই; কিন্তু যখন রিপোর্ট রচনা করা হয়, তখন তিনি ও রায় সাহেব একত্র ছিলেন। তিনি বলেন, ৪ঠা মে রাত্রিতে তিনি মিঃ নীডহ্যামের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পর দিন রিপোর্টে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা তিনি মিঃ নীডহ্যামের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন মিঃ নীডহ্যাম তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে বলেন, তিনি উহা বিশ্বাস করেন নাই। তারপর তিনি বলেন, বিশ্বাস করার বা অবিশ্বাস করার কোনও সময় ছিল না। ব্যাপার জরুরী ও সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথা বলিবার সময় তিনি সাময়িক কালের জন্য ভুলিয়া গেলেন যে, রিপোর্টে যাহাই লেখা থাকুক, সাক্ষ্যদানের সময় তিনি ব্যাপারটীকে অকিঞ্চিৎকর

প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলেন, তিনি রিপোর্টের এক কথাও বিশ্বাস করেন নাই, উহার সমস্তই নিছক বাজে কিন্তু মিঃ নীডহ্যামকে এমন কথা বলিলেন না, বরং এই বাজে কথাই সাজাইয়া গুছাইয়া তিনি এক রিপোর্ট রচনা করিলেন এবং কালেক্টরের নিকট উপহাসছলে তাহা প্রেরণের জন্য তাহাতে মিঃ নীডহ্যামের স্বাক্ষর লইলেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, রিপোর্টে সাধুর প্রথমবার জয়দেবপুব গমনের কথা প্রসঙ্গে সেই কুখ্যাত ও কাল্পনিক চায়ের মজলিসের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। বাদী যে সেই চায়ের মজলিসে বলিয়াছিলেন, তিনি একজন পাঞ্জাবী, তাহারও কোনও উল্লেখ করা হয়ই নাই।

উল্লিখিত ঘটনা যিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আলোচ্য রিপোর্ট তাঁহারই লেখা। উহাকে প্রাথমিক এজাহার বলিয়াই যদি ধরিয়া লওয়া যায়,—অবশ্য মোহিনীবাবু ঐরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াই উক্ত রিপোর্টের প্রামাণ্য নষ্ট করিয়াছেন,—তাহা হইলেও উক্ত ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রিপোর্ট এমন একজন লোককে দেওয়া উচিত ছিল, যিনি উহার মধ্যে কোনও অসত্য থাকিলে তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সত্যতা নির্ণয়ে প্রয়াস পাইতেন এবং সকল অবস্থার তদন্ত করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইয়া জেলার কালেক্টরের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য যথার্থ রিপোর্ট লিখিতে বসিতেন।

বাদীর পরিচয় প্রকাশ

বাদীরপক্ষের জবাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে

যে—ভগিনীগণ কুমার বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য একজন পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে খাড়া করিয়াছিলেন ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ কুলোকগণ চক্রান্ত করিয়া সেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিতেছিল এবং কলিকাতার কয়েকজন তাঁহাকে কুমার বলিয়া দাঁড় করাইয়াছিল—বড়রাণীর জেরার সময় বিবাদীপক্ষ সে সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদ্দারা বিবাদীপক্ষের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই খণ্ডন হইয়াছে। তারপর বিবাদীপক্ষের আর এক যুক্তি এই যে,—সন্ন্যাসী একজন চিকিৎসক। এ যুক্তিও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্যই যে চিকিৎসকরূপে তাঁহাকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহা নহে। সকল ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ কোনও ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে জন্য তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহার কারণ সেই একই, যে কারণে বাকল্যাণ্ড বাঁধে থাকা কালে মিঃ মায়ার সন্ন্যাসীকে অতি অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমারের মত বলিয়াই তাঁহাকে কাশিমপুর যাইতে হইয়াছিল। মধ্যমকুমারের মত চেহারার জন্যই তাঁহাকে জয়দেবপুরে লওয়ার ব্যবস্থা হয়।

সন্ন্যাসী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যান, তারপর অন্যত্র গমন করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ঢাকায় গিয়াছিলেন—চিকিৎসকের অনুসন্ধানে নহে, সন্ন্যাসীকে শৈবলিনীর বাড়ীতে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে। তারপর যখন সন্ন্যাসী পুনরায় আগমন করেন, তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যায়

কিন্তু ৪ঠা মে যখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র কন্যারা সন্ন্যাসীকে 'মামা' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল (বিবাদীপক্ষের ৭৬নং সাক্ষী) এবং যখন (যেমন যোগেন্দ্রবাবু সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া ছিলেন) ভগিনীগণ সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন তখনই সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

কারণ বিশ্লেষণ

মাত্র একটি ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাহা এই—রায় সাহেব কুমারকে চিনিতেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন,—কুমারের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও অন্যান্য ভগনীগণের সন্তান-সন্ততিগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র এই ব্যাপারের উপরই নির্ভর করা চলে না। এই প্রকারের দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কোনও কোনও ঘটনা আদৌ ঘটিতে পারে না। ৪ঠা মে যখন কুমারের পরিচয় প্রকাশ হইল, সে সময় নিশ্চয়ই জয়দেবপুরের সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিবাদিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত একজনকেও সাক্ষিরূপে আদালতে উপস্থিত করেন নাই। কেন না, ঐ দিনকার ঘটনা ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিবাদীপক্ষের বর্ণিত তাৎকালিক প্রাথমিক জবানবন্দীর দ্বারা যে প্রকারে সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ

অবকাশ নাই। এখন, ঐ ঘটনার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপের বিষয়ই অতঃপর বিবেচনার বিষয়।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, ঐ দিন হইতে বাদী পরিবারে স্থান পায়। জ্যোতির্ম্ময়ীর কন্যা পূর্ব্বে যে ঘরে থাকিতেন, ঐ দিন হইতে সেই ঘর বাদীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি পূর্ব্বে কোথায় ঘুমাইতেন, বাদী তাহা বলেন নাই। সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে আমার ধারণা—বাদী ঐ দিনের পূর্ব্বেও ঐ নির্দ্দিষ্ট ঘরেই শুইতেন, অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া বাদীকে পরিবারের আপন জন করিয়া লওয়া হইল। বাড়ীতে যুবতী স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র অন্দর মহল ছিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিজেও যুবতী—তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম; তিনি পর্দ্দানশীন মহিলা। তিনি চিকের অন্তরালে থাকিয়া সকল ঘটনা দেখিতেছিলেন। এই সময় সহসা বাদী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবী বলেন,—তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহার অন্তর উদ্বেলিত হয়; তিনি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসেন। বাহিরে আসিবার সময় সমাগত জনগণ সরিয়া তাঁহার জন্য পথ করিয়া দেয়। তাঁহার ন্যায় পর্দ্দানশীন মহিলা যে অল্প আবেগে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থিত হন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগার প্রসঙ্গ

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাদী ৭ই জুন ঢাকায় আসিয়া-

ছিলেন। তখনও তাঁহার লম্বা চুল এবং গোঁফদাড়ি ছিল গোড়াতেই তাঁহার গুরু ধর্ম্মদাস নাগার নাম করিয়াছিলেন। গোড়াতেই তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুই তাঁহার হাতে উল্কি পরাইয়া দিয়াছিলেন। বাদীর সাক্ষ্যে প্রকাশ,—সেই ধর্ম্মদাস নাগা, সন্ন্যাসী চতুষ্টয়ের একজন, যিনি দার্জ্জিলিংএর শ্মশান হইতে বাদীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে বাদী, মিঃ লিণ্ডসেকে, তাঁহার হাতের উল্কি দ্বারা লিখিত নাম দেখান।

ভাওয়ালের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজারের এক নোটিসে প্রকাশ,—'ভাওয়াল সন্ন্যাসীর দল গোড়াগুড়িই বলিয়া আসিয়াছেন, 'তাঁহার গুরু ধরমদাস আবির্ভূত হইবেন।' (২১২নং এক-জিবিট) ঢাকায় পৌঁছিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীর গুরুকে দেখিবার জন্য উৎসুক হন এবং তাঁহাকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে তিনি জম্বু ও জিতেনকে পাঠান। তাঁহারা গুরুকে দেখিতে পায় না। তারপর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা সাগর (বাদীর ৯৭৭নং সাক্ষী), অতুল রায় এবং হাবীর নামক জনৈক সাধু, গুরুকে আনিতে যান। তাঁহার গুরুকে পাইয়া, ১৯২১ সালের ভাদ্র মাসের একদিন ঢাকায় লইয়া আসেন। মিঃ লিণ্ডসের এক পত্রে ঠিকভাবে তাহার তারিখ জানা যায়। সে তারিখ ১৯২১ সালের ১৬শে আগষ্ট। বিবাদীপক্ষ ঐ তারিখের কথা বলেন এবং আমিও তাহাই মানিয়া লইলাম। ৩০শে আগষ্ট গুরু চলিয়া যান। বাদীর জনৈক সাক্ষীকে (বাদীর ১০৪০নং সাক্ষী) জেরা করিবার সময় বিবাদীপক্ষই ঐ তারিখের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা যে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, এই মামলায় তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা হইয়াছে। বাদী বলেন,—পুলিশের ভয়ে তাঁহার গুরুকে ঢাকা ছাড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু বিবাদীপক্ষ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বাদীর গুরু পুলিশের ভয়ে চলিয়া যান নাই। তিনি পাঞ্জাবের এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন যে, বাদী (ধর্ম্মদাসকে ফটো দেখাইয়া), তাঁহার চেলা সুন্দরদাস সাধু হইবার পূর্ব্বে, সুন্দরদাস লাহোর জেলার আউজলা গ্রামের এক রাখাল বালক ছিল। তখন তাহার নাম ছিল—মাল সিং।

সরযূবালা দেবী

এই মহিলাটি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তিনি হলফ করিয়া বলিয়াছেন, বাদী তাঁহার দেবর মেজকুমার। ১৯১০ সালে এই মহিলার স্বামী বড়কুমার মারা যান, তারপর তিনি কলিকাতা চলিয়া যান আর ফিরিয়া আসেন নাই। ১৯২৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় মধুগুপ্ত লেনে বাস করিতেন; তৎপর ১১নং রিপণ ষ্ট্রীটে উঠিয়া যান। ৮নং মধুগুপ্ত লেন হইতে তিনি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের রেভিনিউ বোর্ডে অনেক পত্র লিখিয়াছেন। ৮নং মধুগুপ্ত লেন তাঁহার পিতার বাড়ী, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মতিলালও তথায় থাকিতেন। ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে আশুডাক্তার শৈলেন্দ্র মতিলালের নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই মহিলার পিতা একজন উকিল ছিলেন। রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের পর এবং মিঃ মায়ারের পূর্ব্বে তিনি একবার ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজারও ছিলেন। সাক্ষ্যে দেখা যায় মতিলাল পরিবার কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার।

বড়রাণী ১৯১০ সাল হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন; সুতরাং বলিতে গেলে ভাওয়ালে তিনি একরূপ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। মেজরাণীর ন্যায় তিনিও এষ্টেট হইতে মাসোহারা পান। এই মামলায় তাঁহার স্বার্থ বিপন্ন হয় নাই এবং কোর্টের পরিচালনাভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা যে ব্যক্তিকে প্রতারক বলিয়া মনে করেন, সেই ব্যক্তিকে যদি তিনি মেজকুমার বলিয়া সমর্থন করিয়া তাঁহাদের বিরাগ-ভাজন না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ আদৌ বিপন্ন হইত না।

বড়রাণী জেরায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রাতা ঢাকা আসিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন এবং বাদীই মেজকুমার এইরূপ কথা তিনি অন্যান্য অনেকের নিকটও শুনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ঐ কথা শুনিয়াছিলাম এই পর্য্যন্ত।" অর্থাৎ তিনি ঐকথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না। তারপর ১৯২৪ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর তিনি আহ্নিক করিতেছিলেন এমন সময় শুনিতে পান "সন্ন্যাসী কুমার" আসিয়াছেন, এবং পাড়ার কয়েকজন লোকও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে উপরে ডাকাইয়া আনান, এবং তাঁহাকে দেখিয়া মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন ও মেজ-

কুমার বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহার পর হইতে বাদী যত দিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন মাসে দুই তিন বার করিয়া বড়-রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বাদী ১৯২৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২৯ সালের অক্টোবর পর্যান্ত কলিকাতায় ছিলেন। বাদী বলিয়াছেন, তিনি যেদিন কলিকাতায় পৌঁছেন সেই দিন মধুগুপ্ত লেনের বাড়ীতে বড়রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বড়রাণী বলিতেছেন, বাদীকে যেদিন তিনি কুমার বলিয়া চিনিতে পারেন সেই দিন হইতে তিনি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং বৌদিরা দেবরদের সঙ্গে যেরূপ আলাপ করে তিনিও তদ্রুপ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেন।

তাৎকালিক এডভোকেট জেনারেল স্যার এন্, এন্, সরকার বড়রাণীকে জেরা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। জেরায় একটি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে. ছোটরাণীর জন্য অনেক ব্যয় হইতেছে মনে করিয়া তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ড ও রেভিনিউ বোর্ডে ঐ সকল ব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক পত্র লিখিয়াছেন। কারণ বড়রাণী ও মেজরাণী কলিকাতা থাকিতেন, কিন্তু ছোটরাণী ঢাকায় থাকিতেন, সুতরাং মেরামতী খরচা ও মোটর গাড়ীর ব্যয় প্রভৃতির সুবিধা ছোটরাণীই উপভোগ করিতেন; এজমালী টাকায় একখানা মোটর রাখা হইত। ছোটরাণী ঢাকায় থাকিতেন বলিয়া তিনিই ঐ গাড়ী ব্যবহার করিতেন। আর একটি বিষয় এই যে, তিনি ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ বৈধ হইয়াছে বলিয়া কখনও স্বীকার করেন নাই, এবং বরাবর দত্তক পুত্রকে

তথাকথিত দত্তক পুত্র' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। একখানা পত্র তিনি লিখিয়াছেল, "শ্রীযুক্তা আনন্দকুমারী দেবী যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমি কখনও বৈধ বলিয়া স্বীকার করি নাই।" সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এষ্টেটের যে সকল এজমালী ব্যয় হইত তাহার উপর তিনি কড়া নজর রাখিতেন এবং যে সকল ব্যয়ে ছোটরাণী উপকৃতা হইবেন বলিয়া মনে করিতেন ঐ সকল বিষয়ে তিনি আপত্তি করিতেন। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেজরাণীও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া এরূপ আপত্তি করিতেন। ছোটরাণীর পোষ্যদের জন্য ব্রজলালবাবু যে মামলা আনিয়াছিলেন, সেই মামলায় সাক্ষ্যদান-প্রসঙ্গে মেজরাণীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এককথায় বলিতে গেলে ছোটরাণী সম্পর্কে বড়রাণীর ও মেজরাণীর মনোভাব একরূপ ছিল এবং উভয়েই দত্তক গ্রহণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; অবশ্যই মেজরাণী সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণে তিনি যে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহাকে উপযুক্তভাবে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বড়রাণী বলিতেছেন যে, ছোটরাণী যে বালকটিকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মায়ের গোত্র ও ভাওয়াল রাজপরিবারের এক গোত্র বলিয়া তিনি দত্তক গ্রহণ অবৈধ মনে করেন, কিন্তু ছোটরাণী বলিয়াছেন, শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইয়াই যে বড়রাণী তাহার দত্তক গ্রহণে আপত্তি করেন তাহা নহে, বড়রাণী তাহাকে বড়রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় বড়রাণী

তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছোটরাণীর প্রতি বড়রাণীর ও মেজরাণীর মনোভাব একরূপ ছিল, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসমন্বয়-বশতঃ মেজরাণী ও ছোটরাণী ক্রমেই একদিকে যাইতে থাকেন। সাধু সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত মেজরাণীর বিরুদ্ধে ছিল না। বড়রাণী বলিতেছেন, ১৯২৪ সালে সাধুকে দেখিয়া তিনি তাহাকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন। বাদী আত্মপরিচয় দিবার কিছু পর ১৯২১ সালের মে মাসে মেজরাণী ও ছোটরাণী মোহিনীবাবুকে কাছে রাখিবার জন্য পাগলপ্রায় হইয়া রেভিনিউ বোর্ডে তার করিতেছিলেন, কারণ তাহাকে বদলী করিবার কথা হইয়াছিল (একজিবিট ১৩৮ ও ১৩৯)। ১৯২১ সালের ১৭শে অক্টোবর তারিখে কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসে বড়-রাণীর নিকট এক চিঠি লিখিলে বড়রাণী তাহার নিকট দার্জ্জিলিংএ মেজকুমারের পীড়া ও মৃত্যু সম্পর্কে এক তার প্রেরণ করেন। জেরায় বড়রাণীকে এমন কথা বলা হয় নাই যে, তিনি এই সাধু সম্পর্কে ১৯২৪ সালের পূর্ব্বেই মেজরাণীর বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন। বরং বলা হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে তিনি ১৩৩৫ সনে (ইং ১৯২৮) মেজরাণীর বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন; কারণ এই মর্ম্মে বহু চিঠিপত্র দাখিল করা হইয়াছে যে, ১৯২৪ সালের পরও অর্থাৎ যে বৎসর তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন, সেই বৎসরের পরও তিনি মেজকুমারকে মৃত সাব্যস্ত করিয়া সরকারী চিঠিপত্রে প্রস্তাব করিয়াছেন, আপত্তি

উত্থাপন করিয়াছেন, অথবা আইন ব্যবসায়ীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ মায়ার

মিঃ মায়ার ১৯০২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। রাণী বিলাসমণি তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। মালিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং কালেক্টারের নিকট রিপোর্ট করার জন্য (যে রিপোর্টের অংশ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) তাঁহাকে ডিস্‌মিস্ করা হয়। ১৯০৪ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক এষ্টেট দখলে নেওয়ার পূর্ণ কাহিনী, এই উপলক্ষে মিঃ মায়ার কি ভাবে রাণীর পতনে কথা বলেন এবং কি ভাবে রাণীকে দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এতদিনের পরে মিঃ মায়ারের মনের সেই তিক্ততা আর নাই, ইহাই মনে করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যে সেই তিক্ততার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আরও দুঃখের কথা এই যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোন কথাই তিনি স্বীকার করেন নাই—যদিও মিঃ র‍্যাঙ্কিন যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, রাণীর সহিত এই ঝগড়ায় প্রথম কুমার ও মিঃ মায়ার একদিকে এবং অপর দুই কুমার ও রাণী আর একদিকে ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর মিঃ মায়ারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, দ্বিতীয় কুমার, ছোটকুমার ও রাণী তাঁহার চরিত্রের উপর বহু কলঙ্ক আরোপ

করিয়াছে এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই ঘটনার পর মিঃ মায়ারের নাম ঐ পরিবারে অভিশাপের বস্তু ছিল। সত্যবাবু তাঁহার রোজ-নামচায় (একজিবিট ৩৯৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেহ এইরূপ গুজব রটায় যে, মিঃ নীডছাম (যিনি ম্যানেজার হইয়া আসিতেছেন) মিঃ মায়ারের আত্মীয় ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সুতরাং ১৯০৪ সালে রাণী ও দ্বিতীয় কুমার মিঃ মায়ারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার দরুণ তাঁহার দ্বিতীয় কুমারের প্রতি কোমল ভাব পোষণ করা সম্ভব ছিল না। সে যাহা হউক, মিঃ মায়ারের কুমারের প্রতি কিরূপ ভাব ছিল, তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ যখন তিনি বলিয়াছেন যে, সাধু নিজকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া প্রচার করিতেছে শুনিয়া তিনি বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধে যান এবং সাধুকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। সাধু যে একজন প্রতারক যে সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। মিঃ মায়ার যখন এই সব কথা বলেন, তখন তিনি সত্য কথা বলেন না। কারণ ইহার প্রায় ১৯ মাস পরে ১৯২২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার কোন সবজজের আদালতে তিনি এইরূপ সাক্ষ্য দেন (একজিবিট ২৯০)—

"আমি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতাম।

প্রশ্ন :—যে সাধু এখানে আসিয়াছেন এবং যাহাকে লোকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া বলিতেছে, তাঁহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন ?

উঃ—হাঁ, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমি সাধুকে রাস্তায়

দেখিয়াছি। আমি যতদূর তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে ঐ সাধু দ্বিতীয় কুমার কি না, তৎসম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু আমার ধারণা, সাধু দ্বিতীয় কুমার নহেন। কিন্তু আমি এই সরকারী উকীলকে এবং কোর্টের জজকে যে ভাবে দেখিতেছি, সেইভাবে ৫ মিনিটের জন্য যদি তাঁহাকে দেখিতে পারি এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিব, সাধু ঢাকায় আসার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই।"

আমার কোন সন্দেহ নাই যে, মিঃ মায়ার দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতেন। তিনি জজকে যেভাবে দেখিতেছিলেন, সেইভাবে যদি সাধুকে দেখিতেন এবং ৫ মিনিটকাল আলাপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাদী মেজকুমার কি না তাহা তিনি বলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কখনও করেন নাই। সুতরাং বাদীকে সনাক্ত করা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের মত নহে এবং তাহা কোন কাজেই লাগিবে না।

উহা জবানবন্দীর নকল বলিয়া তিনি তাহা নিজের জবানবন্দী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

উপরোক্ত জবানবন্দীর পর বাদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের আর একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এই কথা তিনি বলেন এবং তাহা অস্পষ্টভাবে বলেন—যদিও বাদী ১৯২১ ও ১৯২২ সালে ঢাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

মিসেস মায়ার কমিশনে সাক্ষ্য দেন। মিঃ মায়ার

যখন জয়দেবপুরে ছিলেন, তখন এই সাক্ষী নিশ্চয়ই মধ্যমকুমারকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ মায়ার জয়দেবপুরে থাকা কালেই সাক্ষী ইংলণ্ডে চলিয়া যান; ইহার পর আর কখনও তিনি জয়দেবপুরে যান নাই। ১৯০৪ সালে মিসেস মায়ার জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন।

এই সাক্ষী বলেন,—সাধু মধ্যমকুমার নহেন। সাক্ষী বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের উপর সাধুকে দেখিয়াছিলেন। মধ্যমকুমারকে দেখিবার মনোভাব লইয়া সাক্ষী সাধুকে দেখিতে যান নাই। সাধুকে সাধু হিসাবে দেখিবার জন্যই সেখানে তাঁহার যাওয়া বাঁধের উপর সাধুকে এই সাক্ষী বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এত নিকটে কোনও সাধুকে পান নাই। মিঃ মায়ারের পক্ষে হয় তো অন্য কারণ থাকিতে পারে।

বাঁধের উপর থাকিবারকালে কিম্বা তাহার পরেও সাধুকে কেহ মধ্যমকুমার বলিয়া চিনিতে পারে নাই। সাধুর গায়ের ভস্ম না ধোওয়া পর্য্যন্ত বাদী যে মধ্যমকুমার, এ বিষয় কেহ গভীরভাবে ভাবিবার অবসর পান নাই। ভস্ম ধোওয়ার পর কেহ আর সে বিষয় সন্দেহের চক্ষে দেখেন না অথবা সে সম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা ভাব আসে না। কুমারের বিষয় যতটা স্মরণ রাখা এই মহিলার পক্ষে সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়, তাহাতে মনে হয়, উক্ত মহিলা প্রকৃতপক্ষে যদি দ্বিতীয় কুমার সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট না যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমার বলিয়া সন্দেহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আরও

সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমার বলিয়া ধরিয়া লইয়াও যদি এই নাইল বাঁধে অথবা রাস্তায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া থাকেন তাহাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ সে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় কেউ সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই মহিলাকে এমন অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং সেগুলি যেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বের স্মৃতি হইতেই বলিতেছেন যাহা ভবিষ্যৎ কোনও মামলার বিষয়বস্তুর উপযোগী হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি ; যথা—এই মহিলা বলিয়াছেন যে, জয়দেবপুর থাকাকালে তিনি সেখানে মিঃ হোয়ার্টনকে দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু মিঃ হোয়ার্টন ১৯০১ সালের জুলাই মাসের শেষে জয়দেবপুর ত্যাগ করেন (৪নং একজিবিট)। অবশ্য মিঃ হোয়ার্টনের পদত্যাগপত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই। এই মহিলা সাক্ষী আরও বলেন যে, কুমারেরা বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। কিন্তু বাদীপক্ষের জেরার দায় এড়াইবার জন্য মধ্যমকুমার সম্বন্ধে বিবাদিগণ প্রমাণ করিতে চান যে, কুমারেরা বেশ ভাল ইংরেজী জানিতেন এবং বাদী ইংরেজীর সামান্য উচ্চারণও জানিতেন না। এ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইবে।

(৬) বিবাদীপক্ষের ২৮০নং সাক্ষী আল্‌তা দেবী ইহাকে সুকুমারী বলিয়াও ডাকা হইত।

এই সাক্ষী বাদিনী বিভাবতী দেবীর (মধ্যমরাণী) মাতুল রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। ইহার পিত্রালয়ে পরে মধ্যমরাণীর মাতা এবং তাঁহার সন্তানগণ থাকিতেন। ১৩১৩

সালে সুকুমারী দেবীর বিবাহ হয় ; কিন্তু সাক্ষী বলেন, তিনি বিবাহের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে যান নাই। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মধ্যমকুমারকে প্রথম দেখেন। তাঁহার এ উক্তি ঠিক বলিয়া মনে হয়। সাক্ষীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই সাক্ষী মধ্যমকুমারকে অন্ততঃ বারো-বার দেখিয়াছেন। বাদীর বোস পার্কে থাকাকালে সাক্ষী সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দেখেন। সেই বাড়ী সাক্ষীদেব বাড়ীর লাগোয়া। সাক্ষী তাঁহার শুইবার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া বাদীকে দেখিতেন। ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না ; কারণ, যেমন প্রকৃত লোকের সম্বন্ধে তেমনই প্রতারকের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল একই প্রকারের হয়। কিন্তু যখন সাক্ষী আমার আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন, বাদী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান ; সাক্ষী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ ভাল করিয়া বাদীকে দেখেন। জবানবন্দীর সময় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় :—

প্রঃ। ইনি কি মধ্যমকুমার ?

উঃ। আমি মুখের চেহারায় কোনই মিল দেখিতে পাইতেছি না।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় পর্য্যন্ত সাক্ষী একদৃষ্টে বাদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষী নিশ্চয়ই প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় জন্য অপেক্ষা করেন নাই ; আর সেই জন্যই তিনি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বলিতে পারেন নাই যে, কেন "এই লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।" যে দিক দিয়াই দেখা হউক, ইহা স্পষ্ট প্রমাণ

সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমার বলিয়া ধরিয়া লইয়াও যদি এই নাইল বাঁধে অথবা রাস্তায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া থাকেন তাহাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ সে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় কেউ সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই মহিলাকে এমন অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং সেগুলি যেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বের স্মৃতি হইতেই বলিতেছেন যাহা ভবিষ্যৎ কোনও মামলার বিষয়বস্তুর উপযোগী হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি; যথা—এই মহিলা বলিয়াছেন যে, জয়দেবপুর থাকাকালে তিনি সেখানে মিঃ হোয়ার্টনকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ হোয়ার্টন ১৯০১ সালের জুলাই মাসের শেষে জয়দেবপুর ত্যাগ করেন (৪নং একজিবিট)। অবশ্য মিঃ হোয়ার্টনের পদত্যাগপত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই। এই মহিলা সাক্ষী আরও বলেন যে, কুমারেরা বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। কিন্তু বাদীপক্ষের জেরার দায় এড়াইবার জন্য মধ্যমকুমার সম্বন্ধে বিবাদিগণ প্রমাণ করিতে চান যে, কুমারেরা বেশ ভাল ইংরেজী জানিতেন এবং বাদী ইংরেজীর সামান্য উচ্চারণও জানিতেন না। এ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইবে।

(৬) বিবাদীপক্ষের ২৮০নং সাক্ষী আল্‌তা দেবী ইহাকে সুকুমারী বলিয়াও ডাকা হইত।

এই সাক্ষী বাদিনী বিভাবতী দেবীর (মধ্যমরাণী) মাতুল রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। ইহার পিত্রালয়ে পরে মধ্যমরাণীর মাতা এবং তাঁহার সন্তানগণ থাকিতেন। ১৩১৩

সালে সুকুমারী দেবীর বিবাহ হয়; কিন্তু সাক্ষী বলেন, তিনি বিবাহের পর তুই বৎসর পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে যান নাই। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মধ্যমকুমারকে প্রথম দেখেন। তাঁহার এ উক্তি ঠিক বলিয়া মনে হয়। সাক্ষীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই সাক্ষী মধ্যমকুমারকে অন্ততঃ বারো-বার দেখিয়াছেন। বাদীর বোস পার্কে থাকাকালে সাক্ষী সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দেখেন। সেই বাড়ী সাক্ষীদেব বাড়ীর লাগোয়া। সাক্ষী তাঁহার শুইবার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া বাদীকে দেখিতেন। ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কারণ, যেমন প্রকৃত লোকের সম্বন্ধে তেমনই প্রতারকের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল একই প্রকারের হয়। কিন্তু যখন সাক্ষী আমার আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন, বাদী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান; সাক্ষী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ ভাল করিয়া বাদীকে দেখেন। জবানবন্দীর সময় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়:—

প্রঃ। ইনি কি মধ্যমকুমার?

উঃ। আমি মুখের চেহারায় কোনই মিল দেখিতে পাইতেছি না।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় পর্য্যন্ত সাক্ষী একদৃষ্টে বাদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষী নিশ্চয়ই প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় জন্ম অপেক্ষা করেন নাই; আর সেই জন্যই তিনি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বলিতে পারেন নাই যে, কেন "এই লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।" যে দিক দিয়াই দেখা হউক, ইহা স্পষ্ট প্রমাণ

হয়, যে, সাক্ষী জেরায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সময়ে সেই সেই কথাই ভাবিতেছিলেন।

প্রঃ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি বড় জোর এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, বাদী মধ্যমকুমার হইতেও পারেন, না-ও হইতে পারেন।

সাক্ষী নিরুত্তর)

প্রঃ। বাদী যে মধ্যমকুমার একথাও আপনি বলিতে পারেন না ; আবার বাদী যে মধ্যমকুমার নহেন, তাহাও আপনি বলেন না ?

(সাক্ষী পুনরায় নিরুত্তর)

প্রঃ। কি প্রকারে নাক এত প্রশস্ত হইল ? মুখশ্রী হয় তো, সকলেরই পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু নাকের কোন পরিবর্ত্তন আসে কি ?

এই সময় বিবাদীপক্ষের উকীল কিঞ্চিৎ বাধা দিয়া বলিলেন,— "সাক্ষী সে কথা বলিয়াছেন। নাক এবং চক্ষুর পরিবর্ত্তন হয় না। সাক্ষী শুনিতে পান সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরেই কথাগুলি বলা হইয়াছিল। তারপর আমার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। নাক এবং চোখের পরিবর্ত্তন হয় কি ? সাক্ষীর বক্তব্য সমর্থন করিবার পক্ষে ইহা এক সাধারণ প্রতিবাদ্য বিষয়। নাক কি করিয়া এত প্রশস্ত হয় ? এই প্রশ্নে একদিকে যেমন মনে সন্দেহ আনে, অন্যদিকে তেমনি এমন একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, যদ্বারা বিবেকে কোনও খটকা লাগিয়াছে কি না, তাহা সহজেই ধরা যায়। যখন হইতে

সাক্ষী কুমারকে চিনিতেন বলিয়া বলেন, ঠিক তাহারও পূর্ব্ব হইতে যদি কুমারকে তিনি চিনিয়া থাকেন, আমি তাহার ঐ উত্তরকে সন্দেহ বলিয়া ধরিব না; কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন কুমারকে সনাক্ত করণ সম্পর্কে এই সাক্ষীর সাক্ষ্যের কোনও মূল্য নাই।

... ...

অতুলপ্রসাদ রায় চৌধুরী (৪৩) একজন কমিশন সাক্ষী। বাদীর সহিত কাশিমপুর ও জয়দেবপুর গমনের প্রসঙ্গ সম্পর্কে ইহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মামলার শেষে তাঁহার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে এই সাক্ষী এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার একজন গোমস্তাকে পাঠাইয়া জানান যে, তিনি অসুস্থ। তিনি নিজে বাদীকে কাশিমপুর অথবা জয়দেবপুর লইয়া যান নাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদী অদ্ভুত রকমের কঠিন হিন্দী বলিতেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বাদী জয়দেবপুরে তাঁহার নাম সুন্দরদাস বলিয়া বলিয়াছেন। যদিও ২৭শে জুনের পাঞ্জাব রিপোর্টে প্রথম ঐ নামের উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে তাঁহার সাক্ষ্যের আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা হইবে, যাহাতে তাঁহাকে একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হইবে।

দুই রাণী ও সত্যবাবু ভিন্ন ইহাই সমস্ত সাক্ষী। অবশ্য নায়েব এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী (যাহাদের উপর আদেশ ছিল যে, কেহ যেন বাদী পক্ষে সাক্ষী না দেয়) এবং প্রজা সাক্ষী-দিগকে (নায়েবগণ যাহাদিগকে রায়সাহেবের 'নমূনা সাক্ষ্যে

পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য সঙ্গে লোক দিয়া পাঠাইয়াছিলেন) ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ফণীবাবু, তাঁহার ভগ্নী এবং ভগ্নীর জামাতা (যিনি এষ্টেটে চাকুরী করেন) ভিন্ন আর কোন আত্মীয় বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দেন নাই। মেজরাণীর নিজের লোকের মধ্যে একমাত্র তাঁহার এক আত্মীয়া, যিনি তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সে মেজকুমারকে শেষবার দেখেন এবং যাঁহার অস্বীকৃতি প্রায় স্বীকারোক্তির কাছাকাছি আসিয়াছিল এবং এক ব্যক্তি যিনি তহবিল তছরুপের অপরাধে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন—এই দুই জন ভিন্ন উত্তরপাড়া হইতে আর কেহ সাক্ষ্য দেন নাই। সূর্য্যবাবু ও রামবাবুর বিধবা পত্নীদ্বয় (মেজরাণীর মামীমা) এখনও জীবিত। একমাত্র মিঃ এস, পি, ঘোষ ভিন্ন এমন একজন নিরপেক্ষ পদস্থ লোক নাই, যিনি কুমারকে চিনিতেন ও তখনও কুমারের কথা স্মরণ ছিল এবং তাঁহার সম্পর্কে কোন ভুল হইত না। অপরপক্ষে কুমারের ভগ্নীর সাক্ষ্য, তাঁহার বিশ্বাষের সততা শুধু তাঁহার উক্তির উপর নির্ভর করে নাই। ৪ঠা ও ৫ই মে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহার ইঙ্গিত নীডহ্যামের রিপোর্টে রহিয়াছে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—সেই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, এতদ্ভিন্ন বহু লোকের আচরণ, নিরপেক্ষ বহু স্ত্রীপুরুষের হলপান জবানবন্দী—এমন কি রাণীর নিজের একজন আত্মীয় ও মামীমার সাক্ষ্যও—যাঁহাদের সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই এবং যাঁহাদের কুমারকে ভুল করিবার সম্ভাবনা—ইহা সমর্থন করে প্রত্যেকেই কুমারের ভগ্নী নহেন। অবশ্য বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণ

বাদীর চেহারার সহিত কুমারের চেহারার সাদৃশ্য নাই একথা বলিয়াছেন। রাণী ও তাঁহার ভাই সাদৃশ্যের কথা অস্বীকার করিয়াছেন; এই রাণীর অস্বীকারের বিষয় এবং কুমারের তথাকথিত মৃত্যু সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে হইবে। সাক্ষিগণ কিরূপ বিশ্বাসযোগ্য, তাহারা কিরূপ পদস্থ, তাহার উপর ইহার মীমাংসা কিছুই নির্ভর করে না। শরীর ও মন সম্পর্কে বাদী ও বিবাদীপক্ষ যে সব বৈষম্য ও সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন পরীক্ষায় যদি তাহা টিকে, বাদীর শরীরের চিহ্নাদি দ্বারা—যাহা একত্রিতভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে সম্ভব হয় না, যদি তাহা সমর্থিত হয়, মৃত্যুর কাহিনী যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে রাণী ও তাঁহার ভাইয়ের অস্বীকারে বাদীর কোন ক্ষতি হইবে না। ভাইয়ের সম্পর্কে রাণীর নিজস্ব কোন মত নাই।

চেহারার তুলনা

(ক) ফটোগ্রাফ, (খ) জুতা প্রস্তুতকারক, দর্জ্জি প্রভৃতির লিখিত বিবরণ, (গ) অর্ডারী জুতা জামা, (ঘ) বিতর্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল কাগজপত্রে কুমারের আকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছিল,—(এই ক্ষেত্রে উহা হইতেছে বীমা কোম্পানীর ডাক্তারের রিপোর্ট (ঙ) বিতর্ক আরম্ভের পর কিন্তু উহা চরমে উঠিবার পূর্ব্বে যে সকল কাগজপত্রে কুমারের আকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে, (চ) যাঁহারা কুমারকে চিনিত তাহাদের মৌখিক সাক্ষ্য—এই সকল বিষয় হইতে বুঝা যায় কুমারের আকৃতি কিরূপ ছিল।

সত্যবাবু বলিয়াছেন,—কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ দুই তিন বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয়ান দর্জ্জি এবং জুতা ও জিন প্রস্তুতকারক প্রভৃতির নিকট বিস্তৃত তদন্ত করিয়াছেন। সত্যবাবুও ঐ সকল তদন্তে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ চৌধুরী তদন্তের কাগজপত্র নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল তদন্তে যাহা পাওয়া গিয়াছে বিবাদী পক্ষ তাহার কোন বিষয় প্রমাণ করেন নাই। মিঃ চৌধুরী শুধু কুমারের পায়ের মাপ সম্পর্কে মিঃ এস, জে, ঘোষালকে প্রশ্ন করিয়াছেন। সওয়ালের সময় মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, বাদীর পা দেখিয়া মনে হইয়াছিল তাঁহার জুতা বড়, তাই বাদীকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করিয়া মিঃ ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বীমার কাগজপত্রে মেজকুমারের চেহারায় যে সকল বর্ণনা আছে বাদীই তাহার উপর নির্ভর করিয়াছেন—বিবাদীপক্ষ উহার উপর নির্ভর করেন নাই। বাদী ১৯২১ সালের ৪ঠা মে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্টে সত্যবাবু ঐ সংবাদ পান, তিনি ৬ই মের পূর্ব্বে ঐ সংবাদ পাইতে পারেন না। ঐ সংবাদ পাইয়াই সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, মেজকুমারের মৃত্যুর প্রমাণগুলি যেন সযত্নে রাখা হয়। তিনি মিঃ লেথব্রিজকে বীমার এফিডেভিট দিলেন এবং কুমারের মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ১৫ই মে তারিখের পূর্ব্বেই একজন ব্যারিষ্টার লইয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন। মিঃ লেথব্রিজ ১০ই মে তারিখে বীমা কোম্পানীর

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ

নিকট মূল কাগজপত্রের জন্য লিখেন; বীমা কোম্পানী মিঃ লেথব্রিজকে জানান যে, ঐ সকল কাগজপত্র স্কটল্যাণ্ডে আছে। কাগজপত্র স্কটল্যাণ্ড হইতে পাঠান হয় ও উহা ১৪।৭।২১ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে দেওয়া হয়। রেভিনিউ বোর্ড ঐ সকল কাগজপত্র ও মেডিকেল রিপোর্ট ১৫।৭।২১ তারিখে ফেরত পাঠাইয়া বলেন, উহা কোনও পক্ষের নিকট থাকিতে পারিবে না; উহা বীমা কোম্পানীর নিকট থাকিবে এবং প্রয়োজন মত উহা বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে আনন হইবে। মামলা চলিবার সময় বিবাদীপক্ষ বীমা কোম্পানীর নিকট এই ছয়খানা কাগজ তলব করেন:—মৃত্যুর দুইখানি সার্টিফিকেট, সৎকারের দুইখানি সার্টিফিকেট এবং ঐ পরিচয়ের দুইখানি সার্টিফিকেট; তাঁহারা ডাক্তারী রিপোর্ট তলব করেন নাই। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় ১৯৩৪ সালে বাদীপক্ষ ডাক্তারী রিপোর্ট তলব করেন এবং ১৯৩৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর উহা এডিনবরা হইতে পাসে। বীমার কাগজ পত্রের মধ্যে যাহাতে কুমারের চেহারার বর্ণনা আছে তাহা বাদীপক্ষ দাখিল করেন। কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল এই মর্ম্মে বিবাদীপক্ষ যে এফিডেভিট দাখিল করিয়াছেন, বাদীপক্ষ বলেন তাহাতে বরং প্রমাণ হয় যে, যে দেহ দাহ করা হইয়াছিল, তাহা কুমারের দেহ নহে। কুমারের আকৃতি সম্পর্কে বাদীপক্ষ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও একখানা এফিডেভিট দাখিল করিয়াছেন; মিঃ চৌধুরী প্রথমে বলিয়াছেন, তিনি ঐ এফি-

ডেভিট মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু পরে তাহারা ঐ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

কুমার যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, বাদী-পক্ষ তাহার উপরও নির্ভর করিয়াছেন বাদীপক্ষ যে পুরাতন জুতা ও পোষাক আদালতে দাখিল করিয়াছেন। তাহা যে কুমারের—সেই সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নাই। পরে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করিব। দর্জ্জি, জুতা প্রস্তুত কারক প্রভৃতি-দের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল, বিবাদীপক্ষ তাহার প্রায় কোনওটির যে প্রমাণ করিতে চাহেন নাই তাহাও সত্য। ঐ সকল তথ্যের মধ্যে শুধু একটি বিষয়, অর্থাৎ কুমারের পায়ে ৬ নম্বরের জুতা লাগিত—শুধু এই বিষয়টি তাঁহারা প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল, বাদীর পায়েও ৬ নম্বরের জুতাই লাগে বিবাদীপক্ষের কৌঁশুলী বলিয়াছেন, বাদীর পা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, বাদীর পা বড় তাই তাঁহারা ঐ সম্পর্কে বাদীকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, মিঃ ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিধবা স্ত্রীলোকেরা স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের স্বামীর জুতা, কোট ইত্যাদি যাহা রক্ষা করে, বিবাদী পক্ষ তাহার কিছুই আদালতে দাখিল করেন নাই। রাজবাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণের জিনিষপত্র এখনও রাখা হইয়াছে, কুমারদের স্ত্রীরা তাহা দেখিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যসুলভ মমত্ববোধে না হউক, অন্ততঃ তাহা দেখিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীদের জিনিষপত্র ঐরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন।

ইন্‌সিওরেন্সের কাগজপত্রের কথা আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আমি এখন ফটোগ্রাফ ও মৌখিক সাক্ষ্য আলোচনা করিব। ফটোগ্রাফের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমি চেহারা সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিব; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, ফটোগ্রাফে কোন কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী এই বর্ণনা দিয়াছেন ঃ—

তাঁহার নিজের সম্পর্কে বর্ণ—গৌর, চক্ষু—কটা, বিশেষ বিবরণ বলিতে পারেন না, চুল—কটা, ফিকে বাদামী।

মেজকুমারের বর্ণ—গৌর, লালচে ও হলদে আভা আছে; চক্ষু—কটা, বাদীর ন্যায়, চুল—কটা বাদামী, বাদীর ন্যায়।

ছোটকুমার—বর্ণ ফর্সা, গোলাপী আভা আছে; চক্ষু—কটা, ফিকে নীল, চুল কটা, ফিকে বাদামী।

বুদ্ধু—বর্ণ,—মেজকুমারের মতই ফর্সা তবে তাহার ন্যায় তেমন লালচে আভা নাই; চক্ষু—কটা, নীল, চুল—কটা, মেজকুমারের ন্যায় ছোটকুমার অপেক্ষা কালো।

এককথায় বলিতে গেলে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মতে মেজ-কুমারের শরীরের বর্ণ, চক্ষু ও চুল বাদীর ন্যায় তাঁহার মতে মেজকুমার ও বাদী একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা নয় তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আরও বলেন, এখন বাদী একটু ময়লা হইয়াছেন, কিন্তু ১৯২১ সালে তাঁহার রং আরও ফর্সা ছিল তিনি বলেন, বাদীর নাকও ঠিক মেজকুমারের

নাকের ন্যায়, যদিও কেহ কেহ বলে বাদীর নাক মেজকুমারের নাকের চেয়ে চ্যাপটা তাহার মতে বাদীর নাক চ্যাপটা নয় ;— তবে বাদী এখন মোটা হইয়াছেন, তাই নাকও মোটা হইয়াছে। আকৃতি বিচারে তাঁহার সাক্ষ্য মূল্যহীন, কারণ তিনি বাদীকে কুমার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে অন্য দুই জনের চেহারার তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা কাজে আসিবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, তাঁহার, মেজকুমার ও ছোটকুমারের গায়ের রং একরূপ—উহা সাহেবী. অর্থাৎ ইংরাজদের গায়ের রং যেরূপ, তাঁহাদের গায়ের রংও সেইরূপ তাহাদের চুল বাদামী রংএর এবং চক্ষু কটা—বাঙ্গালীদের মত কালো নয়।

চক্ষু ও চুল বিশ্লেষণ

মামলার বিচারকালে এক সময়ে মিঃ চৌধুরী 'কটা' শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক তুলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার নিজের পক্ষের সাক্ষীই বাদীর চক্ষু এবং মধ্যমকুমারের চক্ষু একই রকমের 'কটা' বলিয়া বর্ণনা করে এবং তারপর যখন ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মধ্যমকুমারের চক্ষু সেখানে 'ধূসর' বলিয়া লেখা আছে, তখনই বাদীপক্ষ কর্ত্তৃক কুমারের চক্ষুকে নীলবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিবাদীপক্ষের মামলা সেখানেই শেষ হইয়া যায়। এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মিঃ এস, পি ঘোষ (কমিশনে গৃহীত সাক্ষী), ১৯৩২ সালে সাক্ষ্যদানকালে মধ্যমকুমারের তাঁহার

ভগ্নীর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর, ছোটকুমারের এবং বুদ্ধুর চক্ষু 'কটা' রকমের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। চুলের এবং চক্ষুর সমালোচনাকালে আমি পুনরায় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। সেই সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে,—চক্ষুর সম্বন্ধে বলিতে হইলে 'কটা' শব্দ এবং 'করঞ্জা' শব্দ, একমাত্র কালো রং ব্যতীত, আর সকল রংএর সম্বন্ধেই বলা যায়। 'কটা' বা 'পিঙ্গলা' শব্দের 'নীলাভ' বা কোনও নির্দ্দিষ্ট রং অর্থ নিষ্পন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, পরে তাহা পরিত্যক্ত হইলেও, সে প্রকার প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

চেহারা ও গায়ের রং

ইহা কোনও প্রকারেই স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরা যায় না যে, মধ্যমকুমারের, ছোটকুমারের, বুদ্ধুর এবং হিরণ্ময়ী দেবীর চেহারা একই রকমের ছিল অর্থাৎ শরীরের রং অত্যন্ত ফর্সা, বাদামী রংয়ের অথবা বাদামী আভার রং বিশিষ্ট চুল এবং কটা চক্ষু। এদেশে ঐ ধরণের অথবা অন্য প্রকারের ফর্সা রং সহজে মানুষের নজরে পড়িলেও, বিবাদীপক্ষের সাক্ষী রমানাথ রায় (কমিশন সাক্ষী) মধ্যমকুমারের এবং বুদ্ধুর গায়ের রংএর মধ্যে কোনই সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই। তিনি এ বিষয় একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। বাদীর একজন সাক্ষী তিনজনের চেহারার সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বর্ণান্ধ। অর্থাৎ বর্ণবিচারে অক্ষম কি না? এই সাক্ষীর পর শত শত সাক্ষী তিনজনের গায়ের

রং সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণও যখন রং একরূপ বলিয়া স্বীকার করেন এবং কেহই যখন তৎসম্বন্ধে অন্যমত প্রকাশ করেন না, তখন আর বর্ণ এক নহে বলিয়া কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না ; তখন তাহা স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী শরৎ ব'লয়াছে,—বুদ্ধু, ছোটকুমার এবং মধ্যমকুমার—তিনজনের গায়ের রং একই ছিল। কিন্তু তিনজনের মধ্যে মধ্যমকুমার একটু বেশী ফর্সা ছিলেন। তিন-জনের চুলের রংও একই রকমের 'লালচে' ছিল। বাদীর চুলও 'লালচে' রংয়ের।

লেফটনাণ্ট হোসেন বলেন,—বুদ্ধু দেখিতে অনেকটা মধ্যম-কুমারের মতই ছিলেন। মধ্যমকুমারের, বুদ্ধুর এবং ছোট-কুমারের গায়ের রং, চক্ষু এবং চুল যে প্রকারের ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। বাদীপক্ষের সাক্ষিগণ যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন চেহারা দেখা যায় না—লেফটনাণ্ট হোসেনের সাক্ষ্যে ঐ উক্তি সমর্থিত হয়। সাক্ষীরা হয় তো দেশবিদেশে ভ্রমণ করে নাই ; কিন্তু লেফটনাণ্ট হোসেন তাহা করিয়াছেন। আর সাক্ষীরা বাঙ্গালীদের কথাই কহিতেছেন।

বিবাদীপক্ষের ৩৬নং সাক্ষী কলিমদ্দী বলে,—"আমি বুদ্ধু বাবুকে দেখিয়াছি। ছোটকুমারের চেহারাও আমার মনে আছে। তাঁহাদের এবং মধ্যমকুমারের চেহারা প্রায় একই রকমের ছিল। আমি আর কাহারও তেমন চেহারা দেখি নাই।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী এস, পি ঘোষ কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে বলেন,—"মধ্যমকুমার, ছোটকুমার, বুদ্ধু এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সকলেরই চক্ষু, চুল, এবং গায়ের রং একই রকমের ছিল।

বস্তুতঃ তাঁহাদের চেহারা এমনই অস্বাভাবিক ছিল যে, বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী (৮২নং সাক্ষী) সত্যই বলিয়াছেন যে, মধ্যমকুমারকে সাহেব-সুবো'র মত দেখাইত। এ দেশের লোকের মত দেখাইত না। আমার মনে হয় সাক্ষী সত্যই বলিয়াছিলেন।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং মামলার অবস্থা ও ঘটনা পরম্পরা হইতে বেশ বুঝা যায়, মধ্যমকুমারের সহিত বাদীর সাদৃশ্য আছে। বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, উভয়ের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে। "প্রথম দৃষ্টিতে বাদীকে সেই ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।" (বিবাদীপক্ষের ৩৩৬নং সাক্ষী) ; আর একজন সাক্ষী বিবাদীপক্ষের ১০১নং সাক্ষী) বলিয়াছেন,—"বাদী যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিব।" আর একজন সাক্ষী (বিবাদীপক্ষের ৩৮৬নং সাক্ষী বলেন,—"খুব নিকটে যাইয়া ১৫।২০ মিনিটকাল বাদীকে দেখিবার পর আমার মনে হইল,—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং অপর সকলে ভুল করিয়াছেন।" সুকুমারী দেবী (বিবাদী পক্ষেব ২৮০নং সাক্ষী) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি করিয়া নাক এমন চওড়া হইল ?"

এক্ষেত্রে এই ধরণের উক্তি আর বাহুল্যভাবে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সাক্ষী-

দিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উক্তিতে এমন এক বিষয়ের আভাষ দেওয়া হইয়াছিল যে, সেরূপ আভাষ পাওয়া না গেলে ঐ সকল উক্তি উদ্ধৃত করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না।

বাদী ও কুমারের তুলনা

বিবাদীপক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী উল্লেখ করেন যে, ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে বেশ ভদ্রলোকের মত দেখাইত; আর এই বাদীকে "এক বিশালকায় পালোয়ানের" মত দেখায়। সংক্ষেপে বাদীকে বেশ মোটা বলিতে পারা যায়। উভয়ের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী ইহাও বলিতে পারেন যে, কুমারের বয়স ছিল ২৫ বৎসর; আর এই লোকটির বয়স ৫২ বৎসর।

বাদীর শরীরের বর্ণ সম্পর্কে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। বাদী দেখিতে অতিশয় ফর্সা। এই ফর্সা রং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি ময়লা হইয়াছে বটে; তাহা হইলেও একটু খানি রক্তিম আভা রহিয়া গিয়াছে। বাদী ও কুমারের মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য দেখাইতে গিয়া বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণ কেবলই এই রক্তিমাভার উপর জোর দিতেছিলেন। এই রক্তিমাভা এবং তাহার রং যে ইতিমধ্যে অনেকটা ময়লা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই কথা উঠিয়াছে যে, দ্বিতীয় কুমারের শরীরের রং ছিল পীতাভ; কিন্তু এই বাদীর রং কেবল যে লাল তাহা নহে, কিঞ্চিৎ ময়লা।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন যে, বাদীর রং ইতিমধ্যে অধিকতর

ময়লা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ১৯২১ সালে তিনি যখন জয়দেবপুরে আসেন তখন তিনি স্বাভাবিক অপেক্ষাও অধিকতর ফর্সা ছিলেন। এই সাক্ষ্য উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কেহ বলেন নাই যে, বর্ত্তমান মামলার বাদী, কুমার অপেক্ষা কম ফর্সা। পক্ষান্তরে এমন কথাও বলা হইয়াছিল যে, বাদীর রং কুমারের রং হইতেও ফর্সা। একখানি পুস্তিকায় এরূপ কথাই বলা হইয়াছিল। (বাদীপক্ষের ৩৪নং সাক্ষী) কুমারের শরীরের বর্ণ সম্পর্কে শত শত সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন ; কিন্তু এমন কথা কেহ বলেন নাই যে, বাদীর রং কুমারের রং হইতে ময়লা। বাদীপক্ষের ৪৩৮নং সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯২১ সালের মে মাসে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াই তিনি বাদীকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। জেরার সময় এই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ—

প্রশ্ন—খুব ফর্সা রংয়ের একটি লোক বসিয়া আছে, তাহাই আপনি দেখিয়াছিলেন ? উত্তর—হাঁ, সকলেই তাঁহার দিকে উৎসাহ সহকারে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহা হইতে আমি বুঝিলাম যে, তাহারা কুমারকে দেখিতে আসিয়াছেন।

প্রঃ—ইহা হইতে এবং কুমারের ন্যায় ফর্সা একটি লোক, এই ধারণা হইতে আপনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, এই লোকটিই দ্বিতীয় কুমার ? উঃ—হাঁ, তাহার আকৃতি হইতে।

শরীরের রং কিরূপ ছিল

বাদী ও কুমারের মধ্যে প্রভেদ সম্পর্কে প্রথমতঃ যে কথা

উঠে তাহা এই যে, দ্বিতীয় কুমার ছিলেন রক্তাভ শ্বেতবর্ণ কিন্তু বাদীর রং হইতেছে কেবল "শ্বেতবর্ণ"। কমিশনে অতুলবাবু যে জবানবন্দী দিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রভেদের কথাই তিনি বলিয়াছেন এই কথাগুলির মধ্যে উপরোক্ত কথাটিও আছে। শৈবলিনী দেবীই সর্ব্বপ্রথম পীতবর্ণের কথা উত্থাপন করেন। তাঁহার মতে দ্বিতীয় কুমার ছিলেন পীতবর্ণ অথবা পীতাভ; কিন্তু বাদী হইতেছেন লাল; এমন কি অতিরিক্ত লালবর্ণ।

সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সাহস করিয়া কুমারের শরীরের রং সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। তবে এইরূপ ভাবে কথাটা তুলিয়াছিলেন— দ্বিতীয় কুমারের মুখের রং ফর্সা হইলেও কতকটা লাল ছিল; রোদে পোড়ার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল "রোদেপোড়া" এই কথাটি কৌঁসুলীর নিজেব কথা। আসলে ইহা প্রমাণিত হইতে চলিয়াছিল যে, দ্বিতীয় কুমার ছিলেন পীতাভ, রাণী ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় কুমারের শরীরের বর্ণ এমনই ফর্সা যে, ইংরাজের নিকটেও তাহা ফর্সা বলিয়া মনে হইত। অতএব মুখমণ্ডলে যে রক্তিমাভা, তাহা ছিলই; তবে রোদে পোড়ার দরুণই তাহা হইয়াছিল।

রোদে পোড়ার কথা পরে আলোচনা করিব। তবে আপততঃ যাহা বিচার করিতে হইবে, তাহা এই যে, দ্বিতীয় কুমারের শরীরের রং ছিল ফর্সা এবং পীতাভ; তিনি রোদে

পোড়া ছিলেন বলিয়া তাহার মুখমণ্ডলে ছিল একটা জ্যোতিঃ। বয়োবৃদ্ধির ফলে শরীরের রং অপেক্ষাকৃত ময়লা হইয়া যায়, এই অনুভূতি হইতেই বিবাদীপক্ষ পরে বলিয়াছেন, বাদীর রং যেন কুমারের রং হইতে কালো বলিয়া মনে হয়। বাদীপক্ষের ৪৩৮নং সাক্ষীর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই বাদী কুমারের ন্যায় ফর্সা কি না। এতদ্দ্বারাই রংয়ের প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিবাদীপক্ষ মামলার শুনানীর সময় ভাবিয়া চিন্তিয়া রংয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বাদীপক্ষের এক আবেদনের উত্তরে ৯।৮।৩৬ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষ এক আবেদন (ফাইলের ৩২০৪ নং কাগজ) করেন এবং তাহাতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য—১নং বিবাদী দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্যে বর্ণিত বিষয় হইল এই যে, কুমার ছিলেন অতি ফর্সা; সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার একটা পীতাভা ছিল এবং মুখমণ্ডলে একটুখানি রোদে পোড়ার চিহ্ন ছিল। তারপর বিবাদীপক্ষ বলিয়া আসিয়াছেন যে, বাদী মোটের উপর কুমার হইতে কম ফর্সা; উভয়ের বর্ণের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে; তবে একদিন পরে হয়ত, অনেকেই সেই প্রভেদটা ধরিতে পারিবে না; আর ধরিতে পারিলেও সেই প্রভেদ কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না।

দুধে-আলতা রংএর কথা

দ্বিতীয় কুমারের সম্পর্কে একটা বিষয়ে সকলেই একমত যে, তাহার শরীরের রং ছিল অতি আশ্চর্য্য রকমের। একজন

মহিলা এই রংকে "দুধে-আলতা রং বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন, গোলাপী রং। বারবারই এই রংয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শুনানীর প্রথম হইতেই এই বর্ণকে ভিত্তি করিয়া বাদী ও কুমারের পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। উভয়েই ফর্সা; তবে এই ফর্সার মধ্যেও একটু রকমফের আছে। এই বাদী শ্বেতবর্ণ; কিন্তু কুমার ছিলেন লাল; কুমারের বর্ণের মধ্যে একটা পীতাভা ছিল; কিন্তু এই বাদীর তাহা নাই।

১৯২১ সালে এবং তৎপরে বাদীর শরীরের রং কিরূপ ছিল, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণের নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পাই :—

"অতি সুন্দর পরিষ্কার চামড়া"—মিঃ লিণ্ডসে।

"স্বাস্থ্যের পরিচায়ক শ্বেতবর্ণ"—মিঃ গুপ্ত (বিবাদীপক্ষের ২৫নং সাক্ষী)।

"অতি সুন্দর ফর্সা লোক"—কমিশনে গৃহীত মিঃ দেবব্রত মুখুয্যের সাক্ষ্য।

প্রশ্ন :—বাদীর রং কি কুমারের রং হইতে ভিন্ন রকমের? উত্তর :—না; সম্পুর্ণ পৃথক রকমের নহে। বাদীও ফর্সা তবে একটা রক্তিমাভা আছে।

প্রশ্ন :—যদি কেহ বলে যে, দ্বিতীয় কুমারের মুখ লালচে রকমের ছিল, তাহা কি সত্য হইবে? উত্তর :—কতকটা লালচে ছিল। দ্বিতীয় কুমারের মুখ ফর্সা ও লালচে ছিল লালচে এই কথায় আমার সম্মতি আছে। রোদেপোড়া ছিল

বলিয়া আমি বলিয়াছি যে, কিছু লালচে। বাদীর মুখের রংটাও লালচে বটে; তবে সাধারণের মুখে যেরূপ লালচে দেখা যায় ইহা হইতেছে সেইরূপ লালচে; ইহাকে রোদে পোড়া বলিয়া মনে হয় না।

বিবাদী পক্ষের ১৪নং সাক্ষী শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীও এইরূপ বলেন। ইনি জয়দেবপুরে থাকিয়া কোন স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন এবং চাকুরী সম্পূর্ণরূপে ভাওয়াল এষ্টেটের দয়ার উপরই নির্ভর করিত। এই সাক্ষী কুমারের আক্ষরিক জ্ঞান প্রমাণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কথা নিম্নে আলোচনা করিতে হইবে।

যামিনী গাঙ্গুলীর সাক্ষ্য

শ্রীযুক্ত যামিনী গাঙ্গুলী পরম খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী; তাঁহার মর্য্যাদাও খুব উচ্চ। এই সাক্ষীর গুণাগুণ ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদার কথা নিম্নে উল্লেখ করিব। ইনি লেডি হার্ডিঞ্জ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি নিজেও খুব ফর্সা লোক অতএব বর্ণ সম্পর্কে তাঁহার কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন,—"ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোনও জিনিষের রং বিচার করিবার উত্তমরূপ ক্ষমতা আমার আছে। আমি মনে করি যে, বাদী বর্ত্তমানে আমার নিজের অপেক্ষাও সামান্য একটুখানি বেশী ফর্সা। উষ্ণ মণ্ডলের একজন ইউরোপীয়ানের গায়ের যেরূপ রং হয়, বাদীর রং ঠিক সেইরূপ। এতদ্দারা আমি উষ্ণমণ্ডলে যাহার জন্ম, সেইরূপ

ইউরোপীয়ানের কথাই বলিতেছি। ইংলণ্ড হইতে সন্থ সমাগত ব্যক্তির রং, বাদীর রং হইতেও ফর্সা। একথা আমি নিশ্চয়ই বলিব যে, এক সময়ে বাদীর গায়ের রং অতিশয় ফর্সা ছিল।" সাক্ষী বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বাদীর রং ফর্সা—ইহাকে বরং রোদে-পোড়া কটা রকমের বলা যায়। প্রথম বয়সে বাদীর গায়ের রং খুবই উজ্জ্বল ছিল আমি এ বিষয়ে সাক্ষীর সহিত একমত। আদালতে বাদীকে লক্ষ্য করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে বলিতে পারি যে, বাদীর রং একটুখানি কটা রকমের ফর্সা—সাদা এবং কটা বাঙ্গালী সমাজে যাহাকে শ্যামবর্ণ বলা হয়, সেইরূপ হলদে রকমের নহে। এই অভিমত প্রকাশ করিলেই পূর্ব্বে বাদীর রং কি প্রকারের ছিল, তাহার কথা কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। বয়োবৃদ্ধিব ফলে রং কতকটা ময়লা হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে জামার নীচে তাহাব হাতখানির রং কিরূপ আছে, এই সমস্ত কথা বিবেচনা করা দরকার কাহারও রং সর্ব্বদা একই প্রকার থাকে না। বয়সের সঙ্গে, স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতির সঙ্গে, মানসিক উদ্বেগের ফলে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় শরীরের রং পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যেভাবে—যেরূপ আলোতে কাহাকেও দেখা যায়, তাহারও রংএর পরিবর্ত্তন হইতে পারে। জল বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গেও খাদ্য ও পানীয়ের প্রকার ভেদে শরীরের রং বদলাইতে পারে। যখনই কোন রংএর কথা ভাবা যায়, অথবা কোন রংএর বর্ণনা করা যায়, তখনই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কথা সাধারণভাবে বলিতে হয় এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই আসে, তাহার

কথা স্মরণ রাখিয়া ও কাছাকাছি কোন একটা জিনিষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদনুসারে রংএর নাম দিতে হয়, যেমন—ইহা গোলাপের মত অথবা দুধ ও গোলাপের মত বলিতে হয়।

... ...

এক্ষণে প্রশ্ন, বুদ্ধুর গায়ের রং কিরূপ ছিল? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, ছোটকুমার, মেজকুমার এবং তাহার নিজের মতই ইহা সাহেবী রং ছিল। তবে এইটুকু পার্থক্য ছিল যে, বুদ্ধুর রং দ্বিতীয় কুমারের মত এতটা লালচে ছিল না। তবে ছোট-কুমার অত্যন্ত ফর্সা ছিলেন এবং তাহাতে একটা রক্তিমাভাও ছিল। শৈবলিনী বলেন যে, ছোটকুমার "অত্যন্ত ফর্সা" ছিলেন মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন যে, ছোটকুমারের রং ছিল দ্বিতীয় কুমারের তুলনায় কিঞ্চিৎ ময়লা; কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি (তিনি কুমারকে ভাল করিয়াই জানিতেন; কেননা তিনি কুমারের সঙ্গে সকল সময়েই পলো খেলিয়াছেন এবং কুমারের নিকট একটা ঘোড়া বিক্রয় করিয়াছেন) বলেন—ছোটকুমার দ্বিতীয় কুমারের সমান ফর্সা ছিলেন। বিবাদী পক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্যচাঁদ বলেন যে, ছোটকুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফর্সা ছিলেন।

বাদীর গায়ের রং

বাদীপক্ষের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, বাদী ও মেজ-কুমারের গায়ের রং একই। খানাসাহেব আবদুল হামিদও বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের গায়ের রং পীতাভ। বাদীপক্ষের

সাক্ষিগণ ইহা মোটেই স্বীকার করে নাই, তাহারা লালচে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শৈবলিনী বলিয়াছেন যে মেজ-কুমারের গায়ের রং পীতাভ এবং মুখ লাল নহে, কর্ণেল পুলি মেজকুমারকে খুব সুন্দব পুরুষ বলিয়াছেন কিন্তু গায়ের রং গোলাপী বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের গায়ের রং মলিন হইয়া গিয়াছে কিন্তু মেজকুমারের গায়ের রং বাদীর গায়ের রংয়ের মত হলদে ও লালে মিশান। কয়েকদিন এই সাক্ষীকে আমি দেখিয়াছি, তাঁহার রং প্রায় সাদা ইউরোপীয়দেরই মত, তবে উহাকে মলিন দেখা যাইতেছিল।

মেজরাণীর গায়ের রং ও হলদে তবে উহা বাদীর রং হইতে আলাদা। যে সকল সাক্ষী মেজকুমারের রং সাহেবী বলিয়া-ছেন মিঃ চৌধুরী তাহাদিগকে জেরা করিয়াছেন এবং কোন বাঙ্গালীর রং সাহেবী হইতে পারে না উহা প্রমাণ কয়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবী রংকে উজ্জ্বল পীতাভ হইতে আলাদা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল না, সাদা ধবধবে ছিল এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই তাঁহার রংকে সাহেবী বলা হইয়াছিল।

মেজকুমারের রং সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটা বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। সাহেবী (বাদীপক্ষের ২১০, ৩৩৬, ৪২৬ এবং ৬৬০ সাক্ষী) সাহেবের মত সুন্দর (বাদীপক্ষের ৪৫৮ নং সাক্ষী

এবং বিবাদীপক্ষের ৫৭, ৬৩, ৭২, ৭৪, ৮৩, ২৭, ৩০, ৩৯, ৫৪, ৩৭ এবং অন্যান্য সাক্ষী)

ইংরেজ সাহেবের মত সুন্দর (বিবাদীপক্ষের ৪২৭ ও ৪০নং সাক্ষী) সাহেবের মত সুন্দর ও লাল (বিবাদীপক্ষের ৩০, ৪২৭, একজন উকিল, বাদীপক্ষের ৪২৭নং সাক্ষী আবদুল মন্নান এবং অন্য কয়েকজন সাক্ষী)।

'তিন কুমারের মধ্যে মেজকুমারের রং লাল ও পাকা'—শিবচন্দ্র মিত্র (বিবাদীপক্ষে কমিশন সাক্ষ্য দিয়াছেন) লাল সাদায় মিশান'—(বিবাদীপক্ষের সাক্ষী অতুলপ্রসাদ কমিশনে বলিয়াছেন) 'সাদার উপর লাল্‌চে' (বাদীপক্ষের ৪৯নং সাক্ষী মিঃ এন্ কে নাগ বার য়্যাট ল)

'সুন্দর বাঙ্গালী অপেক্ষাও সুন্দর প্রায় ইউরোপীয়ের মত' (বিবাদীপক্ষের সাক্ষী কর্ণেল হোসেন)।

'খুব সুন্দর তবে গোলাপী মনে হয়'—কর্ণেল পুলে উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই হলদে রংকে উড়াইয়া দিয়াছে। সাক্ষীদের মধ্যে ছোটরাণী, ফণীবাবু, রায় সাহেব (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী) সত্যবাবু, (৩৮০নং সাক্ষী) বীরেন্দ্র (বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) কালী বিবাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী কামিনী (বিবাদী-পক্ষের ৩৬৪নং সাক্ষী এবং অবনী (বিবাদীপক্ষের ৩২৪নং সাক্ষী) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাক্ষী। প্রধান তদ্বিরকারক রায় সাহেব সত্যবাবু, ফণী এবং দুই রাণী ব্যতীত অন্য সকলেই এষ্টেটের কর্ম্মচারী। পুলি বলিয়াছেন গোলাপী এবং শৈবলিনী বলিয়াছেন হলদে, উহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

বিবাদীপক্ষে ৩৬৪নং সাক্ষী বৃদ্ধ কামিনী খাজাঞ্চি বলিয়াছেন যে কেহ রৌদ্রপোড়ার নামও শুনে নাই। বিবাদীপক্ষের ৩০৯নং সাক্ষী সর্ব্বমোহন বলিয়াছেন যে কেহ যদি রৌদ্রপোড়া বিলয়া থাকে, তবে মিথ্যা বলিয়াছে। মেজকুমারের রং সাদা এবং লালচে এবং বাদীর রংও সাদা ও লালচে বলিয়া আমি সাব্যস্থ করিতেছি।

চুল, গোঁপ ও ভ্রূ

আমি দেখিয়াছি যে, বাদীর চুল লাল আভাযুক্ত কাল। অর্থাৎ সচরাচর বাঙ্গালীদের চুল বে প্রকার কাল থাকে, সে প্রকার নহে। যখন ৬৬০নং সাক্ষী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন মিঃ চৌধুরী বলিয়াছিলেন যে, কুমারের চুল পিঙ্গল অর্থাৎ উজ্জ্বল আর বাদীর চুল কাল পিঙ্গল। বাদীর চুল কাল এবং কুমারের চুল পিঙ্গল। অতুলবাবু সাক্ষ্যদান কালে এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। এই সাক্ষীর উক্তির সহিত লাহোরে সাক্ষীদের সামঞ্জস্য রাখা হইয়াছে। তাহারা কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং উহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, বাদী উজলার একজন শিখ কৃষক তাহার নাম মাল সিং, মালসিংহের চুল কাল. বাদীর আত্ম পরিচয় দানের পর ১৯২১ সালের ২৯শে মে মিঃ লিণ্ডসের সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি এখন বাদীর সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, 'সুন্দর সোণালী পিঙ্গল।' কর্ণেল পুলির গোলাপীর সহিত শৈবলিনীর হলদেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল এখানেও এই দুইটী রংকে খাপ খাওয়াইবার

চেষ্টা হয়। এখানে উহাকে রৌদ্রপোড়া বলা হয় নাই, তবে অযত্নের দরুণ এই প্রকার হইয়াছে বলা হইয়াছে। যুবক মাল সিং সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং তাহার চুল জটা হইয়া যায়। চুলে তেল পড়ে নাই অথবা ধূলা বালি পড়িয়াছে বলিয়াই পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে বার বৎসর চুলে তেল না দেওয়ার জন্য বাদীর চুলের স্বাভাবিক রং নষ্ট হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। বাদীপক্ষের ৩৬৫, ১৫৫, ৩৭৭, ৪৫৫, ৯৩৮ এবং ৬৬০নং সাক্ষিগণকেও অযত্নের দরুণ কাল চুল পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে কি-না জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। মিঃ যামিনী গাঙ্গুলী বলিয়াছেন যে, চুলে তেল না পড়িলে বা অযত্ন করিলে ইহার রং নষ্ট হইয়া যায় এবং ময়লা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠে।

বাদী এই উক্তিতে বিচলিত হন এবং ৯৬১, ১০১০ ও ৪৩৫ নং সাক্ষীকে আহ্বান করেন। তাঁহারা কখনো চুলে তেল দেন নাই, অথচ তাহাদের চুল কালই আছে। ইহাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে, চুলে তেল না পড়িলে উহা লাল হয় না, উহা শুষ্ক হয়। বিবাদীপক্ষে কয়েকজন সাক্ষী পরে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাদী উজলার মাল সিং এবং মালসিংহের চুল সোণালী বর্ণ ছিল। কিন্তু পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে বাদীর চুল মেজ-কুমারের মতই।

চুলের রং

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর চুল কাল একজন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী

বলিয়াছেন যে, 'ভূষিকাল' কখনো কখনো লালচে বা লাল অর্থাৎ কটা হয়। বাদী তাঁহার চুলকে 'কটা' বলিয়াছেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চুল এখন পিঙ্গলবর্ণ, তিনিও উহাকে 'কটা' বলিয়াছেন। এই অঞ্চলে পিঙ্গল শব্দটী প্রচলিত কিন্তু ভাওয়ালের সাক্ষী ও সুকুমারী দেবী 'কটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা রংকে লালচে বলিয়াছেন। চুল সম্পর্কে যে কটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার অর্থ ঠিকই হইয়াছে, তবে চক্ষু সম্পর্কে যখন এই শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন উহার অর্থ কাল ব্যতীত অন্য কিছু বুঝায়।

বাদীপক্ষের সাক্ষিগণ মেজকুমারের চুলকে পিঙ্গল বলিয়া বলিয়াছেন। বাদিগণ পিঙ্গল কথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন এই মামলার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। মিঃ চৌধুরী বাদীপক্ষের ৩১৪নং সাক্ষীকে এই শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাদীপক্ষের ৮২নং সাক্ষীকে কতদিন ধরিয়া এই শব্দটি জানিতেন বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন। মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে এই শব্দটা জানিতেন কি না বাদীপক্ষেব ৩১৪নং সাক্ষীকেও উহা জিজ্ঞাসা করা হয়। সাক্ষিগণ মেজকুমারের চুলের রংটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শব্দের অভাবে তাঁহারা উহা পরিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না। বাদীপক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে, চুলের রং উজ্জ্বল লাল। বাদীপক্ষের ১৩৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন, উহা মেদী নহে; কিন্তু গাঢ় কাল। বাদীপক্ষের ৩১৪নং সাক্ষী বলিয়াছেন, উহা কৃষ্ণাভ লাল।

বাদীপক্ষের ২৬৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন, উহা লাচচে, বাদীপক্ষের ১০১ নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা নূতন পয়সার রংও নহে। বাদী-১১০ নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা তাম্রাভ। বাদীপক্ষের ১৩৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন পুরান তামার রং, উহা পূজার তাম্রপাত্রের রং বলিয়া বাদীপক্ষকে ৩৫৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন। বাদীপক্ষের ৮৯নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা তামাটে। বাদীপক্ষের ১২ নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে উহা সাক্ষীর কাটগড়ার রেলিংএর রংএর মত।

সংক্ষেপে মিঃ চৌধুরী বলিতে চাহিয়াছেন উহা তামাটে। বিবাদীপক্ষও এই প্রকার বর্ণনাই দিয়াছেন। বিবাদীপক্ষের ১৯, ২৭, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫৮, ৭০, ৭৬, ১৪০, ১৫৯, ২৯০, ৩১০, ৩২৪, ৩২৫, ৩৯৭, ৩৪৮নং সাক্ষিগণ উহাকে পিঙ্গল বা লাল বা লালচে বলিয়াছেন। বিবাদীপক্ষের ৩নং সাক্ষী যোগেশ (ভূতপূর্ব্ব নায়েব) উহাকে তামাটে বলিয়াছেন, ছোটরাণী উহাকে তাম্রবর্ণ বলিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল পুলি উহাকে লাল বলিতে চাহিয়াছেন। বাদী এবং মেজকুমারের চুল সম্পর্কে যে সামান্য পার্থক্য দেখান হইয়াছিল, বিবাদীপক্ষের ৩৬৪নং সাক্ষী বৃদ্ধ নায়েব কামিনী তাহা দূর করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদী ও মেজকুমারের চুলের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। বিবাদীপক্ষের ৩৭১নং সাক্ষী পুরান খাজাঞ্চী, বিবাদীপক্ষের ৩৩৮নং সাক্ষী পুরান কর্ম্মচারী অবনী এবং বিবাদী-পক্ষের ১৪৫নং সাক্ষী বৃদ্ধ চাষী আলিমুদ্দিন বাদীর চুল ও মেজকুমারের চুলে কোন পার্থক্য নাই বলিয়াছে। রায় সাহেব যোগেন্দ্র, ফণীবাবু সাক্ষ্যে গণ্ডগোল করিবেন বলিয়া আমি মনে

করি না। কয়েকজন চাষী ও অন্যান্য সাক্ষীকেও ভাল করিয়াই শিখাইয়া আনা হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে কালী (বিবাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী) বলিয়াছে বাদী ও মেজকুমারের চুলের মধ্যে আমি কোন পার্থক্যই দেখি না।

এখন আমি চুল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি বলিয়া উভয়েরই একটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোচনা করিতে চাই। দুই জনেরই চুল কোঁকড়া। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, মেজ-কুমারের চুল কোঁকড়া, কিন্তু বাদীর চুল সোজা। শৈবলিনী দেবী বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের চুল চিকণ এবং পরিপাটি ; সাধুর চুল ভারী রুক্ষ এবং খাড়া থাকে। বিবাদীপক্ষের মিঃ পার্কে ব্রাউন দুইখানি ফটোর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীর চুল খাড়া থাকে এবং কুমারের চুল তরঙ্গায়িত থাকে। আমি কোর্টে উভয় পক্ষের ব্যবহারজীবীদের সম্মুখে বাদীর চুল দেখাইলাম, তাঁহার চুল সামনে এবং পেছনে তরঙ্গায়িত। আমি উহা ২৭।৪।৩৫ তারিখে রেকর্ড করিয়াছি।

গোঁফের রং

বিবাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন, কুমারের গোঁফের রং তাঁহার চুল অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। মিঃ গাঙ্গুলী কখনো মেজকুমারকে দেখেন নাই। তিনি বাদীর গোঁফ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—উহা বাদামী ও চুল অপেক্ষা উজ্জ্বল। এই সম্পর্কে কেহই আপত্তি করেন নাই। আমি মনে করি, উভয়েরই গোঁফ বাদামী এবং উহা চুল হইতে অনেক উজ্জ্বল।

ভ্রূ-লতার রং

উভয়েরই ভ্রূ বাদামী রংয়ের আভাযুক্ত ভ্রূ-যুগলের গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও ভ্রূ-যুগলের বর্ণ সম্বন্ধে কোনও সওয়াল করা হয় নাই। সর্ব্বমোহন (কমিশনে সাক্ষ্য দেন) ভ্রূর রংকেই পার্থক্যের এক প্রধান লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—কুমারের ভ্রূ-যুগল দেখিতে অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ এবং সুগঠিত! অর্থাৎ দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। মেজরাণী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, উহা লাল রংয়ের আভাযুক্ত ছিল। বিবদীপক্ষের কয়েকজন সাক্ষীও যেমন ১৮২নং সাক্ষী ঐ কথাই বলিয়াছিলেন।

চক্ষুর পাতার লোম

উভয়ের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। চক্ষুর পাতার লোম সম্বন্ধে যে কোনও পার্থক্য আছে, এ বিষয় কেহ উল্লেখও করেন নাই। বাদীর একজন সাক্ষীকে মধ্যমকুমারের চক্ষর লোম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ঐ সাক্ষী উত্তর দিয়াছিলেন যে,—উহা দেখিতে সুন্দর ঐ উত্তরে যাহাই বুঝা যাউক না কেন, চোখের লোম সম্পর্কিত প্রশ্নের কেহ আলোচনা করেন নাই।

চক্ষের রং

এই প্রসঙ্গ হইতে যে সকল বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন,—বাদীর চোখ বাদামী রঙের। তাঁহার মতে হাল্‌কা বাদামী

বলিলেই ঠিক হয়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ধরণের চোখ আঁকিবার সময় তিনি কপিল রং ব্যবহার করিবেন। (তাঁহার মতে মাথার চুল এই রংয়ের ছিল); তবে গাঢ় রং হাল্‌কা করিবার জন্য তিনি তাহার সহিত অন্য রং মিশাইয়া লইবেন। বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী রায় সাহেবের মতে বাদীর চোখের রং বাদামী আভাযুক্ত। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার জয়দেবপুর যাওয়ার সময় হইতে. আগাগোড়া তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। বাদীর চুল যে বাদামী রংয়ের, সে বিষয়ে কোনও বাদপ্রতিবাদ নাই।

মধ্যমকুমারের চোখের রঙ সম্বন্ধে বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, অথবা তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে,— মধ্যমকুমারের চোখের রঙ নীলাভাযুক্ত ছিল। চোখের এই বর্ণনা ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট না পৌঁছান পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু ঐ রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছিলে যখন দেখা গেল—উহাতে মধ্যমকুমারের চোখের রং ধূসর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, তখন বলা আরম্ভ হইল যে, কুমারের চোখের রঙ ধূসর বর্ণেরই ছিল; তবে সে রঙ নীল রঙয়েরই সমান। সাধারণ লোকে উহাকে নীলের আভাযুক্ত বলিয়াই সাব্যস্ত করিবে।

কুমারের বিড়াল চোখ

দেখা যায়, শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষ এই সকল চোখকেই

কটা বলিতেছেন এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী (কমিশনে গৃহীত) উকীল জগদীশবাবু দ্বিতীয় কুমার এবং বুদ্ধুর চোখকে বিড়ালের চোখ বলিতেছেন; কিন্তু ইহাতেও বিবাদীপক্ষ কিছুতেই এই কথা বুঝাইতে নিরস্ত হন নাই যে, বিড়াল চোখ বা কটা চোখ বলিতে চোখে একটা নীল আভা বুঝায় বা এই দুইটী কথায় বাঙ্গালীদের মনে একটী রংয়ের কথা জাগে। কিন্তু সহজ কথা হইল এই যে, বিড়াল চোখ কিম্বা কটা চোখ বলিলে সাধারণ বাঙ্গালীদের কালো চোখ বুঝায় না। বাঙ্গালীদের অধিকাংশের চোখই কালো।

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণেই এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনিও বলিয়াছেন, কটা এবং নীলাভ একই শ্রেণীভুক্ত। উকিল জগদীশবাবুও এই কথাই বলিয়াছেন এবং বিবাদীপক্ষের আরও বহু সংখ্যক সাক্ষী এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; কটা বলিতে যদি একটি নির্দ্দিষ্ট রঙকেই বুঝাইত, তবে এই প্রশ্ন লইয়া এত মাথা ঘামাইতে হইত না। বিবাদীপক্ষের অনেক সাক্ষীই এই কথা বলিয়াছেন যে, বাদী এবং দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং এক রকম অর্থাৎ কটা। তাহার অর্থই হইল কালো নহে। কাজেই কেহ যদি বলেন যে, দ্বিতীয় কুমারের চোখ কটা ছিল তবে তিনি কোন বিশেষ রংয়ের কথা মনে করিয়া বলেন নাই। তিনি এই কথাই মনে করিয়া বলিয়া থাকিবেন যে, সাধারাণ কালো চোখের মত নহে। এই বিষয়ে বিবাদীপক্ষের যে সকল সাক্ষীকে জেরা

করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

বিবাদীপক্ষের ৩, ২১ এবং ১৪০ নং সাক্ষী বলিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, যাহা কালো নয়,—তাহাই কটা। বিবাদীপক্ষের ২১নং সাক্ষী বলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং দ্বিতীয় কুমারের চোখ কটা। ৩২, ৫৮, ৩৭১, ৫৯ এবং ১২২নং সাক্ষী বলেন,—বাদী এবং দ্বিতীয় কুমার উভয়েরই চোখ কটা।

১২২নং সাক্ষী রমানাথ বলে,—বাদী এবং কুমারের চোখ ও চুল কটা ; এতদ্ব্যতীত উভয়ের মধ্যে চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই। ৫৯নং সাক্ষী জব্বর খাঁ বলে,—চোখের রং একই রকম। কেবল চাষীরাই যে কালো চোখ না হইলে কটা বলে এমন নয়, প্রত্যেকেই ইহা বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণ কটার পরিবর্ত্তে করঞ্জা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং এই কারণেই ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ৩২৩, ৩৮, ৬৪, ৬৯, ৭৯, ৩৩৭, ৩৫৪নং সাক্ষী এবং রমানাথ (কমিশনে গৃহীত) করঞ্জা শব্দ ব্যবহার করিয়াছে।

বিড়াল চোখও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে চোখ কাল নহে, তাহাকেই বিড়াল চোখ বলা হয়। ইহাতে বিশেষ কোন রং নির্দ্দিষ্ট হয় না, কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, চোখ কাল নহে। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী (কমিশনে গৃহীত) জগদীশবাবু বলেন, জ্যোতি, মেজকুমার ও বুদ্ধুর বিড়াল চোখ ছিল, ৫৭নং সাক্ষী দুর্গাদাস পাল বলেন যে, যে চোখ সাধারণতঃ কালো চোখের মত নহে তাহাকেই বিড়াল চোখ বলা হয়।

আবার কটাও বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আশুতোষ ডাক্তার কোথাও বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কুমারের বিড়াল চোখ ছিল এবং তিনি বিড়াল চোখ বলিতে বাদামী রং বলিয়া ভুল করিয়াছেন। পাঞ্জাবেও দেখা যায় যে, রং অনুসারে চক্ষুকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইল মামুলী অর্থাৎ সাধারণ কালো রংয়ের এবং অপরটী হইল "বিল্লি" অর্থাৎ যাহা কালো নহে। পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট শিখ ভদ্রলোক এবং বিবাদীপক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী লেফটেন্যাণ্ট রঘুবীরের নিকট এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মাল-সিংহের কাহিনী বলিবার সময় তাঁহার কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইবে।

কটা চোখ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সকল কটা চোখকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হইলেও রং নিশ্চয়ই আছে এবং এই রংয়ের তারতম্য আছে; কিন্তু এদেশে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা কিংবা পাঞ্জাবে কেহই রং লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় না; অতএব কটা চোখের রং ফ্যাকাসে নীল জলের মত নীল না ফিকে নীল ধূসর, নীলাভ ধূসর না ইস্পাতের ন্যায় ধূসর, বাদামী, না বেগুনী, কমলা না সবজে কটা হইবে, কেহই কিছু বলেন না। অবশ্য এদেশে এই জাতীয় কয়েকটি রংয়ের আভা পরিলক্ষিত হয়; তবে সাধারণতঃ কটা বলিতে বদরঙের কথাই এদেশে বুঝা যায়। কাজেই এদেশে কটা চুলের মত কটা চোখও লোকে পছন্দ করে না। বিবাদীপক্ষের ২৮০ নং সাক্ষী সুকুমারী দেবী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহাকে যদি কোন পাত্রী পচ্ছন্দ করিতে বলা

হয়, তবে অন্যান্য দিক হইতে পাত্রী সুশ্রী হইলে কটা চক্ষুতে তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না। কটা চোখের রং বড় কেহ একটা লক্ষ্য করিয়া দেখে না। সাধাবণ সকলে চুল কিংবা চোখ কটা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। একমাত্র নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্টভাবে যাহারা মিশে, তাহাদের নিকটই কটা চোখের রং ধরা পড়ে। শ্রীযুক্ত এস পি ঘোষ দ্বিতীয় কুমারকে শৈশব হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত জানিতেন তাহার পবেও যিনি কুমারকে দেখিয়াছেন এবং ভালভাবেই জানিতেন। এখন এইরূপ সমস্ত চোখকে যিনি কটা শ্রেণীতে ফেলিতে অভ্যস্ত এবং যিনি কখনও ঐ শব্দটীর অনুবাদ কবিয়াছেন, তিনি 'গ্রে' (ধূসব) কথাটী ব্যবহাব কবিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাদী বলিয়াছেন যে, তাঁহার চোখ কটা। আমি ঐ শব্দটীও লিখিয়া লই, কিন্তু ব্র্যাকেটে তাহাব প্রতিশব্দ 'গ্রে' লিখি। অবশ্য ইহা ভুল, কিন্তু আমার মনে হয় যে, 'গ্রে' কথাটীর পরিবর্ত্তে 'কটা শব্দটীই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিবাদীপক্ষেব ৩নং সাক্ষী যোগেন্দ্র 'কটা' শব্দটী 'গ্রে' বলিয়া অনুবাদ কবিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ আর, সি, সেন ৮ বৎসর বিলাতে ছিলেন এবং তিনি আরও ভাল জানিবেন ইহাই আশা করা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু এবং তাঁহার সহিত ক্লাবে পার্টিতে খানা খাইবার সময় তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সাক্ষ্য দেওয়ার দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে তিনি জানেন।

তিনি আর এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহারও 'গ্রে' অথবা কটা চোখ ছিল। তাহার চোখের রং কিরূপ

ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহা বলিতে পারেন না। তিনি 'কটা'কে 'গ্রে' (ধুসর) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

সুতরাং আমি কুমারের নিকট আত্মীয় অথবা যাহারা তাহাকে চিনিতেন তাঁহাদের সাক্ষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং সম্পর্কে উভয়পক্ষের অপর কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আলোচনা করিব না। দ্বিতীয় কুমারের চোখ কটা ছিল, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন কিন্তু এমন কি বিবাদীপক্ষের ৩৭১নং সাক্ষী পুরাতন খাজাঞ্চী আর অধিক কিছু জানিতেন না। আমি এই সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ সাক্ষীদের উক্তির আলোচনা করিব কারণ তাঁহারা চোখের রং লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা না হইলে ইংরেজী ভাষায় চোখের বিভিন্ন রংএর উল্লেখ থাকিত না। আমার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সব সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বাদী ও কুমারের চোখের রং একই রকমের তাহারা যদি সত্য কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পর্যান্ত প্রমাণ আমরা পাই যে, বাদীকে দেখিয়া অন্ততঃ চোখের রং সম্পর্কে কোন পার্থক্য তাহাদিগকে চমকিত করিতে পারে নাই। এইরূপ সাক্ষী বিবাদীপক্ষেও ছিল। এখানে তাহাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। এইরূপ সাক্ষী অনেক আছে। বাদীপক্ষে যে সব সাক্ষী কুমারেব চোখ 'কটা' অথবা 'কটাভ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আ.ম (১) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (বাদীপক্ষের ৬৬০নং সাক্ষী (২) বিল্লু বাবু (ভগ্নীর ছেলে) (৩ সাগরবাবু (জ্যাতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা) (৪) সরোজিনী দেবী, (৫) উকীল রেবতীবাবু (৬) মণীন্দ্রবাবু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার) (৭) ব্যারিষ্টার মিঃ এন, কে, নাগ, (৮) উকীল মিঃ হিরণ্ময় বিশ্বাস।

এই সম্পর্কে বিবদীপক্ষের সাক্ষীদের পূরা তালিকা আমি দিতে পারি—কর্ণেল পুলি, দ্বিতীয় রাণী, তৃতীয়রাণী, সৌভাগ্যচাঁদ

(সত্যবাবুর এজলাসে এই ব্যক্তির ফৌজদারমী মামলা ছিল), সত্যবাবু, পুরাতন খানসামা বিপিন (বর্ত্তমানে এষ্টেটের দপ্তরী), মামলার তদ্বিরকারক রায়সাহেব যোগেন্দ্র, লেঃ হোসেন, দ্বিতীয় রাণীর মাসীমা স্থকুমারী দেবী, ফণীবাবুর ভগ্নী শৈবলিনী দেবী, ফণীবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু জিতেন্দ্র, কমিশন সাক্ষী অতুলবাবু, ফণীবাবু ষ্টেটের কর্ম্মচারী বীরেন্দ্র।

এই সব সাক্ষীদের মধ্যে জিতেন্দ্র খুব সম্ভব চোখের রংয়ের বৈষম্য লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু এমন একটি দলিল এবং এমন সব ঘটনা রহিয়াছে, যাহা দ্বারা দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী প্রমাণের নিস্পত্তি হইবে ঐ সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব্বে আমি শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী ও মিঃ কে, সি, দে'র সাক্ষ্যের আলোচনা করিব। এই সম্পর্কে মিঃ কে, সি, দে'র সাক্ষ্য বিবাদীপক্ষকে মোটেই সমর্থন করে না।

মিঃ কে, সি, দে বলিয়াছেন যে, সাক্ষ্য দিতে আসিবার ২৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তিন কুমারকেই রেলওয়ে ষ্টেশনে, গার্ডেন-পার্টি ইত্যাদিতে দেখিয়াছেন। জবানবন্দীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বাদী ও কুমারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি না। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, উভয়ের রং ফর্সা, উভয়ের চোখ নীলবর্ণ অথবা অন্ততঃ ফিকে নীল হইবে। জেরার উত্তরে তিনি বলেন, সহস্র সহস্র লোকের নীল চোখ আছে। এই উক্তি বরং বাদীর অনুকূলেই যায়। চোখের রংয়ের কথা তাঁহার স্মরণ না থাকিলেও তিনি রংয়ের বৈষম্য দেখিয়া বিস্মিত হন নাই! তিনি বলিয়াছেন, অনেকেরই নীল চোখ আছে। যদিও এই দেশে নীল চোখ অতি বিরল।

মিঃ মায়ার বলেন,—দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং ছিল পাতলা রকমের; তবে তিনি কোন রং স্থস্পষ্ট বলেন নাই। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন, যে, ইহার মধ্যে অত্যন্ত পাতলা বাদামী

রঙ ছিল। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি নিজে বিশ্বাস করিয়া এত সব জিনিষ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত "এই ফিকে নীল রং" প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী ভাষায় যাহা বুঝায়, তাহা হইতে পারে না। লর্ড কিচেনারের শিকার পর্ব্ব তাঁহার জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই; তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে এবং স্মরণকালের মধ্যে হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। অন্যেরা তাঁহাকে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। তিনি তৃতীয় কুমারকে জানিতেন; তৃতীয় কুমার তাঁহার সহিত পলো খেলিতেন; তাঁহার চোখগুলি ছিল নীলাভ। এই সমস্ত কথা হইতে মনে হয়, তিনি দ্বিতীয় কুমার ও তৃতীয় কুমারের মধ্যে ভুল করিতেছেন। দ্বিতীয় কুমারের দেহও মাংসল ছিল। ছোটকুমার ছিলেন মোটা (তাহার ফটোগুলি দ্রষ্টব্য)।

মিঃ র‍্যাঙ্কিন সাক্ষ্য দিতে আসিবার পূর্ব্বে প্রায় ২৭ বৎসর কাল দ্বিতীয় কুমারকে দেখেন নাই। তিনি জবানবন্দীতে বলেন, দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং ছিল পাতলা রকমের। তিনি প্রকৃত রংটা কি, তাহা বলেন নাই। আমি তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তদুত্তরে সাক্ষী বলেন যে, পাতলা রংয়ের— এই কথা দ্বারা তিনি নীল অথবা ধূসর বুঝাইতে চাহেন। জবানবন্দীর সময় বিবাদীপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে এই কথাটি আদায় করিয়াছেন যে, সাক্ষীর নিজের চোখগুলিকে ধূসর কিম্বা নীল বলা যাইতে পারে। তিনি স্বীকার করেন যে, ধূসর ও নীল চক্ষু সম্বন্ধে তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করা হইয়াছে। বীমা

করিবার সময় ডাঃ যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহার কতকটা প্রভাব এই সাক্ষ্যের উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

বীমার ডাক্তারের রিপোর্ট

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ কোন এফিডেভিটে বলিয়াছেন কি না (প্রকৃতপক্ষে তিনি এরূপ বলিয়াছেন) যে, দ্বিতীয় কুমারের চোখগুলি বাদামী আভাযুক্ত ছিল? সাক্ষীকে এইরূপ প্রশ্ন করা হইলে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ চৌধুরী বাধা দেন এবং বলেন যে, রূপএইভাবে প্রশ্ন করিলে সাক্ষীর প্রতি সুবিচার করা হইবে না; কারণ এই বিষয়ে আরও কয়েকটি উক্তি রহিয়াছে। এস্থলে সাক্ষী কোন প্রকারেই বিচারক ছিলেন না; অতএব তাঁহার সম্মুখে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যাইত না। বাদীপক্ষ হইতে কৌঁসুলী মিঃ চ্যাটার্জ্জী যাহা বলাইতে চাহিতেছিলেন, তাহা এই যে, এই "ধূসর অথবা নীল রং"— মূলতঃ যাহা সন্দেহজনক স্মৃতির কথা মাত্র—তাহা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীর স্মরণ আছে কি না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এই সাক্ষী তৃতীয় কুমারের চোখের রং কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। অথচ তিনি এই ছোটকুমারের সঙ্গে প্রায় সমানভাবেই—এমন কি দ্বিতীয় কুমারের সঙ্গে অপেক্ষা অনেক বেশী সময় মিশিবার অবসর পাইয়াছেন। কারণ তৃতীয় কুমার ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, জবানবন্দীর সময় মিঃ র‍্যাঙ্কিনের স্মৃতিরেখা, পাতলা রকমের এর বেশী আর কিছুই স্মরণে আনিতে পারে নাই। আমি এস্থলে সাক্ষীর একটি উক্তি স্মরণ করিতেছি। এই উক্তিতে তিনি বলিয়াছেন যে, যদি কেহ বলে যে বাদীকে অনেকটা দ্বিতীয় কুমারেরই মত দেখায়, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

সন্ন্যাসী কুমার, রাণী সত্যভামা দেবীর শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

বাদীর শরীরের চিহ্ন

বাদীর শরীরে প্রকৃতপক্ষে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি পাওয়া গিয়াছে—(১) পায়ের গোড়ালী খসখসে এবং তাহাতে দাগ আছে।

(২) মাথার খুলিতে ফোঁড়ার ত্রিকোণাকৃতি চিহ্ন।

(৩) বামপার্শ্বের উপরের পাটীর কসের দাঁত ভাঙ্গা।

(৪) বাদীর কথিতমত বাদীর অস্ত্রোপচারের চিহ্ন।

(৫) দক্ষিণ বাহুতে চিহ্ন, এই চিহ্নকে বাঘের নখের চিহ্ন বলা হইয়াছে।

(৬) শুষ্ক ফোঁড়ার চিহ্ন—ডাক্তারেরা এই চিহ্ন সম্পর্কে একমত। এই চিহ্নটিকে পৃষ্ঠদেশের ফোঁড়ার চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করা যায়।

(৭) পায়ের বাহিরের দিকের গোড়ালীর উপরিভাগের অসমান ক্ষত চিহ্ন।

(৮) পুরুষাঙ্গের উপরস্থ ক্ষুদ্র তিল চিহ্ন।

(৯) জিহ্বার নিম্নে থলের মত মাংস-পিণ্ড।

বাদী সাক্ষ্য দিবার সময় উপরোক্ত চিহ্নসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উপদংশ এবং বাহু ও পায়ে উপদংশ জনিত ক্ষত চিহ্নের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কুমার সম্পর্কেও এই শেষোক্ত চিহ্ন স্বীকার করা হইয়াছে। বাদী বাগী অস্ত্রোপচারের চিহ্ন ও পুরুষাঙ্গের উপর তিল চিহ্ন ভিন্ন অন্যান্য সকল চিহ্নই আদালতে দেখাইয়াছেন। তিনজন ডাক্তারই ঐ সকল চিহ্ন

দেখিয়াছেন। পৃষ্ঠদেশস্থ ফোঁড়ার চিহ্নও তাঁহারা দেখিয়াছেন, অবশ্য পৃষ্ঠদেশে বলিয়া বাদী নির্ভুলভাবে এ চিহ্ন দেখাইতে পারেন নাই।

এই সব চিহ্ন বাদী নিজে ডাক্তারদিগকে দেখাইয়াছেন—যদিও ডাক্তারদের লিখিত নোটে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট আদালতে উহা (১০) 'উপদংশ জনিত চিহ্ন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোক্ত দশটি চিহ্ন ভিন্ন ডাক্তারের নোটে আরও কয়েকটি চিহ্নের উল্লেখ আছে এবং বাদী তাহা দেখাইয়াছেন। ঐ গুলিকে উপদংশজনিত চিহ্ন বলা যায়। কুমারের শরীরে ঐ সময় কোন চিহ্ন ছিল না—যদিও ঘা ছিল।

বাদীর বক্তব্য এই যে, ঐ ঘা শুকাইয়া বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। আমি এই সব চিহ্নগুলিকে (১০) উপদংশজনিত চিহ্ন বলিয়া আলোচনা করিব।

(১১) তিনটি টিকার চিহ্ন—যাহা ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন।

(১২) উভয় কাণের লতিকায় ফোঁড়া চিহ্ন।

(১৩) বাদীর বাম বাহুতে উর্দ্দুতে 'ধর্ম্মদাসদা চেলা নাগা' এই কয়টি কথা উল্কিতে লেখা আছে। বাদী বলিয়াছেন যে, তিনি যখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিলেন তখন ঐ উল্কি লেখা হয়। মিঃ লিগুসে বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহাকে ঐ উল্কি দেখাইয়াছেন এবং উহা তাঁহার গুরুর নাম একথা বলিয়াছেন। ঐ শব্দগুলির অর্থ—'নাগা, ধর্ম্মদাসের চেলা' অথবা ধর্ম্মদাসের চেলা নাগা।

বাদী ঐসব চিহ্নের কথা উল্লেখ করিলে এবং আমি যে সব দাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা দেখাইলে বাদী যখন ১৯২১ সালের ৪ঠা মে কি ঘটিয়াছিল (আত্মপ্রকাশের দিন) তাহার বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে জেরাতে এই সব প্রশ্ন করা হয়—

"ইহা কি সত্য নহে যে, আপনার শরীরের দাগসমূহ দেখিয়া এইরূপ ঘোষণা করা হয় যে, ঐ সব দাগ দ্বিতীয় কুমারের শরীরে ছিল ?

বাদী আদালতে তাঁহাব উপদংশজনিত যে সব দাগ দেখাইয়া- তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়—

প্রঃ—আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি উপদংশজনিত দাগ বলিয়া যে সব দাগ দেখাইয়াছেন তাহা আদৌ উপদংশজনিত দাগ নহে।"

বাদীর উপদংশ থাকা দূরের কথা, উপদংশ সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই—এই মর্ম্মে বাদীকে জেরা করা হইয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন তাঁহার জবানবন্দীতে উপদংশজনিত চিহ্ন অথবা টিকার চিহ্ন অথবা জিহ্বার নীচের থলের মত চিহ্ন ভিন্ন অন্যান্য সকল চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন, তখনও তাঁহাকে একই রকমের জেরা করা হয়।

ইহা ১৯৩৪ সালের জুন মাসের কথা। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই ছিল যে বাদীর শরীরের কোন চিহ্নই কুমারের শরীরে. ছিল না। ৪ঠা মে অথবা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে ঐ সব চিহ্ন আবিষ্কার হয় এবং মিথ্যা করিয়া কুমারের শরীরে

ঐ সব চিহ্ন আরোপ করা হইয়াছে। এককথায় ভগ্নী বাদীর শরীরের ঐ সব চিহ্ন দেখিয়াছেন এবং কুমারের শরীরের তাহা আরোপ করেন। কোন চিহ্ন সৃষ্ট করা হইয়াছে বিবাদীপক্ষের তাহা মামলার বিষয় ছিল না।

পায়ের ক্ষত চিহ্ন

এই দলিলে ইন্‌সিওরেন্স প্রার্থী কুমারের ব্যক্তিগত ও শারীরিক নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐ সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে ডাঃ আর্ণল্ড কেডির স্বাক্ষরযুক্ত একখানি মুদ্রিত ফরমের ৫নং কলমে সনাক্ত করিবার অর্থাৎ চিনিবার উপযোগী চিহ্নসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা দৃষ্ট হয়—

"বাঁ পায়ের গোড়ালীর উপর দিকে কতকগুলি অসমান ক্ষত চিহ্ন আছে।"

বিবাদীপক্ষে, ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট সাক্ষ্যদানকালে বলেন,—যে ক্ষতচিহ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে, সেই ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করিবার সময় তিনি তাহাকে "বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিঞ্চিৎ উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন" বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি তাঁহার নোটে লিখিয়াছিলেন,—

"বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিছু উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন। ঐ ক্ষতদাগ উপরের দিকে ১॥ সেন্টিমিটার চওড়া। নীচের দিকে উহা ৯ মিলিমিটার চওড়া। উহা ২ সেন্টিমিটার উঁচু। গোঁড়ালীর সর্ব্বনিম্ন বিন্দু পর্য্যন্ত উহা ৬ সেন্টিমিটার বিবাদীপক্ষের সুবিধার

জন্য মেজর টমাস যে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ক্ষতচিহ্নের রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের।”

মিঃ ডেনহাম হোয়াইট জবানবন্দীতে বলিয়াছেন,—আমাকে যদি ঐ ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করিতে বলা হয়, আমি আদালতে যেরূপ বলিতেছি ঐ প্রকারেই সে ক্ষতের বর্ণনা করিব। একখানি প্রয়োজনীয় ছবিতে ঐ দাগ চিহ্নের নির্দ্দেশ আছে। ঐ চিহ্নে সর্ব্বপ্রকারের চিহ্ন এবং তাহাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (একজিবিট এ ৪০ এবং এ ৪০এ দ্রষ্টব্য)।

ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে উল্লিখিত বর্ণনা—বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিছু উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন বাদীর দেহস্থিত ঐ ক্ষতদাগের সহিত বেশ মিলিয়া যায়। বাদীর এবং কুমারের মিলের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা শুকনা ক্ষতের দাগ, সাধারণ কোনও দাগ নহে। ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট তাঁহার নোটে সাধারণ দাগের এবং ক্ষতদাগের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। মেজর টমাসের মতে সে পার্থক্য অনেক সলা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের ব্যাখ্যাক্রমে বুঝা যায়, ঐ ক্ষতের মাংস আঁশাল বটে; কিন্তু তাহাতে চুল উঠিবার গ্রন্থি বা কোষ নাই। কেবল তাহাই নহে; ঐ ক্ষতযুক্ত অংশ রসবাহক নাড়ী সমন্বিত নহে। তাই ঐ স্থানে রক্ত চলাচল হয় না বলিলেও চলে। ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—সেই ক্ষতদাগ অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার যদি সত্য ইন্‌সিওরেন্সের ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে

তিনি উক্ত ক্ষত দাগ ছাড়া আরও সুস্পষ্ট কোনও দাগের প্রতি লক্ষ্য করিতেন।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্ষতদাগ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হওয়ার দিকেই যায় এবং ইহাও সকলের স্বীকৃত যে, ১৯০৫ সালে কুমারের শরীরে একমাত্র ঐ ক্ষতদাগ ছাড়া আর এমন কোনও বিশেষ দাগ ছিল না, যাহা সহজে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৯০৫ সালে মধ্যমকুমার উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এতদ্বিষয় কাহারও আলোচনার বিষয়ীভূত নহে ; সুতরাং দুষ্ট ক্ষতের জন্য অথবা উপদংশের জন্য ঐ ক্ষত হইয়াছিল,—ডাক্তারের নজর তাহা এড়াইয়া গেলেও কিছু আসিয়া যায় না। সুতরাং বাদীর পরিচয় অন্য কোনও ঘটনার দ্বারা মিথ্যা সপ্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা নিঃসন্দেহ যে, ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল, কুমার ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার পায়ের গোড়ালীতে যে ক্ষত দাগ দেখিতে পান, তাহা এই ক্ষত দাগ, যাহা বাদীর শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ডাক্তারের রিপোর্টে ভয় করিবার মত যথেষ্ট কারণ বিবাদী-দিগের ছিল, তাঁহাদের সেই ভীতি অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার অন্যতম প্রমাণ। ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছিলে কি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক—

ডাক্তারের রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাক্ষী-দিগের অনেকেই বলিয়াছেন যে,—ছোটকুমারের বিবাহের সময় মধ্যমকুমার লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোড়াইয়া বেড়াইতেন।

(বাদীর ১৫, ৩৪, ২, ১৫, ৭১, ২১১, ৯৫৯, ৪৫৪, ৮০৬ ও ৯১৭ নং সাক্ষী দ্রষ্টব্য)

বৃদ্ধ নাজীর গঙ্গাচরণ বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছেন। তিনি তখন বড়দালানে ছিলেন, তিনি তথা হইতে দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন, যাইয়া দেখেন যে, মেজকুমারের হাত হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। সাক্ষী একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া পট্টি বাঁধিয়া দেন। বাদীপক্ষে ৭৪নং সাক্ষী বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার বলিয়াছেন যে, মেজকুমার ডিস্পেন্সারী হইতে ঔষধ লইয়াছেন, চাকরগণ তাঁহার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়াছে, বাদীপক্ষের ৪৮নং সাক্ষী বৃদ্ধ খানসামাও উহা দেখিয়াছে। এই সাক্ষ্যগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই বা একটা অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে বৈষম্য আছে, উহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই। ইহা পরিষ্কার যে, মেজকুমারের গায়ে একটা অসমান দাগ ছিল। ইহা যদি গাড়ীর চাকার দাগ না হইয়া থাকে, তবে এই দাগের প্রকৃত কারণ বলিতে ভগ্নীদের পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিবাদীপক্ষের কোন সাক্ষী এমন কি, ফণীবাবুও এই দাগ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। এখন আর এই দাগের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যানা। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন, ছোটকুমারের বিবাহের সময় তিনি খোঁড়াইয়া হাঁটেন নাই। গাড়ীর চাকার দ্বারা তিনি কোন জখম পান নাই; চিকিৎসকগণ উপদংশের দরুণ এই প্রকার হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না। বিবাদী-পক্ষের একমাত্র মেজরাণী এই সম্পর্কে কিছু বলিয়াছেন।

মেডিকেল রিপোর্ট আসিবার পর মেজরাণী একটা দাগ

আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ—

প্রঃ—তাঁহার শরীরে আপনি কোন দাগ লক্ষ্য করিয়াছেন ?

উঃ—তাঁহার বাম পায়ে একটি কাটার দাগ ব্যতীত অন্য কোন দাগ লক্ষ্য করি নাই।

প্রঃ—হাঁ কি রকম দাগ ?

উঃ—চামড়ার উপর একটা সাধারণ দাগ।

তিনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের বিবাহের সময়ই তিনি এই দাগ দেখিয়াছেন। ছোটকুমারের বিবাহের সময় তিনি (মেজকুমার) খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন কি না জেরায় তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন—

'ছোটকুমারের বিবাহের সময় মেজকুমার খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন কি না তাহা আমার মনে নাই। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে তখন যেন খোঁড়ান নাই।"

প্রঃ—তিনি যে তখন খোঁড়াইয়া চলেন নাই, তাহা আপনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আমি সঠিক ভাবে বলিতে পারি না, কারণ আমার মনে নাই। এই সময় তাঁহাকে একখানি চিঠি দেখান হয়। এই চিঠিখানি তাঁহার বড় ভগ্নী মলিনা ১৩১০ সনের ৭ই ফাল্গুন (১৯০২-১৯০৪) তাঁহার নিকট লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠিখানির মধ্যে নিম্নোক্ত ছত্রটিও লেখা ছিল; "রমেন্দ্রের পায়ের ঘা শুকাইয়াছে শুনিয়া আমরা সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ১৯০৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী ছোটকুমারের বিবাহ হইয়াছে।

(ছোটরাণীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) কোন চিকিৎসকই উহাকে অসমান দাগ বলিবেন না।

আমি বাদীর বাম পায়ের গোঁড়ালীর উপর একটা অসমান ক্ষত চিহ্নের দাগ দেখিতেছি। ইনসিওরেন্স ডাক্তারও এই দাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একজন চিকিৎসক বলিরাছেন, বাদীর পায়ের গোড়ালীর সামনের দিকে একটা দাগ আছে এবং গোড়ালীর পেছনের দিকেও একটা দাগ আছে। বাদী এই দাগ সম্পর্কে কিছু বলে চিকিৎসকগণ এই দাগেব মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন না।

বাদীর উভয় পায়ের গোড়ালীর উপর চামড়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

বিবাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী লেঃ কর্ণেল পুলি একজন চিকিৎ-সক নহেন। তিনি কোর্টে বাদীর পায়ের চামড়া খসখসে বলিয়া দেখিয়াছেন।

লেঃ কর্ণেল ম্যাকগিল ক্রাইষ্ট একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, এম, এস, তিনি সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি বাদীর চানড়া সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, বাদীর চামড়া খসখসে এবং চিকণ—উহাকে মাছের চামড়া বলা যাইতে পারে, উহা বংশগত বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইটও উহা দেখিয়াছেন, তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, বাদীর পায়ের

গোড়ালির উপর যে চামড়া আছে, উহা কতকটা অদ্ভুত ধরণের, উহা কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, উহা চামড়ার উপর একটা দাগ।

উহার যে নামই দেওয়া হউক না, আমি মনে করি কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইট অনুমানের উপরই উহা বলিয়াছেন। বাদী বলিয়াছেন যে, ছোটকুমার, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, কৃপাময়ী দেবী, বুদ্ধু, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা মণি এবং তাঁহার এই প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পায়ে এইপ্রকার দাগ আছে। বাদীপক্ষ হইতে তাঁহাকে এই সম্পর্কে জেরা করা হয় নাই। সেই পক্ষের একজন সাক্ষীও স্বীকার করিয়াছেন এবং অন্য সাক্ষিগণও উহা অস্বীকার করেন নাই। একজন সাক্ষী মামলার পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পরে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি এই দুইজন সম্পর্কে বলিব। মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনে ফণীবাবুর ভগ্নীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তিনি উহা অস্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কুমারের খসখসে পা সম্পর্কে বহু সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার, কৃপাময়ী দেবীর, দ্বিতীয় কুমারের, ছোটকুমারের, তাঁহার নিজের, তাঁহার ছেলে বুদ্ধুর এবং তাঁহার কন্যা মণির এইরূপ খসখসে পা। আমি তাহার গোড়ালি ও পায়ের পাতার উপরের দিক দেখিয়াছি এবং উহা বেশ সুস্পষ্ট রূপে খসখসে। উহা মোটেই মসৃণ নহে। উহা রেতির মত খসখসে। বিবাদীপক্ষের কমিশন সাক্ষী উকীল জগদীশবাবু জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, বুদ্ধু,

দ্বিতীয় কুমার, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ছোটকুমার ও বাদীর ঐরূপ চামড়া, উহা 'হাতীর চামড়ার মত খসখসে।' ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অপর দুইজন সাক্ষী উহা প্রায় স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র ফণীবাবুর ভগ্নী শৈবলিনী উহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর যতটা স্বীকার করা সম্ভব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বেলায় এই সম্পর্কে তিনি ততটা স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী এই বিষয়ে তাঁহার জেরার উল্লেখ করেন নাই এই সম্পর্কে বাড়ীর চাকর অথবা আত্মীয়স্বজন অথবা যাঁহারা এই পরিবার ভাল রকম জানিতেন এইরূপ বহু লোকের সাক্ষ্য খণ্ডন করা হয় নাই। আমি দেখিতেছি যে, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন মিঃ নবেন্দ্র মুখার্জ্জী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দ্বিতীয় কুমার ও ছোটকুমারের মধ্যে উহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য। আশু ডাক্তার বলিয়াছেন যে, গোড়ালির সন্ধিস্থলে খসখসে চামড়া ভাওয়াল রাজপরিবারের একটী বৈশিষ্ট্য কেবল বড়কুমার ও ইন্দুময়ীর বৈশিষ্ট্য নাই।

কাণ ফোঁড়া

বাদী ইহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মিঃ চৌধুরী সত্যভামা দেবীর ভাইপো কুমুদ গোস্বামীকে জেরা করিয়া ইহা বাহির করিয়াছেন কুমুদবাবু রাজবাড়ীতে প্রতিপালিত হন। তিনি বলেন যে, কুমারের কাণ ফোঁড়া ছিল। জীবন বীমার এজেণ্ট মিঃ সেনকেও এই প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু মিঃ সেনের তাহা

স্মরণ নাই কাণ ফোঁড়ার কথা সাক্ষিগণ অস্বীকার করিবে এই উদ্দেশ্যেই ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর আসিয়া 'হাঁ' এবং কেহ তাহা অস্বীকার করিতেছে না। বাদীর কাণ ও ফোঁড়া দেখা যায়। ইহা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, উহা টাকার চিহ্নের ন্যায় একটা সাধারণ জিনিষ।

উপদংশজনিত চিহ্ন

উপদংশঘটিত চিহ্ন বলিয়া যে সব চিহ্নের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা উপদংশ ঘটিত চিহ্ন ইহা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু ঐরূপ চিহ্ন দেখা গিয়াছে এবং ডাঃ ডেনহ্যাম তাঁহার নোটে তাহা বর্ণনা কবিয়াছেন।

পক্ষাপক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত এক আদেশ দেন যেন পক্ষাপক্ষ স্বীকার করেন যে বিবাদীপক্ষের একজন ডাক্তার এবং বাদীপক্ষের একজন ডাক্তার দ্বারা বাদীকে পরীক্ষা করা হইবে ও তাঁহাদের দ্রষ্টব্য বিষয় এবং মতবাদের মধ্যে যদি মতভেদ হয়, তাহা হইলে বাদী তাহার একজন ডাক্তার ডাকিতে পারিবেন।

বিবাদীপক্ষে লেঃ কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট আই এম এস, (অবসর প্রাপ্ত) এবং মেজর টমাস আই এম এস বাদীকে পরীক্ষা করেন এবং বাদীপক্ষে লেঃ কঃ কে কে চাটার্জ্জি ছিলেন। এই তিনজন ডাক্তার বাদীকে একই সময় পরীক্ষা করেন।

এই উপদংশজনিত চিহ্ন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হয়।

কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট এল আর সি পি (?) এম আর সি এস, এম-বি, বি-এস (লণ্ডন), একজন অবসরপ্রাপ্ত আই এম এস। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তিনি তিন বৎসর রেসিডেন্ট সার্জ্জেন ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সার্জ্জারীর অধ্যাপক ছিলেন ইহা ভিন্ন তিনি বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন।

মেজর টমাস আই এম এস একজন সিভিল সার্জ্জন তিনি এখনও চাকুরীতে আছেন।

দুইজনই অভিজ্ঞ ডাক্তার। কিন্তু ইঁহারা কেহই উপদংশ রোগের বিশেষজ্ঞ নহেন। অবশ্য সাধারণ চিকিৎসাকালে তাঁহারা উপদংশের রোগী পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন। মেজর টমাস ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের কোন যৌন রোগ চিকিৎসার হাসপাতালে ৬ মাস কাল ছিলেন। লেঃ কঃ কে কে চাটার্জ্জি এফ আর সি আই, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটী অব মেডিসিনের ফেলো বেঙ্গল ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ফেলো, রয়েল সোসাইটী অব মেডিসিনের ফেলো, লণ্ডনের বাইও কেমিক্যাল সোসাইটীর সদস্য। ১৯০৭ সালে ডিগ্রী লাভ করেন। লণ্ডনের উলউইচ হাসপাতালে কর্ণেল ল্যামকিনের অধীনে তিনি কাজ করেন। যৌন ব্যাধি চিকিৎসার জন্যই ঐ হাসপাতাল। সার্জ্জারী, ট্রপিক্যাল সার্জ্জারী এবং উপদংশ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা সরকারী মেডিকেল স্কুলের সার্জ্জেন ছিলেন এবং পরে উহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ঐ অবস্থায়ই তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমানে তিনি কারমাইকেল কলেজের মেডিকেল সার্জ্জারীর সিনিয়র অধ্যাপক। তিনি অপারেটিভ সার্জ্জারী, ট্রপিক্যাল সার্জ্জারী, প্যাথলজি, সিফিলিস সম্পর্কে বই লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফণ্ডের অধীনে তিনি উপদংশ রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন। ঐ ফণ্ডে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য আছে। টক্সিন ভিন্ন স্যালভাসন হয় কি না তৎসম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি উপদংশ রোগ বিশেষজ্ঞ নহেন একথা কেহ বলেন নাই।

কি ভাবে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করেন

প্রত্যেক ডাক্তারই পরপব বাদীকে পরীক্ষা করেন। পরে কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট চিহ্নসমূহের বিবরণ বলেন এবং অপর দুইজন ডাক্তার তাহা লিখিয়া লন। মেজর টমাস ও কর্ণেল চাটার্জ্জির নোট আদালতে দাখিল করা হইয়াছে। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, সেই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। উপদংশজনিত চিহ্ন সম্পর্কে কর্ণেল চাট্যার্জ্জি একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু দাগের কারণ সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মভভেদ হইয়াছে।

কর্ণেল ডেনহাম মেজর টমাসের গৃহীত নোট প্রমাণ করেন।

কর্ণেল চাটার্জ্জিকে বলা হইয়াছে যে, কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট যাহা বলিয়াছেন এবং ঐ দুইজন ডাক্তার যাহা লিখিয়াছেন উভয়ের স্বীকৃত মতেই তাহা লিখা হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা অধিক অসত্য উক্তি আর কিছু হইতে পারে না।

পরে ইহা আর মনে ছিল ছিল না এবং তাহা প্রত্যাহার করা হয়। ডাক্তারগণ যখন বাদীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন উভয়পক্ষের কৌঁসুলী উপস্থিত ছিলেন। শুধু যখন বাদীর গোপন অঙ্গ সমূহ পরীক্ষা করা হইতেছিল তখন তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন না। কর্ণেল চাটার্জ্জি বলিয়াছেন; এবং তাঁহার লিখিত নোট দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে যে, কর্ণেল ডেনহাম যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা তিনি লিখিয়া নিয়া তাঁহার সঙ্গে নিজের মন্তব্যও জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, ঐ সব নোট তুলনা করা হইবে এবং পরে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইবে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে তিনি ডাক্তারেরা যেরূপ করিয়া থাকেন সেইভাবে তাহাদের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঐরূপ কোন আদেশ নাই এই অজুহাতে বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী তাহাতে বাধা দেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

"আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আপনারা তিনজন ডাক্তারে যাহা দেখিয়া একমত হইয়াছেন তাহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

উঃ—না সামান্য মতভেদ ছিল এবং এইজন্য আমরা মিলিত হইতে চাহিয়াছিলাম।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, যাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছিল তৎসম্পর্কে আপনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

উঃ—ইহা সত্য নহে।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে নোট নিবার পূর্ব্বেই সমস্ত অলোচনা হইয়া গিয়াছিল।

উঃ—হাঁ, আমার মতানৈক্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আমার মতানৈক্যের কথা লিখিয়া রাখিতেছি এবং কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটকে তাহা স্থানে স্থানে দেখাইয়াছি।

প্রঃ—আমি বলিতেছি যে, আপনি কখনও তাহা করেন নাই।

উঃ—তাহা মিথ্যা কথা।

ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, কর্ণেল চাটার্জ্জি তাঁহার নোটে তখনই তখনই অতিরিক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা তুলনা করিতে চাহেন। কিন্তু কোর্টের আদেশের ঐরূপ ভাব থাকিলেও বিবাদীপক্ষের উকীল তাহাতে বাধা দেন। যেখানে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে চলিয়াছে এবং আলোচনা করিয়াও যেখানে কোন অভিমত প্রকাশ করা যায়, সেই ক্ষেত্রে কর্ণেল চাটার্জ্জি তাঁহার নিজের মতকে প্রামাণ্য মত বলিয়া অপর দুইজন ডাক্তারকেও নিজের মতে টানিয়া আনিবেন এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। আর যদি তিনি তাঁহার যুক্তি দ্বারা ঐরূপ করিতে সমর্থ হন তাহা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ করিবার কিছু থাকিবে না।

উপদংশ সম্বন্ধে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্যাবধারণ করিতে হইলে যে সকল বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নাই, তাহার কতকগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। তাহা ছাড়া উপদংশ ব্যাধি সম্বন্ধে যে সাতজন ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতেই (সকলেই ব্যাধি সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিয়াছেন) এবং ঐ ব্যাধি সম্বন্ধে আমার নিকট যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ উপস্থিত করা হইয়াছে (তন্মধ্যে ডেভিড লেসের "প্র্যাকটিক্যাল মেথডস ইন ডায়গনসিস এণ্ড ট্রিটমেণ্ট অব ভিনিরিয়েল ডিজিসেস—"রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং ধাতু সংক্রান্ত ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য), তাহা হইতে যে আবশ্যক বিষয়গুলি সংগৃহীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। উপদংশ ব্যাধি সংক্রান্ত বর্ণনার যে অংশ আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নাই। এই মামলা সম্পর্কে উহার যতটা আবশ্যক, তাহার অধিক এখানে কিছুই উল্লেখ করা হইবে না।

১৯০৯ সালের মে মাসে মধ্যমকুমার যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন তাঁহার শরীরে অর্ব্বুদ উৎপাদক উপদংশজ ক্ষত ছিল। ১৯০৮ সালে চিকিৎসার্থ তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার শরীরে সে ক্ষত ছিল। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ফণীবাবু

বলিয়াছেন, ১৯০৯ সালের পূর্ব্বে তিন বৎসর যাবৎ মধ্যম-কুমারের উপদংশ রোগ ছিল। ঐ সময় আড়াই বৎসর কাল তিনি উপদংশজ ক্ষতে ভুগিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চিত যে, ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মধ্যমকুমার যখন ইনসিওরেন্স ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার উপদংশ ব্যাধি ছিল না, এ হিসাবে ১৯০৫ সালের এপ্রিল এবং ১৯০৭ সালের নবেম্বর—এই সময়ের মধ্যে মধ্যমকুমারের উপদংশ সংক্রমণ হইয়াছিল এবং ১৯০৭ সালের নবেম্বরে ক্ষত প্রকাশ পায়। ঠিক কোন দিন তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন, তাহার সঠিক তারিখ স্থির করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ১৯০৬ সালের প্রথমেই যে কুমারকে রোগ স্পর্শ করে, তাহা বুঝা যায়—কেননা, ছয় মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ অর্ব্বুদ বাহির হইবার সময়। ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না—কেননা, পুরাতন খানসামা প্রতাপ বলিয়াছে যে, রাণীর জীবিত থাকা কালেই ব্যাধির আক্রমণ আরম্ভ হয়।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে চিকিৎসার জন্য মধ্যমরাণীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। ইন্দুময়ী এক চিঠিতে রাণীকে লিখিয়াছিলেন (চিঠির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) যে, তাঁহার (মধ্যমরাণীর) রক্ত বিষাক্ত হয় নাই। রাণী ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন, তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং দার্জ্জিলিং গমনের তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্যাধির সূচনা হয়—এই সিদ্ধান্ত প্রায়ই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এখন উপদংশের ঔষধ বাহির হইয়াছে। ১৯০৯ সালে এলরিস এই ব্যারামের 'স্যালভাসন' নামক ঔষধ আবিষ্কার করেন। ১৯১০ সালে ঐ ঔষধ বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির করা হয় (ডেভিড লেসের গ্রন্থ, ১৫৫ পৃঃ, ১৯৩১ সালের সংস্করণ) মধ্যমকুমার এই ঔষধের কোনও সুবিধাই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উপদংশের যদি রীতিমত চিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অর্ব্বুদ প্রায়ই হয় না। মধ্যমকুমারের যখন পীড়া হয়, তখনও প্রতিষেধক ঔষধ ছিল—যেমন পারদ ব্যবহার করিলে অর্ব্বুদ হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। তৎসত্ত্বেও মধ্যমকুমারের যখন উপদংশজনিত অর্ব্বুদ হইয়াছিল, তখন বেশ বুঝা যায় যে, মধ্যমকুমারের চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মধ্যমকুমারের কনুইতে এবং তাঁহার পায়ে উপদংশজ অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, বাদীর শরীরের যে অর্ব্বুদ চিহ্ন আছে, তাহা উপদংশজনিত কি না এবং ঐ অর্ব্বুদ চিহ্ন উপদংশের স্মারক চিহ্ন কি না? আর একটী প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বাদীর উপদংশ রোগ ছিল অথবা ছিল না? এ প্রশ্ন ডাক্তারদের মনে জাগিয়াছিল বটে; কিন্তু এই সাধারণ প্রশ্ন ঠিক খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করা হয় নাই। মেজর টমাস বলিয়াছেন,—দরখাস্তের লিখিত চিহ্নগুলির বিশ্লেষণ এবং উপদংশ সম্পর্কিত বিষয় প্রমাণ করা অথবা তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ, আমাদের সাক্ষ্যের বিষয় ছিল।

উপদংশ ব্যাধি দুই প্রকারে সংক্রামিত হয়। এক সংসর্গজ,

আর জন্মসহজাত সংসর্গজ উপদংশে, উপদংশের বীজাণু পরস্পর সংসর্গের ফলে এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। সংক্রমণের আদি ক্ষেত্রই হইতেছে, জননেন্দ্রিয় লোনছা হইতে প্রথমে ব্যাধির সূচনা হয়। ক্রমশঃ সেই লোনছা দুষ্ট ব্রণে পরিণত হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করে। সে ক্ষত বেদনাহীন, অবসাদ-যুক্ত এবং ক্ষয়শীল। এই প্রকারের ক্ষত উপদংশজনিত ক্ষত বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার ফলে সচরাচর নিকটবর্ত্তী লসিকাবাহী গ্রন্থি স্ফীত ও শক্ত হইয়া উঠে। এই সকল এবং কুঁচকির মাংসপিণ্ড (ইনকুইন্যাল গ্ল্যাণ্ড) রবারের বলের মত নিম্নগামী হইয়া ফুলিতে থাকে ইহাকেই উপদংশজ বাগী বলে। অন্য কোনও বীজাণু সংক্রামিত না হইলে ইহাতে পূঁয হয় না। তবে পূঁয হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

উপদংশের বীজাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। বীজাণু রক্তের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেই দ্বিতীয় স্তরের অবস্থা সূচিত হয়। এই প্রাথমিক অবস্থার অব্যবহিত পরেই যে সকল বহিঃপ্রকাশ আরম্ভ হয়, তাহার মধ্যে স্ফোটকাদি উদ্ভেদ, ব্রণ, কণ্ডু প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ক্রমশঃ মিলাইয়া যায় না, মিলাইলে শেষ অবস্থায় তাহা হইতে উপদংশজনিত ক্ষতের উৎপত্তি হয়। এ অবস্থা যে কতদিন চলে, তাহা বলা যায় না। মাংসের নীচে যে কোনও স্থানে—হাড়ে, যকৃতে অথবা অন্য কোনও যন্ত্রে 'গামা' বা উপদংশজ ক্ষত জন্মিতে পারে। মাংসতন্তুর কোনই এই আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় না।

চামড়ার উপর যে ক্ষতজনিত অর্ব্বুদ জন্মে, তাহা প্রথম অবস্থায় সচরাচর চামড়ার নীচে গুটি বা আঁবের আকারে উঠে। সময় সময় ঐ গুটি চামড়ার নীচে থাকিয়াই শুকাইয়া যায়। তাহাতে চামড়ার উপরে কোনও দাগ রাখে না বটে, তবে চামড়ার উপর একটা গর্ত্তের মত চিহ্ন দেখা যায়। ঐ গুটি বা আঁব বড় হইয়া চামড়া ফুটিয়াও বাহির হইয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে শরীরে উপদংশজ ক্ষত জন্মে। ঐ প্রকার ক্ষতের প্রকৃতিই এই যে,—উহার ধারগুলি বসা এবং উহার মধ্য হইতে পচা মাংস আলগা হইয়া আসে, এবং ধাবের চামড়া মরিয়া উঠিয়া যায়। যখন সেগুলি শুকাইয়া যায়, তখন একটা ক্ষতের দাগ থাকে। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই হইতেছে যে, বাদী তাঁহার শরীরে উপদংশজ ক্ষত বলিয়া যে সকল চিহ্ন দেখাইতেছেন, তাহা এই প্রকারের ক্ষত চিহ্ন কি না ?

চামড়ার উপর যে ক্ষত জন্মে, তাহা ছাড়া আগে অথবা পরে, অন্য প্রকারের উপদংশজ অর্ব্বুদ হইতে পারে। শরীরের অপরাপর অংশের মধ্যে ঐ প্রকারের গুল্ম জিহ্বার উপরে এবং হাড়ের উপরে জন্মে। উপদংশজ অন্যান্য চিহ্নের মধ্যে হাড়ের উপরও অস্থি-গুল্ম হয় হাড়ের এই বাড়তি সচরাচর অস্থি-গুল্ম নামে অভিহিত হয়।

চামড়ার উপরকার অর্ব্বুদ সম্বন্ধে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উপদংশ ব্যাধির মাধ্যমিক অবস্থায় যে প্রকারের স্ফোটক জন্মে, ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ঐ অর্ব্বুদের আকার

সুডোল ও বৃত্তের স্থায় অথবা বৃত্তাংশের মত; আবার ক্ষেত্র বিশেষে উহার আকৃতি বৃত্ত-সমষ্টির স্থায়।

আমি বিশেষজ্ঞদিগের উক্তি হইতে আমার নিকট দাখিলী প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে এই বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্কলন করিলাম। আমার সিদ্ধান্তে সহায়তা করে—এমন সকল বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে আমি পুনরায় এ বিষয়ের অবতারণা করিব।

এক্ষণে দুইটি বিষয় সম্পর্কিত প্রমাণের বিষয় বিবেচনা করিব, তাহা এই—(১) উপদংশজ গুল্ম; যাহার সম্বন্ধে মতান্তর আছে; এবং (২) উপদংশজনিত অর্ব্বুদের চিহ্ন।

যে গুল্ম লইয়া মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ডাঃ ডেনহাম হোয়াইটের নোটের মধ্যে ২য় ও ১০ম দফায় দৃষ্ট হয়। ঐ গুল্ম সম্বন্ধে তিনজন ডাক্তার এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'নাসিকা সেতুর' ডানদিকে হাড়ের যে বাড়তি, যাহা উপস্থিত একটু উপরে অবস্থিত, এবং যাহাকে মুখমণ্ডল সম্পর্কিত একটা স্তর বলা যাইতে পারে, তাহাকে গুল্ম বলা চলে না। ডাক্তারেরা (কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি) 'নাসিকা-সেতুর' বাম দিকে সেরূপ কোনও হাড় বাড়তি দেখেন নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, 'নাসিকা সেতুর' ডানদিকের 'হাড় বাড়তি' যাহা সকলেরই স্বীকৃত, সেটি কি? লেঃ কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট এবং মেজর টমাস বলেন, উহা উপদংশজ নহে। ইহা ছাড়া তাঁহারা অন্য মত প্রকাশ করেন নাই। প্রথম জবানবন্দীতে ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—এইরূপ গুল্ম কোনও আঘাতের ফলে অথবা ঘুষি মারিলে হইতে পারে।

জেয়ার উত্তরে তিনি বলেন, উহা কতদিনের তাহা তিনি বলিতে পারেন না; তবে এইরূপ চিহ্ন যে অল্প দিনের নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে, খুব জোরে আঘাত করা হইয়াছিল। ঐস্থানে কোনও দাগ নাই। তাঁহার মতে উহা জন্মসহজাত হইতে পারে। কিন্তু তিনি আবার বলেন যে, সেরূপ নাও হইতে পারে। শেষে তিনি বলেন যে, ঐরূপ চিহ্ন যে কোনও কারণে হইতে পারে। হাড় ভাঙ্গা সে সকল কারণ হইতে বাদ পাড়ে না। নাকের মধ্যে হাড় বাড়িয়া গেলেও ঐরূপ গুল্ম চিহ্ন হইতে পারে। ফলতঃ সাক্ষী জন্মগত কারণ একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, সে কারণ সম্ভব নাও হইতে পারে।

মেজর টমাস বলেন যে, ইহা ঠিক কিনা, তাহা বলা কঠিন; হয় ইহা নাসিকার অস্থিতে একটা অস্বাভাবিক কিছু, নতুবা নাসিকার অস্থিতে আঘাত লাগিবার পর উহা তাহার অবশিষ্টাংশ বা উহা অস্থির অস্বাভাবিক পরিবর্দ্ধনও হইতে পারে। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের মনেও ঠিক এইরকম ধারণাই হইয়াছিল। তিনি এই অস্থির পরিবর্দ্ধন দেখিয়া যে সকল কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হাড় ভাঙ্গার কথাও বাদ যায় নাই। অবশ্য তিনি উপদংশের কথাও বলিয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে বাদীর যদি উপদংশ কখনও হইয়া থাকে, তবে অবস্থাটা অদ্ভুত রকমের হইলেও এই দুইটি কথা একসঙ্গে মনে হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর স্থির বিশ্বাস যে, ইহা উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ, একজন বিশেষজ্ঞও এই কথা বলিয়াছেন। অপরদিকে

উপদংশের কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কেবল নেতিবাচক ও যুক্তি-হীন উত্তর কর্ণেল লেফটেনাণ্ট ডেনহাম উপদংশের কথা এই বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে চান যে, উপদংশ হইলে ইহা ক্রমশঃই বাড়িত এবং যে অবস্থা দেখা যায় তাহা অস্বাভাবিক, কেহই জানে না যে, ইহা বাড়িতেছে কি না। স্থান সম্পর্কে কর্ণেল চাটার্জ্জী বলেন যে, ইহা স্বাভাবিকও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। টমাস ও মাইলাসর যে "ম্যানুয়েল অব সার্জ্জারী" আমাকে দেখান হয়, তাহাতে নিম্নের কথাগুলি আছে ঃ—

অর্ব্বুদ উৎপাদক উপদংশ জাতীয় ব্যাধিতে যে সকল অস্থি আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইতেছে,—মাথার খুলি, নাসিকার অস্থি, নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক ঝিল্লী, প্যালেট, ষ্টেরনাম, ফিমার, টিবিয়া এবং বাহুব অগ্রভাগের অস্থি। (৮ম সংস্করণের প্রথম সংখ্যায়, ৯ম পরিচ্ছেদে, ৪৭১ পৃষ্ঠায়) ৫১ পৃষ্ঠায় ডেভিড লীজ বলেন যে, মাংসতন্তু ছাড়া-ছাড়া নয়; যদিও ১০১ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ অর্ব্বুদ কোলাট বোন, ষ্টেরনাম, বুকেব পাঁজর এবং টিবিয়াতে দেখা দেয়। উপদংশ যে ছিল, একথা উড়াইয়া দেওয়াব কোন কারণ নাই এবং মিঃ চাটার্জ্জীর উক্তি হইতেই ইহা বিশ্বাস করা যায়। তবে আমি বলিব, সেরূপভাবে ইহা বিশ্বাস করিবারও প্রয়োজন নাই। বাদী যে উপদংশ ব্যাধিগ্রস্ত লোক ছিলেন, তাহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নজীর আছে। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী উপদংশের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা অর্ব্বুদ দ্বারাই প্রমাণিত হয় এবং বিশেষ করিয়া ষ্টেরনামে যে স্থুল চিহ্ন দেখা

যায়, তাহাতে আর কোন সন্দেহের অবসর থাকে না। কর্ণেল চাটার্জ্জী জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ স্থূল চিহ্ন একটি উপদংশজনিত অর্ব্বুদ। অপর পক্ষে বলা হইয়াছে যে, খুব সম্ভব চর্ব্বি জমিয়া ঐ স্থানটী ঐরূপ হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলা যায় যে, বাদীর শরীরে উপদংশ আছে।

বাদীর শরীরে বর্ত্তমানেও উপদংশ আছে কি না এই কথা ডাঃ টমাস কিংবা ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ইহা নাই—এ কথাও কাহাকে বলা মুস্কিল এবং উপদংশ সম্বন্ধে নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করিয়া সাদৃশ্য প্রমাণ বাতিল করিয়া দেওয়ারও কোন প্রশ্নই উঠে না; কিন্তু যদি স্বীকার করা হয় যে উপদংশ আছে, তবে সাদৃশ্য প্রমাণের পক্ষে উহা একটি নজির হইয়া দাঁড়ায়। ইহা দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না; তবে দ্বিতীয় কুমারের উপদংশ ছিল এই যা। উপদংশের চিহ্ন যে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই থাকিবে এমন কোন কথা নাই।

মেজর টমাসের কথা উল্লেখ করিয়া ডাক্তারেরা—উপদংশ ছিল, কি ছিল না—ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া এমন কতকগুলি জিনিষ দেখিতে পান, যাহা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের নোটে উল্লেখ নাই। মেজর টমাস ইহা স্বীকার করেন যে, কর্ণেল চাটার্জ্জী যেমন বলিয়াছেন তেমন কতকগুলি কাজ করা হইয়াছে সেইগুলি হইল এই:—
কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বাদীর অণ্ডকোষ টিপিয়া দেখেন।

বাদী যে ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়েন, তৎপ্রতি কর্ণেল চাটার্জ্জী, মেজর টমাস ও কর্ণেল ডেনহামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বাদীর পুরুষাঙ্গে উপদংশজনিত কোন ক্ষত আছে কি না তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কর্ণেল চাটার্জ্জী বলিয়াছেন যে, বাদী বেশ জোরে শ্বাস টানেন এবং উহাতে শব্দ হয়। কর্ণেল চাটার্জ্জীর এই কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা জমিয়া আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য মেজর টমাস টর্চ্চ লাইট ফেলিয়া লক্ষ্য করেন। বাদীর শ্বাস-প্রশ্বাস যে অদ্ভুত ধরণের এই কথা মেজর টমাস স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি পায়ে এবং হৃদ্‌পিণ্ডে শোথের কথা উল্লেখ করেন। ইহা কিন্তু পরীক্ষা করা হয় নাই। বাদীর শ্বাস-প্রশ্বাস কেবল জোরেই বহে এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দও হয় এবং তাহাতে মনে হয় যে, নাসিকা পথে কোথাও বাধা পাইতেছে। কর্ণেল চাটার্জ্জী নাকের মধ্যে সাদা সাদা দাগ দেখিতে পান এবং ইহাও লক্ষ্য করেন যে, নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক ঝিল্লী কিঞ্চিৎ স্ফীত। তিনি বলেন যে, উপদংশ থাকিলে এরূপ অবস্থা হয়।

ইহার সহিত আরও বলা যাইতে পারে যে, বাদীর অণ্ড-কোষ তিনবার টিপিবার পর সে ব্যথায় সঙ্কুচিত হয়। কর্ণেল চাটার্জ্জী বলেন যে, সাধারণ লোক হইলে ইহাতে চীৎকার করিবার কথা।

কর্ণেল চাটার্জ্জী বলেন যে, বাদীর জিভের মাঝখানটা যে কাটা, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। আমি আদালতে বাদীর জিভ দেখিয়াছি, উহা কাটা বলিয়া মনে হয়। কর্ণেল চাটার্জ্জী

নাকে, জিহ্বায় এবং পায়ের আঙ্গুলে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছেন, তাহা উপদংশজনিত বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত বাদীর অণ্ডকোষে যে তেমন স্পর্শানুভূতি নাই ইহা দ্বারাও বাদীর উপদংশ থাকা প্রমাণিত হয়।

ডেভিড লীজ ৮৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ সাধারণতঃ জিভেই প্রথমে দেখা দেয়। খাদ্য বস্তুর সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণ লাগার দরুণ ইহা বৃদ্ধি পায়। ফলে জিভে ফাঁক দেখা দেয়, বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হইলে পরে ক্ষত হয়।

বাদী বহু পূর্ব্বেই উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। তাঁহার "নাসিকা সেতুর" ডান দিকে ৭/১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি হাড় বাড়িয়াছে এবং বাঁ দিকের হাড় সামান্য মোটা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেপ্টাম সামান্য ফুলিয়াছে এবং নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক ঝিল্লী স্ফীত হইয়াছে। এই সকলের দরুণ এবং অর্ব্বুদ থাকায় নাকের গড়ন পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য; এতদ্ব্যতীত চেহারায় আর কোন বৈসাদৃশ্য নাই; একমাত্র বলা যায় বাদীর চুল পাকিয়াছে ডি (২) চামড়ায় উপদংশ জনিত ক্ষত চিহ্ন ডেনহাম হোয়াইটের নোটের মধ্যে উল্লেখ আছে, তথায় ছয়টি চিহ্নের কথা আছে, সেইগুলি এই :—

(১) বাম বাহুতে গোলাকৃতি অসমান চিহ্ন।

(২) ডান বাহুতে গোলাকৃতি অসমান চিহ্ন।

(৩) ডান বাহুর উপর আর একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন।

(৪) কাণের ভিতরে একটী চিহ্ন।

(৫) বাম পায়ের নীচের দিকে চুরুট আকারে একটা চিহ্ন।

(৬) বাম পায়েব পিছনের দিকে একটা চিহ্ন।

শেষ চিহ্নটীকে বাদী উপদংশজনিত ক্ষত বলিয়া বলেন নাই। চিকিৎসকগণ উহাকে উপদংশের ক্ষত বলিয়াছেন। কর্ণেল চাটুয্যে উহাকে 'লিয়োকো মেলানো দেরমা' নামক চামড়ার একপ্রকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট ইহা শুনিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত নহেন বলিয়া বলিয়াছেন, উপদংশের একটী চিহ্ন ব্যতীত এই চিহ্নের আর কোন গুরুত্ব নাই, তিনি উহাকে পোর্টে ওয়াইনের চিহ্ন বলিয়াছেন কিন্তু এই চিহ্ন হইবার কারণ তিনি খুজিয়া পান নাই।

অন্য চিহ্নগুলি উপদংশজনিত ক্ষত নহে বলিয়া কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট ও মেজর টমাস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কর্ণেল চাটুয্যে ঐগুলি উপদংশজনিত ক্ষত বলিয়াছেন।

এই সকল চিহ্নের মধ্যে (১) নং চিহ্ন বাম বাহুর উপর (২) ও (৩) ডান বাহুর উপর কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট (১) ও (২) নং চিহ্নকে একই শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন এবং ঐগুলিকে বসন্তের দাগ বলিয়াছেন (১) (২) ও (৩) নং চিহ্ন গোল এবং (১) ও (৩) নং চিহ্ন অস্পষ্ট (১) ও (২) নং চিহ্নে কর্ণেল চাটুয্যে কয়েকটা রঞ্জক চিহ্ন দেখিয়াছেন ও

(২) নং চিহ্ন অস্পষ্ট বলিয়াছেন (৩) নং চিহ্ন যে অস্পষ্ট তাহা পরিষ্কারই বুঝা যায়। মেজর টমাস স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুমানের উপরই এই চিহ্নগুলি সম্পর্কে তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটও অনুমানের উপরই বলিয়াছেন, তিনি ঐগুলি 'পাত্র চিহ্ন' বলিয়াছেন, তারপর (১) ও (২) নং চিহ্ন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপরই জোর দিতে থাকেন মেজর টমাস যে ঐগুলিকে উপদংশজনিত ক্ষত চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ তিনি যে অবস্থায় এই ধারণা করিয়াছেন, সে সময় উপদংশজনিত ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল। ইহা স্বীকৃত যে, এই দাগগুলি গোলাকার। সাধারণতঃ ঐগুলি অস্পষ্ট হয় এবং তাহাতে কিছুটা রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই রঞ্জক পদার্থ আবার দাগগুলির কিনারায় থাকিতে পারে; কিম্বা দাগের কেন্দ্রস্থলেও থাকিতে পারে। কর্ণেল চাটুয্যে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনি এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব আমি তাঁহার মতামত সমর্থন করি। বিশেষতঃ বাদীর সিফিলিস থাকার দরুণ ১নং, ৩নং এবং ৫নং চিহ্নগুলি অর্ব্বুদ চিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে তবে ৩নং চিহ্নটিকে চর্ম্মের নিম্নস্থিত অর্ব্বুদ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, এই সমস্তই অর্ব্বুদ চিহ্ন। ৪নং এবং ৬নং চিহ্ন সম্পর্কে সন্দেহ আছে এবং আমি নিশ্চয়ই বলিব যে, এই-গুলি অর্ব্বুদ চিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এই বিষয়ের প্রমাণ ততটা সঠিক নহে; হইতেও পারে না। দ্বিতীয়

কুমারের দেহের কোন্ কোন্ স্থানে ক্ষত ছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায় না। সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কুনুইতে এবং পায়ের উপর এই সমস্ত ক্ষত ছিল। ঠিক কোন্ কোন্ স্থানে এই সব ক্ষত ছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিবার জন্য বিবাদীপক্ষ কোন চেষ্টা করেন নাই। ডাঃ আশু-তোষকে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি কুমারের কুনুই এবং হাটু সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। অন্যান্য স্থানেও হইতে পারে, তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারেন নাই। অতএব ইহা বলা চলে না যে, বাম পায়ের বাহিরের দিকের দাগটি দ্বারা যেরূপ সনাক্তকরণ চলে, এই সকল চিহ্ন দ্বারাও তেমনি সনাক্তকরণের সহায়তা হয়। তবে এই সকল দাগ দ্বারা বাদী ও দ্বিতীয় কুমারের সাদৃশ্য প্রমাণের পথে কোনই বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে বাদীর শরীরেও যে সিফিলিস আছে, তাহা দ্বারা সনাক্তকরণের সুবিধাই হয়। অধিকন্তু বাদীর কুনুই এবং তাহার নীচে এবং বাদীর পায়ে অর্ব্বুদ চিহ্ন আছে, এতদ্দারাও সনাক্তকরণের সহায়তাই হইতেছে। কারণ একজন সাক্ষী (বাদীপক্ষের ১৫নং সাক্ষী) অস্পষ্টভাবে দ্বিতীয় কুমারের এই সব স্থানে দাগ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

এখন আমার দুইটি বিষয় বলা উচিত। এই বিষয় দুইটির কথা আরও পূর্ব্বেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। বাদীর পুরুষা-ঙ্গের উপর কোথাও উপদংশজনিত ক্ষতের চিহ্ন নাই। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে গ্রন্থিগুলির

মধ্যে যদি আসল উপদংশজনিত দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে চিরকাল তাহার দাগ থাকে। মেজর টমাস ইহার সহিত একমত তবে তিনি বলেন যে, উপদংশজনিত যে ক্ষত তাহা একেবারেও বিলুপ্ত হইতে পারে এবং কোনও প্রকার ক্ষত চিহ্ন নাও থাকিতে পারে। বাদী এবং বৃদ্ধ খানসামা যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, উপরোক্ত ক্ষতটা অস্থায়ী রকমের ছিল না, ইহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পটি বাঁধিয়া রাখিতে হইত। সে যাহাই হউক, ইহা পুরুষাঙ্গের ঠিক অগ্রভাগে হইয়াছিল অথবা পুরুষাঙ্গের অপর কোন অংশে হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। সাধারণতঃ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের কোমল ভাঁজ-করা চর্ম্মের অভ্যন্তরেই এইরূপ ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে (ডেভিড লীজের পুস্তকের ৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠা দেখুন) সাক্ষীরা যে ইঙ্গিত করিয়াছেন (এই বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বেই তাহারা বলিয়াছিলেন) তাহাতে মনে হয় যে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম্মের উপরই ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত এই যে, পুরুষাঙ্গের যে স্থানেই উপদংশজনিত ক্ষত উৎপন্ন হউক না কেন, পরে তাহার কোন দাগ নাও থাকিতে পারে। অতএব যাহার সিফিলিস হইয়াছে কি না এই সম্পর্কে সন্দেহ আছে, সেরূপ কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার সময় উপদংশের ক্ষত চিহ্ন থাকা না থাকা দ্বারা বিশেষ কোন সাহায্য হয় না (টমাস ও মাইলসের লিখিত "ম্যানুয়েল অব সার্জ্জারী" পুস্তকের ৮ম সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা এবং রোসানি এণ্ড মিচেলার

লিখিত "জেনারেল সার্জ্জারী" ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ, ১৯২৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

অপর কথা হইতেছে বাদীপক্ষের সাক্ষী লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ম্যাকগিল খ্রাইষ্টের উক্তি তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন, তিনি বাদীর শরীরের উপর কতকগুলি দাগ দেখিয়াছেন এবং সেগুলি সিফিলিসের ক্ষত হইতেই উৎপন্ন কিন্তু জেরার সময় তিনি বলেন, সেগুলি উপদংশজনিত অর্ব্বূদ নহে। তিনি অপর একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন তিনি কোন চিহ্নের কথা বলিতেছেন, তাহা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে আমি যে তিনজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা যেরূপ অভিনিবেশ সহকারে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াছেন, কর্ণেল ম্যাকগিল খ্রাইষ্ট তেমন ভাবে দেখেন নাই।

সাক্ষীগণের উক্তির বিশ্বাসযোগ্যতার উপর যাহা নির্ভর করে না, এতক্ষণ আমি সেইরূপ চিহ্নগুলির কথাই আলোচনা কবিতেছিলাম। খসখসে পা সম্পর্কে উভয় পক্ষই প্রায় একমত। বীমার ডাক্তারের রিপোর্টে বর্ণিত যে চিহ্ন—বাম পায়ের গোড়ালীর বাহিরের দিকের যে অস্বাভাবিক দাগ, তাহা অতি সুদৃঢ় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ণভেদের চিহ্ন তো বিবাদী পক্ষের নিজেদের বর্ণিত বিষয়। তারপর অর্ব্বূদ চিহ্নও উভয় পক্ষের স্বীকৃত সিফিলিস ও দুষ্ট ক্ষতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এক্ষণে সেই সকল চিহ্নের কথা আলোচনা করিব; সে সকল চিহ্ন কেবল সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

বাগী চিহ্ন

ইহা একটি অস্ত্রোপচারের দাগ কিন্তু ঐ দাগ কুঁচকীতে নহে, তলপেটে।

বাদী সকল সময়ই উহাকে বাগী বলিয়া আসিয়াছেন। বাগী অর্থ 'বিউবো', 'সিফিলিস' অথবা অন্য কিছু। কিন্তু বাদী বলিয়াছেন যে, উপদংশ থাকার ফলে ঐ দাগ হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন—"পুরুষাঙ্গের উপর একটি ঘা হইয়া প্রথমতঃ উপদংশ রোগ দেখা দেয় এবং ইহার এক মাস পর বাগী হয়। এলাহী ডাক্তার তাহাতে অস্ত্রোপচার করে। এই ঘটনা তাঁহার পিতার মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পর অনুমান ১৯০৬ সালে হয়। এই কাহিনী দুইজন পুরাতন ভৃত্য এবং পরিবারের একজন কম্পাণ্ডার সমর্থন করিয়াছেন। এলাহী ডাক্তার এতদঞ্চলের একজন সুপরিচিত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার ডিপ্লোমা রহিয়াছে। ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১৯২১ সালে বাদীর আগমনের পর রায় সাহেব তাহাকে খোঁজ করিতেছিলেন। তিনি ইহা স্বীকার কবিয়াছেন এবং পরে তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন (একজিবিট ৩০৪)। চিহ্ন দ্বারা ঐ উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। এবং যদি এলাহী ডাক্তার অথবা বাদী উহাকে বাগী বলিয়া ধারণা করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কারণ মেজর টমাস স্বীকার করিয়াছেন যে কুঁচকির নিকটবর্ত্তী স্থান সম্পর্কে লোকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে।

দ্বিতীয় কুমারেরও ঐ অস্ত্রোপচারের দাগ ছিল, ইহাই আমি সাব্যস্ত করিতেছি।

জেরার নমুনা

বাদীকে যেভাবে জেরা করা হইয়াছিল নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

আপনি কি জানেন "এথলেটিকস্" কাহাকে বলে? স্পোর্টস্? ক্রিকেট ফ্ল্যানেল? বেল ব্রীক ক্রিকেট ফ্ল্যানেল ষ্ট্যাম্পস? উইকেটস? এল বি ডব্লিউ? আম্পেয়ার? ডিউস? ভাণ্টেজ? ১৫৩০৪০? কির্ড? মিস ইন বক্স? গোল-কিপার? হাফ ব্যাক? ফুল ব্যাক? সেণ্টার ফরোয়ার্ড? পোলো পেনিয়ান্স? পোলোতে ফাউল? ক্রস? নিয়ার সাইড ব্যাক হ্যাণ্ড? অফ সাইড ব্যাক হ্যাণ্ড? চাকের?

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাদীকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি মিলিটারী কলার্স, স্যুট, ব্রিচেস, হ্যাণ্ডকারচিফ, গ্যালাইন, ভেষ্ট, সক, টাই, লাউঞ্জ স্যুট, ইভনিং ড্রেস, চেষ্টারফিল্ড কোর্ট, ব্রড ক্লথ, ডাউবি ব্রেষ্ট কোট, সিঙ্গল ব্রেষ্টেড কোট চিনেন কি-না? বাদী এই সকল নাম জানিতেন না। তিনি স্যুট বলিতে কাপড়ের স্যুটই বুঝেন। পোষাকের এই সব নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী ইহার মধ্যে "ক্রাসড ফুড" কথাটিও উল্লেখ করেন। বাদী এই কথাটির উত্তরে বলেন যে, উহা একরকম ঘোড়ার খাদ্য। নাম জিজ্ঞাসা না করিয়া বাদীকে কতকগুলি জিনিষ দেখানো হয়, বাদী সেইগুলি চিনেন এবং

তাঁহার নিজের ভাষায় সেইগুলির নাম বলেন। বাদীকে কলার দেখান হইলে তিনি উহার নাম বলেন "কোল্ল" এবং টাইকে তিনি বলেন "নেক্সটি" এবং চেষ্টকে কোট বলেন।

বাদীকে আবাব জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি ডাইনিং রুম, সাইড বোর্ড, কাপবোর্ড, স্পন, ফর্ক, নাইক, সল্ট সেলাট, ক্রুযেট, মেনু, টাম্বলার, ওয়াইন গ্লাসটেবিল স্প্ন, ন্যাপকিন, ফিসলাইফ চিনেন কি না? উপরোক্ত নামের জিনিষগুলি দেখানো হয় না, কেবল নাম বলা হয়।

বাদী ক্যামেরা চিনেন কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন,—'হাঁ' ফোকাস, লেন্স, এক্সপোজার কাহাকে বলা হয় বাদী জানেন না। তিনি ষ্টুডিওকে "ষ্টুডি" বলেন।

... ...

এই সকল ইংরেজী শব্দের কোন্‌গুলির অর্থ কুমার জানিতেন এবং কোন্‌গুলির অর্থ জানিতেন না, তাহার বিশদ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কুমার যদি শিক্ষিত ও ইংরেজী জানা লোক হইতেন, তবে বাদীর আশা এইখানেই খতম হইত। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় যে, কুমার ইংরেজী জানিতেন না এবং তিনি অশিক্ষিত ছিলেন, তবে জেরাও এইখানেই শেষ হয়। ব্যাপারটী দাঁড়ায় এই যে, বাদীকে একখানি ল্যাটিনের প্রশ্নপত্র দিয়া যখন দেখা গেল যে সে উহার উত্তর করিতে পারিল না তখন ধরিয়া লওয়া হইল, কুমার নিশ্চয়ই ল্যাটিন জানিতেন। বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য এবং তাঁহারা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, উহা হইতে বুঝা যায় যে, কুমার একেবারেই নিরক্ষর। তিনি

শুধু কোন প্রকারে ইংরেজী ও বাঙ্গলাতে নিজের নামটা সহি করিতে পারেন। বিবাদীপক্ষ বলিতে চাহিয়াছেন যে, কুমার ইংরেজী জানিতেন, তিনি সাহেবী পোষাক পরিতেন, পোষাকের নাম জানিতেন এবং সাহেবী কায়দায় খানাপিনা করিতেন এবং তিনি টেনিশ হইতে পলো পর্য্যন্ত সকল খেলাই জানিতেন। অবশেষে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনি ক্রিকেটের বা ফুটবলের কিছুই জানিতেন না। তিনি ছেলেবেলায় বলে লাথি মারা বা ব্যাট দিয়া বল পিটান ছাড়া কখনো ফুটবল কি ক্রিকেট খেলেন নাই। অতঃপর বিবাদীপক্ষ টেনিশ পলো ও বিলিয়ার্ডের উপর জোর দিয়াছেন এবং কুমারের ইংরেজী জ্ঞান এবং বন্দুক ও গোলাবারুদ সম্পর্কিত ইংরেজী শব্দগুলি সম্পর্কেও জোর দেন।

মেজকুমারের জ্ঞান সম্পর্কে ফণীবাবু সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইনি ইঁহার শিক্ষা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ১৯০১ সালে পাঠ শেষ করিয়া ঢাকা হইতে যখন আসেন, তখন মেজ-কুমারকে ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছেন, ছোট কুমারও ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন তবে তাঁহার অপেক্ষা মেজকুমারই ভাল ইংরেজী বলিতে পারিতেন তিনি আরো বলিয়াছেন, ১৯০০ সালে বড়কুমারের বিবাহের বৎসর কুমারের শিক্ষা বন্ধ হইয়াছিল, ইহার পর রাজার মৃত্যু হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পর তাঁহারা আর মোটেই পড়াশুনা করেন নাই। ফণীবাবু বলিয়াছেন যে, মেজকুমার সকল প্রকারের খেলা জানিতেন। তিনি খেলায় মেজকুমারের সাথী

ছিলেন। তিনি বাদীকে ক্রিকেট টেনিস এবং শিকার সম্পর্কীয় শব্দগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এখন জানা গিয়াছে যে, তিনি এই শব্দসমূহের একখানি বই প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই বই হইতেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

... ...

দ্বিতীয় কুমার ছিলেন রাজপুত্র

বাদীর মানসিক শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল শব্দই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তাহার আচরণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এবং জীবন-যাত্রার পথে তিনি এই সকল শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। সুবিজ্ঞ কৌঁসুলি আমাকে বারবার বলিয়াছেন, মনে রাখিবেন যে, দ্বিতীয় কুমার ছিলেন, রাজপুত্র; তাঁহার কোন শিক্ষা হউক আর না হউক, তাহার সম্পর্কে কতকগুলি সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। এই কথাগুলি আমি অবশ্যই মনে রাখিব। তবে ইংরাজী ভাষা জ্ঞান কখনও ঐশ্বর্য্য সঞ্জাত বস্তু নহে। আপনি যদি স্বয়ং ক্রীকেট না খেলেন, অথবা খেলা সম্বন্ধে আগ্রহ না রাখেন, তাহা হইলে "এল বি ডবলিউ" এই কথাগুলি আপনি জানিতে কিম্বা মনে রাখিতে পারেন না। তারপর আচরণ সম্পর্কে কথা এই যে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় অথবা তাঁহাদের ভাওয়াল পরিদর্শন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও কুমারের আচার আচরণ

মোটের উপর খাঁটি বাঙ্গালীর ন্যায় ছিল। "রাজপুত্র" এই কথাটি দ্বারা সাক্ষীদের বেলায় সুবিধা করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে কি রাজপুত্র বলিয়া মনে হইত না? তাঁহার ছিরি কি রাজপুত্রের মত ছিল না? তাঁহার গোঁফ কি রাজপুত্রের মত দেখাইত না? একজন কৃষক শ্রদ্ধাভরে বলিয়াছে যে, রাজপুত্রের নাসিকার মতই তাঁহার উন্নত নাসিকা ছিল। যে যাহাই হউক এই সমস্ত কথায় আদালত বিভ্রান্ত হইবেন না।

বিবাদীপক্ষের মতলব

আমরে মনে হয়, প্রকৃত কুমারকেও বিফল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত এক ব্যক্তি যে ভাবে জেরা করিত ঠিক সেইভাবেই বাদীকে জেরা করা হইয়াছে; বিশেষতঃ কুমারের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নগুলিতে ঠিক এইরূপ মনোভাবই ধরা পড়িয়াছে। জেরাতে স্মৃতির কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ক্রীড়া সম্পর্কে কুমারের কোন সাধারণ জ্ঞান ছিল না; কারণ তিনি কখনও এই সমস্ত ক্রীড়ায় যোগ দেন নাই। তবে শিকার, ঘোড়ায় চড়া এবং পোষাক ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার সাধারণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু ইংরাজী শব্দ এবং পূর্ব্ববঙ্গে অপ্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করার ফলে এই সাধারণ জ্ঞানও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বাদীকে শিখান পড়ান হইয়াছে, এই অজুহাতে তাঁহার স্মৃতির কথা বাদ দিয়া কেবল সাধারণ জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া, ইহা একটা ছলনা মাত্র।

... ...

আমি ধরিয়া লইতেছি যে, দ্বিতীয় কুমার নিরক্ষর ছিলেন—তিনি শুধু তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন এবং তিনি ইংরেজী জানিতেন না।

কুমারদের খেলাধূলা

রাজবাড়ীর বড় দালানে একটি বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল এবং উহার সম্মুখে একটি টেনিস খেলিবার মাঠ ছিল। বাদী-পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায় যে, বড়কুমার এবং রায়সাহেব যোগেনবাবু টেনিস খেলিতেন। সত্যেনবাবু যখন আসিতেন, তখন তিনিও খেলিতেন। দ্বিতীয় কুমার টেনিস খেলিতেন না। বড়কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বে ছোটকুমারও উহা খেলিতেন না। (বাদীপক্ষের সাক্ষী ৬৬০, ৮৮১, ৮০৬ এবং ৯৭৭) বিলিয়ার্ড খেলা সম্বন্ধেও প্রায় একই রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একমাত্র দেখা যায় যে, ছোটকুমার মাঝে মাঝে ইহা খেলিতেন (বাদীপক্ষের সাক্ষী ৯০৭) বড়কুমার সময় সময় সাহেবদের সহিত মিশিয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেন এবং তিনি যাহাতে খেলাতে উন্নতি করিতে পারেন তজ্জন্য একসময় একজন "রামফ্যাল বা বিলিয়ার্ড পারদর্শী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একজন সাক্ষী বলিয়াছে যে, দ্বিতীয় কুমার টেনিস খেলাকে "মেয়েলী খেলা" বলিয়া পরিহাস করিতেন। তিনি ছিলেন শিকার প্রিয়। হাতী ঘোড়া আর মেয়েমানুষ লইয়াই তিনি মত্ত থাকিতেন। অনেকের

স্বভাব থাকে, খেলিতে না পারিলেও ফ্যাসান হিসাবে খেলা জানা; কিন্তু মধ্যমকুমার সেই ধাতের লোক ছিলেন না। প্রমাণে দেখা যায়, দ্বিতীয় কুমার বিলিয়ার্ড কিংবা টেনিস খেলা কোনটাই জানিতেন না; এবং বাদী যাহা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় কুমারকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনিয়া দাঁড় করাইলে তিনিও ইহার বেশী কিছু বলিতে পারিতেন না। এ সম্পর্কে লেফটেনাণ্ট হোসেনের কথা খুব বেশী উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি প্রমাণ করিতে আসিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় কুমার এবং তৃতীয় কুমার বিলিয়ার্ড খেলা জানিতেন এবং তাঁহারা যখন পার্ক ষ্ট্রীটে ছিলেন, তখন তাঁহার বাড়ীতে তাঁহারা বিলিয়ার্ড খেলিতে আসিতেন। ১৯০৪ সালে মায়ার সাহেব কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইবার পর দ্বিতীয় কুমার একাকীই কলিকাতা গিয়াছিলেন এবং র‍্যাঙ্কিন সাহেব কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর ছোটকুমার কলিকাতা গিয়াছিলেন। ছোটকুমার কলিকাতা গিয়া সেই সময় ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থিত বাড়ীতে ছিলেন।

পলো খেলা সম্বন্ধে বাদী বলিয়াছেন,—মিঃ মায়ার জয়দেবপুরে একটী পলো খেলার মাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমি সামান্য পলো খেলা শিখিয়াছিলাম। আমি ও ছোটকুমারই জানিতাম, বড়কুমার জানিতেন না।”

আমার বিবেচনায় একদিক হইতে এই উক্তির বিশেষ মূল্য আছে। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে যাঁহারা কৌঁসুলী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা আশা করেন নাই যে, তিনি টেনিস এবং অন্যান্য খেলা সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্ন করিবেন।

ইহারই ফলে যত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন বলা যায় যে, যদি পলো খেলার জন্য কোন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, তবে পলো খেলার কথা নিশ্চয়ই তাহাদের স্মরণ আছে। জেরায় দেখা গিয়াছে যে, বাদী পলো খেলা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। জয়দেবপুরে রাজবাড়ীর সম্মুখে যে ময়দান ছিল মিঃ মায়ার আসিয়া উহা সমতল করাইয়া পলো খেলার মাঠে পরিণত করেন। ইহাও অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনজন মণিপুরী ঘোড়শোয়ার রাখা হইয়াছিল। মণিপুরেই পলো খেলার সৃষ্টি। ঐ তিনজন ঘোড়শোয়ারের মধ্যে এক-জনের নাম ছিল চন্দ্রানম সিং। এই ব্যক্তি বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। সে যে বিবরণ দিয়াছে তাহা এই :—

১৯০১ সালে সে দ্বিতীয় কুমারের ঘোড়শোয়ার নিযুক্ত হয়; দেড় বৎসর দ্বিতীয় কুমারের অধীনে চাকুরী করিবার পর সে ছোটকুমারের ঘোড়শোয়ার হয় এবং প্রায় ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত সে ছোটকুমারের অধীনে চাকুরী করে। সে বলে যে, কাজে যোগ দেওয়ার দুই তিন মাস পরে দ্বিতীয় কুমার ১৫।২০ দিন তাহার সহিত পলো খেলিয়াছিলেন। রেবতী সিংও মাঝে মাঝে খেলিত। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় কুমার আর পলো খেলেন নাই। ছোটকুমারও পলো খেলিতে আরম্ভ করিলেন এবং তিনি খেলা বন্ধ করিলেন না। ইহার পর ছোটকুমার ঢাকা ক্লাবে পলো খেলিতে আসেন। সাক্ষীও তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, তবে খেলিতে নয়। মিঃ মায়ার তখন ক্লাবে খেলিতে আসিতেন। ইহার পর জয়দেবপুরে আর কখনও পলো খেলা হয় নাই।

একমাত্র ছোটকুমারের বিবাহের পরে একদিন খেলা হইয়াছিল। ঐদিনের খেলায় মিঃ মায়ার ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণ যোগ যোগ দিযাছিলেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিবাহ হইয়াছিল। সাক্ষী আরও বলেন যে, মিঃ মায়ার কলিকাতা হইতে ৬টি পলো খেলার ঘোড়া আনিয়াছিলেন এবং উহাদের মধ্যে ৪টি নলগোলায় এবং বাকী দুইটি জয়দেবপুরে রাখিয়াছিলেন; জেবার সময় সাক্ষী বলে যে, সে "পেলহ্যামবিট" কাহাকে বলে জানে না। নরম মুখকে "কাহৈ" বলা হয়—এবং শক্ত মুখকে "দাহন" বলা হয়—সে কথা জানে, পলো খেলার জন্য ঢাকায় সে কোন ঘোড়া কিনে নাই।—ঘোড়া কিনিবার জন্য সে কলিকাতায় যায় নাই। ঘোড়ার যে সব লক্ষণ সাক্ষী নজর করিত তাহা সে বলে; কিন্তু "১৪ হাত কি ১৫ হাতের"। কথা সে জানে না।

দ্বিতীয় কুমার যদি কোনও পলো প্রতিযোগিতায় না খেলিয়া কেবল খেলা অভ্যাস করিয়া থাকেন, তবে "নিয়ারসাইড ব্যাকহ্যাণ্ডের" মত কথা তাঁহার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ মণিপুরীরা হয়ত উহার পরিবর্ত্তে কোন বাংলা কথা ব্যবহার করিয়া থাকিত। "চাক্কের" শব্দটাকে তাহা বাজী বলিত এবং ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, মিঃ চৌধুরী যে সকল ইংরেজী শব্দ জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন, মণিপুরীরা তন্মধ্যে অনেকগুলির পরিবর্ত্তে বাংলা শব্দ ব্যবহার করিত। সে যাহাই হউক ইহা আশা করা যায় না যে, খেলা সম্বন্ধে বাদী যাহা জানিতেন, ৩৫ বৎসর পরেও তিনি তাহা মনে করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় কুমার ও বাদীর হস্তাক্ষর

আদালতে উত্থাপিত বাদীর স্বাক্ষরগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পাওয়া যাইতেছে দুইখানি ওকালতনামায় তাঁহার স্বাক্ষর এবং এবং জমি রেজেষ্টারী সংক্রান্ত মামলায় ১৯২১ সালে উত্থাপিত কয়েকখানি দরখাস্তের স্বাক্ষর (পি সিরিজের একজিবিট সমূহ)। তাহার পরে প্রায় ১৯টি স্বাক্ষর। ৮।১২।২৬ ইং তারিখে বোর্ড অব রেভিনিউএর নিকটে তিনি যে আবেদন করেন, তাহাতেই এই ১৯টি স্বাক্ষর আছে। তারিখ বিবেচনায় পরবর্ত্তী স্বাক্ষর হইতেছে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালতের নিকট দাখিলীকৃত কতিপয় স্বাক্ষর। এই স্বাক্ষরগুলিকে "আদালতে উত্থাপিত স্বাক্ষরের নমুনা" বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাদীর সর্ব্বশেষ স্বাক্ষর হইতেছে সেইগুলি—যেগুলি তিনি প্রকাশ্য আদালতে জেরার সময়ে লিখিয়া দিয়াছেন। এই স্বাক্ষরগুলিকে "আদালতে লিখিত স্বাক্ষরের নমুনা" বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রত্যেকটী স্বাক্ষরই ইংরাজীতে। বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, ঐ সকল স্বাক্ষর বাদী ব্যতীত আর কাহারও নয়। বাঙ্গলা স্বাক্ষর দুইটী দেওয়া হয় ১৯৩৩ সালে, কোর্টে যখন তাঁহাকে জেরা করা হয়। কোর্টে ৩টী স্বাক্ষর দাখিল করা হয়। ঐ সকল স্বাক্ষর যে বাদীর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মামলার বিচার আরম্ভ হওয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং বাদী যখন ১৯টী স্বাক্ষরই রেভিনিউ বোর্ডের নিকট মেমোরিয়াল প্রেরণ করেন,

তাহার ৫ বৎসর পরে সরকারী উকিল রায় বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ বিবাদীপক্ষ হইতে বাদীর হস্তাক্ষর সম্পর্কে হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞের মতামত জানিতে চেষ্টা করেন। তিনি কলিকাতায় পুলিশ কমিশনারকে জানান যে, ঐ হস্তাক্ষর সম্পর্কে মিঃ এস চৌধুরীর মতামত জানা প্রয়োজন। তিনি তখন হস্তাক্ষরের নমুনা পাঠান। ঐ হস্তাক্ষর মিঃ এস সি চৌধুরীকে পাঠান হয় এবং তৎসহ নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ পাঠান হয় ঃ—

(ক) স্বর্গীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তাঁহার ভ্রাতারা যে হুণ্ডির স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেই ৭ খানা হুণ্ডি একখানা হ্যাণ্ডনোট পরীক্ষা করা হউক।

(খ) প্রতারক রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্বাক্ষর পরীক্ষা করা হউক। ১৯২৮ সালে ঢাকায় প্রতারক রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্বাক্ষরসহ যে চারখানা ওকালতনামা ভূমি রেজেষ্টারী সংক্রান্ত মামলায় দাখিল করা হয়, তাহা পরীক্ষা করা হউক। ভূমি রেজিষ্টারী সংক্রান্ত মামলার আপীলে ঢাকার কালেক্টরের নিকট প্রতারক রমেন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষরযুক্ত যে তিনখানা টাইপ করা দরখাস্ত দাখিল করা হয়, তাহা পরীক্ষা করা হউক। ভূমি রেজেষ্টারী মামলায় ডেপুটি কালেক্টারের নিকট বাঙ্গলায় যে দুইখানা আবেদন পাঠান হয়, তাহাতে ঐ প্রতারকের যে স্বাক্ষর আছে, তাহা পরীক্ষা করা যাউক।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষর ও প্রতারক রমেন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষর তুলনা করিবার জন্য উভয় স্বাক্ষরই লাল পেন্সিলে দাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উভয়ের স্বাক্ষর হইতে ৫টী

স্বাক্ষর লইয়া তুলনা করিয়া মন্তব্য এবং মন্তব্যের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল বিশেষজ্ঞের মতামতের সহিত প্রিণ্ট ও নেগেটিভগুলিও পাঠাইতে বলা হইয়াছিল।

১৯নং লান্সডাউন রোডের মিঃ এস সি ঘোষ কিম্বা ঐ ঠিকানার মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জীর নিকট মতামত পাঠাইবার জন্যও বিশেষজ্ঞকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ঐ নির্দ্দেশেও বলা হয় যে উভয়ের স্বাক্ষরের মধ্যে কোনই মিল দেখা যায় না, তাহা লইয়াই যেন পরীক্ষা করা হয়।

রায় বাহাদুর যখন ঐ প্রকার নির্দ্দেশ সহ পত্র লিখিতে ছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কাঁপিতেছিলেন। তিনি কি চাহেন, তাহা তিনি গোপন রাখেন নাই। তিনি পুলিশ কমিশনারের নিকট ঐ পত্র লিখেন মিঃ এস সি চৌধুরী পূর্ব্বে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন তাঁহার কাজ ছিল পুলিশের মামলায় হস্তাক্ষর পরীক্ষা করা। ঐ সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে হস্তাক্ষর বিশারদের কাজ করিতেন, তিনি এখনও পুলিশের কাজ কিছু কিছু পান।

মিঃ এস সি চৌধুরী (ক) ও (খ) দুই দিক হইতেই স্বাক্ষরগুলির তুলনা করিয়া থাকেন, উহাদের মধ্যে যে গরমিল আছে, তাহা বিচার করিতে থাকেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মন্তব্য করেন যে, (ক) এবং (খ) উভয় ভাগের স্বাক্ষর খুব সম্ভবতঃ একই লোকের এবং গরমিল যাহা দেখা যায়, তাহা বার্দ্ধক্য, পঙ্গুতা এবং ব্যাধির জন্য হওয়া সম্ভবপর। তিনি উভয় স্বাক্ষরের মধ্যে অনেক বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মিল দেখিতে পান। যে

বিশেষজ্ঞ উপরোক্তরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার মধ্যে যে কিছুটা নিরপেক্ষতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রেভিনিউ বোর্ড অবশ্য ঐ মন্তব্য প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, ঐ মন্তব্য পাঠানই হয় নাই। বাদীপক্ষ মিঃ এস সি চৌধুরীকে সাক্ষী মানেন। তাঁহার সাক্ষ্য এখন বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আরও দুইবার জরুরী পত্র দেওয়া হয়। ৪ঠা জানুয়ারী শ্রীযুত পঙ্কজ ঘোষ বিবাদীপক্ষ হইতে বাঙ্গলায় লেখা ৬ খানা পত্র (২নং একজিবিট) এবং বাদীর স্বাক্ষর তাঁহাব নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহার মতামত চাহিয়া পাঠান। তিনি জানান যে, ২নং একজিবিটের লেখক (যদি ঐ স্বাক্ষব তাঁহার স্বাভাবিক স্বাক্ষর হইয়া থাকে) ঐ সকল পত্র লিখিতে পারেন না এবং ঐ পত্রের স্বাক্ষর তাঁহার হইতে পারে না। তিনি ইহাও বলেন যে, ২নং একজিবিটের লেখা ও বাদীর স্বাক্ষর (যদিও ঐ স্বাক্ষর বাদীর বলিয়া তিনি জানিতেন না। একই হাতের হইতে পারে।

৯ই জানুয়ারী বিবাদীপক্ষ হইতে মিঃ মুখার্জ্জি তাঁহার নিকট যান। তিনি কুমার ও বাদীর ইংরেজী ও বাঙ্গলা হাতের লেখা তাঁহাকে দেখাইয়া মতামত জানিতে চাহেন। মিঃ চৌধুরী বাঙ্গলা সম্পর্কে কোন মতামত জানাইতে অস্বীকৃত হন। ইংরেজী লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন, উহা এক হাতেরই লেখা।

তাঁহার সাক্ষ্য প্রমাণ বুঝিবার জন্য এমন কতকগুলি সরল ও সহজবোধ্য বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাহার প্রামাণ্য

স্বতঃসিদ্ধ। অনুকরণকারী যাহার অনুকরণ করে, তাহার পক্ষে লিখনভঙ্গীর এবং অন্যান্য পদ্ধতির অনুকরণ অনেকটা সফল হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার নিজস্ব লিখিবার অভ্যাস আছে। সেইজন্য যে যাহার অনুকরণ করে, তাহার অজ্ঞাতসারে অনুকৃতের মধ্যে নিজের অভ্যাসের একটা ছাপ রাখিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত মৌলিক সামগ্রীর মধ্যে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখা যায় না—তাহাই মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বড় বড় দলিল-পত্রের কথাই যদি ধরা যায়, হউক সে দলিল বিতর্কমূলক বা আদর্শমূলক, যে দলিলপত্রের মধ্যে বিরাম-দাগ অথবা অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষরসমূহ, যেমন 'ন' (ই) লিখিবার অভ্যাস এই হিসাবে মৌলিক বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা মূল ভিত্তিস্থানীয়, তাহা হইল লিখিবার সময়কার হস্তচালনার ভঙ্গী। দুইটী হস্তাক্ষরের মধ্যে যে ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে সেই হস্তচালনভঙ্গীর নির্দ্দেশক্রমেই হস্তাক্ষর বিচার করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, হস্তচালনার ভঙ্গী বলিতে কি বুঝা যায়। তুমি তোমার হাত দিয়া লেখ, অথবা অঙ্গুলিচালনা সম্ভব না হইলে আঙ্গুল দ্বারা কলম ধরিয়া হাত দিয়া লেখ। হাতের কব্জী দ্বারা তখন কাগজ চাপিয়া ধরা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে আবার কনুইকে কীলক করিয়া হাত দোলাইয়া লিখিতে দেখা যায়। সেই ভঙ্গীতে লিখিবার সময় হাতের কব্জী নড়ে না। কনুই হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত হাতের অগ্রভাগ সমস্তটাই তখন নড়ে। কোন কোনও ক্ষেত্রে আবার স্কন্ধদেশকে কীলকরূপে রাখিয়া সমস্ত হাত দিয়া সারিয়া লন; কিন্তু তাহার তখনও এই মত থাকে যে, ঐ

চিঠিগুলিতে আশ্চর্য্য রকমের লিপি চাতুর্য্য আছে এবং ঐগুলি হাতের পাঞ্জা ও আঙ্গুলের ভরে লেখা। মিঃ চৌধুরীর মত তিনিও বলেন, লেখার বাঁকা টানগুলি চমৎকার, সোজা টানগুলি এমন সমান ভাবে টানা যে, তিনি বলিতে পারেন, এই লেখকের মত অতি কম লেখকই আছেন যাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত সোজা টানগুলি এমন চমৎকারভাবে টানিতে পারেন। মিঃ এস সি চৌধুরীও ঠিক এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মত এই যে, ২নং একজিবিটের লেখকের সাধ্য নাই যে, এমন চমৎকারভাবে লিখিতে পারেন।

এখন মিঃ হার্ডলেসের মতে দেখা যায় যে, ২নং একজিবিটের লেখাও বেশ সুন্দর উহার মধ্যে যে ধাপ আছে তাহা তিনি স্বীকার করেন এবং অতি কষ্টে ইহাও স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় কুমারের দস্তখতও এইরূপ খোঁচা খোঁচা ও বাঁকা ছিল। কুমারের ফটোতে (একজিঃ জেড ১৬০) যে দস্তখত আছে, তাহাতে দেখা যায়, ধনুকের মত বাঁকা। লেখক যদি কব্জিতে ভর করিয়াই লিখিতেন, তবে দস্তখত ঐরূপ বাঁকা ও সিঁড়ি তোলা হইত কি করিয়া? তিনি এই সকল সাধারণ সত্য কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, যাহারা আঙ্গুলে ভর দিয়া লিখেন, সাধারণতঃ তাহাদের লেখা হয় বাঁকা বা উর্দ্ধমুখী অথবা সমস্ত লেখাটাই বাঁকা হয়,—যদি না কলম ঠিক করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। তিনি স্বীকার করেন যে সমস্ত লেখাটায়ই দেখা যাইবে লাইনগুলি উপরের দিকে চলিয়াছে এবং দেখা যাইবে, যে যেন একখানি মই দাঁড়াইয়া আছে।

রাণী সত্যভামা

এই সম্বন্ধে সাক্ষী কিছু উল্লেখ করেন না। ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বাদীর ইংরেজী এবং বাঙ্গলা উভয় প্রকার দস্তখতই বাঁকান এবং খোঁচা-খোঁচা। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি পাঞ্জায় ভর দিয়া লিখেন।

যিনি আঙ্গুল চালাইয়া লেখেন, তাঁহার লেখা বাঁকা হয় না। মিঃ হার্ডলেস বই হইতে আঙ্গুল চালাইয়া লেখার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া বাদীর স্বাক্ষর সম্পর্কে বলেন যে, উহাতে অক্ষর-গুলি আলাদা আলাদাভাবে আছে ; সুতরাং উহা বাঁকা হইতে পারে নাই। ১৬০ (১) নং একজিবিটে বাদীর যে সকল স্বাক্ষর আছে ঐ গুলি তাঁহাকে দেখান হইলে, তিনি বলেন যে, ঐ গুলির মধ্যে কলম উঠাইয়া উঠাইয়া লেখা হয় নাই, তবে কতক দূর লিখিয়া আবার লেখা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, কলম না উঠাইয়াও এই প্রকার লেখা যায়। অন্ধেরা লাইনচ্যুত হইতে পারে এই ভয়ে লিখিবার সময় কলম উঠাইয়া উঠাইয়া লেখে না। এই ব্যাপারটা অত্যন্ত বিরক্তিকর। মিঃ হার্ডলেস বাদী ও কুমারের স্বাক্ষরের মধ্যে কয়েকটা পার্থক্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু ঐ গুলির কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি যে পার্থক্য দেখাইলেন, একই ব্যক্তির দুইটী স্বাক্ষরের মধ্যেও সেই প্রকার পার্থক্য থাকিতে পারে। কয়েক বৎসর না লিখিলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বের স্বাক্ষরের সহিত বর্ত্তমান স্বাক্ষরের পার্থক্য হয়। হার্ডলেস বলিয়াছেন যে, বাদীর স্বাক্ষর এবং কুমারের স্বাক্ষর একই ব্যক্তির হাতেরই, সেই জন্যই আমি এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই না।

বাদীর স্বাক্ষর স্বাভাবিক কি না

বাদী কখন লেখা শিক্ষা করেন? নিশ্চয়ই ১৯২১ সালের পরে নয়। যখন দেখা গেল, বাদীর বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, তখন ১৯২১ সালের পর বাদী নিশ্চয়ই লিখিতে শিখেন নাই। এই মামলায় এ সম্বন্ধে নানাবিধ সম্ভাব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি মধ্যমকুমারের স্বাক্ষর নকল করিতে চায়, অক্ষর না চিনিয়া একেবারেই স্বাক্ষর নকল করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব কি? অক্ষরের সহিত মোটেই পরিচিত না হইয়া, লেখার নক্সার উপর মক্স করা কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি নিরাপদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন কি? এরূপ কথা শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়াছিলেন এবং বাদীর মনেও অসাধারণ অস্বস্তি উদয় হইয়াছিল; আর সে অস্বস্তি তাঁহাকে বিশেষ উদ্বেগের সহিত সহ্য করিতে হইয়াছিল। যত প্রকারেই আমার বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করা হউক না কেন, কিছুতেই আমার এ প্রতীতি জন্মিবে না যে, ঊনিশটী স্বাক্ষরের সকলগুলিরই নক্সা প্রস্তুত করিয়া লিখান হইয়াছিল। সেরূপ করা একেবারে অসম্ভব। ১৯২৯ সালের স্বাক্ষরের সহিত ১৯৩৩ সালের স্বাক্ষরের পার্থক্য দেখিলেই নক্সা আঁকিয়া মক্স করার যুক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। কেননা, ঐ দুই স্বাক্ষরে স্বাভাবিক গরমিল আছে; আদর্শ নক্সার অভাবহেতু সে ইতর বিশেষ ঘটে নাই। বাদী বঙ্গাক্ষরের 'ন' এবং ইংরাজী অক্ষরের 'N' (এন) চিনিতেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

বাদীব অক্ষব পবিচয়ে অজ্ঞতার বিচার করিলে ইহা চূড়ান্তভাবে সপ্রমাণ হয় যে, ১৯২১ সালে বাদীব আগমনের পর তাঁহাকে লিখিতে শিখান হয় নাই। তবে বাদী ইংবাজীতে ও বাঙ্গলায় যে স্বাক্ষব করেন, সে স্বাক্ষবেব অন্ততঃ একটী অক্ষর সম্বন্ধেও তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতি থাকা সম্ভব।

মিঃ হার্ডলেস লেখাব অভ্যাস সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি ঐ অভ্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে সেই অভ্যাসেব পরিমাণ নির্ণয় কবিতে যাইয়া, তিনি 'এ' হইতে 'জেড' পর্য্যন্ত লেখকদিগেব শ্রেণীবিভাগ কবিয়াছেন এবং বাদীকে 'ডবলিউ' শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। মিঃ হার্ডলেসেব মতে কুমার দার্জ্জিলিং যাইবাব পূর্ব্ব হইতেই ঐ শ্রেণীর লেখক এবং তাঁহার বর্ত্তমান স্বাক্ষর ঐ সময়কাব স্মৃতিব শেষ চিহ্ন। এই প্রসঙ্গে আমার ইষ্ট বেঙ্গল ফ্লোটিল্লা কোম্পানাব অন্যতম ডাইরেক্টব শ্রীযুক্ত হলধর রায়েব সাক্ষ্যের কথা মনে পড়ে। বেশী আগে না হইলেও ১৯২৬ সাল হইতে (২৪ নং একজিবিট) বাদী—যিনি উক্ত কোম্পানীর প্রথম ডাইরেক্টরগণের অন্যতম ছিলেন,—মিঃ রায়ের অবলম্বিত পদ্ধতিতেই অর্ডারে স্বাক্ষর করিতেন। জেরার মুখে মিঃ চৌধুবী তাহা পরিষ্কাব কবিয়া লইয়াছিলেন। যুক্তিতর্ক দেখান হইয়াছে যে, বাদী যদি সত্যসত্যই কুমাব হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অক্ষবগুলি ভুলিয়া যাইতেন না। কেননা, কাহাকেও সেরূপ হইতে দেখা যায় নাই। অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত শিক্ষা যেমন ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব, তেমনি বর্ণজ্ঞানও বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব নয়। অনভ্যাসবশতঃ অল্পশিক্ষিত যে একেবারে

অশিক্ষিত হয় এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহা সাধারণ ঘটনা এবং বহুদর্শিতায় তাহা দেখা যায়, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকের সাক্ষের দ্বারা স্থূল দৃষ্টান্তের অবতারণা করা না হইলেও ইহা সাধারণ ঘটনা। হিন্দী, উর্দ্দু অথবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করিবার পর, যদি সে অভ্যাস একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, কিছুদিন পরে ঐ সকল ভাষার অক্ষর সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকে না। তারপর যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানে, তাহাদের বিস্মৃতি শীঘ্র শীঘ্র ঘটে। তবে যাহাদের গানের অভ্যাস থাকে, সে অভ্যাস ত্যাগ করিলেও যদি গুনগুনি না ছাড়ে, তাহা হইলে সে গানের শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না। কিন্তু লেখাপড়ার সম্বন্ধে সে যুক্তি খাটে না। বহুদিন লেখা অভ্যাস না থাকিলে স্বাক্ষরের অন্তর্গত রেখাগুলি পর্য্যন্ত স্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যায়।

সুতরাং আমার বেশ প্রতীতি হইতেছে যে, মধ্যমকুমারের স্বাক্ষর ও বাদীর স্বাক্ষর. বিশেষজ্ঞগণ যাহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা একই হাতের লেখা এবং সে সম্বন্ধে মিঃ এস, সি, চৌধুরীর সিদ্ধান্তই ঠিক।

অক্ষর সম্বন্ধে বাদীর অজ্ঞতা এবং পোলো খেলা সম্বন্ধে বাদীর অনভিজ্ঞতা—যাহার বিষয় বাদী তাঁহার মূল জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছেন,—এই দুইটী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্তই বদ্ধমূল হয় এবং আমিও সেই সিদ্ধান্তই সমর্থন করি যে, বাদীকে নামসহি করিতে শিখান হয় নাই। ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকিলে, রেভিনিউ

বোর্ডে বিকৃত ফটো পাঠানোর মত, উক্ত প্রকারের কার্য্য কেহ করিতে পারে না।

বাদী অ-বাঙ্গালী কি না

বাদী বাঙ্গালী নহে—এই বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বাদীকে যে প্রকারে জেরা করা হইয়াছিল, আমি এখনও জেরার সেই অংশ সম্পর্কে কোনও মন্তব্যই করি নাই। ঐ সংক্রান্ত জেরা যেন একটা কথার খেলা, অথবা অশিক্ষিত লোককে হতবুদ্ধি করিবার বিশেষ উপযুক্ত শব্দাড়ম্বর মাত্র। আমি বিস্তৃত ভাবেই ইহার আলোচনা করিব। কেন না, বাদীকে পরীক্ষা করিবার জন্য উক্ত জেরায় পশ্চিম বঙ্গের বাছাই বাছাই ছেলে-ভুলানো ছড়া মনোনীত করা হইয়াছিল। বাদী অ-বাঙ্গালী কি না, সেই প্রসঙ্গে এ বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করা হইবে।

উভয়পক্ষে স্বীকৃতি প্রভৃতি

বাদীপক্ষের প্রমাণাদি শেষ হইবার পর বিবাদীপক্ষ বাদীর সম্বন্ধে এমন সকল বিষয় আরোপ করিতে থাকেন, যাহা তাঁহারা বাদীর স্মৃতি সম্পর্কিত জেরার সময় আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, বাদী 'অমুক কথা' বলিতে পারেন নাই; বাদী এই এই লোকের কাছে এই এই কথা পরবর্ত্তী চিন্তার ফলে বিবাদীপক্ষ উক্ত বিষয় বিশেষের অবতারণা করিতেছেন। এই অজুহাতে আমি তাঁহাদের সে সকল যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করি নাই। বরং আমি সে সকল যুক্তির

অনেকগুলি আলোচনা করিয়াছি। কুমারের সম্বন্ধে অপরে যাহা বলিয়াছে, তাহা আদালতের গোচর না করায় এবং কুমার স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা আদালতের সমক্ষে উপস্থিত না করার পক্ষে বিবাদিগণের কোনও অর্থপূর্ণ যুক্তি থাকা সম্ভব। কিন্তু আমি তাহার কোনও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ

ঐ সকল ঘটনার মধ্যে আমি ১লা বৈশাখের চা-পার্টি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিয়াছি। ঐ সম্বন্ধে যে স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ এবং সেই পার্টি পর্য্যন্ত ঘটনা পরম্পরার দ্বারা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমভিব্যহারে মিঃ কিরণ গুপ্তের সহিত সাক্ষাতের বিষয় আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মিঃ কে, সি, দে'র সহিত তথাকথিত সাক্ষাতের বিষয় তাঁহার নিজের সাক্ষ্যে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা অপ্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৬ সালে ঢাকায় বাদীর সহিত মিঃ দে'র দেখা হওয়ার কথা একেবারে অসম্ভব। মিঃ দে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯২৩ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত একখানি পত্রেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এখন সেই সাক্ষাতের ঘটনা বাদীর উপর আরোপ করা হইয়াছে। বাদী তাহাকে প্রথমে কলিকাতায় দেখেন। তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং সে সাক্ষাৎ ১৯২৪ সালের মধ্যে অথবা তাহার পরে হওয়া সম্ভব।

বাদীর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, কলিকাতা পুলিশের কর্ম্মচারী মিঃ শেরিডেন ১১ই মে বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্ট তলব করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা দাখিল করা হয় নাই; এ বিষয় সেইখানে শেষ হইয়া যায়।

লিণ্ডসে সকাশে

এখন একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিতে বাকি আছে। তাহা ১৯২১ সালের ২৯শে মে তারিখে মিঃ লিণ্ডসের সহিত সাক্ষাৎ। মিঃ লিণ্ডসের কথায় প্রকাশ, তিনি সেইদিনই ঐ সাক্ষাতের এক বিবরণ রাখেন। কিন্তু সে বিবরণ সেই সময় সেইখানেই লেখা হয় না। সুতরাং বাদী হিন্দীতে যাহা বলিয়াছিলেন, মিঃ লিণ্ডসের বিবরণ তাহার স্মৃতিলিপি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মিঃ লিণ্ডসেই বলিয়াছেন যে, বাদীর সহিত তাঁহার হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। মিঃ লিণ্ডসে কি লিখিয়াছিলেন, তিনি বাদীকে তাহা পড়িয়া শুনান নাই। মিঃ লিণ্ডসের হিন্দী সম্বন্ধে জ্ঞান কি প্রকার তাহাও জানা নাই।

মিঃ লিণ্ডসের লিখিত একখানি পত্র দাখিল আছে। তাহা হইতে জানা যায়, বাদীর গুরু যখন ঢাকায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় মিঃ লিণ্ডসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেরী করেন। কারণ তিনি মিঃ মারের অপেক্ষায় ছিলেন। মিঃ মারে হিন্দী ভাষা ভাল বুঝিতেন।

এই সাক্ষাৎকারের রেকর্ডে বাদীর বিরুদ্ধে একমাত্র যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা হইতেছে এই যে, তিনি বলিয়াছেন, দার্জ্জিলিংয়ে তাঁহার দুইদিন কি চারিদিনের জন্য নিউমোনিয়া হয় এবং জয়দেবপুর হইতে দার্জ্জিলিং যাওয়ার সময় তাঁহার ডান পায়ের হাঁটুতে একটি ফোঁড়া হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত তখন তাঁহার আর কোন অসুখ ছিল না। মিঃ লিণ্ডসের প্রশ্নের উত্তরে বাদী এই কথা বলেন। এই রেকর্ড যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে বাদী উপদংশের কথা স্বীকার না করিয়া ফোঁড়ার কথা কেন বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ বাদীকে পড়িয়া শুনান হয় নাই বা তাহার সমক্ষেও লেখা হয় নাই ; কাজেই উহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাদী যদি নিউমোনিয়া শব্দটি না বলিয়া থাকেন, তবে নিউমোনিয়া শব্দটিকে হিন্দীতে যাহা বলা হইয়া থাকে, তাহা মিঃ লিণ্ডসে জানিতেন ইহা ধরিয়া লওয়া কষ্ট। আর একটি ব্যাপারে মুস্কিল দাঁড়াইয়াছে এই যে, যে বিষপ্রয়োগের কাহিনী ৪ঠা মে'র পরই কলিকাতায় সত্যবাবুকে তার করিয়া জানান হয়, তাহা যদি বাদীকে শিখাইয়া পড়াইয়া না দেওয়া হইয়া থাকে তবে একমাত্র কুমার না হইলে আর কাহাকেও মিঃ লিণ্ডসের নিকট উপস্থিত করা হয়ত সম্ভব হইত না। সাক্ষাৎকারের এই বিবরণ সত্য বলিয়া আমি ধরিয়া লইতে পারি না এবং এসম্পর্কে দেখা যায় যে, মিঃ লিণ্ডসের নিজের কিছুই মনে নাই।

অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ বাবু দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যের কথা ধরা যাউক। সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, বাদী যখন নদীর ধারে সন্ন্যাসী অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বাদীর সাক্ষাৎ হয় এবং বাদী তখন নাকি তাঁহাকে দশ এগার বৎসরের একটি বালককে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বাদীর যখন ঐ বালকটির মত বয়স, তখন সে তাহার নিজ মুল্লুক ছাড়িয়া আসিয়াছে। সাক্ষী বলেন যে, বাদী সম্ভব নিজের মুল্লুক বলিতে পাঞ্জাবের কথা বলিয়াছিলেন। সাময়িক আলাপের কথা কতদূর স্মরণে আছে না আছে তাহার উপর খুব বেশী নির্ভর করা যায় না এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাক্ষীর স্মৃতিশক্তি কোন কোন সময় তাহার সহিত চাতুরী করিয়াছে। এমন দেখা গিয়াছে যে একটি প্রসঙ্গে তিনি এমন কথা বলিলেন যাহা তাহা তাঁহার তাঁহার পূর্ব্ব প্রদত্ত বিবরণে নাই। তাঁহাকে তখন তাঁহার পূর্ব্বেকার বিবরণ দেখান হইলে পরে প্রদত্ত বিবরণ তিনি আবার প্রত্যাহার করিয়া লন। যে বিবরণটী দিয়া তিনি আবার প্রত্যাহার করিয়া লইলেন উহা দ্বারা বাদীর সাদৃশ্য প্রমাণ ব্যাপারে বিবাদী পক্ষের সুবিধা হইত। কাজেই দেখা যায়, তিনি অনেক শুনা কথা বলিয়াছেন এবং সেই সব শুনা কথাও তাঁহার স্মৃতিশক্তিতে মিশিয়া জগা-খিচুড়ী হইয়াছে; কাজেই দেখা যায়, বাদীর স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হয় নাই এবং আত্ম-পরিচয়ের পূর্ব্বে বাদী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কোথাও কোন অসামঞ্জস্যও নাই।

১৯২৬ সালে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট বাদী যে আবেদন-

পত্র দাখিল করেন, বিবাদী পক্ষের কৌঁস্থুলী মহাশয়—অনেক স্থলে তাহার উল্লেখ করেন; কিন্তু উহাতে কোনরূপ অসামঞ্জস্য প্রমাণিত হয় নাই। উক্ত আবেদনপত্রখানি কোন নালিশের আরজি ছিল না; তদন্তের জন্য উহাতে অনুরোধ করা হয়, বাদীপক্ষের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, একজন সাব ডেপুটি কালেক্টর এই আবেদনপত্রের মুসাবিদা করেন। তিনি ভাওয়াল রাজ-পরিবারের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং আশু ডাক্তারের মানহানির মামলায় যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল, তাহাও উক্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টরকে সরবরাহ করা হয়। বিশদ বর্ণনা দিয়া বেশ সাজান-গুছান ভাবে এই আবেদনপত্রের মসাবিদা করা হয়—এবং তৎসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মানহানি মামলা সম্পর্কিত নথিপত্রের নকল জুড়িয়া দিয়া বলা হয় যে, উক্ত মামলায় যে রায় দেওয়া হইয়াছে,, তাহা বাদীর অনুকূলে যায়। এই আদালতে যাঁহারা সাক্ষী ডাকিয়াছেন, সাক্ষীদের উক্তিতে তাঁহাদের যতটুকু সমর্থন আছে, উক্ত মামলায়ও বাদীর তাহার বেশী কিছু সমর্থন আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। বাদী সেই মামলায় কোন পক্ষ ছিলেন।

সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে বাদীর প্রদত্ত বিবরণ এবং তাঁহার কথাবার্ত্তার বাধন সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে—সেই প্রসঙ্গে যখন আসা যাইবে, তখন বলাই ভাল।

মেজরাণীর সহিত বাদীর সাক্ষাৎ

দ্বিতীয় রাণীর চালচলন অথবা স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে যে সকল

সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নবিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

বাদীর আত্মপ্রকাশের পর দ্বিতীয় রাণীর সহিত ফণীবাবুর আত্মীয়া কমলকামিনী দেবীর যে আলাপ হইয়াছিল, সাক্ষ্যে তাহা তিনি বলেন। রাণী তাহা অস্বীকার করেন; কিন্তু সেই আলাপে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে রাণী কোন কিছু স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কুমারের মামী সুধাংশুবালা দেবী বলেন যে, তিনি যখন কলিকাতায় বাদীর বাড়ীতে ছিলেন, তখন দ্বিতীয় রাণীর বাড়ীতে তিনি গিয়াছিলেন। জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি যে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেই কথা বাদীর বাড়ীর সকলেই জানিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং বাদী নিজেও তাহা জানিতেন। রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাক্ষী তাঁহাকে বলেন যে, বাদীকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন এবং বাদী যে দ্বিতীয়কুমার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাক্ষী বলেন, "তুমি একবার মেজ খোকাকে দেখ।" রাণী তাহার উত্তরে বলেন, "লাভ কি? ভাই এবং আরও লোকের মুখে শুনিয়াছি বাদী কুমার নহেন। একজন পাঞ্জাবী সাধু সাজিয়া রাজ্যভোগ করিতে আসিয়াছে।" এই মহিলা যে রাণীর নিকট গিয়াছিলেন এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন; তবে বাদীকে কুমার বলিয়া তিনি কিছু স্বীকার করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করেন এবং এই সংলাপের কথা অন্যভাবে বলেন। ইহার উপর

নির্ভর করিয়া কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা যায় না; কিন্তু রাণীর নিজের উক্তিতেই ইহার সারকথা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, সুধাংশুবালা দেবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "তুমি একবার গিয়া তাহাকে দেখইনা।"

এই কথার উত্তরে রাণী বলেন যে, দেখার যদি প্রয়োজন থাকিত, তবে তিনি গিয়া দেখিতেন এবং তাঁহার বলার অপেক্ষায় থাকিতেন না। আবার তিনি বলেন যে, তাহাকে তিনি দেখিয়াছেন। রাণী সাক্ষ্যে বলেন যে, সুধাংশুবালা দেবীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। এখানে স্বীকারোক্তিতে কিছু না থাকিলেও একেবারে যে কিছু নাই, একথা বলা শক্ত। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী একজন প্রতারককে কুমার বলিয়া দাঁড় করাইয়া রাণীর উপর টেক্কা মারিবার জন্য এই মহিলাকে পাঠাইয়াছিলেন, ইহা বলা যায় না। আমার মনে হয়, তিনি এই আশায়ই পাঠাইয়াছিলেন যে, স্বামীকে দেখিয়া স্ত্রীর হয়ত মন গলিতে পারে এবং ভাইয়ের কথা নাও শুনিতে পারে।

সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে রাণী আদালতে বলিয়াছেন কিভাবে এবং কখন তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন এই সাক্ষাৎ হয়। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে কোনও তারিখে হইবে। একদিন বাদী এবং বুদ্ধ যখন একখানি ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া ধীরে ধীরে রাণীর বাড়ীর বিপরীত দিক দিয়া

যাইতেছিলেন, সেইদিন রাণী প্রথম বাদীকে দেখেন। রাস্তার দিকে যে খোলা গাড়-বারান্দা ছিল, তাহার উপরে রাণী ছিলেন। রাস্তার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছে বারান্দার কতকটা অংশ ঢাকা পড়িয়াছিল। ফিটন গাড়ীটি খুব ধীরে যাইতেছিল। রাণীর বাড়ীর বিপরীত দিকে উহা থামান হইল, বুদ্ধ রাণীকে দেখাইয়া দিল, বাদী রাণীকে দেখিবার জন্য ঘাড় ফিরাইলেন। ফিটনটি সেখানে পাঁচ মিনিট কাল রাখা হইল, ঐ সপ্তাহেই আবার একই স্থানে ও একই সময়ে দ্বিতীয়বার ঐরূপ সাক্ষাৎ হয়। এইক্ষেত্রেও ফিটন থামাইয়া রাখা হয়। ইহার পর রাণীর বাড়ীর পাশ দিয়া অনেকবার ফিটনে চড়িয়া বাদী যাতায়াত করেন। কিন্তু ফিটন আর ইহার পর থামান হইত না ; তবে রাণীকে হয়ত তিনি লক্ষ্য করিতেন। বাদা এবং রাণী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে একজন অপরকে দেখিয়াছেন ; রাণী হয়ত মোটরে চলিয়াছেন, বাদী মোটর চালাইয়াছেন, কিম্বা ট্যাক্সি হাঁকাইয়াছেন অথবা হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন—এমন অনেক সময় হইয়াছে, তাঁহারা একজন অপরকে ষ্ট্র্যাণ্ডে দেখিয়াছেন, এমন কি, একবার কলেজ স্কোয়ারেও দেখিয়াছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জী এই সকল দেখাশুনাকে চেনা এবং ঔৎসুক্য প্রকাশ করার পরিচায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি, উহা যে নারী হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাও হইতে পারে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। একজন প্রতারককে দেখিবার জন্য যে আগ্রহ হয়, উহা সেই আগ্রহও হইতে পারে। বাদী একথা মনে করিতে পারেন যে, রাণীকে দেখিলে হয়ত রাণী তাঁহাকে চিনিতে পারেন। ঐ সকল কথা

বিবেচনা করিলেও দেখা-সাক্ষাতের এই আতিশয্য, (যাহা রাণী নিজেই স্বীকার কবিয়াছেন) একটু কেমন মনে হয়, কিন্তু ঐ আচরণে তেমন কিছু প্রমাণ হয় না। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রায় ২৩ বৎসর পরে রাণী জয়দেবপুরে গমন করেন। তিনি পর্দ্দার আড়াল হইতে বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে সাক্ষ্য দিয়াছে। রাণী বলেন, তাহারা তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে ; কিন্তু সাক্ষীরা বলিয়াছে, নায়েবেরা তাহাদিগকে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে এবং রাণী তাহাদিগকে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করিয়াছেন (১০৮, ১১০, ১২৪, ১৫১, ১৭৭, ২০-, ৭৪, ৯৩, ১০৪ এবং ১৪৭ নং সাক্ষী) তাহাদের মধ্যে অনেকে বলিয়াছে, রায় সাহেব এবং আশু ডাক্তার ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগকে যখন সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করা হয়, তখন তাহারা বলে যে, তাহারা কুমারকে চিনিয়াছে, রাণী কি তাঁহাকে একবার দেখিতে পারেন না? ফুলদীর একজন বড় তালুকদার মেজ-বাহারুদ্দিন বলেন যে, তিনি এবং ডাঃ সামসুদ্দিন যখন সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন রাণী পর্দ্দার আড়ালে ছিলেন। তাহারা আসন গ্রহণ করিলে আশু ডাক্তার পর্দ্দা তুলিয়া দেন, তখন তাহারা প্রণাম করেন এবং এক টাকা নজর দেন। রাণী তাহাদিগকে বলেন যে, তাহাদের অঞ্চলে কেহ যেন সাক্ষ্য না দেয়। তখন সাক্ষী বলেন, "আমরা তাঁহাকে কুমার বলিয়া চিনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে জয়দেবপুরে আনিতে চাই। আমাদিগকে অনুমতি দিন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস

আপনিও তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন। কেন এষ্টেটের টাকা নষ্ট করিবেন?" ঐ কথা শুনিয়া রাণী কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলেন, "এখন উহা কি করে' সম্ভব হয়?" মেজরাণীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মনোমোহন ভট্টাচার্য্য নলগোলার রাজবাড়ীতে রাণীর নিকট যান। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি রাণীকে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিতে অনুরোধ করেন। মেজরাণী তাঁহার গমনের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, তিনি বাদীপক্ষ হইতে তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য গিয়াছিলেন। যদি উভয়ে আসল সত্য না জানিতেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির এমন সাহস কি করিয়া থাকে যে, তিনি রাণীকে ভয় দেখাইতে যাইতে পারেন?

আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যে সকল সাক্ষী বাদীকে কুমার প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা অনেকেই বাদীর সহিত আলাপ করিয়াছে, বাদী তাহাদের অনেককে চিনিয়াছেন। তন্মধ্যে আমি ১০৪ নং সাক্ষী শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তীর সাক্ষ্যের উল্লেখ করিতেছি। তিনি অধুনালুপ্ত গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ডস সেলাইয়ের দোকানে চাকুরী করিতেন। তিনি ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে জামার অর্ডার আনিবার জন্য অনেকবার জয়দেবপুরে গিয়াছেন। তিনি ১০।১৫ দিন তথায় থাকিতেন। তিনি কুমারদিগকে জানিতেন, তিনি বাদীকে দেখিবার জন্য ১৯২৪ সালে কি ১৯২৫ সালে কলিকাতা বসু পার্কে গমন করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দুই তিন মিনিট দেখিবার পরেই তিনি বাদীকে চিনিতে পারেন। তিনি প্রথমে 'বেয়ারা' 'বেয়ারা'

বলিয়া ডাকেন; ঐ সময় বাদী তাঁহার সামনে আসেন। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন, তাঁহার সহিত উপরে যান, তাঁহাকে প্রণাম জানান। তখন বাদী তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সাক্ষী তখন তাঁহাকে বলেন,—"ভাল করে' দেখে বলুন ত আমি কে?" বাদী তাঁহার দিকে তাকান্ এবং বলেন, "ঠিক চিনিতে পারিলাম না। সাক্ষী বলেন, "আমি মাঝে মাঝে জয়দেবপুর যাইয়া জামার অর্ডার আনিতাম।" তখন বাদী বলেন, "আপনি গেজুত (গ্রাজুয়েট) নেকির মশায়।"—অনেক সাক্ষ্যে এই ধরণের অনেক কথা আছে। আবদুল মান্নান এবং যাদব বসাকের সাক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষ্য অনুসারেই মামলার বিচার করা হইবে না। অবিসংবাদী প্রমাণের উপর উহা নির্ভর করিবে। আমি এ যাবৎ বাদীর শরীর এবং মন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে, বাদীর পরিচয় মিথ্যা মনে করিবার মত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই—যে পরিচয় প্রমাণ হইয়াছে, তাহা অনেক অবিসংবাদী সাক্ষ্যের উপরে। আমি দেখিয়াছি, হাতের লেখা এক এবং বাদীকে শিখাইয়া লওয়া হয় নাই। ডাক্তারী রিপোর্ট বাদীর পরিচয় ঘোষণার দুই একদিনের মধ্যেই মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ ঠিক রাখার জন্য মিঃ লেথব্রীজের নিকট সত্যবাবুর অনুরোধ এবং অন্যান্য ব্যাপারে আমি বিবাদীপক্ষের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি মধ্যমকুমার দার্জ্জিলিংএ মারা গিয়াছেন কিম্বা বাদী অ-বাঙ্গালী অথবা ঔজলার মালসিং ইহা প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে বাদী যে মধ্যমকুমার,

তাহাতে আব কোন সন্দেহ থাকিবে না। দার্জ্জিলিং সম্পর্কে আলোচনা সুরু করার পূর্ব্বে আমি দুইটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। বাদী মধ্যমরাণীব শরীরেব তিনটী চিহ্নের কথা বলেন। তন্মধ্যে দুইটী পরিবারের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব, একটী একমাত্র তাঁহার স্বামীর পক্ষে জানা সম্ভব। রাণী উহা অস্বীকার করেন। একপক্ষ স্বীকার এবং একপক্ষ অস্বীকার করায় উহা লইয়া আলোচনা করা বৃথা।

অপর বিষয়টী এই—মিঃ চৌধুরী কি কারণে আমি জানি না, কুমারের ভাগিনেয়কে একটি প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, মধ্যমরাণী একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন কি না, বিল্লু উহা কখনও শোনে নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনিও উহা অস্বীকার করেন। মিঃ চৌধুরী জেরার সময় তাঁহাকে বলেন, তিন মাস মাসিক বন্ধ থাকিলে তাহা ননদের পক্ষে জানা সম্ভব কি না?

তিনি বলেন যে, এই ব্যাপার তাঁহার জানার কথা। এই-খানেই সব শেষ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মেজরাণী তাঁহার জেরায় বলেন যে, তাঁহার শ্বাশুড়ীর এ সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল এবং যখন মাসিক আরম্ভ হয় তখন তাঁহার সন্দেহের নিরসন হয়। তৎপর তিনি জেরায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার গর্ভপাত হইয়াছিল। এই কথার দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল যে স্বামী সহবাস ব্যতীতই তাঁহার গর্ভ হইয়াছিল এবং সন্তান হইয়াছিল। এই সম্পর্কে পূর্ব্বে কোন কথাই উঠে নাই এবং কোন প্রমাণও নাই। এই কথা উত্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া আমি অত্যন্ত

দুঃখিত এবং এই অভিযোগ আনা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদেব কার্য্যের নিন্দা করি।

দার্জ্জিলিংএর ঘটনা

আমি রায়ের প্রথমভাগে বর্ণনাদান প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ই তারিখে মেজকুমার কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ৮ই এপ্রিল দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। সত্যবাবু একমাস পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে আসেন এবং শিলং যাইতে আসিয়াছেন বা সরকারী চাকুরীর জন্য শিলং গিয়াছিলেন ইত্যাদি মিথ্যা কথা বলিতে থাকেন। পরিশেষে একখানি চিঠি অনুযায়ী তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, তিনি তখন শিলং যান নাই, তিনি অক্টোবব মাসে শিলং গিয়াছিলেন। কুমারের সহিত তাঁহার কলিকাতাতে ঘন ঘন দেখা হইয়াছে অথচ কুমার আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জয়দেবপুরে আসিয়াছেন এবং তিনি তথায় আসিয়া তাঁহাকে দার্জ্জিলিং নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন ও মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—এই সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। প্রশ্নটা হইয়াছে এই যে, কুমার দার্জ্জিলিংএ মারা গিয়াছেন কি না? ইহা জানিতে হইলে কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর কারণ জানিতে হয়। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে বাদীর মামলা শেষ হইয়া যায়। কোন পক্ষের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় নাই এবং বাদীও রাণীর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের কথা বলেন নাই। মধ্যমকুমারের দার্জ্জিলিং

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সত্যবাবু এবং কুমারের খাস কেরাণী মুকুন্দ বাড়ী ঠিক করিবার জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিল। তাঁহারা ষ্টেপ এসাইড নামক একটা বাড়ী ঠিক করেন। এই প্রকার বলা হইয়াছে যে, পরিবারের অন্যান্য বয়স্কা মেয়েরা যাহাতে মেজ-রাণীর সঙ্গে যাইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ছোট বাড়ী ভাড়া করা হয়। ঐ বাড়ীতে বিধবাদের থাকা অসুবিধা ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং সত্যভামা দেবীকে না নেওয়ার জন্যই সত্যবাবু এই ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তবে ইহা সত্য যে, মেজরাণী বা কোন বৌ তাহাদের বোনদিগকে ব্যতীত বা অন্য কাহাকেও না লইয়া কখনো একা স্বামীর সঙ্গে যায় নাই।

যাঁহারা জয়দেবপুর হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তাহাদের তালিকা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। চাকর-বাকরদের মধ্যে দারো-সরিফ খাঁ ছিল, তিনজন দাসী, একজন পাচক অম্বিকা, একজন বাবুর্চ্চি ও কয়েকজন গুর্খা পাহারাওয়ালা গিয়াছিল। বিপিনসহ চারিজন খানসামা ছিল, ইহা ছাড়া উক্ত দলের মধ্যে (১) ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত, (২) বীরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে, (৩) সাব্রেল, (৪) সত্যবাবু, (৫) মেজরাণী, (৬) কুমার, (৭) কুমারের খাস কেরাণী মুকুন্দ গুপ্ত, (৮) এণ্টনী মরেল। সাব্রেল একজন পুরানো চাকর। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, সে দার্জ্জিলিং বাজার করিত এবং ঢাকাতে সে ভাওয়াল পরিবারের কতকটা দর্জ্জির কাজ করিত। সত্যবাবুর রোজনামচা (ডায়েরী) দেখিলে মনে হয় যে, উক্ত লোকটা অশিক্ষিত এবং ঠিক চাকর নহে, সে স্বাক্ষর

করিতে পারিত। এণ্টনী মরেল চাকরের মধ্যে একটু উঁচুদরের এবং তাহার বয়স পঞ্চাশের মত। সে পাঁচ বৎসরের মত চাকুরী করিয়াছে।

এণ্টনী এবং সাব্রেল ব্যতীত অন্য সকলেই যুবক। উহাদের মধ্যে মুকুন্দের বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল। কুমারের বয়স পঁচিশের কম। ডাঃ দাসগুপ্তের বয়স পঁচিশ বৎসর ছিল। সত্যবাবুর বয়স চব্বিশ বৎসর ছিল। বীরেন্দ্রের বয়স একুশ এবং রাণীর বয়স কুড়ি বৎসরের মত ছিল। বীরেন্দ্র এষ্টেট হইতে কোন মাহিনা পাইত না বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। একমাত্র মুকুন্দই মাহিনা পাইত এবং হেফবিনের মৃত্যুর পব তাহার স্থলে সে নিযুক্ত হইয়াছিল। মুকুন্দ এবং বীরেন্দ্র মধ্যমকুমারের হিসাব রাখিত এবং দার্জ্জিলিংএর হিসাবও তাহারাই রাখিয়াছিল। বীরেন্দ্র বলিয়াছে যে, দার্জ্জিলিং যাইবার আট মাস পূর্ব্বে সে নিযুক্ত হইয়াছিল। মুকুন্দ মেজকুমারের কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার ভাই বলিয়াছে যে, সে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। সত্যবাবু বি-এ পাশ করিয়াছেন এবং বি·এল পড়িয়াছেন।

চৌরাস্তা হইতে রঙ্গিন রোডে যাইতে যে বাড়ীটা প্রথম বাম দিকে পড়ে, উহাই 'ষ্টেপ এসাইড'। উক্ত দল এই ষ্টেপ এসাইডে গিয়া উঠে। দার্জ্জিলিংএর এখনকার একটা ম্যাপ উপস্থিত করা হইয়াছিল, এখন উহাতে ঐ বাড়ীর নম্বর ২০১ আছে। উহা একটা ছোট দোতলা বাড়ী। উহাতে প্রত্যেক তলায় পাঁচটী করিয়া কক্ষ আছে। এই বাড়ীটী রঙ্গিন রোডের সঙ্গে এক

লাইনে আছে। উক্ত রাস্তাটী উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই বাড়ীর সামনে একটা প্রাঙ্গণ আছে ও ছোট একটা ফুলের বাগান আছে। কক্ষগুলির সম্মুখে একটা লম্বা-লম্বি বারান্দা আছে। বাড়ীটার পেছনের দিকে একটা ছোট জায়গা আছে। উহাতে চাকরদের ঘর ও রান্নাঘর আছে। সেখানে যাতায়াতের জন্য আলাদা সিঁড়ি আছে।

কার্ট রোড নামক রাস্তাটি দার্জ্জিলিং এর মধ্যদিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ ইহার উপর দিয়া এমন স্থানে গিয়াছে, যাহাকে "গুডসেড" বলা হয় কিন্তু যাত্রীদের উঠানামার যে ষ্টেশন তাহা আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহারই নিকটে কিন্তু একটু নিম্নস্তরে লোয়িস জুবিলী স্যানিটোরিয়াম অবস্থিত ভারত-বাসীদের মধ্যে যাঁহারা একটু মর্য্যাদাশীল ব্যক্তি এবং যাহারা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিংএ আসেন, তাঁহারা এই স্যানি-টোরিয়ামে থাকেন। ষ্টেপ এসাইড হইতে আপনি যখন চৌরাস্তা পর্য্যন্ত আসিবেন, তখনই আপনি আপনার বাম দিকে একটি রাস্তা দেখিতে পাইবেন, এই রাস্তার নাম কমার্শিয়াল রো। এই রাস্তা ধরিয়া নিম্নের দিকে গেলে আপনি এমন এক স্থলে আসিবেন, যেখানে ইহার সহিত রবার্টসন রোড ও অকল্যাণ্ড রোড আসিয়া মিলিয়াছে অতঃপর আপনি যদি এই রবার্টসন রোড ধরিয়া নিম্ন দিকে অল্প একটু খানি পথ গমন করেন, এবং তাহার পর পয়েড রোড ধরিয়া আরও একটুখানি অগ্রসর হন, তাহা হইলে আপনি দেখিবেন যে, আপনি এতক্ষণে "গুডসেডের" নিকটবর্ত্তী কার্ট রোডের উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই

গুডসেড হইতে একটা রাস্তা পশ্চিম দিকে গিয়াছে, ইহার নাম কার্ণডেল রোড এই রাস্তা ধরিয়া নিম্ন দিকে গেলে আপনি কনসারভেন্সী রোড পাইবেন—এই রাস্তার বাঁক ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকুন, আপনি ভিক্টোরিয়া রোডে পৌঁছিবেন। এই ভিক্টোরিয়া রোড ধরিয়া একটুখানি অগ্রসর হইয়া আপনি বাম দিকে একটু পায়ে হাঁটার রাস্তা পাইবেন, ইহা শ্মশানে গিয়াছে। এই পায়ে হাঁটার রাস্তাটি তিন ফুট মাত্র চওড়া, পাকা নহে, ইহার উভয় পার্শ্বে ঝোপ, জঙ্গল ও বৃক্ষাদি আছে। এই রাস্তাটি স্থানে স্থানে এতই সঙ্কীর্ণ যে, পাশাপাশি দুই জন লোক চলিতে পারে না। ১৯০৯ সালে এই রাস্তাটিই সুধীরকুমারী রোড, এই গালভরা নামে অভিহিত হইত। এই পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মতের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই এবং আমি এই বিবরণীর মধ্যে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা আমদানী করি নাই। ১৯১২ সালে নূতন সুধীরকুমারী রোড খোলা হইবার পূর্ব্বে যে সকল পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহা হইতে এবং বিবাদী পক্ষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত "হিন্দু বার্ণিং এণ্ড বেরিয়াল গ্রাউণ্ড" কমিটির কার্য্য বিবরণী হইতে আমি এই সকল কথা পাইয়াছি। সাক্ষীদের উক্তি এবং মানচিত্র হইতেও এই সকল কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কুমারের অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনার সময়ে আমাকে উপরোক্ত কাগজ পত্রাদির কথা বিবেচনা করিতে হইবে। তবে এই মাত্র আমি যে রাস্তার বর্ণনা করিলাম, তাহাকে শ্মশানে যাইবার কমার্শিয়াল রো রুট বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ষ্টেপ এসাইড হইতে আর কোন রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাওয়া

অসম্ভব। আপনি চৌরাস্তা অতিক্রম করুন, তারপর আপনার বাম দিকে ফিরিয়া কমার্শিয়াল রো'তে না যাইয়া আপনি ডান দিকে ফিরুন এবং নিম্ন দিকে যাইয়া থর্ণ রো'তে উপনীত হউন তারপর আরও নিম্ন দিকে যাইতে যাতে কতকগুলি পথ অতিক্রম করিয়া ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ছাড়াইয়া হাসপাতাল রোড দিয়া অগ্রসর হইতে থাকুন। বোটানিক্যাল গার্ডেন রোড অতিক্রম করিয়া আপনি লালদীঘি রোডে যাইয়া উঠুন। এই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া আপনি কার্ট রোডে আসিয়া নামুন।

মার্কেটের উত্তরে কোন একটা যায়গায় নামন এবং মার্কেট ও তাহার বিপরীত দিকের কাছারী বাড়ী অতিক্রম করিয়া মাল গুদামের দিকে যান। ঐ স্থান হইতে একই রুট এবং মাত্র একটি 'রুট' ফেরুডেল রোড, কনজারভেন্সী রোড, ভিক্টোরিয়া রোড, ওল্ড সুধীরকুমারী রোড।

এই রাস্তা দিয়া যাইতে থাকুন এবং যেখানে আপনার ডান দিকে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে সেই বাঁক পার হইয়া পুরাতন শ্মশান হইতে আরও কিছুদূর গেলে দক্ষিণ দিকে নূতন শ্মশান। আরও একটি কথা এই যে, ১৯০৯ সালে নূতন শ্মশানের যখন সৃষ্টি হয় তখন এই শ্মশানে আসিবার রাস্তা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিনা, পুরাতন শ্মশান তখনও ব্যবহার করা হইত কিনা, ম্যাপে যে ঝোড়া দেখান হইয়াছে সেইরূপ কোন ঝোড়া ছিল কিনা। ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯০৯ সালের মে মাসে পুরাতন শ্মশানে কোন প্রকার ছাউনি ছিল না, কিন্তু নূতন শ্মশানে ছিল।

শ্মশানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর

শাক সব্জীর বাগান ছিল। পরে মিউনিসিপ্যালিটীর ঐ বাগান মিঃ মার্গেনষ্টিনকে ভাড়া দেন। দেখা যাইবে যে বেল্ধুইন ঝোড়া ও কাগঝোড়া নামক তুইটী পার্ব্বত্য নদীর মধ্যবর্ত্তীস্থানে শ্মশান ক্ষেত্র। ভিক্টোরিয়া রোডের পশ্চিম দিক নীচু ও জঙ্গলা কিছু পশ্চিম দিকে তুইটি ঝোড়া একটি উপত্যকায় আসিয়া মিশিয়াছে।

কুমার ও তাঁহার লোকজন ২০শে এপ্রিল দার্জ্জিলিং পৌঁছেন এবং ১৯০৯ সালের ৮ই মে তাঁহার মৃত্যু হয় অথবা মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বলা হয়; সুতরাং দেখা যায় যে তিনি দার্জ্জিলিং এ ঠিক ১৯ দিন ছিলেন।

ঐ তারিখের পরের ঘটনা সম্পর্কে বাদী যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানের জন্য বাদ দেওয়া হইল।

বাদী বলিয়াছেন যে, ১৯০৯ সালে সত্যবাবু জয়দেবপুর আসিলে তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি দার্জ্জিলিং যান। ঐ সময় উপদংশ রোগ ভিন্ন তাঁহার আর কোন রোগ ছিল না। দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া তিনি বলেন—তাঁহার উক্তি কিছু সংক্ষেপ করিয়াছি—

"আমি ভাল ছিলাম। দার্জ্জিলিং পৌঁছিবার ১৪।১৫ দিন পর আমার অসুখ হয়। রাত্রিতে পেট ফাঁপা হইতে ইহা আরম্ভ হয়। ঐ রাত্রিতে আমি আশু ডাক্তারকে বলি—পরদিন একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার আসেন। তিনি একটি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেন। আমি তাহা সেবন করি। তৃতীয় দিনেও তিনি ঔষধ দেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। ঐ দিন রাত্রি ৮ কি

৯টার সময় আশু ডাক্তার আমাকে একটি গ্লাসে (একটি ছোট গ্লাস দেখান) করিয়া ঔষধ দেন, তাহাতে কিছু ফল পাই। উহা সেবন করিবার সময় আমার বুক জ্বালা-পোড়া করিতেছিল। আমি বমি করি এবং ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকি। ঔষধ সেবনের ৩।৪ ঘণ্টা পর ঐ সব উপসর্গ দেখা দেয়। আমি চিৎকার করিতে থাকি। ঐ দিন রাত্রিতে কোন ডাক্তার আসে নাই।"

চতুর্থ দিন ঃ—"পরদিন প্রাতঃকালে আমার রক্ত দাস্ত হয় এবং বারবার দাস্ত হইতে থাকে। আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। ঐ সময় কোন ডাক্তার আসিয়াছিল কি না তাহা আমি জানি না।"

জেরায় মিঃ চৌধুরী ঠিক কাহিনীই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যাহা বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, বাদী প্রথম দিনই ডাঃ ক্যালভার্টের নাম শুনিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় দিন আশু ডাক্তার তাহাকে ঔষধ দিলে তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"আশু, তুমি আমাকে কি দিলে ?"

এই কাহিনীর সার মর্ম্ম এই দাঁড়ায়—

৫ই রাত্রিতে পেট ফাঁপা। ৬ই রাত্রিতে ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া ব্যবস্থা-পত্র দেন।

৭ই একই রকমের ঔষধ দেওয়া হয়। কোন ডাক্তার আসে নাই। রাত্রিতে আশুবাবু ঔষধ দেন ; ঔষধ দিবার কয়েক ঘণ্টা পর তাঁহার বুক জ্বালা-পোড়া করে এবং বমি হয়।

৮ই রক্তদাস্ত হয় এবং ফলে তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। বাদী যতটা জানেন তখন পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার ডাকা হয় নাই।

বাদীর বক্তব্য এই যে, ৮ই রাত্রি ৭টা ৮টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বলা হয় এবং শবদাহের জন্য একদল লোক তাঁহাকে পুরাতন শ্মশানে লইয়া যায়। শ্মশানে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পর প্রবলভাবে ঝড় বৃষ্টি আসিলে লোকজন তথায় কোন আশ্রয় না পাইয়া তাঁহাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। ৪ জন সাধু নিকটবর্ত্তী কোন গুহায় বাস করিতেন। তাহারা তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া লইয়া যান এবং লুকাইয়া রাখেন। বৃষ্টি থামিলে সত্যবাবু প্রভৃতি আসিয়া দেখে যে শব নাই। অতঃপর তাহারা চলিয়া যায়। পরদিন রাত্রিতে তাহারা একটা শব সংগ্রহ করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে তাহা শ্মশানে লইয়া যায়। শব বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ঐ শব পরে দাহ করা হয়।

ভাওয়ালের কুমারের শব শৃগাল কুকুরের মত ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এই কলঙ্কের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহারা ঐভাবে শোভাযাত্রা করে বলিয়া বলা হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, ৫ই মে শেষ রাত্রিতে কুমারের পীড়া হয় এবং ৮ই তুপুর রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিত্তশূল বেদনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। দার্জ্জিলিং বলিয়া রাত্রিতে তাঁহার শবদাহ করা সম্ভব না হওয়ায় পরদিন ভোরে শোভাযাত্রা করিয়া শব নূতন শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাহা দাহ করা হয়। ঐ শ্মশানই তখন একমাত্র শবদাহের স্থান ছিল। দিনের বেলা শব দাহ করা হয়।

কুমারের পীড়া সম্পর্কে একমাত্র বাদীর সাক্ষ্য ভিন্ন বাদী পক্ষের আর কোন সাক্ষ্য নাই। মৃত্যু পর্য্যন্ত কি ঘটিয়াছিল

তৎসম্পর্কে বাদীর উক্তিই একমাত্র প্রমাণ। কি ঘটিয়াছিল তৎ-সম্পর্কে বাদী বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার অধিকারী অথবা তাঁহার উক্তিব বিপরীত যে সব উক্তি করা হইয়াছে তাহা যে অসত্য তাহাও বাদী প্রমাণ করিবার অধিকারী। যাহারা কুমারকে সন্ধ্যার কিছু পর মৃতাবস্থায় দেখিতে পান অথবা যাঁহারা রাত্রি ৯টার সময় দাহ করিবার জন্য শব শ্মশানে লইয়া যান এবং বৃষ্টির জন্য ছাউনীতে আশ্রয় লইবার পর ফিরিয়া আসিয়া শব দেখিতে পান না বাদী সেই সব সাক্ষী হাজির করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষ ডাঃ ক্যালভার্ট, যিনি কুমারের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহাকে ডাকা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় রাণী, সত্যবাবু ডাঃ আশুতোষ, বিপিন (খানসামা), বীরেন্দ্র (পার্সন্যাল ক্লার্ক), এণ্টনী মোরেল, নার্স জগতমোহিনী দেবী, সত্যবাবুর মামাত ভাই শ্যামাদাস মুখার্জ্জি সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম ৬ জন মৃত্যু পর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছিল তাহা সমস্তই বর্ণনা করেন। ডাঃ ক্যালভার্টও প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনীই বলেন। এতদ্ভিন্ন বহু সাক্ষী প্রাতঃকালে শোভাযাত্রা হইবার কথাই বলিয়াছেন। তাহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, যে শব ঐ সময় বহন করিয়া নিয়া দাহ করা হইয়াছিল তাহা কুমারেরই শব।

এই সম্পর্কে ৯৬ জন লোক সাক্ষ্য দিয়াছেন। যদিও সকলে মৃত্যু, অসুখ অথবা শবদাহ সম্পর্কে বলেন নাই তথাপি অধিকাংশ সাক্ষীই তাহা বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে বিবাদীপক্ষের অনেক সাক্ষীর কমিশনে জবানবন্দী হইয়াছে।

এই সব সাক্ষীর উক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্মরণ থাকিতে পারে যে ৪ঠা মে বাদী আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলে সত্যবাবু ১৫ই মে'র পূর্ব্বের কোনও তারিখে একজন ব্যারিষ্টার সঙ্গে করিয়া দার্জ্জিলিং যান এবং দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এন, রায় কয়েক জন সাক্ষীর জবান-বন্দী গ্রহণ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করেন। ঐ সময় কতজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু ঐসব সাক্ষীদের মধ্যে ক্ষেত্রনাথ মুখার্জ্জি বলিয়া এক ভদ্রলোক ছিলেন। ১৯২১ সালের ১৭ই মে দার্জ্জিলিংএ তিনি সাক্ষ্য দেন এবং বাদী পক্ষেও সাক্ষ্য দেন। যখন ঐ সব জবানবন্দী গৃহীত হইতেছিল তখন সত্যবাবু এবং জি পি রায় বাহাদুর দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই একই হোটেলে বাস করিতেছিলেন এবং ব্যারিষ্টারও তথায় ছিলেন। ঐ ব্যারিষ্টারটী মিঃ এন এন রায়ের আত্মীয়। আমি মিঃ রায় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতেছি না কিন্তু যখন সত্যবাবু বলেন যে, তিনি হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন তখন আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না এবং তিনি যখন বলেন যে, সাক্ষিগণ কি বলিতেছিল তাহা তিনি জানিতেন না, আমি তাহাও বিশ্বাস করি না। এই সব বিষয় অবশ্য খুব প্রয়োজনীয় নহে। যে সব বিষয় প্রয়োজন তাহা এই যে,এই যে তদন্ত আরম্ভ হয় তাহা যে কালেক্টরের আদেশ অনুসারে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। যদিও পরে তাহার নির্দ্দেশ অনুসারেই তাহাই চলিতে থাকে।

মিঃ এন, এন, রায় যে মাসে সাক্ষীদিগকে যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা কে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না; কিন্তু পরে এক সেট প্রশ্ন রচনা করা হয় এবং ঐ প্রশ্ন সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উহার যে উত্তর আদায় করা হয়, তাহাকেই তদন্ত বলা হইয়াছে। রায় বাহাদুর ৩রা জুন ঐ সব প্রশ্ন রচনা করিয়া দার্জ্জিলিংএ পাঠাইয়া দেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে সাক্ষীদিগকে ঐ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবং মিঃ রায় তাহাদের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। রায় বাহাদুর রচিত এই সব প্রশ্ন ১৯২১ সালের ৭ই জুন দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনার মিঃ গুডির নিকট একটি নোট সহ পাঠান হয়। ইহার আরও পরে এই উদ্দেশ্যে আর এক সেট প্রশ্ন রচিত হইয়া মুদ্রিত হয়। শেষের প্রশ্নগুলি ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র দত্ত, (যাঁহার হেপাজতে তদন্ত সম্পর্কিত কাগজ পত্র ছিল) রচনা করেন।

বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্যদান কালে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, তিনি ঐ সব প্রশ্ন রচনা করিয়া রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহাতে চলিবে কিনা। এই সব প্রশ্নাবলী, যাহার অস্তিত্ব ৭ই জুনের পর দেখা যায়, বরাবর সাক্ষীদের নিকট অথবা সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট পাঠান হয—যাহাতে তাঁহারা সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন তথাপি মিঃ চৌধুরী ঐ সব মুদ্রিত প্রশ্নাবলী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে সব সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা এই এই

প্রশ্নের উত্তর কেন দেন নাই অথবা প্রশ্ন দেখিয়া তৎসম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ কেন তাহারা দেন নাই ?

৩রা জুন যে সব প্রশ্ন রচিত হয় তাহার পাণ্ডুলিপির সহিত রায় বাহাদুর নিম্নলিখিত একটী নোট যোগ করিয়া দেন :—

সাধুর কাহিনী

"সাধু বলিয়াছেন যে, তিনি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি বলেন যে, ১৯০৯ সালের ৮ই মে দুপুর রাত্রিতে ডাক্তারগণ মনে করেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্মশানে শব লইয়া যাওয়া হয় এবং চিতার উপর তাহা স্থাপন করা হয়। অগ্নি সংযোগ করিবার পূর্ব্বে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আসিলে শ্মশানযাত্রিগণ চলিয়া যায়। বৃষ্টি থামিলে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া শব দেখিতে পায় না। তাহারা কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া যায় এবং কুমারের শব দাহ করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে। শ্মশানযাত্রিগণ চলিয়া গেলে একজন সন্ন্যাসী চিতার নিকট আসিয়া দেখেন যে, শবের জীবনীশক্তি নাই। তিনি তাঁহার আশ্রমে শব লইয়া যাইয়া কোন অলৌকিক শক্তিবলে শবের প্রাণ সঞ্চার করেন। ইহার পর নোটে কুমারের দেহের বর্ণনা দেওয়া হয়। তাহাতে বলা হইয়াছে, কুমারের রং ফর্সা, সবল দেহ, কটা চুল, ২৭ বৎসর বয়স, ষ্টেপ এসাইডে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, স্ত্রীর ভাই, কয়েকজন কর্ম্মচারী ও ভৃত্য ছিল। ঐ নোটে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, বারিপাত রেকর্ড অনুসারে দেখা যায় যে, ৮ই এবং ৯ই মে দার্জ্জিলিংএ কোন বৃষ্টি হয় নাই। ৭টী প্রশ্ন রচণা করা হইয়া-

ছিল এবং সপ্তম প্রশ্নের পর একটী নোটে লিখা হয় "কুমারের শব শোভাযাত্রার সময় গরীবদিগকে টাকা, এক আনি, দুই আনি ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছিল।"

ইহা কখনও বাদীর মামলার কাহিনী নহে এবং একথা কেহ কখনও বলে নাই যে, দুপুর রাত্রিতে কুমারের মৃত্যু হইয়াছে অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু অলৌকিক শক্তিদ্বারা জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসে অথবা শব ছাড়াই কাষ্ঠ পোড়ান হয়।

পরের মুদ্রিত প্রশ্নগুলি এইরূপ :—

(১) ১৯০৯ সালের মে মাসে আপনি দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত ছিলেন কিনা ?

(২) যদি উপস্থিত থাকিয়া থাকেন তাহা হইলে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর কথা আপনার স্মরণ আছে কি ?

(৩) আপনি কি দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুর সময় অথবা শব শোভাযাত্রায় অথবা শবদাহের সময় উপস্থিত ছিলেন।

(৪) আপনি কি কুমারকে পূর্ব্বে চিনিতেন ? পূর্ব্বে না চিনিয়া থাকিলে মৃত্যুর পর কি আপনি শব দেখিয়াছেন ? আপনার পক্ষে যতদূর সম্ভব আপনি শবের সেইরূপ বর্ণণা দিন।

(৫) কুমারের বাড়ী হইতে শব শোভাযাত্রা কখন বাহির হয় তাহা কি আপনি বলিতে পারেন ? শবদাহ কখন শেষ হয় ? কোন রাস্তা দিয়া কোন শ্মশানে যাওয়া হইয়াছিল ?

(৬) শোভাযাত্রা অথবা শবদাহের সময় কোন ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল কি ?

(৭) ভোরে যদি শবদাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল—ইহা কি আপনি স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন ?

(৮) আপনার জ্ঞানমত যাহারা কুমারের মৃত্যুর সময়, অথবা শোভাযাত্রার সময় অথবা শবদাহের সময় উপস্থিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তির নাম ঠিকানা কি আপনার স্মরণ আছে ?

(৯) কুমারের অসুখ, মৃত্যু এবং শবদাহ সম্পর্কে সাক্ষীর কোন ঘটনা জানা আছে কিনা তাহাও সাধারণভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

মিঃ আর সি দত্ত ঐ সব প্রশ্ন রচনা করেন। মিঃ লণ্ডসে ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ সব প্রশ্ন রচনা করিয়াছেন।

ইহার উত্তরস্বরূপই যে ঐ সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু সাক্ষ্য দেখিয়া উহার বিচার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি—টেলিগ্রাম ও ঔষধের ব্যবস্থাপত্র যাহা পাঠান হইয়াছিল, অথবা অসুখের সময় করা হইয়াছিল, বাদীপক্ষ ঐ সময়ের দলিলপত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছে। দার্জ্জিলিংয়ে যে সমস্ত হিসাবপত্র রাখা হইয়াছিল, বিবাদীপক্ষ তাহাও উপস্থিত করে নাই। তাহাতে দেখান যাইত, কোন্ তারিখে শবদাহ করিবার জন্য অর্থব্যয় করা হইয়াছিল স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯২১ সালের ২৭শে অক্টোবর ঢাকার তৎকালীন কালেক্টর কুমারের মৃত্যু এবং পীড়া সম্পর্কিত সমস্ত টেলিগ্রাম

চাহিয়া বড়রাণীর নিকট একখানা পত্র দিয়াছিলেন। বড়রাণী ১৯২১ সালের ৯ই নবেম্বর ঐগুলি তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন জয়দেবপুরে কুমারের মৃত্যুর সংবাদ জানাইয়া যে টেলিগ্রাম খানা পাঠান হইয়াছিল, ঐ টেলিগ্রামখানা মিঃ লিণ্ডসেকে পাঠান হয় নাই। বিবাদীপক্ষ হইতে একবার বলা হইয়াছিল ঐ টেলিগ্রামখানা বড়রাণী পাঠান নাই, কিন্তু পরে ঐ কথা অস্বীকার করা হয়। বিবাদীপক্ষ ইহা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে ১৯২৮ সালের পূর্ব্বে বড়রাণী কোন পক্ষই গ্রহণ করেন নাই।

১০ই মে যে দিন দার্জ্জিলিং হইতে দলবল সহ সকলে যাত্রা করে সেদিন কর্ণেল ক্যালভার্ট বড়কুমারকে একখানা শোক-জ্ঞাপক পত্র দেন। বিবাদীপক্ষ ঐ পত্র তাহাদের কাজে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কর্ণেল ক্যালভার্ট বড় কুমারকে জানিতেন না। তিনি—কেন, ঐ পত্র বড়কুমারকে লিখেন বিবাদীপক্ষের কেহই তাহার কারণ বলিতে পারে নাই। সত্যবাবু মূল পত্রখানা কখনও দেখেন নাই বলিয়া স্বীকার করেন। এক নম্বর বিবাদী ঐ পত্রখানার একখানা নকল ১৯২১ সালের ৫ই জুন রেভিনিউ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু সত্যবাবু বলেন যে, উহা ঐ পত্রের নকলের নকল, তিনি ঐ নকল জয়দেবপুরে পাইয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্ট বিলাতে তাঁহার সাক্ষ্যে স্বীকার করেন যে, ঐ পত্র তাঁহারই। তিনি যে ঐ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি ইহাও বলেন নাই যে, তিনি ঐ পত্রের কোন জবাব পাইয়াছিলেন

কিন্তু ঐ পত্রে লেখা ছিল—"২০-৫-০৯ তারিখে উত্তর দেওয়া হইয়াছে।" তিনি বলেন, পত্রে ইহাও লেখা হইয়াছিল যে, শুশ্রূষার ত্রুটি হয় নাই। ঐ পত্রখানা যদিও প্রামাণ্য নহে, তথাপি মূল্যবান তাই, উহা নিম্নে দেওয়া গেল—

১নং মন্টিগিল ভিলা

দার্জ্জিলিং ১০ই মে, ১৯০৯

প্রিয় কুমার,

আপনার মধুর স্বভাব, সহৃদয় ভাইয়ের মৃত্যুতে আপনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তজ্জন্য আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার মনে হয়, রোগ সামান্য বলিয়া অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকায় এবং হঠাৎ রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায়ই তাঁহার এমন অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। আমাকে যেদিন প্রাতে ডাকা হয়, সেদিন তিনি এতটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন যে আমার উপদেশমত ঔষধাদি ব্যবহার করিতে তিনি অস্বীকৃত হন। তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং বন্ধুবা-ন্ধব তাঁহাকে অনেক বুঝান সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হন নাই। ঐ দিনই বিকালের দিকে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায়, বেদনা হঠাৎ ভীষণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। তাঁহার সেক্রেটারী বিশেষ প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত নিজেই ষ্টেশনের নিকটে আসেন এবং আমাকে ভ্রমণের সময় রোগীর অবস্থা জানান। ঐ সময় রোগী তাঁহার সেক্রেটারী এবং বন্ধু-বান্ধবের কথা শোনেন এবং আমাকে যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেন। ইনজেকশনের ফলে বেদনা তাড়াতাড়ি কমিয়া যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাতে শরীর

তাঁহার এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে, যাহাব ফলে আস্তে আস্তে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। আমাদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল না। আপনার ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার সহিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেবা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটি করেন নাই। যদি তাঁহার আত্মীয় স্বজন সামনে থাকিতেন, তাহা হইলে ভালই হইত। কিন্তু তাঁহার রোগ এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, তাহা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব্বেও তিনি ঐ রোগে সামান্য আক্রান্ত হইয়াছেন, তিনি তাহাতে সহজে আরোগ্য লাভ করাতে শেষবার রোগের গুরুত্ব যথাসময়ে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ভবদীয়

জে, টি, ক্যাল্‌ভার্ট।

কর্ণেল ক্যালভার্ট এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, অই পত্র বাসাব অপর কাহাবও কথানুসারে তিনি লিখিয়াছেন। তিনি যে ১০ই মে অই পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, "ষ্টেপ এসাইডে" যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা আমার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অই পত্রের কথা জানিতই; কিন্তু কেহই উহা স্বীকার করে নাই, এমন কি তাহারা ইহাও স্বীকার করে নাই যে, দার্জ্জিলিংএ ক্যালভার্টের বাসা তাহারা চিনিত।

মৃত্যুর ২ইমাস পরে ১৯০৯ সালের ৭ই জুলাই জীবন বীমার টাকা তোলা সম্পর্কে সত্যবাবুর নির্দ্দেশক্রমে ডাঃ ক্যালভার্ট এক এফিডেভিট করেন। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এষ্টেট হইতে

উহা করা হয় নাই, সত্যবাবুই উহা করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার ডায়েরীতে ইহাও দেখা যায় যে, তিনি ঐ সম্পর্কে ব্যবস্থা করার ব্যাপারে মিঃ নিডহ্যামকে বাধা পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সুতরাং এফিডেভিটের এষ্ট্রেট হইতে ব্যবস্থা করা হয় নাই—তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্যবাবু যে ঐ জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই উহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইন্সিওরেন্স কমিটির ফরমে ঐ এফিডেভিট দেওয়া হয়। নিম্নে উহার নকল দেওয়া হইল :—

পলিসি নং ৭৪৭৮৯

লাইফ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

মৃত্যুর সার্টিফিকেট

আমি জন টেলফু ক্যালভার্ট লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আই, এম, এস দার্জ্জিলিংএর সিভিল সার্জ্জন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে, আমি ১৪ দিন কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়কে জানিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমি তাঁহার অন্তিম ব্যাধিতে তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছি। তিনি ১৯০৯ সালের ৮ই মে রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিংয়ে মাত্র তিন দিনের অসুখে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ২৭ বৎসর হইয়াছিল। পিত্তশূল বেদনায় (গলষ্টোন) আক্রান্ত হওয়ার দরুণ শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত অবস্থায় যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইতেই উহা অনুমান করা হইয়াছে। ১৯০৯ সালের ৬ই মে প্রথম আমি তাঁহার ঐ ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাই। ৮ই

প্রাতে ঐ ব্যাধির আক্রমণ প্রবল হয়। ঐ দিনই রাত্রিতে তিনি মারা যান।

ইহা মিঃ এইচ, এম, ক্রফোর্ডের সম্মুখে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদবী দার্জ্জিলিং এর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—'জাষ্টিস অব দি পিস' লেখা আছে।

মিঃ ক্রফোর্ড নিজেও ৮-১-১০ তারিখে একটা মৃত্যু সম্পর্কিত সার্টিফিকেট (একজিবিট নং জেড ১১৩) সহি করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে এ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন তাহা কেহই বলে নাই। লণ্ডনে মিঃ ক্রফোর্ডের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, কি ভাবে উহা দিয়াছেন এবং কি ভাবে উহা এখানে বিস্তারিতভাবে আসিয়াছে, তাহা তাঁহার মনে নাই। ১৯০৯ সালের ৬ই মে সকালে দ্বিতীয় কুমার যে অসুস্থ হইয়াছেন, উহা উভয় পক্ষই বলিতেছেন। বাঙ্গালীরা ঐ সময়কে রাত্রিই বলিয়া থাকেন। বাদীর মত সকলেই অসুস্থতার সময়কে ৫ই তারিখ রাত্রি বলিয়াছে।

এই মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যখন কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত হইতেছিল, তখন তাঁহারা সকলেই কর্ণেল ক্যালভার্টের ৭-৭-০৯ তারিখের এফিডেভিট দেখিয়া উহাকে ১৪ দিনের ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্টের এফি-ডেভিট দেখিলে মনে হয় যে, তিনি তাঁহাকে ১৪ দিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তবে উহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রাখেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং তিনি স্বীকারও করিয়া-

ছেন যে, সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু কাগজ-পত্র দেখান হইয়াছিল। উক্ত কাগজ-পত্রগুলির মধ্যে মামলার বর্ণনা সম্পর্কে একটা দলিল ছিল। উহার বিষয় বস্তু পরে আর জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে মিঃ প্রিঙ্গলের এক বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, উহাতে মামলা সম্পর্কে তথ্য ছিল। তাঁহাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

প্রঃ—আপনি নিবারণ এবং গৃহ-চিকিৎসকের সহায়তায় কুমারকে চৌদ্দদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন কি?

উঃ—আমি এ ঘটনা জানি।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি যখন মধ্যমকুমারকে প্রথম দেখেন, তখন তাঁহার পেটের ডান দিকে বেদনা অর্থাৎ পিত্তশূলের বেদনা দেখিতে পান। তাঁহার দার্জ্জিলিং আসিবার পর যে রোগ ছিল, তাহাই আমি দেখিতে পাই। তিনি বলেন যে, আমি দিনের পর দিন তাঁহার অবস্থা দেখিতেছিলাম। আমার যতদূর মনে হয়, তাঁহার রোগ সামান্যই হইয়াছিল এবং তিনি যে মারা যাইবেন তাহা আমরা মনে করিতে পারি নাই।

ইহা চৌদ্দ দিনের ব্যাপার। এই সময়ের মধ্যে কুমারের পিত্তশূলের বেদনা উঠিয়াছিল, তিনি ৮ই মে পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াছেন। ইহা তাঁহার এফিডেভিটের সঙ্গে গরমিল নহে। বিবাদীপক্ষ এই এফিডেভিটকে শুধু কর্ণেল ক্যালভার্ট নহে, অন্য সাক্ষীদের দ্বারাও রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কর্ণেল ক্যালভার্টের পর এণ্টনি মরেল সাক্ষ্য সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনিও এই

সম্পর্কেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কুমারের মধ্যে মধ্যে জ্বর ও বেদনা হইত। কুমারের দার্জ্জিলিং আসিবার ২।৩ দিন পরে কর্ণেল ক্যালভার্ট মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়াছেন।

কুমার ৬ই মে অসুস্থ হইয়াছেন এবং ৮ই মে "মারা" গিয়াছেন বলিয়া যে সকল কথা বলা হইয়াছে, ঐগুলি মিথ্যা বলিয়া এখন প্রমাণিত হইয়াছে। মেজরাণী, আশু ডাক্তার, বীরেন্দ্র এবং সত্যবাবু সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দার্জ্জিলিং আগমনের পর তিনি ভালই ছিলেন। তাঁহারা সাক্ষ্যে বলিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি ৬ই মে পর্য্যন্ত সুস্থ ছিলেন। তিনি তখন সেলুনে বিলিয়ার্ড খেলিতেন এবং তিনি শিকারে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন (বিবাদীপক্ষের ৫৭, ৭০, ৭১, ৬১০নং সাক্ষীর সাক্ষ্য)। আশু ডাক্তারও ইহাদের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, কুমার ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত সুস্থ ছিলেন। সত্যবাবু এবং আরো কোন কোন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, কুমারের মৃত্যুর ছয় দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতেছিল। এণ্টনী মরেল বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে উক্ত বার দিন সাগু এবং বার্লি খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

ডাঃ ক্যালভ্যার্টের এফিডেভিট ঠিক রাখিবার জন্য কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। আশু ডাক্তার বলিয়াছেন যে, কুমারের দার্জ্জিলিং যাইবার ৩।৪ দিন পর ডাঃ ক্যালভার্টকে আনা হইয়াছিল এবং তৎপর ৬ই তারিখ তিনি আবার আসিয়াছিলেন, উহা স্বীকৃত। হইয়াছে তাহার বর্ণনা হইতে ১৪ দিনের

বিবরণ পাওয়া যায়। আশু ডাক্তার আরও বলিয়াছেন যে, ২৪শে এপ্রিল ডাক্তার ক্যালভার্ট যখন প্রথম আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট মেজকুমারের রোগের বর্ণনা দেন। তিনি তখন বলেন যে, মেজকুমারের উপদংশ ছিল এবং তাঁহার পিত্তশূল আছে। ডাঃ ক্যালভার্ট যখন মেজকুমারকে দেখেন, তখন তাঁহার পিত্তশূলের কোন লক্ষণ না দেখিয়া তিনি উপদংশের চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আসেন নিম্নে দেখান হইবে যে, পিত্তশূলের কথাটা একটা গল্প। বিবাদী পক্ষ যে জ্বর এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা তুলিয়াছে ঐগুলিও বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নহে। ধরিয়া লইলাম যে, কুমারের পিত্তশূল রোগ ছিল; কিন্তু কর্ণেল ক্যালভার্ট তাহা কখনও দেখিতে পান নাই। কর্ণেল ক্যালভার্ট যে চৌদ্দ দিন চিকিৎসা করিয়াছেন, উহা একটা কথায়ই উড়িয়া যায়। ৬ই মের পূর্ব্বের কোন ব্যাবস্থা-পত্র নাই। বাদী স্মিথ ষ্টেইনীষ্ট্রারেট এণ্ড কোম্পানীর বই হইতে ব্যাবস্থাপত্র উপস্থিত করিয়াছেন। উহাতে ৬ই মে হইতে ব্যবস্থাপত্র আছে। ব্যবস্থাপত্র অথবা উহার নকলগুলি যে অত্যন্ত সাবধানে রাখা হইত, আশু ডাক্তার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল ব্যাবস্থাপত্র উপস্থিত করেন নাই। এবং এমন কি, ডাঃ ক্যালভার্ট যেদিন প্রথম দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, সে তারিখের ব্যবস্থাপত্র বা উহার নকল উপস্থিত করিতে চেষ্টাও করেন নাই। ৬ই তারিখের পূর্ব্বে কর্ণেল ক্যালভার্ট তাঁহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া যে বলা হইয়াছে, উহা আদৌ সত্য নহে। তিনি যে ৬ই মে'র পূর্ব্বে কুমারের পিত্তশূল রোগ দেখিয়াছেন,

উহাও সত্য নহে। কর্ণেল ক্যাভার্টের এফিডেভিটে যে চৌদ্দ দিন রোগের কথা আছে, ইহাও ঠিক নহে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ ক্যালভার্ট কুমারের উপদংশই দেখিয়াছেন এবং উক্ত রোগের জন্যই ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার এফিডেভিটে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ উক্ত ফরমের পাশে রোগী যে রোগে মারা গিয়াছে, শুধু সে রোগ নহে, যদি তাঁহার অন্য কোনও রোগ থাকে তাহাও উল্লেখ করিবার জন্য নির্দ্দেশ আছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি উক্ত এফিডেভিটে কুমারের বয়স 'সাতাশের মত' লিখিয়াছেন; অথচ সে সময় কুমারের বয়স পঁচিশও ছিল না। ইহা বলা হইয়াছে যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট অনুমানের উপর লিখিয়াছেন; তিনি এই প্রকার কিছু করেন নাই। এই সম্পর্কে সংগৃহীত রায় বাহাদুর কে, পি ঘোষের এফিডেভিট ব্যতীত অন্য সকল এফিডেভিটেই এই ভুলটা করা হইয়াছে। একটা কারণে সব স্থানে একই ভূল করা হইয়াছে। সত্যবাবুর রোজনামচায় দেখিলাম যে, তিনিও কুমারের প্রকৃত বয়স জানেন না এবং সেইজন্য তিনি কুমারের জন্ম তারিখ জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্টের এফি-ডেভিট হইতে ইহা বুঝা যায় যে, তাঁহার নিকট যাহা চাওয়া হইয়াছিল, তিনি ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ না লইয়াই তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। কারণ কুমার যে মারা গিয়াছে, এ ধারণা তাঁহার ছিল।

এফিডেভিটের অবশিষ্ট অংশ যেখানে ১১-৪৫ মিনিটের সময় মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা আমি সামান্য

যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া (বিশেষতঃ তিনি যখন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছেন যে, মধ্য রাত্রে কুমারের মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন) অগ্রাহ্য করিবার ইচ্ছা করি না। পরে যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইবে, তাহা দ্বারাই অই বিষয় মীমাংসিত হইবে। অই সকল ঘটনার অবর্ত্তমানে এফিডেভিটের যে অংশে বলা হইয়াছে যে, পীড়ার প্রকোপ ৮ই তারিখের প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রবল হয় এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।" আমি তাহার উপরও নির্ভর করিব না।

৬ই মে প্রাতঃকালে মধ্যমকুমারের পীড়া আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন,—একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আমি সেই সর্ব্বসম্মত স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়াই আমার মন্তব্য সুরু করিব।

পিত্তশূল কি ?

এই বিষয় সম্পর্কিত সাক্ষ্য সমালোচনার পূর্ব্বে পিত্তশূল কি এবং পিত্তশূল কাহাকে বলে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। কেননা, ঔষধ সংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ঐ সকল ব্যবস্থাপত্র (প্রেস্ক্রিপশন) উক্ত ব্যারামের উপযোগী হইয়াছিল কি না ; তাহা দেখিবার আবশ্যক হইবে।

এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে বাদীর পক্ষে লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল ম্যাকগিল-ক্রাইষ্ট আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত), এম-বি, সি-এইচ-বি (এডিন), এম-ডি (এডিন), এম-আর-সি-পি (লণ্ডন), ডি-এস-সি (এডিন), সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্ট 'ফারমা-

কোলজি' (ভেষজের কার্য্য) বিষয়ে ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আট বৎসর তিনি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে 'ফিজিওলজি'র (শরীর-বিজ্ঞান) অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে তিনি সিভিল সার্জ্জনের কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি মশক ও কুইনাইন সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়াছেন। শীত-জ্বর সম্পর্কেও তিনি নানা তথ্য উদঘাটন করিয়াছিলেন। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের মেরিন সার্ভে এবং ষ্ট্যাটিষ্টিকাল অফিসারের 'সার্জ্জেন ন্যাচারেলিষ্ট' (মেডিকেল ও স্যানিটারী বিভাগ) ছিলেন। সাক্ষী ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাফের বিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

বাদীপক্ষের ডাঃ ব্র্যাডলি এম-ডি (কানাডা), জি-এইচ-এম (কানাডা) সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সাক্ষী রয়েল সোসাইটী অব ট্রপিকেল মেডিসিনের একজন ফেলো ছিলেন।

বিবাদিগণের পক্ষে মেজর টমাস, আই-এম-এস, এম-ডি (ডারহাম), এস-আর-সি-পি (লণ্ডন) এবং লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট এল-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এম-বি-বি-এস (লণ্ডন) সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ইনি এক সময়ে মেডিকেল কলেজে 'সার্জ্জারী'র অধ্যাপক ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারদিগের অভিমত সাক্ষ্য হিসাবেই গ্রহণযোগ্য এবং সাক্ষ্য হিসাবেই সমালোচনীয়। কিন্তু এখানে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দুই একটী নগণ্য বিষয় ব্যতীত যদিও তৎসম্বন্ধে কোনও বিতর্ক উঠে নাই বা কেহ তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, অপিচ, রোগের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণমূলে

৮ই তারিখে যাহা ঘটা সম্ভব তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত যদিও কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের অভিমতের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যদিও ৮ই তারিখে কুমারের দুরন্ত ভেদ হওয়া সম্পর্কে কতক গুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় অবস্থা গোপন করিয়া মেজর টমাসের নিকট হইতে বিরোধী মত আদায় করা হইয়াছিল, তৎসত্বেও মিঃ চৌধুরী লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ম্যাক্‌গিলক্রাইষ্টকে জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই যে, কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির (মিঃ এক্স) বিরুদ্ধে জনৈক ডাক্তার মামলা আনিলে, ঐ ব্যক্তি তাহার লিখিত বিবৃতিতে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল কি না? লেঃ কঃ ম্যাক্‌গিলক্রাইষ্ট উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—মিঃ চৌধুরীর অনুমান মিথ্যা। আমি তখনও ভাবিয়াছিলাম এবং এখনও পর্য্যন্ত আমি চিন্তা করিয়া থাকি যে, লেঃ কঃ ম্যাক্‌গ্রিলক্রাইষ্টকে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কোন সঙ্গত কারণ মিঃ চৌধুরীর কিছু ছিল না।

পিত্তশূল ব্যাধি কি এবং কাহাকে বলে, এ ব্যাধির আশু কারণই বা কি (দূরবর্ত্তী কারণ যাহাই হউক না কেন), তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। পিত্তাশয় হইতে যে পিত্ত নিঃসারিত হয়, তাহা একটী প্রণালীর দ্বারা (সেই প্রণালীর নাম হিপ্যাটিক ডাক্ট) আর একটী প্রণালীতে (সেই প্রণালীর নাম সিষ্টিক ডাক্ট বা কৌষিক কোষ) সংবাহিত হয়। সেই 'সিষ্টিক' নালীর মধ্য দিয়া পিত্তাশয় হইতে নিঃসৃত পিত্ত ক্রমশঃ গল ব্লাডার বা মূত্রাশয় সম্পর্কিত কোষে যাইয়া পড়ে। শেষোক্ত

কোষ আধারের কার্য্য করে। এই কোষ সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় সঞ্চিত পিত্তগুলিকে উপরোক্ত 'সিষ্টিক ডাক্ট' দিয়া বাহির করিয়া একটী সাধারণ প্রণালীতে আনিয়া ফেলে। সেই সাধারণ নালীর সহিত পাকস্থলীর সংযোগ থাকায় ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য আবশ্যক হইলেই উক্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া ভুক্তদ্রব্যের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হয়। এতৎসহ যে নক্সা প্রদত্ত হইল, তাহাতে তিনটি প্রণালীর নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইতে আরও বুঝা যাইবে ;—

'গল ব্লাডারে' অর্থাৎ মূত্রাশয় সংক্রান্ত কোষে যে এক-প্রকার পাথর জন্মে, তাহাকে পিত্তাশ্মরী বলে। ঐ অশ্মরী বিভিন্ন আকৃতির হয়। ইহাতে মূমূর্ষু অবস্থা ঘটে। ঐ সকল অশ্মরীর আকার সময় সময় ক্ষুদ্র বালুকনার মতও হয়। উহা পিত্তের সহিত বাহিরে আসিলে কোনও অস্বস্তির সম্ভাবনা থাকে না ; কিন্তু ঐ অশ্মরীর আকার বড় হইয়া যদি 'সিষ্টিক' অথবা (কমন) সাধারণ প্রণালীর মধ্যে আসিয়া আটকাইয়া যায় এবং যদি তাহা বাহির না হইয়া দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে অত্যন্ত প্রবল বেদনা হয়। এই বেদনাই 'বিলিয়ারী কলিক' বা পিত্তশূল গ্রন্থপত্রে এই যন্ত্রণা তীব্র সন্তাপজনক এবং প্রচণ্ড ও নিদারুণ বলিয়া লিখিত আছে। আমি ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্টের বর্ণনা হইতেই এতদ্বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি। ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁহার এই সাক্ষ্যের কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। এই রোগে এক বা দুই মিনিট অন্তর তড়কার মত আকস্মিক প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হয়। একবারের আক্ষেপেই যদি অশ্মরী স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা

হইলে অকস্মাৎ যন্ত্রণার উপশম হয়। তখন সাবধানতা অবলম্বনের জন্ম যেটুকু প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত কোনপ্রকার চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। একবার আক্ষেপের পর দ্বিতীয় আক্ষেপের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময় যে চিকিৎসা হয়, তাহার নাম 'ইণ্টারভেল ট্রিটমেণ্ট' বা বিরামকালীন চিকিৎসা। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে আক্ষেপ হইত, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কারণ অশ্মরী কোন সময় জন্মিবে এবং কখন তাহা নালীর মধ্য দিয়া বাহির হইবার উপযুক্ত আকারের অপেক্ষা বড় আকারের হইবে, সে সময় অবধারিত নহে।

সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অজীর্ণ রোগের সঙ্গে সঙ্গে অথবা অজীর্ণ রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মূত্রাশয় সম্পর্কিত কোষে এই প্রকারের অশ্মরী জন্মে। ডাঃ ম্যাক্‌গিলক্রাইষ্ট ইহা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু অজীর্ণ রোগের সহিত ইহার সম্পর্ক যে খুব সামান্য, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। এই দুই ব্যাধি (অজীর্ণতা ও অশ্মরী) পরস্পর পরস্পরের অনুসঙ্গী। একটী অপরটীর ফলও হইতে পারে, অথবা উভয়ই উভয়ের ফল হওয়াই সম্ভব। মিঃ চৌধুরী ডাঃ ব্র্যাডলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—প্রাইসের গ্রন্থ এ সম্পর্কে প্রামাণ্য কি না? সাক্ষী ঐই গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। ডাঃ ম্যাক্‌গিলক্রাইষ্ট ব্যাধির আশু কারণ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, ঐই গ্রন্থে তাহার সমর্থন আছে। ভেষজ সংক্রান্ত এই গ্রন্থে গ্রন্থকার অধিক অগ্রসর হন নাই। অন্য রোগ সংক্রমণ অথবা গলব্লাডারের স্ফীতি চূড়ান্তভাবে দূরবর্ত্তী কারণ কি না, অথবা অশ্মরী 'কলেষ্টে-

রেল’ পাথরের জাতীয় কি না, তাহার আলোচনার কোনই আবশ্যক হইত না, যদি ডাঃ টমাস সে সম্পর্কে তাহার অনুমান সম্পর্কিত বিষয়েব অবতাবণা না করিতেন। সে সকল কথা আমি পরে বলিতেছি কিন্তু প্রাইস তাঁহাব গ্রন্থেব অই বিষয়ের সাম্ভাব্যতার উল্লেখ করিয়া পরে উক্ত প্রকাবের অশ্মরী সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আকস্মিক আক্ষেপেব সময়, প্রণালী হইতে যে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তদ্বাবা উদর আক্রান্ত হয় না। সে যন্ত্রণা দক্ষিণ স্কন্ধে যাইয়া সহসা ধাক্কা দেয়। পিত্ত সবাসবিভাবে পেটেব মধ্যে পৌঁছে না বলিয়া উদবেব সহিত যন্ত্রণাব কোনও সম্বন্ধ নাই। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে, সচবাচব পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেব মধ্যে বেশীব ভাগ ‘গলষ্টোন’ হইতে দেখা যায়। ময়না তদন্তকালে দেখা গিয়াছে, স্ত্রীলোকেব মধ্যে পাঁচগুণ বেশী এই ব্যাবাম হইয়াছে। ৩০ হইতে ৬০ বৎসব এবং ৪০ হইতে ৬০ বৎসরেব মধ্যে উভয় ক্ষেত্রে এই প্রকাব অশ্মবী হইতে দেখা যায়। (প্রাইসেব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

পিত্তশূল ব্যাবামে মৃত্যুব সংখ্যা অতি বিবল। সে সম্বন্ধেও কাহারও মতান্তব নাই। একটী বিষয় সম্বন্ধে কাহাবও কোনও মতান্তব দেখি না। প্রাইসও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সে বিষয়টী এই—‘গলষ্টোন’ হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য অনিবার্য্য। প্রাইস বলেন,—ব্যাধি প্রবল হইলে মোটেই বাহ্যে হয় না। যখন প্রবল তড়কাব মত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখন তাহার একমাত্র চিকিৎসা আফিং। যন্ত্রণা লাঘবেব জন্য আফিং প্রয়োগ করার প্রয়োজন।

পুণ্যাহ উপলক্ষে প্রজা ও আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত মধ্যম কুমার।

সত্বর যন্ত্রণা উপশম কল্পে, মর্ফিয়া দ্বারা ইঞ্জেকসন দিতে হয়। বিরামকালের চিকিৎসা স্বতন্ত্র। যাহাতে অতিরিক্ত অশ্মরী জন্মিতে না পারে এবং অতিরিক্ত পিত্ত নিঃসৃত হয়—বিরাম-কালে এই প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও, বিরামকালীন চিকিৎসার একটু বিশেষত্ব আছে।

ডাঃ ক্যালভার্ট সাক্ষ্যে বলিয়াছেন,—কুমার পিত্তশূল রোগে মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'সিষ্টিক' নালীতে অশ্মরী আটকাইয়া এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আর একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মধ্যমকুমারের পীড়ার এবং মৃত্যুর বিবরণ প্রদান উপলক্ষে দ্বিতীয় রাণী এবং সত্যবাবু, পূর্ব্বের কোনও বিবৃতির দ্বারা বিপর্য্যস্ত হন নাই।

সে যাহাই হউক, ডাঃ আশুতোষ এবং বীরেন্দ্র পূর্ব্বেও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। যে সব মামলায় ইহাই বিচার্য্য বিষয় ছিল, সেই সব মামলায় ইঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন। ১৯১১ সালের মানহানির মামলায় ডাঃ আশুতোষ দুইবার সাক্ষ্য দিয়াছেন। কোনও এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তিনি দার্জ্জিলিংএ কুমারকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছেন; এই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই আশু ডাক্তার মানহানির মামলা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস পি ঘোষের নিকটে সাক্ষ্য দেন। তারপর আবার যখন অপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি এম ঘোষের নিকটে এই মামলার পুনর্ব্বিচার হয়, তখন তিনি দ্বিতীয় বার সাক্ষ্য দেন। শ্রীপুর মামলা বলিয়া উল্লিখিত সত্য সাব্যস্তের মামলায়ও তিনি ঢাকার কোন সবজজের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

মানহানির মামলায় ঢাকার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর এস, সি ঘোষ ফরিয়াদীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মামলায় তিনি বিবাদী পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাওয়াল রাজের পক্ষ হইতেই মানহানির মামলা করা হইয়াছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই মামলায় সাফাল্য অর্জ্জন করার জন্য এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারকে প্রশংসা করা হইয়াছিল। শ্রীপুর মামলায়ও ডাঃ আশুতোষ বর্ত্তমান মামলার বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মামলার বিবাদিগণই সেই মামলায় বাদী ছিলেন। বীরেন্দ্র কেবল শেষ মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছে।

ডাঃ আশুতোষের সাক্ষ্য

ডাঃ আশুতোষের পূর্ব্বেকার সাক্ষ্য এবং তাহার বর্ত্তমান সাক্ষ্য পড়িয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, কি ঘটিয়াছে। তাহা সরল ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য এই ডাক্তারটি আমার নিকটে উপস্থিত হন নাই ; সব কিছু ঢাকা দিতেই যেন তিনি আসিয়াছিলেন। অতএব তাহার জবানবন্দী অত্যন্ত অস্পষ্ট। প্রত্যেকটি কথাই তাহাকে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার নিজেরই পূর্ব্ববর্ত্তী উক্তিগুলি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে তিনি এই কৈফিয়ৎ দেন যে, তিনি এবারে অনেকটা ভালরূপেই স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেছেন ; কেননা সে ব্যবস্থাপত্র এবং টেলিগ্রাফগুলি তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, এখন তাহা পাইয়া সব কিছু স্মরণ করিবার পক্ষে তাহার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু

তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপত্র এবং টেলিগ্রামগুলি তিনি পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৯২১ সালের অক্টোবর মাস হইতে এইগুলি বর্ত্তমান মামলা পরিচালনকারী বিবাদিগণের হস্তে মজুত ছিল। আশু ডাক্তার তাই পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারে তাহা এড়াইয়া চলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহা করিতে গিয়া একান্ত অপ্রতিভভাবে তিনি সব কথাই অস্বীকার করিয়াছেন। তারপর রাণী কর্ত্তৃক বর্ণিত পরিষ্কার কাহিনী সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি যাহা খুসী বলিয়াছেন। আশু ডাক্তার অতিশয় ধূর্ত্ত লোকের ন্যায় বলিয়াছেন,—আমি যখন সংবাদপত্রে রাণীর সাক্ষ্যের বিবরণ পাঠ করিলাম, তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলাম:—"দেখ রাণী কি বলেন আর আমি কি বলিয়াছি!"

আমি অতঃপর সাক্ষ্য বিচার করিব। এই সাক্ষ্যের সহিত সেই সকল তথ্য যোগ করিব, যাহা সত্যবাবুর ডায়েরীতে আছে। এই ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলিতে তিনি ৭ই, ৮ই, ৯ই এবং ১০ই মে তারিখে কতকগুলি তথ্য—এগুলি তথ্যের কথাই বটে—লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯শে অথবা ২০শে মে তারিখ এই ডায়েরী লেখা শুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কুমারের রোগ ও মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোড়া হইতে এই প্রসঙ্গ তিনি লিখিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ৭ই মে হইতে আরম্ভ করেন।

৬ই মে

শেষ রাত্রি ৩টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত—কুমারের পীড়ার আরম্ভ। জ্বর ও শূল বেদনা। (রাণী, সত্য, আশু ডাক্তার ও বীরেন্দ্র)

"কুমারের পিত্তশূলের বেদনা যখন আরম্ভ হয় তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। এ কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। সত্য বাবু আমি এবং অন্যান্য সকলে উপস্থিত ছিলেন"—ইহাই আশু ডাক্তারের উক্তি। সত্যবাবু আরও বলেন, তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ৭ই তারিখে কুমারকে তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে সরাইয়া নেওয়া হয় এবং তৎসংলগ্ন কক্ষের মেঝের উপর স্থাপিত এক বিছানায় তাহাকে রাখা হয়, এই কক্ষেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। কুমারকে কেন স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহার কারণ দর্শাইতে গিয়া সত্যবাবু বলেন, কুমারের বেদনা অতি তীব্র হইয়াছিল এবং বেদনায় তিনি লুটোপুটি খাইতেছিলেন।

প্রাতঃকাল :—কর্ণেল ক্যালভার্ট আসিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া গেলেন।

রাণীর উক্তি অনুসারে কুমার এই সময় ভালই ছিলেন। তিনি বলেন, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কুমার ভালই ছিলেন।

সত্যবাবুর উক্তি কতকটা অস্পষ্ট। তবে তিনি বেদনার কথা উল্লেখ করেন নাই। ডাঃ ক্যালভার্ট যখন আসিয়াছিলেন, তখন অতি সামান্য জ্বর ছিল অথবা ছিল না, এইরূপ বলেন।

এই সময় সম্পর্কে আশু ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলেন

নাই। তবে তিনি এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সময়ে যে, ব্যবস্থা-পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা পিত্তশূল ও জ্বরের উপযোগী ছিল।

কর্ণেল ক্যালভার্ট চলিয়া যাওয়ার পর বেলা ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে জ্বর এবং বেদনা।

অপরাহ্ন ঃ—সকলের মতেই পিত্তশূলের বেদনা তথাপি ডাঃ ক্যালভার্টকে ডাকিয়া আনা হয় নাই। সত্যবাবু বলেন, এই সময়ে জ্বরও হইয়াছিল। তাঁহার মতে রাত্রিতে জ্বর ও শূলের বেদনা হইয়াছিল। এ কথা কেহই বলেন না যে, যখন কর্ণেল ক্যালভার্ট আসিয়াছিলেন, তখন কুমারের পিত্তশূল বেদনা ছিল। সকাল বেলাটাকে তাঁহারা সকলেই পিত্তশূলের বেদনা হইতে বাদ রাখিয়াছিলেন। এই দিবসের ব্যবস্থা-পত্র এবং টেলিগ্রাম সমূহ লক্ষ্য করুন ঃ—

টেলিগ্রাম ঃ—২৬১ (ক) নং একজিবিট। সকাল ১০টা। গত রাত্রিতে কুমারের জ্বর ৯৯ ডিগ্রীর নীচে ছিল। এখন জ্বর নাই ; দয়া করিয়া স্বাস্থ্যের সংবাদ তার করুন।—"মুকুন্দ"

২২৩ নং একজিবিট বিকাল ৬-৪৫ মিনিট। গত কল্য হইতে কুমারের ভীষণ জ্বর এবং পাকস্থলীতে বেদনা হইয়াছে। সিভিল সার্জ্জন চিকিৎসা করিতেছেন।—"কেব্রল"

২২৪ নং একজিবিট। রাত্রি ৮-৫৫ মিনিট। জর এবং তলপেটের বেদনা তুই ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। এখন জর ছাড়িয়াছে। চিন্তার কোন কারণ নাই। পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই।—"মুকুন্দ।"

প্রথম শব্দটী দেখিলে বোধ হয়, সেটি ‘লিভার’ শব্দ; আর শেষ শব্দটি ‘রেক্রুটিং’ শব্দ। ১০টায় যে টেলিগ্রাম করা হয়, তাহাতে বেদনাব কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, ৬-৪৫টার টেলিগ্রামেও ৬ই তারিখের কোনও বেদনার কথা লেখা হয় নাই। টেলিগ্রাম পাঠানোর সময পর্য্যন্তও তাহার উল্লেখ নাই। প্রাতঃ-কালের টেলিগ্রামে জর হওয়ার কথা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে গত-কল্যকার অর্থাৎ ৫ই তারিখের পেটের বেদনার কথা মাত্র লেখা ছিল। টেলিগ্রামে বলা হইয়াছিল, ৫ই রাত্রে শরীরের তাপ ৯৯ ডিগ্রীরও কম ছিল। সত্যবাবুর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ,—বাঙ্গালীরা সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সময়কে রাত্রি বলে। পূর্ব্বোক্ত টেলিগ্রাম হইতে বেশ বুঝা যায়, কোনও প্রকারেই ৬ই প্রাতঃকালে কোন বেদনা ছিল না; এমন কি, সন্ধ্যা ৬-৪৫ পর্য্যন্তও বেদনার সূত্রপাত হয় নাই। প্রাতঃকালে যখন ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়াছিলেন, তখন জ্বর এবং পেটের বেদনা ছিল না, সাক্ষিগণের সাক্ষ্যে তাহা পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যই একমাত্র প্রমাণ নহে; উদ্ধৃত টেলিগ্রামও এ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রামাণ্য।

ডাক্তার ক্যালভার্ট ঐদিন আসিয়া যে প্রেস্ক্রিপশন করিয়া-ছিলেন, তাহা লণ্ডনে কমিশনারের নিকট সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে কর্ণেল ক্যালভার্টকে দেখান হইয়াছিল। জেরার সময়ও তিনি ঐ প্রেস্ক্রিপশন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—সাক্ষ্য দিতে আসিবার পূর্ব্বে মিঃ হাণ্টার তাঁহাকে সেগুলি দেখাইয়াছিলেন। “পেটের যন্ত্রণার জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা

করিতে অভ্যস্ত ছিলাম, আমি ঐগুলিকে সেই ব্যবস্থাপত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম”—ডাঃ ক্যালভার্ট তখন এই কথা বলিয়াছিলেন। জেরার সময়ও তাঁহাকে প্রেস্ক্রিপশনগুলি দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ৫১নং একজিবিটে প্রদর্শিত প্রেস্ক্রিপশন দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ বিশেষ প্রেস্ক্রিপশন অর্থাৎ ‘স্পিরিট এমোনিয়া’ যে প্রেস্ক্রিপশনে দেওয়া আছে, তাহা বায়ু দোষ নাশক এবং অজীর্ণ রোগে ঐ প্রকারের ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ‘লিণ্ট ওপিয়াই’ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে,—যে কোনও প্রকার বেদনায় অর্থাৎ যে বেদনা একই স্থানে আবদ্ধ থাকে (লোকেল্ পেইন্) এই ঔষধ সেই ধরণের বেদনার উপযোগী। আমার মতে সে প্রকারের যন্ত্রণা বহিরঙ্গ সংক্রান্ত।

ডাক্তার ক্যালভার্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, পিত্তশূলের যন্ত্রণা প্রবল এবং সবিরাম। ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্টের উক্তিই তিনি এতদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। পিত্তশূল ব্যারামে ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে কিনা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলেন,—সেরূপ কোনও প্রামাণ্য বিষয় প্রদর্শনে তিনি অসমর্থ। এক্ষেত্রে চিকিৎসার পদ্ধতি সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন নাই; এখানে বিষয় হইতেছে এই যে, তিনি চিকিৎসা ব্যাপারে কি উপায় অবলম্বন করিবেন। ইহাই হইল তাঁহার নিকট জানিবার বিষয়।

ডাঃ ক্যালভার্ট বলিয়াছেন,—কুমার ইনজেকশন লইতে

সম্মত হন নাই। সুতরাং এই ব্যবস্থাই হইল তাহার পরিবর্ত্তে উত্তম ব্যবস্থা। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—"পিত্তশূল পীড়ায় ঐসকল ঔষধের ব্যবস্থা কি উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া আপনি মনে করেন?" উত্তরে তিনি বলেন, প্রথম প্রেস্ক্রিপশন (একজিবিট নং ৫১—৬ই তারিখের) সমেত আর সকলগুলি বিরামকালীন অবস্থায় চিকিৎসার উপযোগী। প্রথম প্রেস্ক্রিপশন করিবার সময় হইতে বিরাম কাল পর্য্যন্ত ডাক্তার ক্যালভার্ট তাঁহার ধারণার সহিত মিল রাখিয়া পীড়া ভোগকাল ১৪ দিন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ৬ই তারিখের পূর্ব্বে তিনি কোনও যন্ত্রণা দেখেন নাই, তাঁহার এই স্বীকৃতির দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। ডাঃ ক্যালভার্ট বলিয়াছেন, স্পিরিট এমোনিয়া প্রেস্ক্রিপশন বিরামকালীন ঔষধ এবং 'লিণ্ট ওপিয়াই' যন্ত্রণার সময় যন্ত্রণার উপশম জন্য ইনজেকশনের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয়; উহা ইনজেকশনের পরিবর্ত্তরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ঐ দুই উক্তি যে পরস্পর বিরোধী এবং ডাঃ ক্যালভার্ট নিজের উক্তির দ্বারাই যে নিজের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতেছেন তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই!

সুতরাং ইহা বেশ পরিষ্কাররূপেই বুঝা যাইতেছে যে ৫১নং একজিবিটের অন্তর্গত দুইটী প্রেস্ক্রিপশনের সহিত পিত্তশূল রোগের কোনই সম্পর্ক নাই। বিবাদী পক্ষে ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে, প্রথম প্রেস্ক্রিপশনটী অতি সাধারণ ঔষধ। ডাঃ ম্যাকগিল ক্রাইষ্টের মতে উহা সাধারণ ধরণের অজীর্ণতার ঔষধ। বিশেষ করিয়া পেট ফাঁপার

সময় উহা ব্যবহৃত হয়। পিত্তশুল রোগে তিনি ঐ প্রকারের ঔষধ দিবেন না। 'লিণ্ট ওপিয়াই' সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, পিত্তশুল ক্ষেত্রে ঐ ঔষধে কোনও কাজ হয় না। কেন না, আফিং যখন প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার কার্য্যকরী শক্তি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ডাঃ ব্র্যাডলির মতে ঐ প্রেস্ক্রিপশনের ঔষধ অজীর্ণ রোগের অতি সাধারণ রকমের ঔষধ, পেটের ফাঁপের উপশম জন্য বায়ুনাশক যে ঔষধ 'ষ্টক মেডিসিন' হিসাবেই আফিসে রাখা হয়। উক্ত প্রেস্ক্রিপশনের ঔষধ সেই ধরণের ঔষধ। বিবাদী পক্ষের ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট উহাকে 'কমনার গার্ডেন মেডিসিন' বলিয়াছেন।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষী মেজর টমাস 'স্পিরিট এমোনিয়া' সংযুক্ত প্রথম প্রেস্ক্রিপশনটাকে 'এলকেলাইন কারমিনেটিভ মিকশ্চার' (অজীর্ণরোগের ক্ষারীয় ঔষধ) নামে অভিহিত করিয়াছেন যে কোনও প্রকারের অজীর্ণরোগে এই ঔষধ দেওয়া যায়। পিত্তশুলের বিরাম অবস্থায় পেটের ফাঁপসহ যে অজীর্ণতা দেখা দেয়, তাহাতেও এ ঔষধ দেওয়া চলে। মেজর টমাস আরও বলেন যে, যে কোনও স্থানের যে কোনও প্রকারের বেদনায় বহিঃপ্রয়োগের জন্য লিণ্ট ওপিয়াই দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐ সকল প্রেস্ক্রিপশন হইতে পিত্তশুল ছিল না বলিয়াও বুঝা যায় না, আবার পিত্তশুল ছিল তাহাও বুঝা যায় না।

যে সকল তথ্য স্বীকৃত হইয়াছে, উহাতে ইহা বাদ দেওয়া

হইয়াছে যে, ৬ই তারিখে ডাঃ ক্যালভার্ট যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন কোন বেদনা ছিল না। পরোক্ষভাবে ইহা দ্বারা এ কথাই স্বীকৃত হইয়াছে যে, কতক্ষণ পর পর বেদনা অনুভূত হইত এবং টেলিগ্রামেও দেখা যায় যে, ৬ই তারিখে ৬-৪৫ মিনিট বা উহার কাছাকাছি কোন সময় পর্য্যন্ত বেদনা ছিল না। কিন্তু উহার একঘণ্টা পরের উল্লেখে দেখা যায় যে, বেদনা ছিল; ডাঃ ক্যালভার্ট ইহা দেখিতে পান নাই বা ইহার চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তারকেও ডাকা হয় নাই। উহা যদি পিত্তশূলও হইয়া থাকে তবু এই বেদনায় রোগীকে দুই ঘণ্টাকাল গোঙাইতে হইয়াছিল। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে, এই বেদনার কথা সত্য কি না। কিন্তু সকল দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত ডাঃ ক্যালভার্ট পিত্তশূলের লক্ষণ দেখিতে পান নাই এবং "লিণ্ট ওপিয়াই" নিশ্চয়ই অন্য কোন বেদনার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ বেদনা নিশ্চয়ই খুব তীব্র ছিল। প্রথম ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ ঔষধের ব্যবস্থা পেটের ব্যথার জন্যই করা হইয়াছিল। ব্যথা যেখানেই হউক, উহা পিত্তশূল নহে অথবা ডাঃ ক্যালভার্ট উহাকে থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা বলিতে পারেন না। এমন কি, বিবাদী পক্ষে যে সকল ডাক্তারকে ডাকা হইয়াছে, তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সময়ের জন্য এই ব্যবস্থাপত্র করা হইয়াছিল, তখন পিত্তশূল ছিল না।

৬ই তারিখের রাত্রি বেশ ভালভাবেই কাটিয়াছিল; কারণ ৭ই তারিখে সকাল ৭-১০ মিনিটের সময় প্রাপ্ত একখানি টেলিগ্রামে দেখা যায়ঃ—

"গত রাত্রে কুমারের ভাল ঘুম হইয়াছে। জ্বর বা বেদনা ছিল না। "মুকুন্দ"

৭ই মে তারিখে সত্যবাবুর রোজনামচায় লেখা আছে :—

"রমেন্দ্রের অসুখ চলিয়াছে, পেটে বেদনা ও সামান্য জর আছে। গত রাত্রে ঘুম হয় নাই। ফল পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে তার করা হইল।"

টেলিগ্রামে দেখা যায়, ৬ই মে রাত্রে কুমারের সুনিদ্রা হইয়াছিল ; কাজেই তদনুসারে বলা যায়, সত্যবাবু রোজনামচায় মিথ্যা কথা লিখিয়াছিলেন। সত্যবাবু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উহার অর্থ হইল সে রাত্রে তাঁহার নিজেরই ভাল ঘুম হয় নাই। ঘটনার ১৫ দিন পর স্মৃতি হইতে সত্যবাবু যে তাঁহার নিজেব ঘুমটাকেই খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার মনে করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন রোজনামচার লেখা দেখিয়া তাহা ঠিক বোঝা যায় না।

কুমারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ৭ই মে কোন টেলিগ্রাম করা হয় নাই। ঐ দিন আশু ডাক্তারের একখানি ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন আর কোন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নেওয়া হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে যে সকল নামলা হইয়াছে, সে সকল মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় এই ব্যবস্থাপত্রের কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই মামলায়ও উহার দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শেষের কথাগুলিতে বলা হইয়াছে। ২৫টী বড়ি এবং নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, "খাওয়াদাওয়ার পর দিনে তিনবার সেব্য।"

ডাঃ ম্যকাগিলক্রাইষ্টের মতে এই ব্যবস্থাপত্রে কুইনাইন, আর্সেনিক, নক্সভমিকা, ষ্ট্রীকনাইন এবং এলয়েন ও ইনোনিমিন নামে আরও দুইটী জোর দাস্ত করাইবার ঔষধ আছে।

যাহারা কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে তাহাদিগের জন্য এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; তবে অধিক মাত্রায় দেওয়ায় বিপদ আছে। কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট বলেন যে, ৬ই তারিখে যে ব্যাবস্থাপত্র দেওয়া হইয়াছিল, এই ব্যবস্থাপত্র ঠিক তাহার বিপরীত।

আশু ডাক্তারেরর কৃত ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ পেটের পক্ষে খাবাপ। আর্সেনিক ও কুইনাইনে পেট গরম হয়। পিত্তশুল, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে কেহ এই ঔষধের ব্যবস্থা করে না।

এই ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে মেজর টমার্স বলেন ঃ—

কুইনাইন দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, বুঝি ম্যালেরিয়া ছিল।

এলয়েন এবং ইনোনিমিন দাস্ত হওয়ার জন্য দেওয়া হয়। ঔষধ দেখিয়া মনে হয় যে, রোগীর যেন কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল এবং তাহারই জন্য দাস্তের ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

নক্সভমিকা ও আর্সেনিক টনিক। আর্সেনিকের মাত্রা অবশ্য সীমার মধ্যেই আছে।

আর্সেনিক বিষ গ্রহণে যে ফল দেখা যায়, কুমারের যদি ৫ই এবং ৬ই তারিখে পাকস্থলীর পীড়া কিম্বা পিত্তশুলের বেদনা থাকিত অথবা তিনি যদি ঐ পিল গ্রহণ করিয়া থাকিতেন তাহাতেও ঐ ফল হইতে পারিত না। তিনটী গুলিয়া খাইলেও আর্সেনিকের কাজ উঙ্গাতে হয় না। বারটী পিলেও তাহা বমি

হইয়া পড়িয়া যাওয়াই স্বভাবিক।" ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্টের উত্তরে এই সকল কথা বলা হইয়াছে, 'ঔষধের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ডাঃ ম্যকগিল বলিয়াছিলেন যে, ঐ পিলের বারটী গুলিলে তাহাতে ১৪৮ গ্রেণ কুইনাইন, ৬ গ্রেণ এলয়, সিকি গ্রেণ ষ্ট্রিক্‌নিন, (সিকি হইতে আধ গ্রেণ গ্রহণ মারাত্মক)

১২ গ্রেণ ইউনোনমিল এবং ১/৮ গ্রেণ আর্সেনিক থাকার সম্ভাবনা (২ গ্রেণ আর্সেনিক গ্রহণ মারাত্মক) সুতরাং ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্ট এবং মেজর টমাসের মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মেজর টমাস বলিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া আছে সন্দেহ করিয়াও ঐ পিলের ব্যবস্থা করা হইতে পারে। ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্টও উহা সমর্থন করিয়াছেন। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন—

প্রঃ—ঐ ঔষধের ব্যবস্থা কেন করা হইয়াছিল।

উঃ—আমার মনে হয়, ডাক্তার মনে করিয়াছিলেন, অনেক দিনের ম্যালেরিয়া এবং কোষ্ঠ অপরিষ্কার ও অনেক দিনের ম্যালেরিয়ার ঔষধই আর্সেনিক এবং এলয় ও ইউনোনমিন জোলাপের কাজ করে।

প্রঃ—মাত্রা স্বাভাবিক মত ছিল ত ?

উঃ—উহা ডাক্তারী নিয়ম মতই ছিল। অতঃপর কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বলেন যে, কোন মানুষ উহার ১২টা পিল খাইতে পারে না। তিনি এই কথা বলেন নাই যে, যদি কেহ খায়, তাহা হইলে এমন কোন ফল হইবে যাহা ডাঃ ম্যাকগিল-ক্রাইষ্ট যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অন্যরূপ।

তাঁহকে জিজ্ঞাসা করা হয়—মারাত্মক মাত্রায় যদি নক্স-ভমিকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি কি উপসর্গ দেখা যাইবে ?

উঃ—ষ্ট্রিকনিন বিষ গ্রহণে যে উপসর্গ দেখা যায়, তাহাই দেখা যাইবে। তিনি বলেন যে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঐ উপসর্গ দেখা যাইবে। যদি মারাত্মক মাত্রায় আর্সেনিক বিষ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও আধ ঘণ্টা কি ৪৫ মিনিটের মধ্যে তাহার ফল কি হইবে, ঐ সম্পর্কে ম্যাকগিলক্রাইষ্ট বলিয়াছেন, কতক্ষণে উহা গলিবে তাহার উপরেই উপসর্গ দেখা দেওয়া নির্ভর করে। পাকস্থলী খালি কি খাদ্যদ্রব্যে ভরা তাহারও বিবেচ্য বিষয় হইবে। উভয়েই তাঁহাদের প্রামাণ্য হিসাবে লায়ন্স জুরিস-প্রুডেন্সকে মানিয়াছেন। অই বইয়ে লেখা আছে, বিষ গ্রহণ এবং উপসর্গ দেখা দেওয়ার মধ্যে যে সময় লাগে, তাহা নির্ভর করে আর্সেনিক কতটা গলিবার মত অবস্থায় গ্রহণ করা হইল তাহার উপর এবং অই বিষ গ্রহণের সময় পাকস্থলী খালি কি ভরা তাহার উপর। (লায়ন্স জুরিসপ্রুডেন্স, ৯ম সংস্করণ, ৪৮৮নং পৃষ্ঠা)।

সুতরাং এই বিষয়ে ডাক্তারদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই যে, অই ব্যবস্থাপত্র অনেক দিনের ম্যালেরিয়া রোগীর পক্ষে উপযোগী, উহাতে দাস্ত হইবে এবং পাকস্থলীকে চালিত করিবে। উহা যে পিত্তশুলের বেদনার ঔষধ, তাহা কেহই বলেন নাই। এমন কি আশু ডাক্তার পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—অই ঔষধ পিত্ত-শুলের রোগীর উপযোগী নয়।

মামলায় সর্ব্বদাই এই মন্তব্য প্রকাশ করা হইতেছিল যে,

কুমারকে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাল জানিতেন, কোন ঔষধ কুমারের পক্ষে তখন প্রয়োজন ছিল। ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ডাঃ টমাস স্বীকার করিয়াছেন যে, কাহারও যদি কাহাকেও আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের মতলব থাকিত, তাহা হইলে সে বিষ প্রয়োগ করিয়া এমন একখানা ব্যবস্থাপত্র করাইয়া লইতে পারিত যাহাতে পেটের অসুখ, রক্তবাহ্যে কিংবা আর্সেনিকযুক্ত মল প্রভৃতি উপসর্গের কারণ ছাড়া অপর কিছু বুঝান সম্ভব হইত। আমি কিন্তু ঐদিক দিয়া সাক্ষ্য প্রমাণের বিচার করি নাই। হত্যা কিংবা হত্যার চেষ্টার মামলা হিসাবে আমি ইহা গ্রহণ করি নাই আমি এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছি—কেবল মাত্র ইহাই জানি যে, কুমার মারা গিয়াছেন—না তাঁহাকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না, কুমারের মৃত্যুর সময় ঠিক ঠিক বলা হইয়াছে কি-না—উহা সন্ধ্যার সময় হইবে না সন্ধ্যার কিছু পরে হইবে, তাহাই আমার জানিবার বিষয়।

৭ই তারিখ মধ্যমকুমারের কি অবস্থা ছিল এবং ঔষধের ব্যবস্থাপত্র কি ছিল, এখন পুনরায় তাহার আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৯২১ সালে মানহানির মামলার সময় আশু ডাক্তার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সি ঘোষের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন, উক্ত মামলা সম্পর্কে পুনরায় মিঃ বি এম ঘোষের নিকটও তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি শ্রীপুর মামলায়ও সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি মিঃ এস পি ঘোষের নিটক ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে সাক্ষ্য দেন এবং ১৯২১ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত

তাহার সাক্ষ্য চলিতে থাকে। তিনি ৬-১২-২১ তারিখ হইতে ১৫-১-২৫ পর্য্যন্ত মিঃ বি এম ঘোষের নিকট সাক্ষ্য দেন। এবং শ্রীপুর মামলা সম্পর্কে সাবজজের নিকট ১৯২২ সালের ১২ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন। প্রত্যেক মামলাতেই কুমারের দার্জ্জিলিংএ রোগ চিকিৎসা এবং মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করাই বিচার্য্য বিষয় ছিল। প্রত্যেক মামলাতেই তিনি সাক্ষ্যে এবং জেরায় ৬ই তারিখ হইতে ৮ই তারিখ পর্য্যন্ত অসুখের ও চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি কোন মামলাতেই ব্যবস্থা-পত্র দিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মিঃ এস পি ঘোষের নিকট ৭ই মের সম্পর্কে বলিয়া গিয়াছেন যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট রাত্রি ৮টা অথবা ৯টায় আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিতে পান যে কুমার পিত্তশূলের বেদনায় অত্যন্ত কাতর। তিনি কুমারকে ইঞ্জেকশন করিতে চাহেন ; কিন্তু কুমার তাহাতে রাজি হন না। তৎপর খাওয়ার জন্য একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যান। তিনি বলিয়াছেন কুমারকে কে ঔষধ খাওয়াইছেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। মনে হয় নার্স বা অন্য কেহ খাওয়াইয়া থাকিবে।

মিঃ বি এম ঘোষের নিকট তিনি বলিয়াছেন ঃ—

দার্জ্জিলিংএ আমি মধ্যমকুমারের জন্য কোন ব্যবস্থাপত্র করি নাই। তিনি ডাঃ ক্যালভার্ট বা নিবারণবাবুর ব্যবস্থাপত্র (একজিবিট নং ৪৬০ এর উক্ত অংশে ৪৬৬৬ (জে) উল্লেখযোগ্য) অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই মামলায় তাঁহাকে

উক্ত ব্যবস্থাপত্রগুলি দেখান হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ প্রকার উত্তরই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

৬ই মে ডাঃ ক্যালভার্ট জ্বর এবং পেটের বেদনার জন্য ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন। জ্বরের জন্য কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমার মনে নাই। ৬ই তারিখ পেটের অসুখের জন্য কোন ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহা আমার মনে নাই। ডাঃ ক্যালভার্ট ৬ই তারিখ সকালে একবার আসিয়াছিলেন। ৭ই তারিখও তিনি আসিয়াছিলেন এবং আমি কোন ব্যবস্থাপত্র করি নাই। ৭ই তারিখ ডাঃ ক্যালভার্ট কি ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই। ৬ই ও ৭ই তারিখ অন্য কোন ডাক্তার আসেন নাই। (একজিবিট নং ৩৯৪)।

তারপর আর্সেনিক দিয়া কোন ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন কিনা উহা তাহাকে সোজা জিজ্ঞাসা করা হয়; তিনি তদুত্তরে বলেন, আমি কোন ব্যবস্থাপত্র করি নাই। ঘটনা এই যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট ৭ই তারিখ আসিয়াছিলেন এবং ৭ই ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন, এবং উক্ত দিবস ডাঃ নিবারণ আসেন নাই। তিনি মিঃ এস পি ঘোষের কোর্টে বলিয়াছেন যে, ডাঃ নিবারণ ২।৩ দিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ৭ই তারিখের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ডাঃ ক্যালভার্ট একাই তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছেন এবং তিনি বেদনার উপশমের জন্যই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তিনি শ্রীপুর মামলার সময়ও এই কথাই বলিয়াছেন এবং

উক্ত দিবস ডাঃ নিবারণ মোটেই আসেন নাই বলিয়াছেন। শ্রীপুর মামলায় ইহাই বিচার্য্য বিষয় ছিল, বর্ত্তমান মামলায়ও ঐ সকল ব্যবস্থাপত্র উপস্থিত করা হইয়াছে, এখনো আশু ডাক্তার সেই একই কথা বলিতেছেন। তিনি ব্যবস্থাপত্র করেন নাই. কর্ণেল ক্যালভার্ট ব্যবস্থাপত্র করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন।

বিবাদী পক্ষ হইতে ডাঃ ক্যালভার্টকে ঐ সকল ব্যবস্থাপত্র দেখান হয় নাই, তাঁহারা উহা উপস্থিতও করিতে পারিতেন না। কারণ উহা উপস্থিত করা হইলে পিত্তশুল রোগ, শোকজ্ঞাপকপত্র এবং মৃত্যুসম্মতি এফিডেভিট টিকে না। জেরার সময় তাঁহার নিকট উহা উপস্থিত করা হইলে তিনি বলেন যে, কুমারের ঐ প্রকার অবস্থায় তিনি ঐ প্রকার ব্যবস্থাপত্র করিতেন না। সংক্ষেপে তিনি উহা অস্বীকার করেন। সুতরাং উহা তাঁহার উপর আরোপ করা যায় না। মিঃ চৌধুরী বলেন যে ৭ই তারিখ ডাঃ নিবারণচন্দ্র উক্ত ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে বলিয়া দেন এবং আশু ডাক্তার তাহা লিখিয়া নেন। তিনি ডাঃ ম্যাকগিল ক্রাইষ্টকে বলেন যে, "চিকিৎসক বা চিকিৎসকগণ" উক্ত দিবস ম্যালেরিয়া বলিয়া সন্দেহ করেন। এই সম্পর্কে আশু ডাক্তার তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন :—

দার্জ্জিলিংএ কুমারের অসুখের সময় আপনি কোন ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন কি ?

উ—করি নাই।

প্রঃ—আপনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছিলেন কি ?

উঃ আমি চিকিৎসকদের কথানুযায়ী একখানি লিখিয়াছি। আমি কোন ব্যবস্থাপত্র করি নাই। আমাকে উহা লিখিতে বলা হইয়াছিল, তদনুযায়ী আমি লিখিয়াছিলাম। ডাঃ নিবারণ অথবা কর্ণেল ক্যালভার্ট আমাকে উহা লিখিতে বলিয়াছিলেন।

কোন সময় এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কেন এবং কি অবস্থায় ইহা রোগীকে প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং যদি করা হইয়া থাকে, তবে কিরূপ ফল ফলিয়াছিল—এই সম্বন্ধে তিনি একটী কথাও বলেন নাই। ডাঃ ক্যালভার্টের উপরে ইহা চাপান যায় না ; কারণ তিনি একথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডাঃ নিবারণের উপরও ইহা চাপান যায় না ; কারণ যদিও তিনি ডাঃ ক্যালভার্টের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন. তথাপি তিনি ৭ই তারিখে আসেন নাই ; এতদ্বারা মনে করা যাইতে পারে যে, এখানেই প্রসঙ্গটির পরিসমাপ্তি হইল এবং একমাত্র আশু ডাক্তারই বাকী রহিলেন। তিনিই এই ব্যবস্থাপত্রের রচয়িতা বলিয়া মনে হয় এবং ইহাও ধারণা হয় যে আশু ডাক্তারই এই ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উপরোক্ত ডাক্তারদের মধ্যে যদি কাহাকেও ইহার জন্য দায়ী করা না যায়, তাহা হইলেও অপর কাহাকেও দায়ী করিতে পারা যায়। কারণ ডাঃ নিবারণ আর বাঁচিয়া নাই এবং যিনি সশরীরে

বাঁচিয়া নাই একমাত্র তিনিই সেই কাজ করিতে পারেন. যাহা অপর কেহ করিতে পারে না।

৭ই তারিখে ডাঃ ক্যালভার্ট অথবা ডাঃ নিবারণের কোন ব্যবস্থাপত্র নাই এবং এই ব্যবস্থাপত্রখানি অতি আশ্চর্য্যজনক-ভাবে উপস্থিত হইয়াছে এবং অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে। প্রত্যেকেই ইহার কথা অস্বীকার করিতেছেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে দেখা যাইবে যে, সেই দিনে রোগীর অবস্থা বিবেচনায় ইহা কেবল অসঙ্গত ব্যবস্থা নয়—ইহা সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য এবং রোগীর অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিহীন।

৭ই তারিখে দ্বিতীয় কুমারের অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণ-গুলি এই ঃ—

এই তারিখের কোন টেলিগ্রাম নাই ; একটি মাত্র আছে ; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ৬ই রাত্রিতে কুমারের সুনিদ্রা হইয়াছিল।

সকাল ৭টা হইতে ১০টা—জ্বরও নাই, বেদনাও নাই। ডাঃ ক্যালভার্ট এবং ডাঃ নিবারণ উভয়েই আসিয়াছিলেন।

সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৪টা—সত্যবাবুর মতে অবস্থা প্রায় একই রকমের। আশু ডাক্তারের মতে জ্বর আরম্ভ।

বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা—সত্যবাবুর মতে জ্বর ও বেদনা। তিনি বলেন, রাত্রি ৯টার পরে কুমারের অবস্থা পূর্ব্বা-পেক্ষা মন্দ হইয়াছিল কিনা, ইহা বলা কঠিন। তবে তিনি সকাল বেলার মত ভাল ছিলেন না।

সত্যবাবু আরও বলেন যে, ডাঃ ক্যালভার্ট কিংবা ডাঃ

নিবারণ বিকাল বেলায় কুমারের ব্যথার সময়ে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কোন ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার মনে নাই।

এই দিনের অবস্থা সম্বন্ধে আশু ডাক্তারের বর্ণনা এইরূপঃ—

সকাল ৭টা হইতে ১০টা—কুমার ভাল ছিলেন।

সকাল দশটা হইতে অপরাহ্ন ১টা—জর; তবে তাহার স্মরণ নাই।

অপরাহ্ন ১টা হইতে বৈকাল ৪টা জর থাকিতে পারে; তবে তিনি নিশ্চয় কিছু বলিতে পারেন না।

সন্ধ্যাবেলা হইতে রাত্রি ১০টা—সন্ধ্যাবেলায় পিত্তশুলের বেদনা হইয়াছিল; "হাঁ, সন্ধ্যার সময় আমার মনে হইতেছে।" এই বেদনা সামান্য ছিল, কি বেশী ছিল, তাহা মনে নাই। জর ছিল কি না, ইহাও স্মরণ নাই।

আমি তাহার মতলবটা যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। তিনি এমন একটা অবস্থার কথা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন, যাহাতে জরের উপযোগী তবে বেদনার পক্ষে অনুপযোগী ব্যবস্থা-পত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। পরিশেষে তিনি বলেন—

"আন্দাজ সন্ধ্যার সময় কুমারের পিত্তশুলের বেদনা হইয়া-ছিল। টেলিগ্রাম দেখিবার পর আমি তাহা স্মরণ করিতেছি। কুমারের ব্যথা এরূপ ছিল যে, তখন তাঁহার একটা বিশেষ ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমিও এই সময়ে একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। সেইদিন কুমারের যে বেদনা হইয়াছিল, তাহার কথা আমার মনে আছে।

ইহা ছিল পিত্তশুলের বেদনা। তিনি বিছানায় পড়িয়াছিলেন। সেই বিছানা ছিল শয়নকক্ষের সংলগ্ন অপর কক্ষে অবস্থিত। সেই কক্ষেই কুমার মৃত্যু হয়। বিছানায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি অতিমাত্রায় বেদনা অনুভব করিতেছিলেন।"

তারপর আশু ডাক্তার বলেন যে, এই বেদনার মধ্যেও মর্ফিয়া ইঞ্জেকস দেওয়া হয় নাই; কারণ কুমারের তাহাতে আপত্তি ছিল। এই ইঞ্জেকসনের পরিবর্ত্তে অপর কোন উপায়েও তাহাকে আফিং প্রয়োগ করা হয় নাই। এইস্থলেই সাক্ষী ডাঃ ক্যালভার্ট অথবা ডাঃ নিবারণের আগমনের কথা তুলিয়াছেন। ৫১ (ক) নং একজিবিট যে ব্যবস্থাপত্র তাহা হইতেছে আর্সে-নিকের ব্যবস্থাপত্র। সাক্ষী বলেন, হয় ডাঃ ক্যাল্‌ভার্ট না হয় ডাঃ নিবারণ ইহা মুখে বলিয়াছিলেন। আমার সম্মুখে আশু ডাক্তার স্বীকার করিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যবস্থাপত্র পিত্তশূলের বেদনায় দেওয়া চলে না। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, শূলের বেদনা থাকিলে জ্বরের জন্যও এই ব্যবস্থা দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, ম্যালেরিয়া এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সময়ে ইহা দেওয়া যাইতে পারে; তবে কুমারের এই অবস্থা ছিল না। পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন যে, এই দিবস কুমারের ডাইরিয়া—সামান্য রকমের ডাইরিয়া ছিল— পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষ্যের সময় তিনি ম্যালে-রিয়ার কথা বলেন নাই। ডাঃ ক্যালভার্টকে এখনই বাদ দিতে হয়। সমস্ত বিষয় বিবেচনায় এবং তিনি যে সব উত্তর দিয়াছেন, তাহার পর তাঁহাকে আর ধরা চলে না। ডঃ নিবারণ বাঁচিয়া নাই; অতএব ইহা কল্পনা করা যায় না যে, তিনিই শুল

বেদনার সময়ে এই ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ দিবস তিনি আদৌ কুমারকে দেখিতে আসেন নাই।

সুতরাং দুইটী বিষয় বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। ৭ই মে হয় নিবারণবাবু কিংবা ডাঃ ক্যালভার্ট কেহই আসেন নাই, নতুবা ঐ দিনের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যবস্থাপত্র নিশ্চয়ই থাকিত। কুমার রাত্রিতে বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন, ধরা যাক, উহা পিত্তশুলেরই বেদনা। তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহাকে তখনও অন্য কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয় নাই, যে কক্ষে ৮ই মে তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, ৭ই সে দিনের বেলা তাঁহাকে অন্য কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। এষ্টেটের দপ্তরী বিপিন, বীরেন্দ্র এবং সত্যবাবুর সাক্ষ্য হইতেও উহাই দেখা যায়। ৭ই মে রাত্রিতে পর্য্যন্ত কুমারকে তাঁহার শয়নকক্ষে দেখা গিয়াছিল। আশু ডাক্তার তাঁহাকে বেদনায় কষ্ট পাইতে দেখেন। কিন্তু ঐ সময় একমাত্র ঔষধের ব্যবস্থা ছিল আর্সেনিক ব্যবস্থা।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—আপনি কি ঐ ঔষধেই তাঁহার কষ্টের লাঘব করিবেন আশা করিয়াছিলেন? ডাক্তার উত্তর দিয়াছিলেন—না; কিন্তু অন্য কিছু ছিলও না। ঐ ঔষধে বেদনা ত লাঘব পারেই না, বরং বেশী মাত্রায় দিলে উহা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ডাঃ ম্যাকগিল ক্রাইষ্টও উহা বলিয়াছেন এবং উহা কেহ অস্বীকারও করিতে পারে না।

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, রাত্রিতে কুমারকে বেদনা থাকা অবস্থায়ই অপর কক্ষে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সত্যর খুড়তুত ভাই শ্যামাদাস তখন রাজ দপ্তরের একজন কেরাণী ছিল—পরে তহবিল তছরূপের জন্য তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। পরদিন ভোরে শ্মশানে সেই ছিল প্রধান শ্মশান বন্ধু। সে তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে, ৭ই মে রাত্রি ৬-৩০ মিনিটের সময় পর্য্যন্ত কুমারকে দেখিয়াছে, কুমার তাহাকে বেদনার কথা বলিয়াছে ; তাঁহার যে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই—সে কুমারের নিকট তাহাও শুনিয়াছে। তাঁহাকে বেদনায় খুব কষ্ট পাইতে দেখা যায়। ৮ই মে কুমারের বাড়ী যাইয়া সে তাঁহাকে অন্য ঘরে দেখিতে পায়। সত্যবাবু কুমারকে দিনের বেলা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, কুমার ৬ই মে প্রাতে যখন প্রথম আক্রান্ত হন তখনই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন তিনি বেদনায় বিশেষকষ্ট পাইতে-ছিলেন। কিন্তু যখন ৬ই তারিখের টেলিগ্রামের কথা তাঁহাকে বলা হয়—যে টেলিগ্রামে বেদনার কোন উল্লেখ ছিল না—কেবলমাত্র ৯৯ ডিগ্রী জ্বরের কথা উল্লেখ ছিল—তখন তিনি স্বীকার করেন যে, ৭ই রাত্রিতে যে বেদনা উঠে তাহাতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু কুমার যে বেদনায় ছটফট করিতেছিলেন তাহা তিনি অতিরঞ্জিত বলিয়া বলেন। একমাত্র আশু ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র—অপর কোন ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া মনে করা যায় না যে. কুমারের জর হইয়াছিল। ৭ই মে পর্য্যন্ত কুমারের জর হয় নাই। আশু

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে জরের ঔষধ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। অপর কোন ডাক্তারই উহাতে জরের কোন ঔষধ আছে বলিয়া মনে করেন না। আমার মনে হয়, ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন হিসাবেই জর, হওয়ার দরকার ছিল, জরের জন্য উহার প্রয়োজন হয় নাই। ঐজন্যই বিবাদী পক্ষে রায় সাহেব, ফণীবাবু, এমনকি চাকর-বাকরবা পর্যান্ত ম্যালেরিয়ার কথা বলিতেছিল, কুমার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন। আমি ঐ সকল সাক্ষীর একটি কথাও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। মিঃ চৌধুরী বড়রাণীর ৬-২-০৯ তারিখের একখানা পত্র আমাকে দেখাইয়াছেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, "মেজ ঠাকুরপো ভাল আছেন, আবার গত রাত্রে তাঁহার জর হইয়াছে" ঐ পত্রে 'তাহার বলিতে বড়রাণী তাঁহার স্বামীর কথাই বলিয়াছেন। কারণ, মেয়েরা পত্রেও তাঁহাদের স্বামীর নাম উল্লেখ করে না। ১৯০৮ সালে কুমারের শাশুড়ী লিখেন কুমারের জর হইতেছে, তাহাকে চিকিৎসার জন্যকলিকাতা যাইতে হইবে। ঐ সময় আমরা জানি, উপদংশের চিকিৎসার জন্যই তাহাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। কুমার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, ম্যালেরিয়ার, এমনকি জরেরও কোন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র নাই, এমনকি আশু ডাক্তারও বলেন নাই যে, কুমার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি কোন ঔষধের ব্যবস্থাপত্রই করেন নাই, তিনি কুমারের চিকিৎসা করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তিনি মাত্র মেডিকেল স্কুল হইতে পাশ করিয়াছিলেন। তিনি তখন একজন

যুবক ছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে সত্য কথাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ৭ই তারিখ রাত্রিতে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়, কিন্তু জ্বরের ঐ ব্যবস্থাপত্র হইতে পারে না। তথাপি তিনি ঐ ব্যবস্থাপত্রই করিয়াছিলেন।

ঐ দিনের ঘটনাগুলি বেশ পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। কোন ডাক্তার ঐ দিন আসেন নাই, কোন টেলিগ্রাম পাঠান হয় নাই। তাহাতে বুঝা যায়—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুমার ভালই ছিলেন; অন্ততঃ ৬ই তারিখের অবস্থা হইতে অবস্থা বিশেষ খারাপের দিকে যায় নাই। প্রাতে তিনি ভালই ছিলেন, কিন্তু ডাঃ ক্যালভার্টের সাক্ষ্য সমর্থন করিতে যাইয়া রাণী বলিয়াছেন, ডাঃ ক্যালভার্ট ঐ দিন প্রাতে আসিয়াছিলেন এবং ইন্‌জেকশন দিতে চাহিয়াছিলেন যদি বেদনা ছিল না উহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ডাক্তারের ইন্‌জেকশন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ যে কতটা সত্য তাহা বেশ বুঝা যায়। মরফিয়া পিত্তশূল বেদনার ঔষধ নয়, উহাতে বেদনার উপশম হয়। বিবাদী পক্ষ সাক্ষ্য হইতেই দেখা যায়, ডাঃ ক্যালভার্ট ৬ই তারিখ প্রাতে কোন বেদনা দেখিতে পান নাই। আমি দেখিতেছি, ৭ই তারিখে তিনি আসেনই নাই। যদি আসিয়াও থাকেন, তিনি পিত্তশূলের বেদনা দেখিতে পান নাই। ৬ই তারিখের পূর্ব্বে কুমারের কোন অসুখই ছিল না। ১৪ দিন যাবত অসুস্থ ছিল ইহা বিবাদী পক্ষ পরে আর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে নাই। বরং বাদীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল—তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ৭ই তারিখ পর্য্যন্ত ডাঃ ক্যালভার্ট পিত্তশূলের

বেদনা দেখিতে পান নাই। তখনও তিনি বেদনার কথা বলিতেছিলেন। ডাঃ ক্যালভার্ট প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, প্রথম দিন তিনি দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা দেখিতে পান এবং তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করেন। তিনি কতক্ষণ পরে ঔষধ খাওয়াইতে হইবে তাহারও নির্দ্দেশ দেন কিন্তু ঐ দিন একখানা মাত্র ব্যবস্থাপত্র করা হয়। তিনি ৮ই মে কুমারকে পুনরায় দেখেন, ঐদিন কি ঘটিয়াছিল তাহাই এখন দেখিতে হইবে। ৮ই মে সম্পর্কে বিবাদীপক্ষের বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। মেজরাণী বলিয়াছেন ঃ—

প্রাতে ডাঃ ক্যালভার্ট আসেন, ইন্‌জেকশন দিতে চান, কিন্তু কুমার তাহাতে স্বীকৃত হন না। কুমার তাঁহার শয়ন ঘরের পার্শ্বস্থ ঘরের মেজের উপর মাদুরে শুইয়াছিলেন, রাণী বলিয়াছেন যে, উহা সামনের ঘরে নহে, উহা চতুর্থ কক্ষ, সামনের কক্ষের পরের কক্ষ।

ডাঃ ক্যালভার্টের আসিবার একটু পূর্ব্বে কি পরে অর্থাৎ সকাল ৮টায় কি ৯টায় ডাঃ নিবারণ সেন প্রথম আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কুমারের কক্ষে চলিয়া আসেন. আমি পার্শ্বের ঘরে ঢুকি এবং মধ্যের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকি। আশু ডাক্তার, সত্যবাবু এবং খুব সম্ভব মুকুন্দও উপস্থিত ছিলেন, চিকিৎসকগণ ১০ মিনিট সে ঘরে ছিলেন, তাঁহারা রোগীর সঙ্গে কথা বলিয়া বসিবার ঘরে চলিয়া যান। তিনি বলিয়াছেন যে, ৪নং কক্ষে কুমার ছিলেন এবং তিন নং কক্ষ তাঁহার শয়ন ঘর ছিল। নক্সা হইতে দেখা যায় যে, তিনি ৪নং কক্ষে ছিলেন এবং কুমার ৫নং

কক্ষে ছিলেন ৫নং কক্ষকে বসিবার ঘর বলার উদ্দেশ্য—বাদীর পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। এই সাক্ষী বলিয়াছেন যে, তিনি রাত্রি ৭টায় কুমারকে সামনের ঘরে মৃত অবস্থায় দেখিয়াছেন।

একথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা জানা যায় যে, কুমার সকাল বেলা সুস্থই ছিলেন এবং রাণীই পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, তখন তাঁহার পিত্তশুল বা অন্য কোন বেদনা ছিল না। সকাল ১০টা অথবা ১০-৩০ মিনিটে সামান্য বেদনা হয় এবং বমি হয়। অপরাহ্ণ ১২টা হইতে ২টা অথবা ২-৩০ মিনিটে পিত্তশূলের বেদনা বাড়িতে থাকে। পায়খানার সঙ্গে আম এবং রক্ত যাইতে থাকে, ৪।৫ বার স্নানের ঘরেই বাহ্য করেন এবং তৎপর বেডপেনে পায়খানা করেন। যখন রক্ত এবং আম যাইতে থাকে, তখন ডাঃ ক্যালভার্টের জন্য পাঠান হয়, কিন্তু তখন তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

প্রঃ—আম ও রক্ত ব্যতীত পায়খানায় অন্য কোন উপসর্গ ছিল কি ?

উঃ—পিত্তশুল, অস্থিরতা, বমি বমি ভাব এবং অন্য একবার বমি ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। জেরায় তিনি বলেন যে, পায়খানা তরল এবং পাতলা ছিল, তবে জল নহে।

কুমারের যে পেটের অসুখ হইয়াছিল, তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপরাহ্ণ ২টা অথবা ২-৩০ মিনিটে ডাঃ ক্যালভার্ট আসেন,

এবং ইনজেকশন দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলেন; কিন্তু কুমার রাজি হন না।

অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে কুমার ইনজেকশন লইতে রাজি হন। ইনজেকশন লওয়ার পর তাঁহার বেদনার কিছু উপশম হয়; কিন্তু কুমার ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া লম্বা হইয়া পড়েন, ইনজেকশনের পর নার্সগণ যে আসিয়াছিল তৎসম্পর্কে তিনি জেরায় নিশ্চিত হন। তাঁহার শরীর ঠাণ্ডা হইতে থাকে, নার্সগণ তাঁহার শরীরে পাউডার মাখাইতে থাকে, তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্ট রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া খাইতে চলিয়া যান।

তিনি বলিয়াছেন, খুব সম্ভব দুই বার ইনজেক্শন দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তাঁহার মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবু ডাঃ বি, বি, সরকারকে লইয়া আসেন। তাঁহারা দুইজনেই কুমারের ঘরে যান এবং ডাক্তার কুমারকে পরীক্ষা করেন। তিনি ঐ ঘরে ৭।৮ মিনিট থাকিয়া চলিয়া যান। সূর্য্যনারায়ণ বাবু দেড় ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া যান। যখন ডাঃ সরকার রোগীকে পরীক্ষা করেন, তখন ডাঃ ক্যালভার্ট ও ডাঃ নিবারণ তথায় যান নাই, তাঁহারা বাড়ীতেই ছিলেন। তখন তাঁহার শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসে, তবে বরফের মত ঠাণ্ডা নহে।

ডাঃ সরকার চলিয়া যাইবার সময় কুমারকে মৃত বলিয়া যান নাই বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। মধ্য রাত্রে ডাঃ ক্যালভার্ট ডাঃ নিবারণ এবং আশু ডাক্তারের সম্মুখে তিনি মারা গিয়াছেন।

ডাঃ ক্যালভার্ট নৈশ ভোজনের পর আসেন এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।

ইনজেকশন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রোগ ক্রমেই বাড়িতেথাকে। ইনজেকশন দেওয়ার সময় হইতে পরদিন সকালে শব নেওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেই ঘরেই ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি সারা রাত্রি বিছানায় পড়িয়া কাঁদিয়াছেন।

বাদী পক্ষের কোন সাক্ষীই মৃত্যুর পরের ঘটনা ব্যতীত উক্ত দিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলিতে পারেন নাই। ষ্টেপ এসাইডের মালিক মিঃ ওয়ারিঙ্কলের মুন্সী রামসিংহ শুভা নামক একটী লোক সত্যবাবু ও মুকুন্দের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া কুমারের নিকট উক্ত 'ষ্টেপ এসাইড' ভাড়া দিয়াছেন, একথা সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই। এই লোকটী বলে যে, উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিটে সে লেবং রেস হইতে বাড়ীতে আসিয়া খাওয়া দাওয়া করে। সে ষ্টেপ এসাইড হইতে ১৫ ফুট নীচে বাস করিত। তাঁহার খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর সে ষ্টেপ এসাইড হইতে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিতে পায়। এবং ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বাহির হইয়া আসে ঐ সময় সন্ধ্যা ৭টা কি ৭-৩০ মিনিট হইবে। সে দেখে যে, নীচের তলায় চাকর বাকরগণ কথা বলিতেছে এবং কুমার মারা গিয়াছে বলিয়া শুনিতে পায় সে উপরের তলায় যায় এবং দেখিতে পায় যে ৫নং ঘরে কুমার মৃতাবস্থায় শায়িত আছে, মৃতদেহ কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। সে ঐ ঘরেই ডাঃ বি, বি, সরকার, ডাঃ আশুতোষ, সত্য বাবু ও ঐ বাড়ীরই আর

কয়েকজন লোককে দেখিতে পায়। তাঁহারা সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষী তাঁহাদের সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া ৮-১০ মিনিট দাঁড়াইয়া চলিয়া আসে। সে যখন বারান্দা দিয়া আসিতেছিল, তখন ৩নং ঘরে রাণীকে একটা লোহার খাটে শায়িত অবস্থায় চেঁচাইয়া কাঁদিতে দেখে। যে ঘরে রাণী ছিলেন, সে ঘরের বাহিরের দিকে তালা দেওয়া ছিল।

ডাঃ বি, বি, সরকার যে ৭টা অথবা সাড়ে সাতটায় উক্ত ঘরে ছিলেন এই সাক্ষীই প্রথম বলিয়াছে। বিবাদীপক্ষ বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, এই ডাঃ বি, বি সরকার সন্ধ্যায় উক্ত ঘরে ছিলেন না এবং এই সাক্ষীর সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন যে, ডাঃ বি, বি, সরকার সন্ধ্যায় তথায় ছিলেন, এই ঘটনার দ্বারাই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ঘটনা প্রমাণিত হইবে, কুমার ৫ম কক্ষে মৃতাবস্থায় শায়িত ছিল না, ৪র্থ কক্ষেই মৃতাবস্থায় ছিল—রামসিং স্থুভার এই কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই তারিখে যে তার এবং ব্যবস্থাপত্র করা হইয়াছে, উহা দেখিতে হয়। একজিবিট ২২৫ সকাল ৭-২০ মিনিট—সামান্য জ্বর আছে, গত কল্য বেদনা ছিল, এখন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, চিন্তার কোন কারণ নাই।

একজিবিট ২২১ সকাল ১১-১৫ মিনিট—কোন জ্বর নাই, সামান্য বেদনা আছে, বমি বমি ভাব আছে, সিভিল সার্জ্জন দেখিতেছেন, চিন্তার কোনই কারণ নাই, আসিতেছি, ভাত

পথ্য দিতেছে। যাতায়াতের জন্য টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিন।

একজিবিট ২২২ নং ৩-১০—কুমার গুরুতর রকম পীড়িত হইয়াছেন বারবার জলের মত পায়খানা করিতেছেন, সঙ্গে রক্ত যাইতেছে, তাড়াতাড়ি আসুন।

পরের তারেই মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়, ইহা উপস্থিত করা হয় নাই। উহা কখন পাঠান হইয়াছে এবং উহাতে কোন সময়টা মৃত্যুর সময় বলিয়া লেখা হইয়াছে তাহাই জানিবার বিষয়।

প্রেস্কৃপশন (ব্যবস্থাপত্র)

এক্স নং,—ড্রাগিষ্টস

ক্রমিক নং,—ভাওয়ালের কুমার

৫১ (এ) ৩৪৩৯

রি—

ম্যাগকার্ব্ব—

সোডা বাই কার্ব্ব—

বিসমাথ কার্ব্ব—

পাল্‌ভ ট্রাগসিন্থ কোং এ এ ১ ড্রাম

অয়েল কাজপুট ১২ মিনিস্ত

একোয়া মেন্থপিপ এ এ ৬ ড্রাম

টি, ডি, এস

(স্বাঃ) জে টি সি
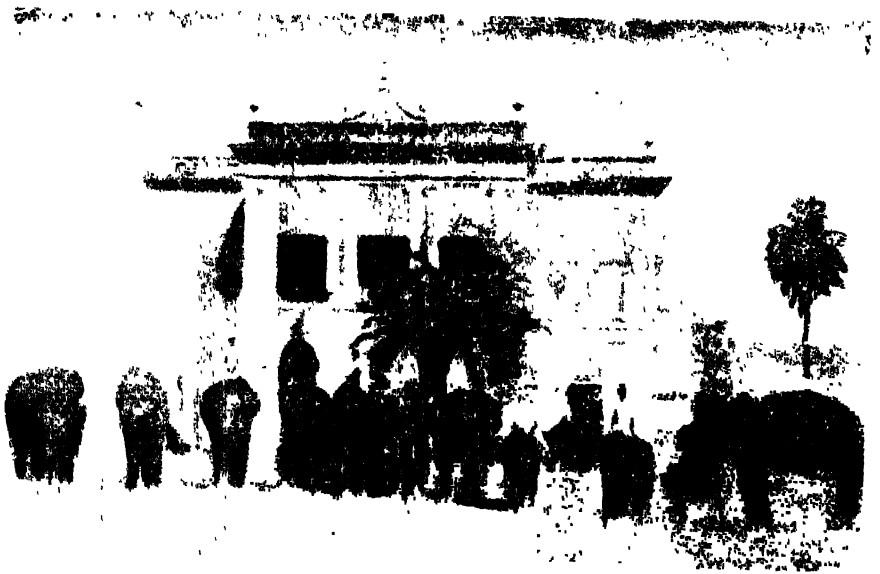
ভাওয়ালের রাজবাটী

৫১ (বি) ৩৪৪০

রি—

৩৪৪০/১

সোডা সাইট্রাস—১ ড্রাম

একোয়া ষ্টিরালাইজড এ এ ৬ ড্রাম

(এক ড্রাম দুধের সহিত)

রি—

গ্লিসারিন পেপসিন—২ ড্রাম

রি—

পেপ পাউডার ড্রেস

(স্বাঃ) এন সি সেন

রি—

এট্রপিন ট্যাব—১/১০০ গ্রেণ

ষ্ট্রাভক ট্যাব—১/৩০ গ্রেণ

ডিজিটেলিস ট্যাব—১/১০০ গ্রেণ

ইথার পিওর—১/২ গ্রেণ

মর্ফিয়া ট্যাব—১/৮

(স্বাঃ) এন সি সেন

৫১ (সি) ৩৪৪২/৪৩

রি—

স্পিরিট ইথার—৪ আউন্স

স্পিরিট এমন এবেমেট—৪ ড্রাম

একোয়া ক্যাম্ফর এ এ ৮ ড্রাম
(এক ডোজে ১/৮ অংশ)

(স্বাঃ) জে টি এস

রি—

একস্‌ট্রাক্ট ওপিয়াই—

বেলেডোনা—

স্যাপোনিজ এ এ আধ গ্রেণ

পিল (বড়ি) প্রস্তুত করিয়া ৬টী পাঠাইবে)

টি ডি এস

স্বাঃ—জে টি সি

এক্স নং

ড্রাগিষ্টস

ক্রমিক নং

৫১ (ডি) লিণ্ট স্যাপোনিজ—২ ড্রাম

সিপানিজ কোং এ এ ২ ড্রাম

আদার গুঁড়া মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গ শরীরে মালিস
করিতে হইবে।

রি—

বেলেডোনা—এ এ ২ ড্রাম

পেটের উপর দিতে হইবে।

স্পঞ্জিস লেলাইন—১২ × ১২

(স্বাঃ) এন সি সেন

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্রসমূহে লিখিত ঔষধ যে দোকান হইতে আনা হইত, সেই দোকানের হিসাবে প্রেসক্রিপশনগুলির ক্রমিক নম্বর আছে। পরম্পর ধারাবাহিক ভাবে সে নম্বর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। নম্বরগুলি দেখিলে মনে হয়, একটীর অল্প পরেই আর একটী ঔষধ আনা হয়। স্মিস ষ্ট্যানিষ্ট্রিটের ঔষধের দোকান সেদিন বন্ধ থাকিলেও কেবল উক্ত প্রেসক্রিপশনগুলির ঔষধ সরবাহের জন্যই ডিস্পেন্সিং বিভাগ সারাদিন খোলা রাখিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে শরীরে মর্দ্দন করিবার শেষ ঔষধ আনা হয়। রাণীর সাক্ষ্যে প্রকাশ, শুশ্রূষাকারিণীরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুমারের শরীরের ঐ মালিশ করিয়াছিল।

একটীর কতটুকু পরে আর একটী প্রেসক্রিপশনের ঔষধ আসিয়াছিল, সে ভিত্তিতে আমি কোনও সিদ্ধান্ত করিব না। আমি এ বিষয়ে কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্কেই বেশী জোর দিব। কেন না, বিবাদিগণ নিজেরাই তাঁহাদের জবানবন্দীতে পৌর্ব্বাপর্য্যের বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়াছেন, কিন্তু আশু ডাক্তার বা অন্য কেহ সময় নির্দ্দেশের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। আশু ডাক্তার দেখাইতে চান, তিনি ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ কিছুই জানেন না।

পৌর্ব্বাপর্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেসক্রিপশনগুলি কি নির্দ্দেশ দেয়, তাহাই দেখা যাউক,—

১। ম্যাগ কার্ব্ব প্রেসক্রিপশন—

অম্ল, পেটের ব্যথা, বমি, উদারাময় এবং শূল—এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ প্রয়োগ হয়। (কর্ণেল ক্যালভার্ট)

অম্ল, পেটের ব্যথা, উদরাময় এবং শূল বর্ত্তমান থাকিলে এই প্রকারের ঔষধ দেওয়া হয়। (কর্ণেল ম্যাকগিল ক্রাইষ্ট)

অজীর্ণ রোগে, (শুলের লক্ষণে প্রয়োগ খুব কম) উদরাময়ে এ ঔষধ নিরর্থক। এই প্রকারের প্রেসক্রিপশনে কোনও সঙ্গীন অবস্থার নির্দ্দেশ দেয় না। (ডাঃ ব্র্যাডলি)

৬ই মে তারিখের প্রেসক্রিপশনের (৫১ নং একজিবিট) ন্যায় অজীর্ণতার চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। (মেজর টমাস)

আশু ডাক্তার অবশ্য কর্ণেল ক্যালভার্টের সহিত একমত কিন্তু তিনি বলিতে পারেন নাই যে, কোন ঔষধটী শুলের পক্ষে বেশী উপযোগী। শুলের প্রকোপে সর্ব্বদা দাস্ত করাইবার প্রয়োজন।

২। সোডি সাইটেট এবং গ্লিসরো পেপসিন প্রেস্ক্রিপশন।

পরিপাক শক্তির সাহায্যকল্পে এই ঔষধ দেওয়া হয়। (কর্ণেল ক্যালভার্ট, কর্ণেল ম্যকগিলক্রাইষ্ট, মেজর টমাস এবং ডাঃ ব্রাডলি।

মেজর টমাস উপরন্তু বলেন যে, পিত্তশুলের বিরামকালে এ ঔষধ বিশেষভাবে উপযোগী।

(খ) পেপ পাউডার (টাটকা)—পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তাকল্পে পূর্ব্বোক্ত প্রেস্ক্রিপশনের সঙ্গে দেওয়া যায়। (কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট, অন্যান্য ডাক্তারেরা অমত করেন নাই)

(গ) মিঃ চৌধুরী প্রতিষেধক বলিয়া ছয়টি ঔষধের নাম করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সম্বন্ধে কর্ণেল ম্যাক্‌গিলক্রাইষ্টের অভিমত ভিন্ন আর কাহারও বিবরণ নাই।

পিত্তশুল অথবা অন্য যে কারণেই বেদনা উপস্থিত হউক না কেন, বেদনা উপশমের জন্য মর্ফিয়া ইনজেকশয় দেওয়া হয়।

এট্রোপিন ১০০/১ গ্রেণ—সাধারণ মর্ফিয়ার সহিত ইন্জেকশনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্রিকনাইন ৩০/১ গ্রেণ, স্নায়ু মণ্ডলকে সতেজ করে।

ডিজিটেলিস—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ইথার পিওর—অসাড় অবস্থায় ইন্জেক্শনের মত শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে আক্ষেপ ও অঙ্গগ্রহ উপশমিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধক ঔষধগুলি প্রেস্ক্রিপশনের অন্তর্গত নহে। ইনজেকশনের জন্য কি পরিমাণে ব্যবহার করা সঙ্গত কেবল তাহাই উল্লেখ করা হইল। সঙ্গত পরিমাণের সহিত মিলাইলেই বেশ বুঝা যাইবে কি পরিমাণ ডোজে ঔষধগুলি সরবরাহ হইয়াছিল।

৩ (এ) ইথর মিকচার ঃ—

সকল ডাক্তারই বলেন, অসাড় অবস্থায় এই মিক্চার দেওয়া যায় ; একমাত্র মেজর টমাস বলেন যে, খুব বেশী অসাড় অবস্থায় প্রযোজ্য নয়।

(এইচ) আফিংএর বড়ি সম্বন্ধে কর্ণেল ক্যালভার্ট বলেন, মরফিয়া ইনজেক্শনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কর্ণেল ম্যাকগিল ক্রাইষ্ট বলেন, দাস্ত, টিনেমাস, রেকটাল অবস্থা প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেজর টমাস বলেন, মরফিয়া ইন্জেক্শনে যদি ফল পাওয়া না যায়, তবে

অতিমাত্রায় দাস্ত রোধ করিবার পক্ষে ইহা খুব ভাল প্রতিষেধক। সাধাবণ দাস্তের ক্ষেত্রে মরফিয়া ইনজেকশনের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে।

৪ (এ) আদা ও সর্ষপচূর্ণ ঃ—

কর্ণেল ম্যাক্গিল ক্রাইষ্ট বলেন, কলেরার মত খিলধরা অবস্থায়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ টমাস বলেন, খিল-ধরায় ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কলেরার সময় অঙ্গে ইহা মালিস করা যাইতে পারে।

৪ (বি) বেলেডোনা লিনিমেণ্ট ঃ—

কর্ণেল ম্যাকগিল ক্রাইষ্ট বলেন, পেট ব্যথার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। কর্ণেল ক্যালভার্ট বলেন, দলিল-পত্রে যেমন দেখা যায়, তাহাতে পেট ব্যথার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। তবে যে কোন স্থানে বেদনার জন্যই উহা দেওয়া যাইতে পারে। মেজর টমাস বলেন, পিত্তশূল হইলে তলপেটে মালিসের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, তলপেট ও পেট এক নয়। তল-পেট বলিতে পেট, লিভার ও মূত্রাশয়কেও বুঝায়; এবং পিত্তশূলের বেদনা সাধারণতঃ দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে উঠিতে থাকে।

সাধারণতঃ চারিটি অবস্থা বলিয়া মনে হয়;—কিন্তু একই সময়ে দুজন ডাক্তারের লেখা দুইখানি ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া মনে হয়, যেন ঐগুলি পরপর লেখা হইয়াছে।

কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বলেন, ৩ (বি) যে আফিংয়ের বড়ির কথা উল্লেখ আছে, উহাদ্বারা দাস্তের যন্ত্রণার কিছু উপশম

হইতে পারে, এবং মর্ফিয়া ইঞ্জেকশনের পরিবর্তে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আদার গুঁড়া সম্বন্ধে তিনি বলেন, উহা মালিশ করিলে খিলধরা কমে, শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কর্ণেল ম্যাক-গিলক্রাইষ্টও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। পিত্তশূলে খিলধরা দেখা দিতে পারে কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—হাঁ।

ব্যবস্থাপত্রগুলি বিচারের মোটামুটি ফলাফল এই :—

বিবাদীপক্ষের ডাক্তার মেজর টমাসের মতে—

১। সাধারণ পেটের অসুখ।

২। অসার অবস্থা।

৩। ইঞ্জেকশনের পরিবর্তে পিত্তশূলের জন্য আফিংয়ের বড়ি।

৪। তলপেটে ব্যথা ও খিল ধরা হইতে পারে।

বাদীপক্ষের ডাক্তার ম্যাকগিল ক্রাইষ্টের এবং ডাক্তার ব্র্যাডলির মতে—

১। সাধারণ পেটের অসুখ।

২। অসাড় অবস্থা।

৩। জোর দাস্তের জন্য আফিংয়ের বড়ি।

৪। পেটে ব্যথা ও খিলধরা।

মেজর টমাস খিলধরার কথা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, উহা পিত্তশূলের ফলে হইয়াছিল। আদা গুঁড়ার প্রয়োগ দেখিয়া মেজর টমাস বিবাদীপক্ষের কথা স্বীকার করেন ; তবে তিনি হইলে উহা ব্যবহার করিতেন না।

মেজরাণী ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিয়াছেন :—

সকাল ১০টা পর্যন্ত ভাল। ১০টার কাছাকাছি সময়ে বমির উদ্রেক হয় এবং সামান্য ব্যথা ওঠে। মধ্যাহ্ন ১২টা সময় তীব্র ব্যথা ও রক্ত বাহ্যি হয়। নিবারণ ডাক্তার আসেন; অপরাহ্ন ২টায় কর্ণেল ক্যালভার্ট আসেন এবং ইঞ্জেকশনের জন্য কুমারকে রাজি করিতে চেষ্টা করেন। অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ব্যথা কমে। সন্ধ্যার আগে শুশ্রূষা করা হয় এবং চূর্ণ মালিশ করা হয়। সন্ধ্যাবেলা ডাঃ বি বি সরকার ছিলেন। মধ্যরাত্রে মৃত্যু হয়।

মেজরাণীর প্রদত্ত বিবরণে গোধূলি হইতে কুমারের মৃত্যু পর্য্যন্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখই নাই। আমার সমক্ষে যে সকল ব্যবস্থাপত্র আছে ঐগুলি যে সেই একদিনেই দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। আর তা ছাড়া একমাত্র কুমারের মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত টেলিগ্রাম ব্যতীত আর সকল টেলিগ্রামই একদিনের।

মেজরাণীর এতদসম্পর্কিত উক্তি সমর্থন করিবার জন্য সত্যবাবু, আশু ডাক্তার, বীরেন্দ্র এবং বিপিন খানসামা সাক্ষ্য দিয়াছে। নিম্নের বিষয়গুলির বিচার করা যাউক ঃ—

(১) সকালে কুমার সুস্থ ছিলেন। সেই সময় ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া তাঁহাকে ইঞ্জেকশন দিতে চাহিলেন। সকাল বেলা যদি ব্যথাই না থাকিবে এবং কুমার যদি সুস্থই থাকিবেন, তবে তাঁহাকে ইঞ্জেকশন দিতে চাওয়া হইল কেন? সত্যবাবু বলেন যে সামান্য ব্যথা ছিল, চিনচিনে ব্যথা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এই ইঞ্জেকশন দিতে চাওয়া হইয়াছিল। সত্যবাবুর এই কৈফিয়ৎ

মোটেই খাটে না। কর্ণেল ক্যালভার্ট ঐ দিনের পূর্ব্বে আর কখনও ব্যথার লক্ষণ দেখেন নাই। তথাপি তিনি ইনজেকশনের প্রস্তাব করিলেন এবং অবশেষে পেটের অসুখের জন্য সামান্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়া চলিয়া গেলেন। এই ব্যবস্থাপত্রখানিই ঐ দিনের প্রথম ব্যবস্থাপত্র।

ইহার পর বলা যায়, সামন্য পেটের অসুখে কেহ অসাড় হইয়া পড়ে না। কুমার কখন অসাড় হইয়া পড়িলেন এবং উহার পূর্ব্বেই বা কি হইল?

বার বৎসর পূর্ব্বে একটি মামলায় আশু ডাক্তার এই সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

মৃত্যুর দিন মেজকুমারের সকাল বেলা জোর দাস্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবলবেগে রক্তবাহ্যি হয়। ইহার দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি পেটের অসুখে ভুগিতেছিলেন।

জবানবন্দীতে আশু ডাক্তার ইহা বলেন, তাহার পর জেরায় তিনি বলেন :—

৭ই মে রাত্রিতে কুমারের পিত্তশূল হয়। তজ্জন্য ডাঃ ক্যালভার্ট ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেন, কিন্তু আমি দেখাইয়াছি যে, এই ব্যবস্থাপত্র ডাঃ ক্যালভার্টের দেওয়া নয়, উহা আশু ডাক্তারই দিয়াছিলেন। ৮ই মে তারিখের ব্যাপার সম্বন্ধে আশু ডাক্তার বলেন :—

"ঐদিন রাত্রি ২টা হইতে ৩টার মধ্যে বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং অনুমান সকাল ৪টার সময় ডাঃ ক্যালভার্টকে ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠান হয়। তিনি সকাল ৭টা কি ৮টার সময়

আসেন। তিনি ইনজেকশন করিতে চাহেন। কুমার তাহাতে অস্বীকৃত হন। ইহার পর ডাঃ ক্যালভার্ট ডাঃ নিবারণ সেনকে লইয়া আসেন। তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টা থাকিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ঐদিন সকাল বেলা ডাঃ ক্যালভার্ট একখানা ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি ঠিক কি ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, আমার স্মরণ নাই। তিনি পুনরায় অপরাহ্ণ ২টার সময় আসেন, কিন্তু অবস্থার তখনও কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

রাত্রি ৮ টার সময় তিনি আবার আসিলেন। এই সময় কুমারের বাহ্যির সহিত রক্ত পড়িতেছিল। রক্তমিশ্রিত বাহ্যির কোনরূপ রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয় নাই। ডাঃ ক্যালভাট রক্তবাহ্যির রাসায়ণিক পরীক্ষা করার কথা বলিয়াছিলেন কি না আমি তাহা জানি না। ডাঃ ক্যালভাট ও নিবারণ ডাক্তার ২।৩ জন নার্স নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা কুমারকে ঔষধ খাইতে দিয়াছিল। কুমারের যেদিন মৃত্যু হয় সেদিন সকাল ৮টা হইতে রক্তবাহ্যি আরম্ভ হয়। দশ বার বার তাঁহার এইরূপ বাহ্যি হয়। রক্ত তাঁহার পড়িয়াছিল, তবে আমি আন্দাজে বলিতে পারি না যে, কি পরিমাণ রক্ত পড়িয়াছিল। রক্তের রং লাল ছিল।"

১৯২২ সালের ২৭শে জানুয়ারী মানহানির মামলায় মিঃ এস, পি ঘোষের সমকক্ষ আশু ডাক্তার এই উক্তি করেন।

... ...

আশু ডাক্তার, যিনি ৭ই তারিখ আর্সেনিক ব্যবস্থা করেন; কিন্তু ইহা অস্বীকার করতঃ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে চেষ্টা করেন—তিনি নেহাৎ অনিচ্ছার

সহিত জেরায় স্বীকার করেন যে, ৭ই তারিখ রাত্রিতে আর্সেনিক দেওয়া হইয়াছিল। পিত্তশূলের কাহিনীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, শূল থাকাবস্থায় এই ঔষধ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই সত্য নহে। কারণ ঐ ঔষধের দ্বারা বেদনার কোন প্রকার উপশম হওয়া সম্ভব নহে বরং বেশী পরিমাণে উহা দিলে বেদনার সৃষ্টি হইতে পারে। এই ঔষধ দেওয়াটা অত্যন্ত সন্দেহের কথা। কিন্তু যেখানে হাতুড়ে ডাক্তারের মত ঔষধ দেওয়ার সামান্য সম্ভাবনাও রহিয়াছে এবং তাহার ফল দেখিয়া তিনি ভয় পান, সেইক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ঐ ঔষধ দিয়াছিলেন এই সিদ্ধান্ত আমি করিতে পারিতেছি না।

বর্ত্তমানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, দ্বিতীয় কুমারের মধ্যরাত্রিতে মৃত্যু হইয়াছিল কি না, অথবা সন্ধ্যার কিছু পর মৃত্যু হয়। এই বিষয়টি এই মামলার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। কারণ কুমারের যদি মধ্য রাত্রিতে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সৎকারেব জন্য তাঁহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া লইয়া যাইবার কাহিনী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এই সম্পর্কে ডাঃ ক্যালভার্টের এফিডেভিট রহিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কুমারের রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময় মৃত্যু হয় এবং তিনি মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় রাণী বলিয়াছেন যে, বেলা দুই ঘটিকার সময় যখন ডাঃ ক্যালভার্ট আসেন, তখন হইতে রক্তদাস্ত হইতেছিল। তিনি কুমারের মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বদার জন্য তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন।

এমন কি, পরদিন প্রাতঃকালে শব লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যান নাই। এই দিনের ঘটনা সম্পর্কে যে সব সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বিতীয় রাণীকেই সমর্থন করিয়াছেন।

রাণী ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট অপরাহ্ণ ২টা হইতে মৃত্যুর কিছু পরেও তথায় ছিলেন। শুধু রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কিছুকালের জন্য আহার করিতে গিয়াছিলেন। ডাঃ ক্যালভার্ট এত সময় পর্য্যন্ত ছিলেন অথচ কিছুই করিতেছিলেন না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ সন্ধ্যার পরের কোন ব্যবস্থা-পত্র নাই। অবশ্য বলা হইয়াছে যে, তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন, কুমার যে ঘরে মরিতেছিলেন সেই ঘরে ছিলেন না। আর একটী কথা দ্বিতীয় রাণী বলিয়াছেন এবং সাক্ষিগণও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কুমারের মৃত্যু হইবে ইহা কেহ ভাবিতে পারেন নাই।

কর্ণেল ক্যালভার্টের সাক্ষ্য

কর্ণেল ক্যালভার্ট তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন,—

"আমার যতদূর স্মরণে আছে তাহাতে বলিতে পারি যে, মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।" ইহার পর ১৯০৯ সালের ৭ই জুলাই তারিখে তাঁহার কৃত মৃত্যুর এফিডেফিট তাঁহাকে দেখান হইলে তিনি বলেন,—

প্রশ্ন—জীবনবায়ু বহির্গত হইয়াছিল বলিয়া কি আপনি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন ?

উত্তর—হাঁ, নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলাম।

জেরায় সাক্ষী বলেন, "সার্টিফিকেট না দেখিয়াই আমি বলিতে পারি যে, মধ্য রাত্রে কুমারের মৃত্যু হইয়াছিল।" সাক্ষী এই সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখেন নাই এবং জোর করিয়াই বলেন যে, চিকিৎসক হিসাবে তিনি একজন পরামর্শদাতা ছিলেন; কিন্তু ২২ বৎসর পরেও তাঁহার এই সব কথা মনে থাকিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "কুমারের মৃত্যুতে আমার প্রাণে খুব লাগিয়াছিল, কারণ আমার মনে হইল যে, মৃত্যুটা যেন খামাকাই হইল। যেভাবে চিকিৎসা করার কথা বলা হইয়াছিল, তাহাতে যদি সে রাজি হইত, তবে হয়ত এই যৌবনেই তাহার মৃত্যু হইত না। জুলাই মাসে সাক্ষী যে এফিডেভিট করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত সাক্ষীর স্বতন্ত্রভাবে কিছু মনে আছে কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, সাক্ষ্য দেওয়ার আগে তাঁহাকে কতকগুলি দলিলপত্র দেখান হইয়াছিল। তিনি যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন তাহা এবং মৃত্যু সম্বন্ধে যে এফিডেভিট দেওয়া হইয়াছিল তাহা দেখান হয়। মৃত্যুর সময় স্মরণ করিবার জন্য এফিডেফিট তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দুর্বোধ্য ভাবে লেখা "রোগীর অবস্থার বিবরণ" এবং ১৯২১ সালে সাক্ষী মিঃ লিণ্ডসেকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন সেই চিঠিখানাও সাক্ষীকে দেখান হয়। মৃত্যুসম্পর্কিত এফিডেভিটে দেখা যায় যে, কুমার ১৪ দিন অসুস্থ ছিলেন এবং রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ১৪ দিন অসুখের কথা যে মিথ্যা একথা

সকল দিক হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ ক্যালভার্ট এখানে ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, কখনও বেদনা থাকিত আবার কখনও থাকিত না ; দিনের পর দিন আসিয়া তাহাকে রোগীর অবস্থা দেখিতে হইত এবং অসুখের সময় কুমার ইনজেকশন লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৪ দিন অসুখে ভুগিবার কথা যেমন সত্য বলিয়া দেখা গেল ; রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে মৃত্যুর কথাও সেই রকমই সত্য কি না দেখা যাউক।

১৯২১ সালে ৩রা আগষ্ট যখন কুমারের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত হইতে থাকে এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট যখন ছাপান চিঠির আকারে প্রশ্নাবলী পাঠান হইতেছিল, তখন ডাঃ ক্যালভার্ট মিঃ লিণ্ডসের নিকট নিম্নের চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন ঃ—

জেড (১২৭)

গোপনীয়

টেম্পল কুম্ব

১০৩, উইলিংডন রোড

ঈসথোর্ণ

৩রা আগষ্ট, ১৯২১।

প্রিয় মহাশয়,

১৯২১ সালের মে মাসে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার যে দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়াছিলেন সে কথা আমার স্মরণে আছে। তিনি 'গলষ্টোন্স' রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, তিনি যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তবে হয়তো তাঁহার মৃত্যু

হইত না। মৃত্যুর দিন তাঁহার কঠিন পিত্তশুল হইয়াছিল। মরফিয়া ইনজেক্‌শন করিলে অনতিবিলম্বেই তাহার পিত্তশুল প্রশমিত হইত; কিন্তু তিনি এই বলিয়া ইনজেকশন লইতে অস্বীকার করিলেন যে, হাইপোডারমিক ইনজেকশন লইবার পরেই নাকি তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। রোগের জন্য যে সে ইনজেকশন দেওয়া দবকার হইয়াছিল সে কথা তিনি না বুঝিয়া বলেন যে, ইন্‌জেকশন দেওয়ার দরুনই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। বমনের জন্য আফিং এবং রেকটাম তাঁহার পেটে রাখা সম্ভব হইতেছিল না। তীব্র বেদনার কোনরূপ উপশম না হওয়ায় রোগী অসাড় হইয়া পড়েত এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম কিনা তাহা আমি এখন একেবারে ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু মৃত্যুর মাত্র কিছু পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে নিতান্ত অসাড় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। আমি শেষবার যখন গেলাম, তখন বাঙ্গালী ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তৎকালীন বাঙ্গলার আই জি সি এইচ স্বর্গীয় কর্ণেল মেক্কাস, আই এম এসকে পরদিন সকালে দেখাইবার জন্য আয়োজন করা হইতেছিল। কর্ণেল মেক্কাস ঢাকার সিভিল সার্জ্জন ছিলেন এবং তিনি ভাওয়াল রাজপরিবারকে জানিতেন। কুমারের অসাড় অবস্থা কাটিল না এবং সেই রাত্রেই তিনি মারা গেলেন।

ভবদীয়—

"জে টি ক্যালভার্ট"

ডাঃ ক্যালভার্ট যে চিঠির উত্তরে ইহা লিখিয়াছিলেন, সেই

চিঠিতে তাঁহাকে কি সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। মৃত্যুর সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন কি না ১৯২১ সালে দেখা যায়. কর্ণেল ক্যালভার্টের সে কথা স্মরণে নাই। এফিডেভিট দেখিয়া হয়ত তাঁহার সে কথা স্মরণ হইতে পারে; কারণ এই চিঠি প্রকাশিত হইবার পর তিনি উহা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার স্মরণে আছে বলিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য নয়।

আমি ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছি যে ১৪ দিন অসুখে ভুগিবার কথা এবং দিনের পর দিন গিয়া তাহার রোগীকে দেখিবার কথা যেমন সত্য এতদসম্পর্কিত স্মৃতিশক্তির কথাও তাঁহার তেমনই সত্য। এফিডেভিট সম্বন্ধে তাঁহাকে যে দুইটি কথা বলিতে হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে স্মৃতি হইতে বলিতে হইয়াছে। উহার মধ্যে একটী নির্জ্জলা মিথ্যা; অপরটিও সেইরূপই অবিসংবাদিত তথ্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় কুমারের তথাকথিত মৃত্যু রাত্রি ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে হইয়াছিল।

আই, এম, এস ডাক্তার ক্যালভার্ট বৈকালে ২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত (অবশ্য রাত্রির আহারের জন্য স্বল্প সময় বাদে) সমস্ত সময়ই এই বাড়ীতে বসিয়াছিলেন,—এই সম্পর্কিত প্রমাণের একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না। এই কাহিনাটি গড়িয়া তুলিবার পূর্ব্বেই জগৎমোহিনীর সাক্ষ্য দ্বারা ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছিল, তাহার একটি পরিষ্কার চিত্রই তিনি তাঁহার জবান-

বন্দীতে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বসিয়া বসিয়া ঔষধের চুর্ণ মালিশ করিতেছিলেন। তিনি এবং অপর নার্স মঙ্গলী এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময় ডাঃ ক্যালভার্ট চলিয়া গেলেন। কক্ষটি সম্পূর্ণ নীরব ছিল। তিনি কুমারকে একটু ডালিমের রস পান করিতে দিলেন। অকস্মাৎ কুমারের অবস্থা মন্দ হইয়া উঠিল। রাণী চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাঃ ক্যালভার্টের জন্য লোক পাঠান হইল। তিনি আসিলেন এবং রাত্রি ১০টা কিম্বা ১১টার সময় একটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। (সন্ধ্যার পর হইতে আর কোন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয় নাই।) কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্র দেখাইয়া ঔষধ লইয়া আসিবার পূর্ব্বেই কুমারের গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হইল এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জগৎমোহিনী অবশ্য ডাঃ বি বি সরকারের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে রাণী সমস্ত রাত্রিই সেই ঘরে ছিলেন। রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত শোকবিহ্বলা রাণী বারবার কুমারের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিতেছিলেন এবং জগৎমোহিনীও রাণীকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতেছিলেন। সত্যবাবুর সম্পর্কিত ভ্রাতা শ্যামাপদ রাত্রি ৭টার সময় আসিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ছিল; তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, সেই রাত্রিতে গুরুতর কিছু ঘটিবে না। শ্যামাপদ আবার শেষ রাত্রি ৩টায় আসিল; কিন্তু ঘরের মধ্যে নার্সদিগকে দেখিল না; উপরের তলায় আর কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। রাণীর মূর্চ্ছা হইতেছিল, এই তথ্য দ্বারা কিন্তু সমস্ত কাহিনীই বাতিল হইয়া গেল; তবে রাণী ইহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক, অল্প বয়স্ক খানসামা বিপিন এবং তাঁহার ভ্রাতা ছাড়া আর কাহারও সম্মুখে তিনি বাহির হইতেন না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীপুরের মামলায় বীরেন্দ্র এইরূপ কথাই বলিয়াছিল এবং বর্ত্তমান মামলায়ও সে

ইহাই স্বীকার করিয়াছে। তবে ৭ই এবং ৮ই মে তারিখে রাণীর সহিত তাহার নিজের সাক্ষাতের কথা বাদ রাখিয়াছে। বীরেন্দ্র ইহাও বলিয়াছে যে, কুমার যে ঘরে ছিলেন, রাত্রি ৯টার সময় রাণী সে ঘরে আসিলেন। তবে এখন সে এই কথাটি অস্বীকার করিতেছে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে, ডাঃ বি বি সরকারের আগমনের সময় রাণী সেই ঘরে ছিলেন না; তিনি তখন ৩য় কক্ষটিতে ক্রন্দন করিতেছিলেন; রাম সিং সুভা, তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছিলেন।

রাম সিংহের উক্তির সত্যতা শুধু তাহার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না; যে সময়ে কুমারের তথাকথিত মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমি উল্লেখ করিয়াছি তাহা দ্বারাও উহা সমর্থিত। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর কথাও মনে রাখিতে হইবে, যে বলিয়াছিল যে, দার্জ্জিলিংএ ফিরিয়া আসিয়া সে কাঁদিয়া ছিল এবং বলিয়াছিল যে, এমন কি তাহাকে ভালভাবে দেখিতেও দেওয়া হয় নাই। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের উক্তি অনুসারে দেখা যায় যে, রাত্রি ৯টার সময় সব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। এবং বীরেন বাবুর পূর্ব্বজবানবন্দী অনুসারে দেখা যায় যে, রাত্রি ৯টার পর রাণী ঐ ঘরে ছিলেন; ইহার পূর্ব্বে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে ছিলেন। বীরেনবাবু এখন তাহা অস্বীকার করেন, কিন্তু আশু ডাক্তার এখনও পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর সময় পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের বহু লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা বাহিরের লোক। যদি এই সব লোক ঐ ঘরে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে রাণী নিশ্চয়ই ঐ ঘরে ছিলেন না। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অনেক লোক মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল, কিন্তু বাহিরের একজন লোককেও ডাকা হয় নাই। বর্ত্তমান মামলায় বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের উক্তি অনুসারে একমাত্র

ডাক্তার ও নার্স ভিন্ন আর একজন লোকও উপস্থিত ছিল না।

সুতরাং যদি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় কুমারের যদি রাত্রি ৭টা হইতে ৮টার মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সারা রাত্রির মধ্যে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় নাই, ইহা প্রায় কল্পনার অতীত। এমন কি দুপুর রাত্রিতে মৃত্যু এবং ভোর বেলায় তাহার সৎকার, ইহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, দার্জ্জিলিংএর মত স্থানে দুপুর রাত্রিতে লোকজন পাওয়া যায় না। মরা বাসি করা হয় না এইরূপ কুসংস্কার রহিয়াছে। অবশ্য মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি অথবা সি আর দাসের শবের তৎক্ষণাৎ সৎকার করা হয় নাই। তাহাদের শব মিছিল করিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই যে ব্যতিক্রম ইহা আধুনিক ব্যাপার এবং ইহাদের কথা আলাদা। কিন্তু এমন কোন সওয়াল করা হয় নাই যে, যদি সন্ধ্যার কিছুপর মৃত্যু হয় তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি শব পড়িয়া থাকিতে পারে কিনা। শব বহনের জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাত্রি ৭টা ৮টার মধ্যে চারিদিকে লোক গিয়াছিল। সুতরাং রাত্রি ৯টার সময় যে শব শ্মশানঘাটে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই।

ঐ শব কখনও দাহ করা হয় নাই

সাক্ষীদের উক্তির সত্যাসত্যের একমাত্র পরখ কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর সময়। কিন্তু যে সাক্ষী রাত্রিতে শব শোভা-যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং যে সাক্ষী ভোরে শব-শোভাযাত্রা যাইতে দেখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বের সাক্ষী যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য, পরের সাক্ষীদের পদ প্রতিপন্ন হইতে

তাহাদিগকেও অনুরূপ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইবে। পূর্ব্বের সাক্ষী বাবু পদ্মিনীমোহোন নিয়োগী। এই ভদ্রলোকটীর বয়স ৫৫ বৎসর। তিনি কোন এষ্টেটের ম্যানেজার এবং ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি জিলা বোর্ড ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মনোনীত সদস্য। ১৯০৯ সালে তিনি বেঙ্গলী নামক সংবাদপত্রের সহ সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্যানিটোরিয়ামে থাকিয়া বিশ্রাম ভোগ করিতে-ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"আমি লুইস জুবিলী স্যানিটরিয়ামে বাস করিতেছিলাম। একদিন সন্ধ্যাকালে একজন লোক আসিয়া বলে যে, ভাওয়ালের কুমারের মৃত্যু হইয়াছে। সে তাহার শব সৎকারের জন্য লোক চাহে। আমার সঙ্গে ৭।৮ জন লোক ছিল। আমাদিগকে ষ্টেপ এসাইডে যাইতে বলিয়া লোকটা চলিয়া যায়। ষ্টেপ এসাইডে কুমার ছিলেন। যে ৭।৮ জন লোক আমার সঙ্গে যায় তাহারা আমার মুখ-চেনা, দার্জ্জিলিংয়েই আমি তাহাদিগকে চিনি।"

"ষ্টেপএসাইডে যাইতে আমাদের প্রকৃতপক্ষে আধা ঘণ্টা লাগিয়াছিল। তথায় যাইয়া দেখি নীচের তলায় একটী খাটিয়ায় শব ঢাকা আছে। শব ঘরের ভিতর ছিল কি বাইরে ছিল তাহা আমার স্মরণ নাই। আমরা তথায় পৌছিবামাত্র শব কাগঝোড়ায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় শব পৌছাইয়া দিয়া আমরা—যাহারা স্যানিটরিয়াম হইতে গিয়াছিলাম—আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ দেখিয়া চলিয়া আসি।"

সাক্ষী ষ্টেপ এসাইডের কাহাকেও চিনিতেন না। তিনি বলিয়াছেন যে, স্যানিটোরিয়ামে ফিরিতে তাঁহাদের ১৫।২০ মিনিট অথবা আধা ঘণ্টা অর্থাৎ ৯-৩০ কি ১০টা হইয়াছিল। ইহার কিছু পরেই বৃষ্টি হয়।

মিঃ লিণ্ডসের তদন্তের সময় ১৯২১ সালের ৭ই জুন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর সি দত্ত এই সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি মানহানির মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে আমি কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার আচরণ দ্বারা আমার মনে এই ধারণাই হইয়াছে যে তিনি একজন সত্যবাদী লোক। কোন মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী যাহা স্বীকার করিত না তিনি তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদীপক্ষের লোকও তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন. তাহারা তাহা লিখিয়া লইয়াছেন। মিঃ আর সি দত্ত যখন এই সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন ইহা সেই সময়ের কথা। কিন্তু উহা তাহার জবানবন্দী গৃহীত হইবার পূর্ব্বে কি পরে তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। অপর যে সব সাক্ষী বলিয়াছেন যে, তাহারা রাত্রিতে শবযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্মশানে গিয়াছিলেন তাহাদের নাম :—

বাদী পক্ষের ৯৪১ নং সাক্ষী কিরণ মুস্তাফী, বয়স ৬০ বৎসর, কোন চা-বাগানের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার এবং দার্জ্জিলিংএর বাসিন্দা ১৯০৯ সালে ব্লুমফিল্ড চা-বাগানের নীচে ম্যানেজারের কোয়াটারে বাস করিতেছিলেন। বাদী পক্ষের ৯৪৪ নং সাক্ষী বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি, বয়স ৫৮, একজন পেনসন ভোগী ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনারের অফিসে কাজ করিতেন। ইহার পর ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত কার্সিয়াংএ ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে কেরাণী ছিলেন।

বাদীপক্ষের সাক্ষী যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বয়স ৫৩ বৎসর। ১৯০৪ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি দার্জ্জিলিংএ তাহার দুই ভাইর সহিত তাহার ভগ্নীপতি রাজকুমার কুশারীর বাড়ীতে বাস করিয়াছেন।

বাদীপক্ষের সাক্ষী মন্মথনাথ চৌধুরী দার্জ্জিলিং মোটর সার্ভিসের মালিক; তিনি ১৭ খানা মোটর খাটাইয়া থাকেন; দার্জ্জিলিংএ তিন খানি বাড়ী আছে এবং তিনি দার্জ্জিলিংয়েই থাকেন।

বাদীপক্ষের ৯৮৮ নং সাক্ষী চন্দ্র সিং। ডেপুটী কমিশনার অফিসের অবসরপ্রাপ্ত রেকর্ড কিপার। দার্জ্জিলিংয়েই জন্ম এবং দার্জ্জিলিংয়েই লালিত পালিত ও দার্জ্জিলিংয়েই শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৯০৩ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত কালিম্পং খাসমহলে নিযুক্ত ছিলেন। খাজনা দিতে দার্জ্জিলিংএ আসিতেন এবং দার্জ্জিলিংএ আসিয়া খাসমহলের রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ করিতেন। কমিশন সাক্ষী সাতাংশুকুমার বাগচী ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং পোষ্ট অফিসের কেরাণী ছিলেন। তিনি যখন সাক্ষ্য দেন তখনও তিনি চাকরীতে ছিলেন।

এসব সাক্ষী যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই যে, তাহারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, কুমারের সন্ধ্যার পর মৃত্যু হইয়াছে। সাহায্যের দরকার হওয়ায় তাঁহারা শব বহন করিতে যান। ২৫জন লোকের এক শোভাযাত্রার সঙ্গে তাহারা ষ্টেপ এসাইড হইতে রওনা হন। ইহাদের মধ্যে কিরণ ও মন্মথ চৌরাস্তায় আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং রাত্র ১০টার সময় শ্মশানে পৌঁছেন। রাত্রি ৯টার সময় শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। কিরণ ও মন্মথ শ্মশানে শব রাখিয়া চলিয়া আসে। খাট নামাইবার কয়েক মিনিট পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। এবং তথায় কোন প্রকার আশ্রয় না থাকায় পাহাড়ের রাস্তার দিকে দৌড়াইতে থাকেন এবং এক কসাইখানায় যাইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা চুল্লীর স্থান ঠিক করিতে থাকেন। এই সময় তাহাদের লক্ষ্য হয় যে, খাটের উপর শব নাই। ইহাতে হৈ চৈ আরম্ভ হয় এবং লণ্ঠন লইয়া

চারিদিকে শব খোঁজা হয়। কিন্তু শব পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসেন। শোভাযাত্রার রুট সম্পর্কে সকল সাক্ষীই বলিয়াছেন যে, কমার্শিয়াল রো-ই একমাত্র রুট।

শ্মশানবন্ধুদের সাক্ষ্যের সমালোচনা

যতই সঙ্গতিপূর্ণ হউক না কেন, এই বিবরণ কাহিনী বলিয়াই মনে হইবে। সন্ধ্যায় কুমারের মৃত্যু এবং সেই রাত্রেই শব লইয়া শ্মশানে গমন—এই ঘটনাই হইল ইহার নিবাপত্তার একমাত্র ভিত্তি। সন্ধ্যায় কুমারের মৃত্যু হইয়াছিল। এই ঘটনার সত্যতার উপর এবং উহার সমর্থক পদ্মিনীবাবুর সাক্ষ্যের উপর শেষোক্ত ঘটনা যে নির্ভর করিতেছে। পদ্মিনীবাবুর সাক্ষ্য ছাড়াও এ বিষয় অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য রহিয়াছে। রাত্রে যাঁহারা শব শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলেন, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে যে দোকান হইতে অন্ত্যেষ্টির জিনিষপত্র কেনা হইয়াছিল, সেই দোকানের কর্ম্মচারী এবং যে দোকান হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ খরিদ করা হয়, সেই দোকানের দোকানি—এই সকলের সাক্ষ্যও পূর্ব্বোক্ত ঘটনাসমূহ সমর্থন করে। তাহা ছাড়া একজন মহিলাও পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। সেই মহিলার (বাদীর ১০১৬ নং সাক্ষী সুশীলা সুন্দরী) ভ্রাতা বসন্ত এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সেই রাত্রে কুমারের মৃতদেহ সৎকার করিতে শ্মশানে গিয়াছিলেন। উক্ত সাক্ষী বলিয়াছেন—"তাঁহার ভ্রাতারা সেই রাত্রে শ্মশানে গিয়াছিল এবং জলে ভিজিয়া বাড়ীতে আসিয়াছিল।"

দার্জ্জিলিংএর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসের হেডক্লার্ক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক আর একজন সাক্ষী অনুকুল চট্টোপাধ্যায়কে সেই দিন সন্ধ্যার পর জলে ভিজিয়া বাড়ী

ফিরিতে দেখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ভূটিয়া বস্তী ভিলা হইতে সূর্য্যবাবু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। (বাদীর ৮৩৮নং সাক্ষী)

সাক্ষীদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই দিন রাত্রে শব-শোভাযাত্রা প্রত্যেক্ষ করিয়াছিলেন, খাঁ সাহেব নাসিরুদ্দীন আমেদ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক এবং যোত্রবান, আমি তাঁহাদের সাক্ষ্যের বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না। সন্ধ্যায় কুমারের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সত্য না হইলে, সে সকল সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যদি সন্ধ্যাকালে কুমারের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। (বাদীর ৯৪০, ৯৬৩, ৯৬৬, ৯৭৮, ৯৮০ ও ৯৮৩নং সাক্ষী।)

'টাউন এণ্ড' নামক বাড়ীর মালিক মিঃ গিরিশ ঘোষ, তাঁহার পুত্র ফণীন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, রাত্রি ১১টা কি ১ টার সময় পুত্র শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিয়াছিল। ফণীন্দ্র তাঁহাকে কহিয়াছিল যে, কুমারের মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে. ১৯২১ সালে একবার এই ফণীন্দ্রের জবানবন্দী গ্রহণের চেষ্টা হইয়াছিল (একজিবিট ৪৫১)। যাঁহারা শব শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে সময় যতদূর সম্ভব তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা হয় এবং দেখা যায় যে, তাঁহারা সংখ্যায় ১৬ জন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে সঞ্জীব লাহিড়ী, অনুকূল চট্টোপাধ্যায় এবং ফকির রায় প্রভৃতি অন্যতম।

ফকির রায়ের সাক্ষ্য

অনুকূল চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিবাদীগণের বক্তব্য এই যে,

তিনি প্রাতঃকালে শব শোভাযাত্রার সহিত শ্মশানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ফকির রায় সাক্ষ্য দিয়াছেন, ফকির সাক্ষ্যে বলিয়াছেন,—তিনি রাত্রিকালের কোনও শোভাযাত্রা দেখেন নাই বা তাহাতে যোগ দেন নাই। তিনি প্রাতঃকালে শবের শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে যোগ দেন নাই। তিনি বলেন,—ইহার পূর্ব্বে অথবা পরে, অনুকূল চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব দিন রাত্রে তিনি (অনুকূলবাবু) কুমারকে দাহ করিতে গিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য তাঁহার শরীর বেদনা হইয়াছিল। পরক্ষণে সাক্ষী বলেন,—"আমি যে দিন শব শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব দিন রাত্রে ঝড় ও বৃষ্টী হইয়াছিল। সে কালবৈশাখীর মত ঝড়বৃষ্টী—সন্ধ্যা হইতে রাত্রি আন্দাজ ৯টা পর্য্যন্ত সে ঝড়বৃষ্টী ছিল" তাঁহার এই উক্তির মধ্যে কোনও গোল নাই। কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন কালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়।—

প্রঃ অনুকূলের আপনার কখন কথা হইয়াছিল?

উঃ—সন্ধ্যার পর।

প্র—অনুকূল কখন শ্মশান হইতে ফিরিয়াছিল, তাহা কি আপনাকে বলিয়াছিল?

উ—স্মরণ নাই।

প্র—সে যে শ্মশানে গিয়াছিল, তাহা কি সে আপনাকে বলিয়াছিল?

উ—হ্যাঁ।

প্র—কখন এবং কোথা হইতে তাহাও কি আপনাকে বলিয়াছিল? উ—ষ্টেপএসাইড হইতে। কত রাত্রে সে গিয়াছিল, সে বলিয়া থাকিলেও আমার স্মরণ নাই। প্র—সে কখন ষ্টেপএসাইডে গিয়াছিল, তাহা কি সে আপনাকে বলিয়াছিল? উ—রাত্রে। প্র—কত রাত্রে, অনুমান করিয়া

বলিতে পারেন কি? উ—আমার অনুমান কি তাহার অনুমান? প্র—আপনি অনুকূলবাবুর কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন। উ—তা থেকে বুঝা যায়—রাত্রি ১০টা কি ১২টার সময় শোভাযাত্রার সহিত কে কে গিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই।

প্র—অনুকুল কি বলিয়াছিল যে, সে মৃতের সংকার করিয়াছে?

উ—অনুকুল বলিয়াছিল যে, সে মৃতদেহ সংকারের জন্য গিয়াছিল। কিন্তু মৃতদেহের সংকার সে করিয়াছিল কিনা, তাহা বলে নাই।

প্র—ঝড়বৃষ্টির দরুণ তাহারা শবদেহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল, অনুকুল কি তাহা আপনাকে বলিয়াছিল? উ—না। প্র—সে কি বলিয়াছিল, তাহারা শবের সংকার করিতে পারে নাই? উ—না। প্র—শবযাত্রার সহিত কখন তাহারা যাত্রা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে অনুকুল কি বলিয়াছিল, তাহা কি আপনার মনে নাই?

... ...

প্র—জেরার উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি কখন তাহা আরম্ভ হয়? উ—মার্চ্চ মাসের শেষ হইতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত। প্র—যখন কালবৈশাখী হয় দার্জ্জিলিংএর সর্ব্বত্রই কি তাহা হইয়া থাকে? উ—হাঁ। প্র—আপনি বলিয়াছেন, পূর্ব্ব রাত্রে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। আপনি এতদিন পরেও স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন শব-শোভাযাত্রার দিনের পূর্ব্ব দিন সেই ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল কি না? উ—আমার স্মরণ নাই। প্র—আপনি কি বলেন নাই যে, পূর্ব্ব রাত্রে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল এবং সে ঝড়বৃষ্টি কাল বৈশাখীর মত? উ—হাঁ।

পুনর্ব্বার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস

যোগ্য নহে। কমিশনারের সমক্ষে যে সাক্ষ্য লওয়া হয়, সাক্ষীকে ঝড়বৃষ্টির কথা, যে ঝড়বৃষ্টি তিনি দেখিয়াছেন—তাহার কথা, অস্বীকার করাইবার জন্যই যেন প্রশ্নগুলি করা হইয়াছিল। কোনও ঘটনা বিশেষের সহিত জড়িত না থাকিলে, কেহই অতীতের কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে বৃষ্টি হইয়াছিল কি না, তাহা বলিতে পারে না। এই সাক্ষীর ঝড়বৃষ্টির কথা মনে আছে; কেন না, উহা একটী বিশিষ্ট ঘটনায় অর্থাৎ অনুকুলের সহিত কথোপকথনের সঙ্গে জড়িত। কথোপকথনের সত্যতা যাহাই হউক না কেন, সেই কথাবার্ত্তায় খুঁটিনাটি বাহির করিয়া তাহার অন্তর্গত ঘটনার সত্যতাই সপ্রমাণ করিয়াছেন; অধিকন্তু তাহা হইতে যে বিষয়বস্তু উদ্ধার হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

... .

যে গৃহে সাক্ষীরা আশ্রয় লইয়াছিল, সেই গৃহ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে, মিঃ মরগিনষ্টিন উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে এবং মাঝখানে বাগানবাড়ীর মালিক ছিলেন। উহা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় ছিল। মাঝখানের স্থানটীর উত্তর অংশে বর্ত্তমান কসাইখানা তৈরী হইয়াছে। বিবাদীপক্ষের কাগজ-পত্রে দেখা যায়, ঐ গৃহ নির্ম্মাণের সময় হিন্দু শ্মশান কমিটীর মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল। মন্মথবাবুর সাক্ষ্যেও দেখা যায়, তিনি বর্ত্তমান কসাইখানার নিকটে একটি গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখনও কসাইখানা নির্ম্মিত হয় নাই। বেশ বুঝা যায়, সব্জিবাগানে মালিকদের জন্য অথবা চারাগাছ সৃষ্টির জন্য গৃহ ছিল, মিউনিসিপ্যালিটীর ম্যাপে যে সকল গৃহ দেখান হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ঐগুলি ছিল। সামসুদ্দিন ১৯০৬ সাল হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর কাজে নিযুক্ত ছিল, সে ঐ সকল স্থানে চালাঘর দেখিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, ঐ বাগানবাড়ী মিঃ মরগিনষ্টিনের নিকট লীজ দেওয়া হইয়া-

ছিল! মিউনিসিসিপ্যালিটীর ম্যাপে যে টিনের চালাঘর দেখান হইবে, ইহা আমি আশা করিতে পারি না। মিঃ মরগিনষ্টিন বলেন যে, একমাত্র কাঁচের ঘর ছাড়া তথায় আর কোন ঘর ছিল না, কিন্তু তিনি পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, মালী, চাকর, সহিস প্রভৃতির জন্য সুধীরকুমারী রোডের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে চালাঘর ছিল। বৃষ্টির সময় আশ্রয় হিসাবে সাক্ষীরা হয়ত ঐ ঘরগুলিকেই ব্যবহার করিয়াছিল। দুইজন সাক্ষী বলিয়াছে, তাহারা কসাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন চন্দ্র সিং তাহাকে কসাইখানার আয়তনাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে সে বলে, উহা ১৫ × ১২ ফিট, কিন্তু বর্ত্তমান কসাই-খানা উহা হইতে অনেক বড়। কোন্ কসাইখানার কথা তাহারা বলিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। ইহাও হইতে পারে যে, তাহারা যে ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান কসাইখানাকে গোলমাল করিয়া ফেলিতেছে।

তারপর বৃষ্টীর কথাই ধরা যাউক, যাহারা ঐ দিন সম্পর্কে বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা বলে, ঐ দিন ১০টার সময় বৃষ্টী হইয়াছিল এবং বৃষ্টী ও বাতাস প্রায় একঘণ্টা কাল ছিল। তাহারা শবানুগমন সম্পর্কে উহা বলে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শব শোভাযাত্রা চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। যাহারা শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহারা বলে, শ্মশানে অথবা খাট রাখিয়া ফিরিবার পথে তাহাদিগকে ঝড়বৃষ্টীতে পড়িতে হয়। পদ্মিনীবাবু বলেন, স্যানিটারিয়ামে ফিরিবার পর ঝড়বৃষ্টী আসে। স্যানি-টারিয়াম শ্মশান হইতে বেশী দূরে নয়। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ফকির উহা সমর্থন করিয়া বলে, তখন কালবৈশাখীর মত ঝড় হইতেছিল। উহা কালবৈশাখীর দিনই ছিল—বর্ষার দিন ছিল না। বিবাদীপক্ষের একমাত্র বক্তব্য এই যে, আবহাওয়ার রিপোর্টে ঐ দিন বৃষ্টীর কথা উল্লেখ ছিল না। দার্জ্জিলিংয়ে

ঐ সময় সেণ্টজোসেফ কলেজ, সেণ্টপল কলেজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চা করদের ক্লাব এবং মিউনিসিপ্যাল অফিসে বৃষ্টী পরিমাপ যন্ত্র ছিল। মিঃ চৌধুরী অবজারভেটরী হিলের উল্লেখ করেন। গবর্ণমেণ্ট সেণ্টপলের রেকর্ডই গেজেটে প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাতে দেখা যায় ৪ঠা মে সকাল ৮টা হইতে ১২ই মে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত বৃষ্টী হয় নাই। মিঃ লিণ্ডসে উহা দেখিয়াই মনে করেন যে, বাদীর কথা মিথ্যা। চা করদের ক্লাবের রেকর্ড কোন পক্ষই উপস্থিত করেন নাই। মন্মথবাবু বলেন, কয়েকবৎসর পরে দুই ভদ্রলোক ক্লাবে আসেন এবং ১৯০৯ সালের রেকর্ড বুকখানা লইয়া যান। তখন তিনি প্ল্যাণ্টাস ক্লাবের হেড ক্লার্ক ছিলেন, এই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ডাঃ ক্যালভার্ট ও অন্যান্য সাক্ষিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, দার্জ্জিলিংএ একই সময় একস্থানে বৃষ্টী হয়, অন্য স্থানে বৃষ্টী হয় না, আবার পাহাড়ের উপর বৃষ্টী হয় নিম্নে বৃষ্টী হয় না, সমতল ভূমিতেও এই প্রকার হইতে পারে।

মামলার মাঝামাঝি সময় বাদী ১৯০৯ সালের দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটীর বারিপাতের রেজিষ্টার দাখিল করেন। বিবাদীপক্ষও বোটানিক্যাল গার্ডেনের রেজিষ্টার দাখিল করেন। বাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে' উক্ত দিবস কার্ট রোড এবং উহার একটু উপরে বারিপাত হইয়াছিল। কিন্তু কোন সাক্ষীই ম্যাকাঞ্জী রোড কমার্শিয়াল রো এবং চৌরাস্তাতে বৃষ্টী হইয়াছে বলেন নাই। ইহার অর্থ এই যে, প্লাণ্টাস ক্লাবে কোন বৃষ্টী হয় নাই কিন্তু মিউনিসিপ্যাল অফিস, বাজার, বোটানিক্যাল গার্ডেনে বৃষ্টী হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাদী যে ৩।৫।০৯ তারিখের বারিপাত সম্পর্কিত রেজিষ্টার উপস্থিত করিয়াছিলেন উহাতে

কিছু অদলবদল আছে। ১৩ই তারিখকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। বাদীপক্ষ বলিয়াছেন ৮তারিখকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন, উহা ১৩ই হইবে। বিবাদীপক্ষ সকল সময়ই বারিপাতের রেজিষ্টারকে খুব আবশ্যকীয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু কেন যে তাঁহারা ১৯৩৪ সালের নবেম্বর মাসে উহার নকলের জন্য আবেদন করিয়াছেন তাহার কারণ বুঝা যায় না। যখন তারিখ অদল-বদল করা হয় এবং ডেপুটী কমিশনার ঐ সম্পর্কে তদন্ত করেন তখনই তাহারা উহার নকল চাহিয়াছিলেন। বাদীপক্ষও ১৯৩৫ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে উহার জন্য আবেদন করেন নাই। রেজিষ্টারে যে সময় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আমি বিশেষ-ভাবে দেখিয়াছি। প্রথমে কি লেখা হইয়াছিল তাহা এখন বলা সম্ভব নহে। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও পারিতেছি না। কোন পক্ষই কোন একটা বিশেষ কারণে ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে তেমন কিছুই বলিতে পারে নাই।

আমি বোটানিক্যাল গার্ডেনের রেজিষ্টারও দেখিয়াছি। উহাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। উক্ত গার্ডেনের একজন কেরাণী উহা উপস্থিত করিয়াছে। ঐ লোকটী ২৩।৭।৩৫ তারিখে সাক্ষ্য দিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তদবধি উক্ত রেজিষ্টার রাখি-তেছে। সে বলিয়াছে সে ৬ই ডিসেম্বর হইতে বারিপাতের হিসাব রাখিতেছে। তাহার কোন কোন উক্তিতে অসামঞ্জস্য ছিল। তখন তাহার সার্ভিস বুক উপস্থিত করা হয়, উহাতে ১।৩।০৯ তারিখে সে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। ইহা হইতে পারে যে, সে ইতিপূর্ব্বে অস্থায়ী কাজ করিয়াছিল। আমি উক্ত রেজিষ্টারে দেখিলাম যে, একটা অংশে ১৯০৯ সালের বারিপাতের বিবরণ আছে। ১৯০৩ সালের খণ্ডে প্রথম পৃষ্ঠায় বারিপাতের তথ্য

আছে, তারপরের পৃষ্ঠায় তাপের বিবরণ আছে, উহার মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠায় বারিপাত এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তাপের বিবরণ লেখা হইয়াছে। কিন্তু ১৯০৯ সালের রেজিষ্টারে উহার উল্টা। উহাতে প্রথম পৃষ্ঠায় তাপের এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বারিপাতের বিবরণ আছে। বারিপাতের পৃষ্ঠায় যে শিরোনামা আছে উহার কালিও অন্যরকম এবং অল্প কিছুদিন আগের লেখা বলে মনে হয়। উহার নিম্নে ষ্ট্যাম্পে 'কিউরেটার' আছে কিন্তু কোন স্বাক্ষর নাই। অথচ ১৯১৫ সালের পৃষ্ঠায় তদানীন্তন কিউরেটার মিঃ কেভ এর স্বাক্ষর আছে, সাক্ষী ১৯২২ সালের সমুদয় বৎসরের বিবরণও দিয়াছে। কিন্তু তাহার সার্ভিস-বুকে দেখা যায় যে সে ঐ সালের ১৫।৮ তারিখ হইতে ৩১।৮ তারিখ ছুটিতে ছিল। অথচ উহাতে দেখা যায় যে, সমুদয় বৎসরের বিবরণ একই ব্যক্তিরই হাতের লেখা। এই লোকটী গার্ডেনের কেরাণী সত্য কিন্তু সে কোন রেজিষ্টার রাখিত না। অত্যল্পদিন পূর্ব্বের কালিতে লিখিত শিরোনামা এবং ১৯০৯ সালের বারিপাত ও তাপের পৃষ্ঠা উলটপালট দেখিয়া মনে হয় যে, উহা ঐ রকম ছিল না। আমি মনে করি মে মাসের বারিপাতের রেজিষ্টার অদলবদল করা হইয়াছে এবং উহা বিশ্বাস করা যায় না এবং ঐ তারিখ যে বৃষ্টী হয় নাই তাহার কোন প্রমাণ নাই।

... ...

যদি সন্ধ্যার সময়েই কুমারের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ৮ই মে রাত্রিকালে তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইয়াছিল। যদি সত্য সত্যই কুমারের মৃতদেহ সেই রাত্রিতে শ্মশানে নীত হইয়া থাকে তাহা হইলে ৮ই মে রাত্রির ঘটনাবলীর যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্মশান, অথবা আশ্রয়স্থল অথবা বৃষ্টী সম্পর্কিত তথ্যগুলির দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। রাত্রিতেই মৃতদেহ

শ্মশানে নীত হইয়াছিল, এ বিষয়ে যে সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ আছে, তাহার অসারতা এই সকল তথ্যের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না। অতএব আর একটি তথ্যের বিষয়ই বিবেচনা করিবার বাকী রহিল এবং তাহা হইতেছে এই যে, ৯ই তারিখ প্রাতঃকালে একটা শোকযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং একটা মৃতদেহ নূতন শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হইয়াছিল।

৯ই তারিখের শোকযাত্রা

এই বিষয় সম্বন্ধে কমিশনে মোট ১৩ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আদালতে ২২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কুমারের বাড়ীর লোক সত্যবাবু, ডাঃ আশু; বীরেন্দ্র এবং বিপিনও সাক্ষ্য দিয়াছে।

বাদী পক্ষ হইতে ৯জন সাক্ষী এই শোকযাত্রা সম্পর্কে বলিয়াছেন।

১৯০৯ সালের মে মাসে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দপ্তর দার্জ্জিলিংএ ছিল। সরকারী দপ্তরের কেরাণীদের মধ্যে কতকজন কাছারীবাড়ী নামক দালানে বাস করিতেন। এই দালানটি বাজারের সম্মুখে এবং কার্ট রোডের সমান উচুতে অবস্থিত। ইহা রেলওয়ে গুডসেড হইতে প্রায় ৩০০ গজ দূরে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই স্থান হইতে ফার্ণডেল রোডে নামিতে হয় এবং ফার্ণডেল রোড আঁকিয়া বাঁকিয়া শ্মশানে গিয়াছে। এই কাছারী বাড়ীতে সত্যবাবুর সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং উত্তরপাড়ার অধিবাসী শ্যামাদাস বাস করিত। ৯ই মে প্রাতঃকালে এই মেস হইতে কয়েকজন লোক মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেপএসাইডে আসে। বিবাদী পক্ষ কর্ত্তৃক আহূত কতিপয় সাক্ষী (ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলের সাক্ষ্যই কমিশনে গ্রহণ করা হইয়াছে)। উপরোক্ত লোকদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত।

অন্যান্য সাক্ষী অন্যান্য স্থান হইতেই আনীত, অন্ততঃ তাহারা এইরূপই বলিয়াছেন, একথা সত্য যে, অন্ততঃ কয়েকজন অপর স্থান হইতে আসিয়াছিল।

সত্যবাবু, নার্স জগৎমোহিনী এবং অপর কয়েকজন সাক্ষী কর্তৃক বর্ণিত কাহিনীটি এইরূপ ঃ—

মধ্য রাত্রিতে কুমারের মৃত্যু হয়। যে কক্ষে তাহার মৃত্যু হয় সেই কক্ষেই রাণী সারারাত্রি জাগিয়া কুমারের মৃতদেহ আঁকড়াইয়া ধরিতেছিলেন ; আর নার্স জগৎমোহিনী রাণীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ডাক্তারগণ "অদৃশ্য হইয়াছেন।" সত্যবাবু বলেন, তিনি একখানি চিরকুট অথবা কাগজ লিখিয়া তাঁহার বন্ধু মিঃ রাজেন্দ্র শেঠের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। মিঃ শেঠ স্যানিটোরিয়ামে ছিলেন। তাঁহাকে কুমারের মৃত্যুর কথা জানাইয়াছিলেন। সত্যবাবু আরও বলেন যে, তিনি কাছারী বাড়ীতে তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতা শ্যামাদাসের নিকটেও অনুরূপ একখানি চিরকুট পাঠাইয়াছিলেন। ঊষাকালে —৩টা অথবা ৪টার সময় কয়েকজন লোক আসে কিন্তু সকাল বেলায় বহু লোকের সমাগম হয়। প্রাতঃকালে কুমারের শবদেহ নীচে নামান হয় এবং সম্মুখের ক্ষুদ্র উঠানে এক খাটের উপর রাখা হয়। অতঃপর শবাধারের উপব কিছু ফুল দিয়া সাজাইয়া তাহা মিছিল সহকারে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। দুইজন গুর্খা প্রহরী বন্দুক উল্টাইয়া ধরিয়া অগ্রে পমন করে এবং পয়সা আধ পয়সা এবং পাই পয়সা ইত্যাদি রাস্তার উপর ছড়াইয়া দিতে দিতে মিছিল শ্মশানের দিকে অগ্রসর হয়। থর্ণ রোডের পথ ধরিয়া শ্মশানে যাওয়া হইয়াছিল,—কমার্শিয়াল রোডের দিকে যাওয়া হয় নাই। অতএব এই মিছিল হাঁসপাতাল অতিক্রম করিয়া গিয়া কার্ট রোডে পৌঁছে। তারপর বাজার ও কাছারী বাড়ী ছাড়াইয়া গিয়া রেলওয়ে গুডসেডেও উপনীত

হয়। তারপর আমি যে রাস্তার কথা বর্ণনা করিয়াছি, সেই পথেই শ্মশানে পৌঁছে। হাঁসপাতাল অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় মিছিলটি আরও নিম্নের দিকে "বলেন ভিলা" অতিক্রম করিয়া যায়। বলেন ভিলা হইতেছে দার্জ্জিলিংএর গবর্ণমেণ্ট প্লীডার মিঃ এম এন বাঁড়ুয্যের বাড়ী। এই বাড়ীর এক অংশে দ্বিতীয় রাণীর মাতুল সূর্য্যনারাণবাবু ভাড়াটিয়ারূপে বাস করিতেছিলেন।

শ্মশানে যাওয়ার পর যথারীতি অনুষ্ঠান পালনের পর শবদাহ করা হয়। ইহাই হইল বিবাদী পক্ষের বক্তব্য।

তারপর বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, মৃতদেহটি আদৌ কুমারের মৃতদেহ নহে; রাত্রিকালে ইহা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। দেখা গিয়াছিল যে, সম্পূর্ণ ঢাকা দিয়া এই দেহটিকে শ্মশানে লইয়া গিয়া কোনও অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই দাহ করা হইয়াছিল। ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা দেখা যাইতেছে। তবে বিবাদী পক্ষের বর্ণনার প্রকৃত উত্তর হইতেছে বাদীর চেহারার সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য ছাড়াও সন্ধ্যার একটু পরে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাও উত্তরস্বরূপে গণ্য হইতে পারে। কুমারের দেহ রাত্রি-কালেই বাহির করা হইয়াছিল এবং দেহটি কখনও দাহ করা হয় নাই। সে যাহাই হউক. প্রকৃতপক্ষে তথ্যগুলি ধরা পড়ে নাই, এরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই এই প্রসঙ্গ সংক্রান্ত প্রমাণগুলি বিচার করিতে হইবে।

সাক্ষীদিগের যাঁহারা শোভাযাত্রা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, এবং শোভাযাত্রা রওনা হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা মৃতদেহ দেখিয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগের কয়েক জনের নাম—

(১) কালীপদ মিত্র, বয়স ৪৫ বৎসর ইনি কলিকাতাবাসী; কমিশনে ইঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। (২) কানাইরাম মুখো-পাধ্যায়, বয়স ৪৪ বৎসর, হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীর বাসিন্দা।

(৩) নলিনী ঘোষ, বয়স ৪৬ বৎসর; ইনি কলিকাতাব বাসিন্দা। (৪) উত্তরপাড়ার শ্যামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৪৮ বৎসর। (৫) উত্তরপাড়ার মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৫২ বৎসর (৬) চব্বিশ পরগণা, জেলার মণিরামপুরের ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বয়স ৪৯ বৎসর। (৭) হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার উকীল তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। (৮) বালী নিবাসী রাজেন্দ্র শেঠ, বয়স ৫২ বৎসর। (৯) বালীর বিজয় মুখোপাধ্যায়, বয়স ৩৯ বৎসর। (১০) নার্স জগৎ-মোহিনী দেবী, বয়স ৫০ বৎসর। (১১) ব্যারিষ্টার মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জি, ৪১ বৎসর। (১২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হারাণচন্দ্র চাকলাদার, বয়স ৫৬ বৎসর। (১৩) গীতা দেবী। এই সকল সাক্ষীর মধ্যে প্রথমোক্ত ছয়জন সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী, তাঁহারা সকলেই আজ পর্য্যন্ত সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত। একমাত্র শ্যামদাস ডিসমিস হইয়াছেন; আমি তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কমিশনে এই তের জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত সাক্ষিগণ আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; যথা—

(১) বিবাদীপক্ষের ১১নং সাক্ষী আবলিউইস, ইনি একজন অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে গার্ড। (২) বিবাদীপক্ষের ১৩নং সাক্ষী ফ্রেডরিক লক্‌টস, অবসরপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী। (৩) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী এ প্লিভা, দার্জ্জিলিংএর একজন রুটি বিস্কুট ব্যবসায়ী। (৪) বিবাদীপক্ষের ৫৭নং সাক্ষী দুর্গাচরণ পাল, সেক্রেটারীয়েট বিভাগের হেড এসিষ্ট্যাণ্ট। (৫) বিবাদীপক্ষের ৬৬নং সাক্ষী নরেন মুখার্জ্জি সেক্রেটারীয়েট কর্ম্মচারী। (৬) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী দার্জ্জিলিং এর সুরেন্দ্র চন্দ্র। (৭) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী জলপাইগুড়ির নুরুল হক। (৮) বিবাদীপক্ষের ৭১নং সাক্ষী রংপুরের মতিয়ার রহমান।

(৯) বিবাদীপক্ষের ৭৩নং সাক্ষী দার্জ্জিলিংএর পালম্যান। (১০) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী দার্জ্জিলিংএর লক্ষ্মী মুদী। (১১) বিবাদীপক্ষের ৭৩নং সাক্ষী কালী ছত্রী। (১২) বিবাদীপক্ষের ১০৩নং সাক্ষী ডাঃ এস পি রায়, এম বি, এম আর সি পি। (১৩) বিবাদীপক্ষের ১০৫ নং সাক্ষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (১৪) বিবাদীপক্ষের ১১৯নং সাক্ষী কালী ছত্রিনী। (১৫) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী দার্জ্জিলিংএর সত্যপ্রসাদ ঘোষাল। (১৬) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী নন্দগোপাল গড়গড়ি। (১৭) বিবাদী পক্ষের ৭১নং সাক্ষী তেজবর। ইনি দার্জ্জিলিংয়ের ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কনেষ্টবল। (১৮) বিবাদী পক্ষের সাক্ষী দার্জ্জিলিং এর পূর্ণ ব্যানার্জ্জি। (১৯) বিবাদীপক্ষের ১১৩ নং সাক্ষী বালীর পঞ্চানন মিত্র। (২০) বিবাদী পক্ষের ৩০৯ নং সাক্ষী অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী মিঃ হল্যাণ্ড। (২১) বিবাদী পক্ষের ৪২০ নং সাক্ষী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সকল সাক্ষী ব্যতীত মধ্যমরাণী, সত্যবাবু, বীরেন্দ্র, আশু ডাক্তার, বিপিন এবং বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সাক্ষ্য দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কমিশনে এণ্টনী মরেলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিগণের মধ্যে যাঁহারা আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাড়ীর লোকজন এবং সত্য প্রসাদ ও গড়গড়ি ব্যতীত আর কেহই শ্মশানে যান নাই, সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। সাক্ষীদিগের কেহ কেহ শবযাত্রা দেখিয়াছিলেন মাত্র। শবযাত্রা যে থর্ণ রোডের 'রুট' ধরিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা সেই কথাই প্রমাণ করিতে আসিয়াছিলেন। মিঃ প্লেভা, মিঃ লক্টস, মিঃ হল্যাণ্ড, পূর্ণ ব্যানার্জ্জি এবং পঞ্চানন এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অন্যান্য সাক্ষীরা বলেন, তাঁহারা সকলেই 'ষ্টেপ এসাইডে' গিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীর উঠানে খাটিয়ার উপর কুমারের

শবদেহ দেখিয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার উপর হইতে শবদেহ নামাইয়া উঠানে আনিতে ও খাটের উপর রাখিতে এবং শোভা-যাত্রা সহ সে শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেও দেখিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা যে থর্ণ রোড 'রুট' ধরিয়া গিয়াছিল তাঁহারা সে কথাও বলিয়াছিলেন।

কমিশনে যাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদের সাক্ষে প্রকাশ,—এক গীতা দেবী ব্যতীত আর সকলেই প্রত্যুষে অথবা আরও পূর্ব্বে 'ষ্টেপ এসাইডে' উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শোভাযাত্রার সময় তাঁহারা শ্মশান পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং শবদাহ পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারই তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

এই সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা এই,—কুমারের মৃতদেহ উপর তলায় এক ঘরের মধ্যে ছিল। সেই ঘরেই কুমারের মৃত্যু হইয়াছিল। বেলা সাড়ে সাতটা কি আটটা পর্য্যন্ত মৃতদেহ ঘরের মধ্যে ছিল এবং প্রায় সেই সময়েই শবদেহ নীচে নামাইয়া আনিয়া উঠানে খাটের উপর রাখা হয়। শব-দেহের উপর ফুল ছড়াইয়া দিয়া একখানি 'শাল' দিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া দিবার পর আরও কিছু ফুল ছড়াইয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে যথারীতি অন্ত্যেষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে শবদেহ ঘৃত মাখাইয়া স্নান করান হয়। পরে নূতন কাপড় পরাইয়া, মন্ত্রাদি উচ্চারণে পিণ্ডদানের পর শবদেহ চিতার উপরে শোয়ান হয়। বীরেন্দ্র মুখাগ্নি করিলে চিতায় আগুন দেওয়া হয়। চিতায় অগ্নিদানের পর বীরেন্দ্র শোকদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে মাটির উপর গড়াইতে থাকে। দারোয়ান শরিফ খাঁ শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং প্রজ্জ্বলিত চিতার উপর পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যায়, অন্যান্য সকলে তাহাকে নিবারণ করে। শেষোক্ত বিবরণ দুইটি স্বীকৃত হইয়াছে।

যে সকল সাক্ষী এই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই প্রাতঃকালে 'ষ্টেপ এসাইডে' আসিয়াছিলেন। চারিজন ভোর হইবার পূর্ব্বেই আসেন। সেই চারিজনের মধ্যে সপ্তদশবর্ষ অথবা তন্যূন বয়স্ক বিজয় মুখার্জ্জি একজন। তাহা ছাড়া সেনিটোবিয়াম হইতে আসেন—মিঃ রাজেন্দ্র শেঠ এবং কাছারী বিল্ডিং হইতে আসেন—শ্যামাদাস ও অনুকূল চট্টোপাধ্যায়।

বাদীর পক্ষে এ সম্বন্ধে তিনজন সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—ষ্টেপ এসাইড হইতে তাঁহারা প্রাতঃকালীন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা শ্বশানে ছিলেন। নিম্নে সেই সকল সাক্ষীর নাম দেওয়া হইল ; যথা—

(১) বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ইনি দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনারের আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেট। ১৮৯৯ সাল হইতে তিনি দার্জ্জিলিংএ বসবাস করিতেছিলেন। (বাদীর ৮২৩নং সাক্ষী)।

২। স্বামী ওঙ্কারানন্দ (বাদীর ৬০৩ নং সাক্ষী)। পূর্ব্বে ইহার ক্ষেত্রনাথ মুখার্জ্জী নাম ছিল। ১৯০১ হইতে ৯০৭ সাল পর্য্যন্ত ইনি দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরী করিয়াছেন।

৩। রাম সিং সুভা (বাদীর ৯৬৭ নং সাক্ষী)। ষ্টেপ এসাইডের মালিকের মুন্সী। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

৪। ডেপুটী কমিশনারের আফিসে নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। (কমিশনে ইহার সাক্ষ্য লওয়া হয়)।

বসন্তবাবু তাঁহার সাক্ষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই,—'নার্স জগৎমোহিনী দাসী প্রাতে আসিয়া আমাকে খবর দিল, ভাওয়ালের কুমার মারা গিয়াছেন, শবযাত্রার সহিত একজন ব্রাহ্মণ থাকা দরকার, কাজেই সে আমাকে 'ষ্টেপ এসাইডে' যাইতে বলে। আমি প্রাতঃ ৮টায় তথায় যাইয়া

পৌঁছি এবং মৃতদেহ প্রাঙ্গনে একখানা খাটের উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখিতে পাই। সমস্ত দেহখানি এমনভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল যে, আমি তাহার মুখমণ্ডল কিম্বা শরীরের অন্য কোন অংশ দেখিতে পাই নাই। আমার যাওয়ার ২০-২৪ মিনিট পরে শব শোভাযাত্রা বাহির হয়, আমি ঐ শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলাম। আমি শবাধার স্কন্ধে বহন করি নাই। শবদেহ বেশ লম্বা ছিল। আমার দেহ হইতে ছোট ত হয়ই বরং একটু দীর্ঘ। আমার দেশে মৃতদেহ স্পর্শ না করিয়া রাখা হয় না। কিন্তু ঐ মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিয়া ছিল না। অনেকেই উহার আশেপাশে ঘুরিতেছিল, একজন যুবতী স্ত্রীলোক উপরতলায় কাঁদিতেছিল। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছিলাম তিনি রাণী। আর কেহই কাঁদিতেছিল না, সকলেই তখন দুঃখিত ছিল। শব শোভাযাত্রা কমার্শিয়েল রো, অকল্যাণ্ড রোড, রবার্টসন রোড, লয়েড রোড হইয়া যায়, থর্ণ রোড হইয়া যায় নাই। শবদেহ নূতন শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। মৃতদেহ চিতার উপর রাখা হইয়াছিল। চিতা ঐখানেই তৈয়ারী ছিল। বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায়ই উহা চিতার উপর রাখা হয়। সাধারণতঃ হিন্দুর মৃতদেহকে স্নান করান হয়, কিন্তু ঐ মৃতদেহকে স্নান করান হয় নাই। তাহার গায়ে ঘি মাখান হয় নাই, উহা নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করাও হয় নাই। মুখাগ্নির পূর্ব্বে যে পিণ্ডদান করার নিয়ম আছে, ঐ পিণ্ডও দান করা হয় নাই। এইভাবে মুখাগ্নি করিতে আমি আর কখনও দেখি নাই। একজন ১৭।১৮ বৎসর বয়সের বালককে মুখাগ্নি করিতে বলা হয়। সে কাঁদিতে থাকে, আমি একটু সরিয়া যাই, মুখাগ্নি ঠিক করা হইয়াছিল কি না তাহা আমি দেখি নাই, আমি প্রাঙ্গণেই ছিলাম, মাত্র ২০-২৫ ফিট দূরে ছিলাম। বালককে যখন মুখাগ্নি করিতে বলা হয়, তখন শবদেহের উপর কাঠ চাপান হইয়াছিল। আমি চিতা

জ্বলিতে দেখিয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত আমি ছিলাম না। আমি মাত্র দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা ছিলাম। যতক্ষণ আমি ছিলাম আমি তথায় জগৎমোহিনী কিম্বা অপর কোন স্ত্রীলোককে দেখি নাই।"

স্বামী ওঙ্কারানন্দ ওরফে ক্ষেত্রবাবু তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, প্রাতঃ ৬ টার সময় জগৎমোহিনী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠায়। তিনি তথায় যান, মৃতদেহ দেখিতে পান, উহা আবৃত ছিল এবং প্রাঙ্গণে খাটের উপর শায়িত ছিল। উহা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় এবং আবৃত অবস্থায়ই বিনা ক্রিয়াকর্ম্মে দাহ করান হয়, ইহাতে তিনি কিছুটা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন! হিন্দুদের ক্রিয়া-কর্ম্মের কিছুই করা হয় নাই, এমনকি পিণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। তিনি শবদাহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তথায় ছিলেন। তিনি বলেন যে, লোকটী দেখিতে লম্বা ছিল; কিন্তু তাহার দেহ মোটেই দেখিতে পান নাই। শ্মশানে এবং ষ্টেপ এসাইডে আচ্ছাদন বস্ত্র সামান্য সরিয়া গেলে তিনি দেখিতে পান যে তাহার রং গৌরবর্ণ। রাম সিং সিভা এবং ডাঃ বি বি সরকার বলে, মধ্যরাত্রিতে কুমারের একজন বালক ভৃত্য তাহাদিগকে ডাকে এবং বলে যে গোলমাল শুনা যাইতেছে, রাম সিং পরদিন প্রাতে যায়। সত্যবাবু তাহাকে খাট আনিতে বলেন এবং বাজার হইতে শবদাহের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনিতে বলেন। সে উহা আনে এবং শব শোভাযাত্রার সহিত গমন করে; সেও বলে যে মৃতদেহ কোন সময়েই অনাবৃত ছিল না নলিনী চক্রবর্ত্তীও তাহার সাক্ষে ঐ কথাই বলে। সেও প্রাতে তথায় যায় এবং শোভাযাত্রার সহিত গমন করে এবং শ্মশান পর্য্যন্ত যায়। সেও বলে যে মৃতদেহ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত ছিল। শ্মশানেও উহা অনাবৃত করা হয় নাই। উহা আবৃত অবস্থাই দাহ করা হয়। কিন্তু দার্জ্জিলিংএ তদন্তের সময় মিঃ এন কে রায়ের নিকট নলিনী যে বিবৃতি দিয়াছে,

তাহাতে তাঁহার এই সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। স্মরণ থাকিতে পারে ১৯২১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সত্যবাবু এবং রায় বাহাদুর এস সি ঘোষ একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সাক্ষীদের নিকট হইতে বিবৃতি গ্রহণের জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবুর পূর্ব্ব উল্লিখিত বিবৃতি তন্মধ্যে একটি, উহা ১৭-৫-২১ তারিখে গৃহীত। নলিনীর বিবৃতি গ্রহণ করা হয়। ৩-৬-২১ তারিখে ঐ বিবৃতিতে বলা হয় যে, মৃতদেহ একজন বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ যুবকের। ঐ বিবৃতির সহিত ২২-৬-২১ তারিখে আর কয়েকটি কথা যোগ করা হয়। উহাতে বলা হয় মৃতদেহ দুপুর বেলা দাহ করা হয়। ইহাতে একটি জিনিষ বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় বাদী নিজের পরিচয় দানের ১১ দিন পরে এই কথা মনে উদয় হয় যে, সাক্ষীদের মুখ হইতে মৃতদেহ অনাবৃত করার কথা বাহির করিতে হইবে। বসন্ত বাবু এবং ক্ষেত্রবাবুর পূর্ব্ব বিবৃতি এবং বর্ত্তমান বিবৃতিতে এইমাত্র পার্থক্য যে, পূর্ব্বে তাঁহারা এই কথা বলেন নাই যে মৃতদেহ দাহ করার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় ছাপান প্রশ্নের ৯নং প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা কেন বলে নাই যে হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম্ম শশানে কিছু করা হয় নাই। মিঃ আর সি দত্ত পরে ঐ সকল প্রশ্ন তৈয়ার করেন এবং উহা রায় বাহাতুর এস সি ঘোষকে দেখান। ঐ প্রশ্নের উপরেই পরে অতিরিক্ত বিবৃতি গ্রহণ করা হয়।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য এই ঃ—যাঁহারা কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শশানে গিয়াছেন, উহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই ষ্টেপ এসাইড হইতে গিয়াছেন, ইনি মলভিলার ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন যে, তিনি একটু পরে আসিয়াছেন এবং শবযাত্রার পিছনে পিছনে যান কিন্তু তাহাদের সহিত একত্র হইতে পারেন। তিনি শশানে গিয়া

মৃতদেহ দেখিতে পান। আর একজন সাক্ষী কানাইও শবযাত্রার সহিত ছিল।

জগৎমোহিনী

মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, সত্যবাবুর পত্র পাইয়া স্যানিটারিয়াম হইতে রাজেন্দ্র শেঠ এবং ব্রজেন্দ্র, অনুকূল ও শ্যামাপদবাবু আসিয়াছিলেন। যাহারা সকালে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ষ্টেপ এসাইডের মৃতদেহের সম্পর্কে কিছু না বলিয়া শশানের ঘটনার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। সকাল বেলা মিঃ এম বি বাড়ুয্যের স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবী ও তাঁহার পুত্র 'বলেন' আসেন, 'বলেন' মৃতদেহ নেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং কাশীশ্বরী দেবী রাণীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বাড়ীতে থাকে। বিবাদীপক্ষ এই ঘটনার উপরও খুব জোর দেয়। দার্জ্জিলিংএ যে দুইজন সাক্ষীর কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, উহাদের অন্যতম ব্যারিষ্টার মিঃ আর এন বাড়ুয্যে কাশীশ্বরী দেবীর আর এক পুত্র তিনিও সকালবেলা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার ভাই বলেনবাবুর সহিত তিনিও শব নেওয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া বলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অন্য কেহ তাঁহার নাম উল্লেখ করে নাই। তাঁহার সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্যের মধ্যে মিথ্যা উক্তি আছে এবং কোন কোন বিষয় সম্পর্কে তিনি বিবাদীপক্ষের ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্যের পর তাঁহার সাক্ষ্যের সমর্থনের জন্য তাঁহার বৌদির সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ঘটনার সময় এই সাক্ষী তরুণী ছিলেন এবং তখন তিনি বলেন ভিলাতে মিঃ এম এন বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূরূপেই ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বলেন ভিলার নিকট দিয়া শবযাত্রা যাইতে তিনি দেখিয়াছেন। নর্থ রোডের পাশ দিয়া শবযাত্রা যাইবার পূর্ব্বে তিনি মিঃ আর এন বাঁড়ুয্যেকে শবযাত্রার সঙ্গে দেখেন নাই। মামলার একস্থানে

বলা হইয়াছে যে, নার্স জগৎমোহিনী সকালে শুধু লোকজনকে ডাকেন নাই, তিনি শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য গঙ্গাজল লইয়া শশ্মানেও গিয়াছিলেন।

তিনি বলেন যে, কাশীশ্বরী দেবী আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে জুতা রাখিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ী হইতে গঙ্গাজল আনিবার জন্য বলেন। তিনি তথায় গিয়া গঙ্গাজল আনেন এবং তৎপর উহা লইয়া শশ্মানে যান। সেখানে তিনি চিতানল দেখিতে পান। সাক্ষ্যে বলা হয় যে, শব লইয়া যাওয়ার পর কাশীশ্বরী দেবী রাণীর সহিত ছিলেন এবং ১২টার সময় রাণীকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান। শশ্মানবন্ধুগণ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তিনি তথায় ছিলেন। মিঃ আর এন বাঁড়ুয্যে বলিয়াছেন যে, শবদাহ হইয়া যাওয়ার পর তিনি অপরাহ্ণ ৫টার মধ্যে পৌঁছিবার জন্য ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে একটা ঘোড়ায় চাপিয়া আসেন। অন্য সাক্ষ্য দেখিলে জানা যায় যে, পাহাড়ের নীচে যাইতে এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছে। তিনি ঐ বিশ্রী রাস্তা দিয়া উপরে গিয়াছেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলেন ও রাণীকে তাঁহার বাড়ীতে দেখিয়াছেন। তাঁহার মায়ের সহিত রাণী একখানি রিকসায় চাপিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ঐ দিন প্রাতঃকালে মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জি যে তথায় ছিলেন তাহা আমি বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক সাক্ষীর উক্তি আলোচনা করা সম্ভব নহে, অথবা দীর্ঘকালের ব্যবধানের দরুণ যতটুকু ভুল ত্রুটি হওয়া সম্ভব তাহা ধরিয়া লইলেই প্রত্যেক সাক্ষীর উক্তির ভিতর কোথায় কতটুকু অসত্য রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়াও সম্ভব নহে। যেমন একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, শব যখন খাটিয়ার উপর ছিল তখন মৃত ব্যক্তির মুখ গোলাপের ন্যায় রক্তিমাভ ছিল, একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, রাস্তা বাঁকা থাকা সত্ত্বেও শব যখন সিঁড়ি দিয়া নামান হইতেছিল

তখন গেট হইতে তাহা দেখা গিয়াছিল। শব উন্মুক্ত ছিল ঢাকা ছিল না অথবা শ্মশানের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করা হইয়াছিল বলিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে বড় বড় কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ করিলেই তাহা সমস্ত বাতিল হইবে।

(১) ইহা সুস্পষ্ট যে রাত্রি ৯টার পর একটী প্রাণীও আসে নাই। শ্যামাপদ বলিয়াছেন যে, রাত্রি প্রায় ১টা কি ১-৩০ মিনিটের সময় সত্যেনবাবু এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠান "কুমার মারা গিয়াছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য ব্রাহ্মণ লইয়া আসুন" তিনি অনুকূলবাবুকে লইয়া উপরের তলায় যান এবং তথায় রাণীকে শবের মুখের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে দেখেন। তখন কোন নার্স ছিল না; খুব সম্ভব তাহারা নীচের তলায় ছিল, আদৌ উপরের তলায় ছিল না। এবং নিবারণ ডাক্তারও তখন ছিলেন। যদিও সত্যবাবুর কথানুসারে নিবারণ ডাক্তারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাজেন্দ্র শেঠ ও বিজয়বাবু বলিয়াছেন, রাত্রি ১০ টার সময় স্যানিটোরিয়ামে কুমারের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বাহির হইয়া আসেন এবং লোক ডাকিতে কাছারী বাড়ীতে যান। কয়েকজন লোক তাহাদের সঙ্গে আসে এবং রাত্রি প্রায় ৩টার তাহারা সকলে ষ্টেপ এসাইডে যান তথায় তাহাদের পূর্ব্বেই শব লইয়া যাওয়া হইবে কিনা। অতঃপর ভোর হইলেই শব লইয়া যাওয়া হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়।

উপরোক্ত সমস্ত কাহিনীই উড়িয়া যায়। রাত্রিতে কেহ আসিয়াছিল একথা কেহই বলে না। সত্যবাবু দ্বিধার সঙ্গে বলেন যে, রাত্রি ৩টার সময় কয়েকজন লোক আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি লোক ডাকিবার জন্য 'চিট' দেন নাই, মৃত্যুসংবাদ জানাইবার জন্যই চিট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার রোজনামচা তাঁহার এই উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। ৬ই তারিখের রোজ-নামচায় তিনি লিখিয়াছেন। "কুমারের মধ্যরাত্রিতে মৃত্যু হয়"

এবং পরে লিখিয়াছেন যে, ডাক্তারগণ চলিয়া গেলে তিনি শব বহন করিবার উদ্দেশ্যে লোক ডাকিবার জন্য স্যানিটোরিয়ামে লোক পাঠান এবং তাঁহার মাতুলের নিকট চিঠি পাঠান তাঁহার মাতুল রাত্রি ৩টার সময় তথায় আসেন।

(২) ভোরে যে শোভাযাত্রা হয় তাহা যতটা প্রকাশ্যভাবে করা সম্ভব ছিল তাহা করা হয়। যদিও সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সে কোন ধনী লোকের মৃত্যু হইলে ঐরূপ করা হইয়া থাকে। কোন যুবকের আকস্মিক শোকাবহ মৃত্যুতে ঐরূপ করা হয় না।—সে যুবক যতই ধনী হউক। ঐ দিন কার্সিয়াংএ একটী শ্রাদ্ধ ছিল এবং ৬টার গাড়ীতে স্থানীয় অধিকাংশ লোক তথায় চলিয়া যান। কিন্তু এইরূপ প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, মিঃ আর এন বানার্জ্জিও শোভাযাত্রার সঙ্গে গিয়াছিলেন, স্থানীয় কয়েকজন লোকও যোগদান করেন। ঐ দিন বাজার বার—রবিবার ছিল। আমার সন্দেহ হয় যে, ডাঃ ক্যালভার্টের শোকজ্ঞাপক চিঠি সংগ্রহ করার পর শোভাযাত্রার সঙ্গে যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখা হয় এবং রোজনামচা খোলা হয়—যদিও উহাকে এখন আর সমসাময়িক বলা হইতেছে না। নতুবা দার্জ্জিলিংএ তদন্ত আরম্ভ হইতে পারে না অথবা যেভাবে তদন্ত আরম্ভ হয় সেভাবে হইতে পারিত না। কিন্তু সত্যবাবু একটু ভুল করেন প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাকুলতা তাঁহাকে বহুদূর টানিয়া লইয়া যান। ষ্টেপ এসাইডের ঠিক বিপরীত দিকে মঙ্গলভিলা ঐ বাড়ীতে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বাস করিতেছিলেন। এই ব্যক্তির নাম সকলেই শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়াছে। তিনি কলিতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। নার্স জগৎমোহিনী ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে ডাকিয়া আনেন ডাঃ আচার্য্যের নিকট মুসৌরিতে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠান হইলে তিনি

মিঃ লিণ্ডসের নিকট এক চিঠিতে কি ঘটিয়াছিল তাহা লিখিয়া পাঠান। তিনি এই চিঠিখানা লিখেন।—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৩৩ ডবলিউ সি নং চিঠিখানা পাইলাম। যতদূর সম্ভব আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ঘটনার বিষয় আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমার অধিকাংশ উত্তরই "না"।

উত্তর

১। হ্যাঁ (২) হ্যাঁ।

(৩) কুমারের মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরে আমি ষ্টেপ-এসাইডে ছিলাম, শোভাযাত্রার সঙ্গে আমি যাই নাই। সৎকারের সময়ও ছিলাম না।

(৪) না, হ্যাঁ আমি তাহার চেহারার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি।

(৫) না, না, না।

(৬) বলিতে পারি না।

(৭) না।

(৮) মৃত্যুর সময় কে উপস্থিত ছিলেন বলিতে পারি না। আমি সরকারী উকীল এম এন বানার্জ্জির পুত্রদিগকে সৎকারের ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছিলাম।

(৮) কুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর যদিও ডাক্তার হিসাবে আমিই তথায় প্রথম যাই তথাপি আত্মীয়স্বজন কেহ আমার নিকট জানিতে চাহেন নাই যে জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে কি না, ইহা আমার নিকট একটু অদ্ভুত মনে হওয়ায়ই আমার একথা মনে আছে।

—ভবদীয়

ডাঃ আচার্য্যকে কেন ডাকা হইল ?

এই মামলায় ডাঃ আচার্য্য কমিশনে জবানবন্দী দিয়াছেন। বিবাদীপক্ষ এই চিঠিখানা তাঁহাকে দেখান। এই চিঠিদ্বারা তাঁহার বর্ত্তমান উক্তির সত্যতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি চা খাইতেছিলেন এবং তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। এমন সময় একজন অপরিচিতা নার্স আসিয়া বলে যে কুমার মৃত্যুমুখে অথবা মৃত্যু হইয়াছে 'একবার আসিয়া তাঁহাকে দেখুন'। ঐ নার্স কুমারের মৃত্যু হইয়াছে না মরিতেছেন বলিয়াছে, তাহা সাক্ষীর স্মরণ নাই। তিনি সন্ধ্যা ৬টার সময় ষ্টেপ এসাইডে পৌঁছেন এবং সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত একটী মৃতদেহ দেখিতে পান। ঐ শব কাহাব তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কুমারের মৃত্যু হইয়াছে কিনা তাহা তিনি দেখিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাহার হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি শবের নিকটে গেলে উপস্থিত লোকজন বলিয়া উঠেন—'ইহা হিন্দুর শব, স্পর্শ করিবেন না' শব একটি খাটিয়ার উপর ছিল, অবশ্য ইহা তাঁহার ধারণা।

জেরায় এইরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শব স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি ভাওয়াল পরিবারের প্রথা অবগত আছেন কিনা, তদুত্তরে তিনি একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, মৃত্যুর পর তিনি ব্রাহ্মণ অথবা উচ্চবংশজাত লোকের শব স্পর্শ করিয়াছেন। সাক্ষীর নিকট হইতে ইহাও বাহির করা হয় যে, কোন ব্রাহ্মকে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ বহন করিতে দেওয়ার প্রথা নাই। মোট কথা এই যে, তাঁহাকে মৃতদেহ দেখিবার জন্য ডাকা হইল কেন এবং কেনই বা তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হয় ?

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কোন ডাক্তার গায়ে পড়িয়া মৃতদেহ দেখিতে চাহে না। ডাঃ আচার্য্য সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন, খাটেই যদি মৃতদেহ রাখা হইয়া থাকে, তবে একথা ঠিক যে, উহা উপরের তলায় ছিল না। কুমারের মৃতদেহ ঘরের মেজের উপর ছিল। খাট সম্বন্ধে ডাক্তারের স্মৃতি খাটি নয়—কেবল এই যুক্তিতে একথা বলা অসম্ভব যে, মৃতদেহ নীচের তলায়ই ছিল। কিন্তু ঘরে যাহারা ছিল তাহাদের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, সকাল বেলা ৭॥টা কি ৮টার সময় মৃতদেহ নীচের তলায় আনা হইয়াছিল। যে সকল সাক্ষী সকাল বেলা সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই কথা বলিয়াছেন। একথাও বলা হইয়াছে যে, কুমারের মৃতদেহ ছিনাইয়া না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত রাণী উহা আঁকড়াইয়া ছিলেন। তিনি ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে দেখিতে পান নাই। ডাক্তারের আগমনের কথা কাহারও স্মরণ নাই এবং ইহা যে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরের তলায় যে মৃতদেহ ভোর ৮টা পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছিল এবং উহা না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত রাণী যে মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন একথা মিথ্যা। কমিশনে যাঁহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষ্য দেখিলে ইহার সত্যতা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। মহেন্দ্র বাড়ুয্যে বলিয়াছেন যে, বারান্দার পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষ হইতে মৃতদেহ বাহির করা হইয়াছিল। তিনি তখন নীচের বারান্দায় ছিলেন। বিজয় বলিয়াছে যে, সে আর একটি কক্ষে বসিয়া ছিল। সেই কক্ষের মধ্য দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মৃতদেহ নীচের ঘরেই ছিল। এণ্টনী মরেল বলেন যে, মৃতদেহ নীচে আনিয়া বারান্দার মধ্যে সিঁড়ির গোড়ায় একখানি খাটের উপর রাখা হয়। তাহার

বর্ত্তমান সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, নীচের তলায় বারান্দা দিয়া মৃতদেহ লইয়া গিয়া বাহিরে একখানি খাটের উপর রাখা হয়।

কুমারের মৃতদেহ উপরের তলায় ছিল এবং সকাল বেলা ৭॥টা কি ৮টার সময় লোকজন উহা লইয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাণী মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন একথা যে মিথ্যা ইহা আর একটি ব্যাপারে প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য সময়ে কাশীশ্বরী দেবী সেখানে ছিলেন। তিনি সে সময় রাণীর যত্নের ভার লইয়াছিলেন এবং দেখা যায় যে, কাশীশ্বরী দেবী এবং জগৎমোহিনী দেবীর গঙ্গাজল আনার কাহিনীই সমস্ত দিনের ঘটনাবলীর মধ্যে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কিন্তু কাশীশ্বরী দেবী সেদিন প্রাতে আদৌ সেখানে ছিলেন না। রোজনামচায় দেখা যায় যে, কুমারের মৃতদেহ যখন লইয়া যাওয়া হইল তখন দ্বিতায় রাণী তাহার মাতুল সূর্য্যবাবুর হেপাজতে রহিলেন। রোজনামচায় কাশীশ্বরী দেবীর কথা কিছুই উল্লেখ নাই। আমার বিবেচনায় এই রোজনামচাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়োজন নাই। শবযাত্রীরা চলিয়া যাইবার পর যাহা ঘটিয়াছিল, খানসামা বিপিন তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

রাণীর বৈধব্য বেশ

রাণী কিভাবে মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন এবং কাশীশ্বরী দেবী ও সূর্য্য বাবু কি ভাবে জোর করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন তাহার বর্ণনা দিয়া বিপিন বলে :—

“রাণীকে সকলে মিলিয়া তাহার শয়ন ঘরে লইয়া গেল। সেখানে তিনি তাহার অঙ্গ হইতে গহনা পত্র খুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। আমি ঐ গুলি কুড়াইয়া লইয়া বিছানার এক কোণে

রাখিলাম। যে অলঙ্কারগুলি তিনি খুলিতে পারিলেন না সেইগুলি তাহার অঙ্গেই রহিল। সরকারী উকিলের স্ত্রী তখন তাহাকে স্নানের জন্য স্নান ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া তিনি স্নান করিলেন। স্নান ঘরে তাহার বাকী গহনাগুলি খুলিয়া লইয়া আমার হাতে দেওয়া হইল। আমি গহনা পত্রগুলি রুমালে বাঁধিয়াছিলাম। সরকারী উকিলের স্ত্রী সেইগুলি তাহার মাতুলের হাতে দিলেন।"

অতঃপর কাশীশ্বরী দেবী রাণীকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমি যখন এই সাক্ষ্য শুনিতেছিলাম, তখন আমার নিকট ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছিল যে, সে অবস্থায় কি করিয়া এই ভদ্র মহিলা একজন যুবতীকে তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারপত্র খুলিয়া ফেলিতে দিতে পারিতেছিলেন, কারণ সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শোকে বিহ্বল হইয়া যুবতীরা অঙ্গের অলঙ্কারপত্র খুলিয়া ফেলিতে চাহে এবং বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা তখন তাহা করিতে বাধা দেয়। এইরূপ অবস্থায়ই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্মশানবন্ধুরা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কখনও এরূপ হয় না; কারণ তখনও আশা থাকে—বৈধব্য তখনও হয় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে বিপিন এই রীতির কথা স্বীকার করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার সে ইহা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। আমি সকল কথা না শুনিয়াই যখন কাশীশ্বরী দেবীর কথা ভাবিতেছিলাম তখন তাহার প্রতি একটু অবিচার করিতেছিলাম। ঐ দিন রাণী তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সহিত যান নাই। রাণী সূর্য্যনারায়ণ বাবুর সহিত গিয়াছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু 'বলেন-ভিলায়' একজন ভাড়াটিয়া ছিলেন। তাহার সঙ্গে পরিবার ছিল না; কাজেই ইহা স্বাভাবিক যে, তিনি রাণীকে লইয়া গিয়া ঐ বাড়ীর

স্ত্রীলোকদের মধ্যেই রাখিবেন, গীতা দেবী সেই সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাণী যখন তাহাদের বাড়ী গেলেন তখন তাঁহার অঙ্গে সামান্য অলঙ্কারও ছিল না। এবং সাধারণতঃ চাকর-বাকর যে রকম ধুতি পরে সেই জাতীয় একখানি সাধারণ ধুতি তাঁহার পরিধানে ছিল। তিনি বলেন,—

"রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি পাহাড়ে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া যাইতেছি। মা বলিলেন, বাছা, তোমার অলঙ্কারপত্র এত সকালেই খুলিয়া ফেলিয়াছ? রাণী বলিলেন, তিনি আমাকে একটি অলঙ্কারও খুলিতে দিতেন না, আজ আমাকে বাধা দেওয়ার কেহ নাই। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অকস্মাৎ এইরূপ হইল কি করিয়া? খুব সম্ভব রাণী উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ডাঃ ক্যালভার্ট তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। মা তখন বলিলেন,—তুমি একা। ভাইদিগকে জানাইতে পারিলে না? রাণী বলিলেন,—তাঁহাদিগকে জানান হইয়াছিল, এমন কি, গতকল্যও টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাঁহাকে বাঁচাও, খরচের কথা ভাবিও না।"

এই সাক্ষ্যের প্রত্যেকটি কথা আমি বিশ্বাস করি। ইহার আগাগোড়া সত্য, ইহাতে ভুল করিবার কিছু নাই। রাণী যে অলঙ্কার পত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি যে চাকর-বাকরের মত সাধারণ ধুতি পরিয়া আসিয়াছিলেন—ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, সেখানে অন্য কোন মহিলা ছিলেন না।

(৩) কাশীশ্বরী দেবীর সাক্ষ্যের দ্বারা এই কাহিনীর অধিকাংশ নিষ্ফল হইয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—এই নার্স জগতমোহিনী শ্মশানে গঙ্গাজল লইয়া গিয়াছিল। সাক্ষ্যে জগৎমোহিনী বলে,—"কাশীশ্বরী দেবী আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং জুতা

খুলিতে বলেন তারপর রোকি ব্যাঙ্ক হইতে কিছু গঙ্গাজল লইয়া শ্মশানে পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ করেন।"

বিবাদীপক্ষ এই স্ত্রীলোকের দ্বারা এমন কথা পর্য্যন্ত বলাইয়াছেন যে, সে ব্রাহ্মণ এবং চক্রবর্ত্তী বংশীয়া। ব্রাহ্মণ বংশের কোনও মহিলা নিজেকে 'দাসী' বলিয়া পরিচয় দেন না। জগতমোহিনী স্বীকার করিয়াছে যে, সে ঐরূপ পরিচয় দিয়াছিল। নিজের বর্ণিত কাহিনী ঠিক রাখিবার জন্য জগত-মোহিনীকে একটার পর আর একটা করিয়া বহু মিথ্যা বলিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উত্তর হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে মোটেই হিন্দু নহে। জগতমোহিনী তাহার মামার নাম করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পারিবারিক পদবী এবং বংশগত পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহার বাপের বাড়ীর কথা সে শুনিয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহা কোথায় সে জানে না।

জগতমোহিনী স্বীকার করিয়াছে যে, সে ঢাকার হাসপাতাল হইতে ধাত্রীবিদ্যা পাশ করিয়া, বংশীবাজারে যাইয়া বাস করিতে থাকে। সাক্ষীদিগের মধ্যে যাঁহারা জগতমোহিনীকে জানেন, তাহারা বলেন, জগতমোহিনী জনৈক মুসলমানের রক্ষিতা ছিল এবং সে মুসলমানের মতই থাকিত ও মুসলমানের মতই তাহার চালচলন ছিল। জগতমোহিনী যে বাড়ীতে থাকিত সেই বাড়ীর মালিকের এজেন্ট বাড়ী ভাড়ার রসিদ আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন। ঐ সকল রসিদ হইতে বেশ বুঝা যায়, জগতমোহিনীর সেই বাড়ী ভদ্রপল্লীতে ছিল না (বাদীপক্ষের ৮২৩, ৮৪৭, ৯৮৫, ১০১৭, ১০১৬, ১০৩১নং সাক্ষী)। জগত-মোহিনীর জবানবন্দী পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, তাহার উদ্ভাবনী শক্তি সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ তাহাকে যে ভাবে দেখা গিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায়, নার্সের পোষাক পরিহিত থাকাকালে তাহার দ্বারা পবিত্র গঙ্গাজল আনান এবং

শ্মশান পর্য্যন্ত তাহা বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য বলা হিন্দুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কোনও হিন্দু এই কার্য্যের জন্য নার্স জগতমোহিনীকে আদেশ করিতে পারেন না।

প্রকৃত কথা এই যে, আনুষ্ঠানিক কোনও ক্রিয়াই সম্পন্ন হয় নাই। সেই জন্য বিবাদিগণ একেবারে মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আর সেইজন্যই তাহাদিগকে গঙ্গাজলের কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছিল। শবদেহে ঘৃত মাখাইয়া স্নান করান হয়। তারপর কাপড় পরাইয়া শবের নবদ্বারে নয়খানি স্বর্ণখণ্ড দেওয়া হইলে, চাউল সিদ্ধ করিয়া চিতাপূরক দেওয়া হয়। তারপর মুখাগ্নি করা হইলে চিতা ধুইয়া ফেলা হয়। বীরেন্দ্র এবং অন্যান্য সাক্ষীরা এই বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্যের পৌরোহিত্য কে করিয়াছিলেন?

গীতাদেবীর সাক্ষ্যে প্রকাশ,—তিনি শোভাযাত্রা 'বলেন ভিলা' ছাড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন; আর সে শোভাযাত্রী-দের মধ্যে মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জিকে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সমূহের বহির্ভূত কোনও কোনও বিগয় গীতা দেবীর সাক্ষ্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গীতা দেবী যে বলিয়াছেন,—তথাকথিত ভাওয়াল কুমারের ফিরিয়া আসার কথা শুনিবামাত্র তাঁহার শাশুড়ী এবং তাঁহার দেবর বলেন বাবুর মধ্যে সে বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। বলেন বাবু বলেন,—"আমি যাব এবং সাক্ষ্য দিব। কুমার আমার সাক্ষাতে মারা গিয়াছিলেন।"

ডাঃ এস সি রায় যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমি উহার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। তাঁহার সাক্ষ্য পড়িলে সব বুঝা যায়, আমি এই সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বসন্ত বাবু ও ওঙ্কারানন্দ স্বামী সত্য কথা

বলিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। মৃতদেহ কাপড়ে ঢাকা ছিল, শোক যাত্রা করা হইয়াছিল এবং কোন প্রকার শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান পালন না করিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মৃতদেহ পোড়ান হইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করি যে কুমার সন্ধ্যার পরেই মারা গিয়াছেন। শোক যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছিল মৃতদেহ দেখিবার জন্য। ডাঃ আচার্য্যকে আনা হইয়াছিল, ৯ই তারিখ। দার্জ্জিলিং হইতে 'নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত' মৃত্যু সংবাদ এবং উহাতে মধ্যরাত্রে মৃত্যুর খবর ও জ্বর, রক্ত নির্গমন এবং পেটের বেদনা উল্লেখ থাকে। পরদিবস শোকজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করা হয়, উহাতে সর্ব্বপ্রথম পিত্তশূল উল্লেখ করা হয়। শ্মশান নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং একটা রোজনামচা (ডায়েরী) প্রস্তুত করা হয়, উহাতে মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই সকল একটা উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। কে অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কেহই জানে না। স্যানিটোরিয়ামের মিঃ চন্দই উহা জানেন বলিতেছেন। তিনি বড়কুমারের সহিত এই সম্পর্কে পত্র ব্যবহার (একজিবিট নং জেড ১২৪) করিয়াছেন, উহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনি একটা শোকসভার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সভার কার্য্য বিবরণীতে মিঃ হারাণচন্দ্র চাকলাদার তথায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। অথচ চাকলাদার একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি উপস্থিত ছিলেন তবে, তখন তাঁহার বয়স অত্যন্ত কম ছিল। জীবন-বীমার টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দুইটি সার্টিফিকেট লওয়া হইয়াছিল, ৯ই তারিখের শবদাহের ঘটনা যে প্রকার অলীক, ইহাও কতকটা সেইরূপই। ইহার একখানা সত্যবাবু লইয়াছিলেন, আর একখানি ক্যাল্ভেল লইয়াছিলেন। ক্যাল্ভেলের স্বাক্ষরটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। কুমারের সঙ্গে যাহারা দার্জ্জিলিং

গিয়াছিল, মৃত্যুর ব্যাপারটা যে কি তাহা তাহারা সকলেই জানিত এবং ঐ তারিখের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কেও তাহারা অবহিত ছিল, তবুও জয়দেবপুর গেলে যাহাতে ভৎর্সনা পাইতে না হয়, তজ্জন্য তাহারা যে এই সাজান সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিল ইহাতে কিছুই আপত্তিজনক বলিয়া মনে করে নাই। কুমারের যে সৎকার করা হয় নাই এই কথা তাহারা রাজপরিবারের কাছে কখনও বলিতে পারিত না। কুমারের সৎকার হয় নাই বলিয়া নানা কথা উঠিয়াছিল, আমি মনে করি, যদি এই প্রকার না হইত তবে শ্রাদ্ধে কুশপুত্তলিকার কথা উঠিত না এবং এই সম্পর্কে খোঁজ করিবার জন্য ১৯১৭ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট রাণী সত্যভামা দেবী পত্র লিখিতেন না এবং ১৯২২ সালে মেজরাণীর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিতেন না।

কুমারের যে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে, সেই মৃত্যু রাত্রি ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে হইয়াছে। রাত্রি ১০টায় তাঁহাব মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ঐ মৃতদেহ পোড়ান হয় নাই। মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ ছিল না। সত্যবাবু বলেন, উহা সত্য নয়। মৃতদেহ তথায় পাওয়া যায়, ফিরাইয়া আনা হয় এবং পরদিত প্রাতে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। যদি সঠিকভাবে বাদীর চেহারা ও মধ্যমকুমারের চেহারার সামঞ্জস্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে পরদিন প্রাতে অপর কোন ব্যক্তিব মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ইহা যে অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহাতে বাদীর সহিত কুমারের চেহারার সম্পূর্ণ মিলকে মিথ্যা বলিয়া মনে করা যায় না; যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা বলিয়া মনে করা যায় না। এই সম্পর্কে যে মিথ্যার জাল বুনা হইয়াছে, কাশীশ্বরী দেবী এই ব্যাপারে যে ভাবের অংশ গ্রহণ করিয়াছে, বাদীর আত্মপরিচয় দানের ১০

দিন পরে সত্যবাবু দার্জ্জিলিংএ যাইয়া সাক্ষীদিগকে যেভাবে হাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শবদাহ মোটেই স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই। সত্যবাবুর যৌবনের কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে এবং তাঁহার ডায়েরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ঐ সকল বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি! বৃষ্টির সময় মৃতদেহ শ্মশানে রাখিয়া আসা হইয়াছিল এবং উহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইহা প্রমাণিত হয় না যে উহা বাঁচিয়া গিয়াছে। বাদীই যে ঐ ব্যক্তি, তাহার দেহ এবং দেহের চিহ্নাদি দেখিয়া তাহা বুঝা গেলেই উহা সত্যসত্য প্রমাণিত হইতে পারে। যে সমস্ত সাক্ষী বলিয়াছে যে, বাদীই মধ্যমকুমার এবং যাহাদের সাক্ষ্য আমি আলোচনা করিয়া তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাহা কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই করা হয় নাই (যদি আমি তাহা করিতে পারিতাম) তাহার উপরই আসল সত্য নির্ভর করে। মৃতদেহ যে বাঁচিয়াছিল, তৎসম্পর্কে যে সমস্ত সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, সে সকল সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে, কুমারকে চারজন সন্ন্যাসী উদ্ধার করে এবং লইয়া যায়। কুমার ১২ বৎসর তাহাদের সহিত বাস করেন—আমি তাহারও আলোচনা করিব। কিন্তু কেহ ঐ সকল সাক্ষ্য মানিয়া লইবে না, অন্ততঃ বাদীই যে কুমার ঐ সাক্ষ্যকে তাহার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু বাদী এবং কুমার যে একই ব্যক্তি তাহা যদি অন্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উহা অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ থাকিবে না।

বাদী বলেন যে, ষ্টেপ এসাইডে অজ্ঞান হইবার পর, তাঁহার যখন সজ্ঞালাভ হয়, তখন তিনি একটি কুটীরে নিজকে দেখিতে পান। চারজন সন্ন্যাসী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। তিনি

তাহাদের সহিত পরে দার্জ্জিলিং ত্যাগ করেন ঐ সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ধরমদাস নাগা, পরে যিনি তাঁহার গুরু হন; অপর তিন জন পীতমদাস, লোকদাস এবং দর্শনদাস—তাঁহারা সকলেই নাগা এবং পুরাপুরি সন্ন্যাসী। দর্শনদাস কুমারের উদ্ধার সম্পর্কে সাক্ষ্যে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে বাদীই যে কুমার তাহার যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য হইতে তাহার বেশী কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে, বাদী এবং কুমার এক ব্যক্তি প্রমাণিত হইলে, কুমারের উদ্ধারের কাহিনী পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। জেরায়ও ঐ কাহিনী মিথ্যা প্রমাণিত হইবে না, ঐ অশিক্ষিত লোকটি ঘটনার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন দিন দার্জ্জিলিং যায় নাই, সে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। সাক্ষীকে হয়ত দার্জ্জিলিংএ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, হয়ত তাহাকে উহা শিখাইয়াও দেওয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ঐ সাক্ষী জেরায় টিকিত না বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু সে জেরায় টিকিয়াছে, সে ঠাণ্ডা মেজাজে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তাহার কাহিনী বলিয়াছে; এমন ভাবে সে বলিয়াছে যে সে যেন তাহার স্মৃতিশক্তি হইতেই বলিতেছে।

দর্শনদাস নাগার সাক্ষ্য

দর্শনদাস তাহার সাক্ষ্যে এইরূপ বলিয়াছে—যে, সে এবং বাদীর গুরু ধরমদাস নাগা একগুরুর শিষ্য, তাহাদের গুরুর নাম হরনাথদাস। সে একজন পাঞ্জাবী। তাহারা অপর দুইজন সন্ন্যাসীর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে দার্জ্জিলিংএ আসে, তাহারা ৪ জন সন্ন্যাসীই বাজারে দিন কাটায় এবং রাত্রিতে একটি নির্জ্জন স্থানে কাটাইতে চায়। তাই, তাহারা পুরাতন শ্মশানের পশ্চিমে পাথরের চাপে তৈয়ারী একটি গুহার মত স্থান বাছিয়া লয়,

একদিন নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে ঃ—আমরা যখন দার্জ্জিলিংএ ছিলাম তখন একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিল। একদা রাত্রিকালে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পর আমরা বসিয়া ধর্ম্মকথা আলোচনা করিতেছিলাম। এই সময় দেখা গেল যে, আকাশে মেঘ করিয়াছে, একটু পরেই ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বারিপাত আরম্ভ হইল এমন সময় আমি "হরিবোল, হরিবোল" চীৎকার শুনিতে পাইলাম। বাবা লোকনাথ বলিলেন,—নেকু, তুমি বাহিরে যাইয়া দেখ। ইনি বয়সে আমার অপেক্ষা বড়। তাই আমাকে নেকু বলিয়া ডাকিতেন। আমি বাহিরে যাইয়া বহু লোককে দেখিতে পাইলাম। এই সমস্ত লোকের মধ্যে লণ্ঠনের আলোও দেখা গেল।

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি দেখিতেছ? আমি বলিলাম,—বহু লোক দেখা যাইতেছে। তিনি বলিলেন,—সত্যই বহুলোক নাকি? তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? ভিতরে চলিয়া আইস! আমি ভিতরে আসিলাম। জোরে জোরে বাতাস বহিতেছিল এবং আকাশে মেঘাড়ম্বর ছিল। আমরা বসিয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম। অধিক রাত্রিতে বাবাজী আমাকে বলিলেন,—বহুলোক সমবেত হইয়া হরিবোল ধ্বনি করিতেছিল; কিন্তু এখন আমরা কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। অতএব সাধুদের মধ্যে একজনের বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আসা উচিত। আমি বাহিরে গেলাম। দেখিলাম যে, ঝড় বহিতেছে না, তবে বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্মশানের দিকে আমি একটা শব্দ শুনিলাম, আমি একটু অপেক্ষা করিলাম; আবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আরও একটু অপেক্ষা করিলাম, আবার আমার কাণে শব্দ আসিল। তখন আমি বাবাজীকে বলিলাম একটা শব্দ শোনা যাইতেছে। তিনি

প্রশ্ন করিলেন,—কিসের শব্দ? আমি বলিলাম জানি না। দয়া করিয়া আপনি বাহিরে আসুন। বাবা লোকনাথ বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন,—কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে? আমি উত্তর করিলাম,—ঐ দিক হইতে—ঐ পূর্ব্ব দিক হইতে। বাবাজী বলিলেন,—শীঘ্র লণ্ঠন লইয়া আইস।

আমি লণ্ঠন লইয়া আসিলাম এবং বাবাজী লোকনাথ বলিলেন,—আমার সঙ্গে চল। আমরা দুইজনে শ্মশানে গেলাম। লোকনাথ আমাকে বলিলেন, লণ্ঠনটি সাথে লইয়া চল। আমি একটা মাচার উপর লণ্ঠন ধরিলাম। দেখা গেল যে, এই মাচার উপর একটি লোক রহিয়াছে। বাবাজী বলিলেন, এইরূপ করিয়া লণ্ঠন ধর। আমি এইরূপ করিয়াই (প্রদর্শন করিল) আলো ধরিলাম। বাবাজী বলিলেন,—আমি খুলিয়া দেখিতেছি। বাবাজী এই বলিয়া মস্তকের দিক হইতে কাপড় তুলিলেন এবং তাহা পায়ের দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

তৎপূর্ব্বেই তিনি জড়ান কাপড়খানি ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। এই কাপড়ের তলায় আর একখানি কাপড় দিয়া লোকটির শরীর আবৃত করা হইয়াছিল। মশারীর দড়ির ন্যায় দড়ি দিয়া তাহা বাঁধা ছিল। উপরের কাপড়খানি মাচার পায়ার সঙ্গে গেরো দেওয়া ছিল। বাবাজী উপরের কাপড়খানি তুলিয়া লইলেন। তারপর তিনি নীচের কাপড়খানাও ছাড়াইলেন। (মুখের ও নাকের উপর হাত দিয়া) বাবাজী তখন লোকটির মুখের উপর হাত দিয়া বলিলেন,—'লেকু এই লোকটি জীবিত।"

তিনি বলিলেন,—অন্যান্য সাধুকে ডাক। বাবা লোকনাথ সেখানেই রহিলেন। আমি অন্যান্য সাধুকে ডাকিয়া আনিতে গেলাম। সেখানে যাইয়া তাহাদিগকে বলিলাম,—বাবাজী তোমাদিগকে চাহেন। তখন আরও দুইজন সাধু আমার সঙ্গে আসিলেন। বাবাজী লোকনাথ বলিলেন,—এই লোকটা

জীবিত; অতএব ইহাকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমাদের তো বেশী জায়গা নাই। সে যাহাই হউক, লোকটিকে সঙ্গে লও।

লোকটার শরীরে জড়ান কাপড়গুলি আমরা সেখানেই ফেলিয়া দিলাম। বাবাজী বলিলেন,—তাড়াতাড়ি কর, বৃষ্টি পড়িতেছে, দেহটি যখন বহন করিতেছিলাম, তখন লোকটি শীতে এইরূপভাবে (দেখান হইল) কাঁপিতেছিল। সময় সময় 'হুন হুন' শব্দ (অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ) করিতেছিল, আমরা তাহাকে বহন করিয়া পাহাড়ের নীচে আমাদের বাসস্থান লইয়া আসিলাম। বাবাজী বলিলেন,—লোকটি শীতে কাঁপিতেছে। অতএব তাহার শরীরের কাপড়গুলি সরাও। লোকটির গায়ে গেঞ্জি এবং অন্যান্য কাপড় ছিল এবং তৎসমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল। বাবাজী বলিলেন যে, লোকটার শরীরে একটা শুষ্ক কাপড় জড়াইয়া দাও। আমি তাহাই করিলাম। বাবাজী বলিলেন, এখন তাহাকে একটা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দাও। কম্বল জড়ান হইলে তিনি বলিলেন,—তাহাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হউক। পাহাড়ের আরও নীচে একটি ঘর ছিল, বাবাজী সেই ঘরে লইয়া যাওয়ার কথাই বলিয়াছিলেন। বাবাজী আরও বলিলেন,—ভীষণ বৃষ্টি হইতেছে, ঘরে লইয়া যাইবার পথে লোকটি আবার ভিজিয়া যাইবে। অতএব এক কাজ কর; আর একখানা কম্বল দিয়া তাহাকে ঢাকা দিয়া লও।

তারপর আমরা চারিজন সাধু—তিন জনে তাহাকে বহন করিলাম এবং চতুর্থ ব্যক্তি পিতমদাস লণ্ঠন ও চিমটা হাতে করিয়া আগে আগে গেল। পিতমদাস ছিল রোগা ও ক্ষীণদেহ। আমরা সকলে তাহাকে ঘরে লইয়া গেলাম; কিন্তু ঘরের দরজায় তালাবন্ধ ছিল। বাবা লোকনাথ বলিলেন,—এখনও বৃষ্টি হইতেছে, অতএব তোমরা গিয়া চাবি আনিতে পারিবে না। আপাততঃ চিমটা দ্বারাই তালা খোল, চিমটার

সাহায্যে দরজার কড়াটি টানিয়া খোলা হইল; কিন্তু তালাটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায়ই রহিয়া গেল।

আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটা মাচা আছে। লণ্ঠন আমাদের সঙ্গেই ছিল। বাবা লোকনাথ বলিলেন,—লোকটিকে মাচার উপর রাখ। আমরা সকলে এই মেঝের উপর শয়ন করিব।

এইরূপভাবে সাক্ষীর বর্ণনাটি অগ্রসর হইয়াছে। জেরার সময়ে এই বর্ণনার সহিত বিস্তৃত বিবরণ জড়িত হইয়া ইহাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছে। কোথাও এই কাহিনী ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—এমন কি, ১৯১২ সালের পর নূতন সুধীরকুমারী রোড নির্ম্মিত হওয়ার ফলে দার্জ্জিলিংএর যে অঞ্চলের এতটা পবিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, পুরাতন শ্মশানের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই জটিল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অবস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নেও সাক্ষী উতরাইয়া গিয়াছে। সাক্ষী বলিতেছে যে, উক্ত ঘটনার পর আর সে দার্জ্জিলিংএ যায় নাই। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে, সে মানচিত্রও বুঝিতে অক্ষম। তাহার এই বর্ণনা যেন রূপকথার মতই মনে হয়। নিজের চেহারার সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাদীকে যদি এই কাহিনীর উপর নির্ভর করিতে হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাদীর চেষ্টা বিফল হইত। কেননা, এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আর এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, বাদীই দ্বিতীয় কুমার।

সাক্ষীর বর্ণিত কাহিনীর অবশিষ্টাংশ অতি সংক্ষেপেই বলা যাইতে পারে। সন্ন্যাসিগণ যে ঘরে লোকটিকে লইয়া গিয়াছিল, সেই ঘরেই তাহারা একদিন ছিল। পরদিন সকালে ঘরের মালিক আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিলেন। কম্বল তৈয়ারীর কারখানার মতন একটা কারখানা হইতে তাহাদিগকে একটা কম্বল এবং কবিরাজী ঔষধ দেওয়া হইল, ক্রমেই এই ঘরে

লোক যাতায়াত আরম্ভ করিল। এই অবস্থায় সন্ন্যাসীরা লোকটিকে লইয়া আরও নীচের দিকে একটা ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল, তখনও এই লোকটির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। সেই ঘরে ১৪।১৫ দিন থাকিয়া তাহারা দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিল। লোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনিবার ২।৩ দিন পরে সে চৈতন্য লাভ করিল; কিন্তু সে তখন বোবা ও নির্ব্বোধের মত আচরণ করিতে লাগিল। তবে জ্ঞান সঞ্চারের পর সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি এখন কোথায় আছি।

কুমারের সন্ন্যাস জীবন

১৯০৯ সালের মে হইতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কুমারের সন্ন্যাস জীবন। ঐ সময়ের মধ্যে কুমারের কোনও খোঁজ ছিল না। তাঁহার কথাও কেহ শুনে নাই। ঐ সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন, তাহাও কাহারও জানা ছিল না। কুমার জীবিত আছেন—এই জনপ্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও ঐ সময়ের মধ্যে কুমারকে জীবিত ধরিয়া লইয়া কেহ কোনও কাজ করে নাই। এই সময়ের মধ্যে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, আমি পূর্ব্বেই তাহা বর্ণনা করিয়াছি। তাহা হইতে বুঝা যায়, কুমারের মৃত্যুই সাব্যস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। বাদী ঐ সন্ন্যাস জীবনের যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সত্যতা তাঁহার নিজের এবং দর্শনদাসের প্রমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল প্রমাণের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যদ্দারা বাদী ও কুমার অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অন্যান্য যুক্তি বাহির হইতে পারে। বাদীর বর্ণনা সংক্ষেপতঃ এই :—

জঙ্গলময় পাহাড়ের মধ্যে একচালা ঘরে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। তখন তিনি দেখিতে পান, সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে, তিনি চারিজন সন্ন্যাসীর নাম করেন।

আমি এই স্থানে ১৫।১৬ দিন ছিলাম। এই কয় দিন

সন্ন্যাসীদের সহিত আমার কোনও কথা হয় নাই। তারপর কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। কতক পায়ে হাঁটিয়া কতক রেলে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা যাহা আমার মনে পড়ে, তাহা এই :—তারপর আমি কাশীতে যাই কাশীতে আমি ঘাটে থাকি, সন্ন্যাসী চতুষ্টয় তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন, অসিঘাটে আমরা এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকি। সেখানে বহু বাঙ্গালী ও পশ্চিম দেশীয় সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। দুইজন বাঙ্গালী সাধু সেখানে আসেন, আমি তাঁহাদের সহিত আলাপ করি। বাঙ্গলায় তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা হয়। পশ্চিম দেশীয় সাধুদের সহিত হিন্দীতে কথা বলিতাম। যে চারিজন সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, আমি হিন্দীতে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতাম; তাঁহারাও আমার সহিত হিন্দীতে কথা কহিতেন। আমি কে ছিলাম, এ সময় আমার স্মৃতি লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন তিনি চারজন সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছেন। ভ্রমণকালে তিনি একবার কাশ্মীরে অমরনাথের মন্দিরে গমন করেন। অসিঘাট যাওয়ার ৪ বৎসর পরে তিনি তথায় যান। অমরনাথে তিনি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ধরমদাস নাগার শিষ্য হন। শ্রীনগর বাজারে গুরুদেবের নাম তাঁহার হাতে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীনগর হইতে তিনি আবার অনেকদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি নেপালে যান, নেপালের পশুপতিনাথের মন্দির হইতে তিনি তিব্বত গমন করেন; তিব্বত হইতে পুনরায় নেপাল আসেন। তথায় তিনি প্রায় একবৎসরকাল থাকেন, তথায়ও চারজন সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গে ছিল, ঐ সময়ই তিনি স্মরণ করেন যে, তাঁহার বাড়ী ঢাকাতে ছিল।

ঐ সময় তাঁহার মনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, অসিঘাটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কিছুই স্মরণ করিতে পারেন নাই, অমরনাথেও তিনি স্মরণ করিতে পারেন নাই, তিনি কে এবং তাঁহার বাড়ী কোথায়, আত্মীয় স্বজন কোথায়, মন্ত্র গ্রহণের পর তাঁহার সহিত তাঁহার গুরুদেবের আলাপ হয়। তিনি তখন জানিতে পারেন দার্জ্জিলিং শ্মশানে তাঁহাকে ভিজা অবস্থায় পাওয়া যায়। যখন তিনি চিন্তা করিতে থাকেন, তিনি কে, কোথায় বাড়ী এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন কাহারা—তখন তিনি গুরুর নিকট তাঁহার মনের কথা বলেন, তখন গুরুদেব তাঁহাকে বলেন, যথা সময়ে তোমাকে তোমার বাড়ী পাঠাইব। তিনি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি পৃথিবীর মায়া কাটাইতে পারেন, তাহার বাড়ীঘরের মায়া কাটাইতে পারেন তাহা হইলে গুরুদেব তাঁহাকে সন্ন্যাসী মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন।

তিনি যখন ব্রাহ্মোচ্ছত্র আসেন, তখন তাঁহার মনে পড়িয়াছিল তাঁহার বাড়ী ঢাকা, তাঁহাকে তখন বাড়ী যাইতে বলা হয়, তিনি তখন একা বাড়ী রওনা হন এবং অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া ঢাকা আসিয়া পৌঁছেন। 'আমি যখন ঢাকা ষ্টেশনে নামি, তখন আমর মনে পড়ে, আমি অনেকবার এইখানে যাতায়াত করিয়াছি'—অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা না করিয়াই বাকল্যাণ্ড বাঁধের দিকে যাইতে থাকেন।

অতঃপর আমি যে সকল ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছি,তাহাই ঘটে। প্রথম তিনি যখন জয়দেবপুর যান তখন তাঁহার নিকট সকলই পরিচিত মনে হয়। এমন কি বাকল্যাণ্ড বাঁধেও যে সমস্ত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বলিত "ইনিই ভাওয়ালের কুমার" তাহাদের মধ্যেও অনেককেই তিনি চিনিতে পারেন। তিনি বলেন, তিনি যখন প্রথম জয়দেবপুরে যান তখন তাঁহার পূর্ণস্মৃতি ফিরিয়া আসে।—এই সকল কথা খুবই অসম্ভব বলিয়া

মনে হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল অস্বাভাবিক ব্যাপারের গবেষণা করেন, তাহা হইতে অধিক অস্বাভাবিক নয়। যুদ্ধের সময় হাঁসপাতালে এমন অনেক রোগীকে চিকিৎসা করা হইত যাহারা স্নায়বিক দুর্ব্বলতাবশতঃ বাড়ী ঘরের সব কথা ভুলিয়া যাইত। তাহাদের ব্যাধির চিকিৎসা কলেরা বসন্তের চিকিৎসার মতই স্বাভাবিক মনে করা হইত। কিন্তু যাহারা সাধারণ বুদ্ধির দোহাই দেন তাহাদের নিকট হয়ত উহা বিশেষ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত। মামলার উভয়পক্ষ হইতেই ডাক্তার উপস্থিত করা হইয়াছে। বাদীপক্ষে রাঁচীর ইউরোপীয়ান পাগলাগারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল হিল, আই, এম, এস, এম, ভি বলেন, তিনি মানসিক বিকার সম্পর্কে পড়াশুনা করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী মেজর ধনজীভাই আই. এম, এস, এবং মেজর টমাস্ আই, এম, এস, বিলাতে গুলীগোলার আহত লোকের চিকিৎসা করিয়াছেন। মেজর ধনজীভাই অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে ডাঃ টেলরের একখানা পুস্তকের নাম সাক্ষ্যদানকালে উল্লেখ করেন। উভয় পক্ষই ঐ বইখানার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বইয়ের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিব না, কারণ উভয় পক্ষের ডাক্তারই কতকগুলি বিষয়ে একমত। শরীরে কোন আঘাত না লাগিলেও যে স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতে পারে তৎবিষয়ে উভয় পক্ষই একমত। মনের কতখানি বিকৃতি হইতে পারে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। উহা কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন একটি লোকের কি ভাবে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ঐ অবস্থা কতদিন চলিতে থাকে তৎসম্পর্কে গবেষণা করিয়া মাত্র কয়েকটি টাইপ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইয়াছে। একটি টাইপ অপসর্পণ অপর ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্বের মনোভাব। অপসর্পণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেভারেণ্ড হেনার ঘটনা। তিনি একদিন প্রাতে মনে করিতে লাগিলেন,

তিনি সদ্যজাত শিশু, তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, এমন কি জিনিষপত্র সম্পর্কে চেতনা তিনি হারাইলেন। তিনি শিশু অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। সিডিস এবং গুডহাটের 'একাধিক ব্যক্তিত্ব' নামক পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এই প্রকারের ঘটনা খুব কম ঘটে, হয়ত উহাই একটি মাত্র ঐ ধরণের ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে। এই যে শৈশবাবস্থা প্রাপ্তি, ইহা মনের সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি। অপর টাইপ দুই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব লোপ—ইহাকেও একভাবে অপসর্পণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, কিন্তু ভুলে যায় সে কে। এই সম্পর্কে রেভাঃ এ্যান্সেল বোর্ণ এবং জেনেট রাওয়ের হিষ্টিরিয়ার লক্ষণগুলির কথা এবং কয়েকটি গোলাগুলীতে আহত লোকের অবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, দুই বা ততোধিক লোক একত্রে বাস করিতেছে। কিন্তু একজন অপরের বিষয় কিছুই জানে না, তাহাকে চিনে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহার চিন্তাধারা জেমস। প্রিন্সিপস অব সাইকলজীতে ফেলিদাওলিও লাইন ঐ ধরণের লোক। ডাঃ প্রিন্সেফএর বইয়ে মিসবুকাম্প ঐ ধরণের লোক, এই সকল ঘটনার কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, মেজর টমাসের মতে বাদীর ঘটনায় ডবল ব্যক্তিত্বের টাইপের লক্ষণ দেখা যাইতেছে—যেখানে একজন লোক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে কিন্তু কিছু সময়ের জন্য সে কে তাহা মনে করিতে পারিতেছে না। রেভাঃ এ্যান্সেল বোর্ণের ঘটনা এইরূপ :—একদিন হঠাৎ সে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়। দুইমাস পরে সে দেখিতে পায়— 'ব্রাউনের' নামে সে পেনিসিলভেনিয়ার দোকান করিতেছে। চার্লসের ঘটনা এইরূপ :—একটি রেল দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ১৭ বৎসর পরে সে দেখিতে পায় তাহার বিবাহ হইয়াছে এবং ৪টী সন্তান হইয়াছে, কিন্তু তাহার যে ২৪ বৎসর বয়স নয়, তাহা

সে কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, কারণ ২৪ বৎসর বয়সের সময় সে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। জেমেটের বইয়ের রায়ের ঘটনা এইরূপঃ—রায় কে, তাহা সে ভুলিয়া যায়, নানাস্থানে কাজকর্ম্ম করে এবং চারমাস পরে বাদীর ঘটনাও এইরূপঃ—তিমি কি তাহা তিনি ভুলিয়া যান, ১২ বৎসর সন্ন্যাসীদের সহিত ঘুরিয়া বেড়ান এবং পরে তাঁহার মনে পড়ে, তাঁহার বাড়ী ঢাকায় এবং ঢাকায় ধীরে ধীরে তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসে।

বাদীর উক্তিতে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা মেজর টমাস অসম্ভব বলিয়া মনে করেন; তিনি বলেন যে, প্রথমতঃ দার্জ্জিলিংএর ঘটনা হইতে অসিঘাটের ঘটনা পর্য্যন্ত বাদীর জ্ঞান ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি যখন তাঁহার প্রথমাবস্থা ফিরিয়া পাইলেন, তখন দ্বিতীয় অবস্থা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নহে, তৃতীয়তঃ এইরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না, তবে মুর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ হয়। মেজর ধনজীভাই প্রায় উক্ত অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন। লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল হিলের মানসিক রোগ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বাদীর উক্তি অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না। বাদী যদি শৈশব অবস্থায় থাকেন তবে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা বারবার বলা হইয়াছে। বাদী শৈশব অবস্থায় আছেন বলিয়া বলেন নাই। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন তাহাই বলিয়াছেন, তিনি অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। তিনি গাছ গাছড়া, পাহাড় পর্ব্বত সন্ন্যাসী, খাট ইত্যাদির কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু দার্জ্জিলিং হইতে অসিঘাটের ঘটনা তিনি স্মৃতি পথে আনিতে পারেন নাই। তাঁহার এই মানসিক অবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা আমি তাঁহার নিকট বা অন্য কাহারও নিকট আশা করি না, তাঁহার এই বর্ণনা বিশ্বাস করা

যায় না। যদি ইহা বিশ্বাসও করা হয়, তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন উহা শিশুর উক্তি বলিয়া বলা যায় না, এই অবস্থা স্মৃতিশক্তি লোপের চরম অবস্থা, ইহার মধ্যে অবস্থার স্তর নাই বলিয়া যে মেজর ধনজীভাই বলিয়াছেন—উহা আমি সমর্থন করি না। মেজর টমাস বলিয়াছেন :—

"তাঁহার স্মৃতিলোপ অবস্থায় তিনি পারিপার্শ্বিক নানারকম অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়াছেন। একজন লোক মনের এলোমেলো অবস্থায় দিন কাটাইয়া যাইতেছে আর একজন লোক স্বাভাবিক-ভাবেই চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু মনের অবস্থা স্বাভাবিক নহে। আমরা এই দুই অবস্থার মধ্য হইতে কতকগুলি বিষয় জানিতে পারি।

এই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া যে একজন লোক যাইতে পারে না, তৎসম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই বা কোন যুক্তি নাই। টেলার্সের পুস্তকের ৩০৮ পৃষ্ঠায় সৈনিকের মনের অপসর্পণ সম্পর্কে চারিটী বিবরণ আছে। ১নং বিবরণে বলা হইয়াছে যে, একজন সৈনিক পনর মাসের শিশুর মনের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিল, কিন্তু সে সিগারেট ধরাইতে পারিত। সমুদয় বিবরণের মধ্যে অবস্থার স্তর ছিল, আমি 'এ্যবনরম্যল সাইকোলজি' হইতে এই সম্পর্কে একটা অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মধ্যে স্মৃতি লোপের ঘটনা অনেক দেখা যায়। আমি এই প্রকার অনেক ঘটনা দেখিয়াছি। এই রকম ঘটনায় সচরাচর দেখা যায় যে, রোগী সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছে। সে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা স্মৃতি শক্তি ফিরাইয়া আনিতে পারে না, তাহার আগেকার কোনও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না, এই প্রকার অবস্থায় একজন সৈনিক তাহার নাম, রেজিমেণ্টের নম্বর, সে বিবাহিত কি অবিবাহিত কোথায় তাহার

বাড়ী, তাহার ব্যবসা কি ছিল, অথবা তাহার আগেকার জীবন সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারে না। তবে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা মনে রাখিতে পারে এবং স্বাভাবিক অবস্থার মতই জিনিষপত্র ব্যবহার করিতে পারে, লিখিতে পড়িতে পারে এবং ভাবা বুঝিতে পারে, কোনও ঘটনা সম্পর্কে তাহার স্মৃতিশক্তির অভাব ব্যতীত অন্য ব্যাপারে সে স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকে। একজন আগন্তুক তাহার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই দেখিবে না।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এই সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। সামান্য পরিবর্ত্তনসহ এই প্রকার অবস্থা যে আরম্ভ হইতে পারে না তাহার কোন যুক্তি নাই, তবে এই শ্রেণীর ঘটনা অত্যন্ত কম। নানাপ্রকার অবস্থার সমন্বয়ের ঘটনা প্রচুর আছে। এই স্মৃতিলোপ অবস্থা কয়েক দিন হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে বলিয়া দেখা গিয়াছে। চার্লসের ঘটনা আছে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন অস্বাভাবিক অবস্থার কথা মনে থাকে না। ইহাকে একটা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রেভারেণ্ড হেনা তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার স্মৃতিলোপের কাল সম্পর্কে লিখিয়াছেন, ডাঃ প্রিন্স লিখিয়াছেন যে, যদি কাহারও আত্মবিভ্রম ঘটে, তবে যে স্মৃতিলোপও হইবে তাহার কোন যুক্তি নাই। বাদী যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে—এই প্রকার কোন নিয়ম নাই। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ যে থাকিবে এমন কোন কথা নাই, কিন্তু উহা থাকিতে পারে। কুমারের যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ছিল না তাহাও কেহ খোঁজ করেন নাই। বাদীর সম্পর্কে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছে কেন, মিঃ চৌধুরী তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহার উত্তর এই যে, অন্য ঘটনার দ্বারা যদি বাদীর পরিচয়

পাওয়া যায়, তাহা হইলে দার্জ্জিলিংএর পরের ঘটনার উপর তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ থাকে না এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে অজুহাত দেখাইয়া ইহা অগ্রাহ্য করিবার কোন যুক্তি নাই।

বাদী কি হিন্দুস্থানী ?

একজন হিন্দুস্থানীকে, মধ্যম কুমারের মত দেখা যাইবে, তাহার দেহে কুমারের চিহ্ন থাকিবে, কি ভাবে মেজকুমার নাম লিখিতেন তাহা ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে অভ্যাস করিবে, আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বাদ দিয়া এবং অন্য সকল বাদ দিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে পারি না। আমি এই সম্পর্কিত সাক্ষ্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।

বিবাদীপক্ষ বাদীকে পাঞ্জাবী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষ আর কিছু প্রমাণ করিতে বাধ্য নহেন। বাদী প্রকৃত প্রস্তাবে এই লোক, একথা প্রমাণ করিতে বিবাদীপক্ষ বাধ্য নহেন। তথাপি মামলার শুনানীর সময় বাদীকে পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার আউজলা গ্রামের মাল সিং বলিয়া প্রমাণ কবিবার একটা চেষ্টা হয়।

বিবাদীপক্ষের জবাবের মধ্যে কিন্তু এরূপ কথা নাই, বাদীকেও স্পষ্ট করিয়া একথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আউজলার মাল সিং—যে ব্যক্তি ধরমদাস নাগার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর সুন্দরদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই বাদী হইয়া আসিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন বাদীকে করা হয় নাই।

এই সম্পর্কে যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে ১৯২১ সালের দিকে দৃকপাত করা আবশ্যক ঐ বৎসরের ৪ঠা মে বাদী নিজেকে কুমার বলিয়া

ঘোষণা করেন। ৬ই ও ৯ই তারিখের মধ্যে সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর এফিডেভিট দেন এবং তাঁহাকে মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রমাণাদি বজায় রাখিতে বলেন। তিনি ঢাকার কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসের নিকটও মৃত্যুর এফিডেভিটের একখানা নকল পাঠান এবং ৮ই মে তারিখে মিঃ লিণ্ডসের প্রস্তাবনাক্রমে যাহাতে ৯ই তারিখে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য ইংলিশম্যান পত্রিকার নিকট এক পত্র লিখেন ও ১৯০৯ সালের ৯ই মের শব সংকারের সাক্ষী ঠিক রাখিবার জন্য ১৫ই মের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যান। ১৯শে মে বাদী মিঃ লিণ্ডসের এজলাসে হাজির হইয়া তদন্তের প্রার্থনা করেন। ৩১শে মে দারোগা মমতাজউদ্দীন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এষ্টেটের জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা বাদীর পরিচয় স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব যায়। মিঃ লিণ্ডসে ইহা জানিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯২১ সালের ২৭শে জুন সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভাওয়ালের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের নিকট পাঞ্জাব হইতে এক রিপোর্ট দেন। একজিবিট নং ৩৪৭ হইতেছে ঐ রিপোর্ট। রিপোর্টে সে বলিয়াছে :—

সে ও এই তদন্তের উদ্দেশ্যে মনোমোহন বাবু নামে পরিচয় প্রদানকারী দারোগা মমতাজউদ্দীন উভয়েই কলিকাতায় আসে এবং তথা হইতে বহুস্থানে ঘুরিয়া পরিশেষে হরিদ্বার আসিয়া পৌঁছে। হরিদ্বারে আসিয়া সে (সুরেন্দ্র) জানিতে পারে যে, হীরানন্দ নামে এক সাধু কন্‌খলে বাস করে। সে সাধুর কোন শিষ্যকে ফটোখানি দেখাইলে শিষ্য বলে যে, উহা শান্তদাস নামে পরিচিত ধরমদাসের জনৈক শিষ্যের ফটো। ঐ দিনই সে ও দারোগা মমতাউদ্দীন অমৃতসর গিয়া অমৃতসরস্থ সাঙ্গওয়ালা আখড়াতে হীরানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তথায় হীরানন্দ ও তাহার শিষ্য শান্তরামকে ঐ ফটো দেখায়। ফটো দেখিয়া

শান্তরাম বলে, ইহা ধরমদাসের শিষ্য সুন্দর দাস বাবাজীর ফটো। অতঃপর সে ও দারোগা মমতাজউদ্দীন অমৃতসর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী ছোট সংস্রাতে যায় এবং তথায় ধরমদাসের সহিত দেখা করে। তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, ধরমদাস তথায় বাস করিত। ধরমদাস জয়দেবপুরের সাধুর ফটো দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারে এবং ঐ সময়ে ধরমদাসের অপর একজন শিষ্য দেবদাসও ফটো চিনিতে পারে; উভয়েই বলে যে, উহা সুন্দরদাসের ফটো; ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন লাহোর জিলার আউজলার নারায়ণ সিং সুন্দরদাসকে ধরমদাসের নিকট লইয়া আসে, তখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। ধরমদাস তাহাকে শিষ্য করিয়া লয়। সুন্দরদাস পিতৃমাতৃহীন। নারায়ণ সিং মণ্টগোমারী জিলার ৪৭নং চকে বাস করে। ২৭-৬-২১ তারিখে ধরমদাস, দেবদাস, বিষেণ দাস, চিরণ দাস, শান্তরাম দাস প্রভৃতি সকলকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয় এবং সকলেই "সুন্দরদাসের দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো" সনাক্ত করে। অতএব জয়দেবপুরের সাধু যে একজন পাঞ্জাবী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সংস্রার ধরমদাসের বিষয়েও অবগত হওয়া গিয়াছে যে তাহার বহু শিষ্য আছে। এই শিষ্যগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে ও উহা পাঠাইয়া দেয় এবং ধরমদাস নিজেও ঐরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়। ধরমদাসের বয়স ৫৫ বৎসর; তাহার গায়ের বর্ণ কালো, মাথায় জটা ও দাড়ি আছে। ধরমদাস বলে যে, ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরদাস এলাহাবাদের কুম্ভমেলা হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা দেয়, সুন্দরদাসের বয়স প্রায় ৩০ বৎসর এবং তাহার গোঁফ ও দাড়ি ছাঁটা।

সুন্দরদাস তাহার সঙ্গেই বাস করিত। একটা পুনশ্চ আছে। এই পুনশ্চর মধ্যে বলা হইয়াছে, সুন্দরদাসের আসল নাম এবং

তাহার পিতার নাম নির্দ্ধারণ করা যায় নাই, তবে কেবলমাত্র তাহার কাকার নাম পাওয়া গিয়াছে। লেংটি পরিহিত যে সাধুর ফটো ফণীমোহন বসু দিয়াছেন, তাহাই যদি জয়দেবপুরের সাধুর ফটো হয়, তাহা হইলে সেই সাধু নিশ্চয়ই সুন্দর দাস।

ইহাই রিপোর্টের মর্ম্ম। ৪-৭-২১ ইং তারিখে দ্বিতীয় রাণী এই তদন্তের ফলাফল তারযোগে ম্যানেজারের নিকট প্রেরণ করেন। তারবার্ত্তায় বলা হয় :—

"এই মাত্র তার পাওয়া গেল ; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।"

২।৭।২১ ইং তারিখে ম্যানেজার, সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রিপোর্টের ইংরাজী অনুমান করিয়া মিঃ লিণ্ডসের নিকট প্রেরণ করেন। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, তাহারা কতকটা সন্ধান পাইয়াছে। অতএব আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতেই তাহারা এই লোকটির প্রকৃত পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। পত্রের মধ্যে ইহাও লিখিত হইয়াছিল যে, কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে রেভিনিউ বোর্ড নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছেন; অধিকন্তু সাধুর প্রকৃত পরিচয়ও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। অতএব নোটীশের কোনও অংশ পরিবর্ত্তনের কোন প্রস্তাব থাকিলে, তাহার বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করা কর্ত্তব্য (৩৮৮নং একজিবিট)।

উপরে যে নোটীশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ৩।৬।২১ ইং তারিখের নোটীশ। ইহাতে বাদীকে ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া ঘোষণা করিবার কথা ছিল। ৫।৭।২১ ইং তারিখের ২১৮নং একজিবিট দৃষ্টে তাহাই মনে হয়। পূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া পরে যে তার করা হইয়াছিল তাহার অর্থ এই যে, ইনস্পেকটার মমতাজউদ্দীন (তিনি নিজেই এরূপ বলিয়াছেন)। ১।৭।২১ ইং তারিখের পূর্ব্ব আউজলায় গিয়া শাঁসরায় প্রাপ্ত বিবরণের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ২৭।৬।২১

ইং তারিখে শাঁসরায় ধরমদাসের নিকট হইতে জানা যায় যে, বাদী শাঁসরার মাল সিং ছাড়া আর কেহই নহে। এই ট্রেলিগ্রাম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার পর একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, এই তদন্তের সহিত সত্যবাবুর কোন সম্পর্ক ছিল না। তদন্তের ফলাফল সর্ব্বাগ্রে তাহারই নিকটে আসিয়াছিল এবং ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

২৭।৬।২১ ইং তারিখে ধর্ম্মদাস নাগা নামক এক ব্যক্তি, অমৃতসর হইতে ৭ অথবা ৮ মাইল দূরবর্ত্তী রাজা শানসি নামক স্থানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনাণ্ট রঘুবর সিংহের নিকটে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করে। এই ধরমদাস নাগাকে আমি ২নং ধরমদাস বলিয়া অভিহিত করিব। বাদীর গুরু ধরমদাসকে ১নং ধরমদাস বলা যাইতে পারে। ২নং ধরমদাস এইরূপ বিবৃতি দান করে ঃ—

আমার নাম ধরমদাস। আমি হরনামদাসের চেলা। আমি উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, বয়স ৪৫ বৎসর। ঠিকানা শাঁসরা। পেশা সেবাদারী, মৌজা শাঁসরা, থানা আউজলা, জেলা অমৃতসরে আমার বাস। এই ছবি আমাকে দেখান হইয়াছে। ইহা আমার চেলা সুন্দরদাসের ছবি পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল মাল সিং। সে লাহোর জেলার আউজলা মৌজায় বাস করিত। তাহার পিতার ছোট ভাইয়ের ছেলে—অর্থাৎ তাহার কাকার ছেলে নারাইন সিং এখন মণ্টগোমারী জেলার চক ৪৭এ বাস করে। এই নারাইন সিংই আমার নিকটে নানকানা সাহেবে উক্ত মাল সিংহকে লইয়া আসিয়াছিল। ইহা ১১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় আমি মাল সিংহকে আমার চেলা করিয়াছিলাম। তখন মাল সিংহের বয়স ছিল ২০ বৎসর। উজাইলের মাঙ্গা সিং এবং লাব সিং হইতেছে উক্ত মাল সিংএর কাকা। তাহারাই মাল সিংকে লালন পালন করিয়াছিল। ছয় বৎসর

পূর্ব্বে মাল সিং আমার নিকট হইতে চলিয়া যায়। সুন্দর দাসের চক্ষু ছিল উজ্জ্বল এবং শরীরের রং ফর্সা। প্রয়াগে (এলাহাবাদে) কুম্ভমেলার সময় প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তারপর আমার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। এই তসবীর (ফটো) যাহাকে পি ১নং একজিবিট করা হইয়াছে তাহাই আমার চেলা সুন্দর দাসের তসবীর (ফটো)।"

বিবৃতিদানকারীর সম্মুখে পঠিত এবং নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত।
২৭।৬।২১ ইং।

লেপ্টেনাণ্ট রঘুবর সিং এই বিবৃতির কথা প্রমাণ করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট ইহারা লাহোরের এক কমিশনারের রঘুবর সিং কর্ত্তৃক পি ১নং—এইরূপ চিহ্নিত ফটো দেখিয়া ২৭-৬-২১ ইং তারিখে ধরমদাস নামক এক ব্যক্তি এই বিবৃতি প্রদান করিয়াছে; এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ঠিক সেই সময়ে এবং সেই স্থানে উক্ত ফটোখানি দেখিয়া আরও কয়েক ব্যক্তি বিবৃতি দান করে। যথা :—দেবদাস, কালা সিং, ভগত সিং, কর্ত্তার সিং এই সকল ব্যক্তির নাম দিয়া সাব ইনেসপেক্টার মমতাজউদ্দীন একখানি আবেদন করিয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট রঘুবর সিং এই আবেদন পাইয়া ছয় ব্যক্তির উক্তি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার উল্লেখ করেন। সে যাহাই হউক, লেপ্টেনাণ্ট রঘুবর সিং এই সমস্ত বিবৃতি পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করেন।

বিবৃতিপ্রদানকারী ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া না আনা পর্য্যন্ত এই সকল বিবৃতির মধ্যে একটিও প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যায় না। ধরমদাসের বিবৃতিতে মাল সিং সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সে ছিল আউজলার অধিবাসী। নারাইন সিং ছিল তাহার খুড়তুত ভাই। ইহাতে প্রত্যেকের ঠিকানা আছে। ১৯১০ সালে মাল সিংএর দীক্ষা হয়। ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত সে

ধরমদাসের সঙ্গেই থাকে। ১৯১৭ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় তাহাকে দেখা যায়। ১৯১০ সালে যদি তাহার বয়স ২০ বৎসর থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এখন তাহার বয়স ৪৬ বৎসর হইবে। লেপ্টেনাণ্ট রঘুবর সিং কর্ত্তৃক পি-১ চিহ্নিত ফটোতে যে লোক-টিকে দেখা যাইতেছে, মালসিংএর চেহারা সেইরূপ ছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাদীর গুরু ধরমদাস নাগা ১০২০ সালের আগষ্ট মাসের ২৬শে তারিখে ঢাকায় আসেন এবং ৩০শে তারিখে চলিয়া যান। মিঃ লিণ্ডসে তাহাকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁহার সহিত দেখা করেন ; কিন্তু দেখা না করিয়াই ধরমদাস নাগা চলিয়া যান। বাদীর সাক্ষ্য এই যে, পুলিশের ভয়ে ভীত হইয়া ধরমদাস ঢাকা পরিত্যাগ করেন। বাদী তাঁহার আবেদন পত্রের মধ্যে স্বীকার করেন যে, বিরুদ্ধ-বাদিগণের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া তিনি পাঞ্জাবের পুলিশের নিকট একটি বিবৃতি দান করিয়াছিলেন।

মামলার শুনানীর সময় বাদী প্রস্তাব করেন যে, ঢাকায় আসিয়া ধরমদাস যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা আদালতে প্রমাণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ ধরমদাসকে আদালতে হাজির করিতে না পারিলে এই-বিবৃতিকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না ; এমন কি ধরম-দাসকে আদালতে ডাকিয়া আনিলেও সম্ভবতঃ এই বিবৃতিকে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা চলে না। বিবাদী পক্ষ কিম্বা বাদী পক্ষ হইতে কোনও কালে প্রস্তাব করা হয় নাই যে, এই ধরমদাসকে সাক্ষী স্বরূপে আহ্বান করা হইবে। সাক্ষ্য হিসাবে আমার নিকট যাহা উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতেছে কমিশনে গৃহীত লাহোরে ১০ জন লোকের সাক্ষ্য। সম্মুখে ফটো দেখিয়া সনাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদী প্রকৃতপক্ষে মাল সিং।

২১-৯-৩৫ ইং তারিখে বন্ধের পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমার সম্মুখে

একটি লোককে উপস্থিত করা হয়। সে বলে যে,সেই ধর্ম্মদাস নাগা। লেপ্টেনান্ট রঘুবর সিংএর নিকটে সে-ই বিবৃতি প্রদান করিয়াছিল। এই সাক্ষী আরও বলে যে, আদালতে উপস্থিত বাদী প্রকৃতপক্ষে তাহারই চেলা সুন্দরদাস। সাক্ষী কখনও দার্জ্জিলিং যায় নাই। বাদীর পূর্ব্ব নাম মাল এবং সে ছিল লাহোর জেলার আউজলার অধিবাসী।

বাদীর বক্তব্য এই যে, এই যে ধরমদাস, সে প্রকৃতপক্ষে একটা প্রতারক। সে বাদীর গুরুদেব সাজিয়া ঢাকায় আসিয়াছিল। সে যে এরূপ ভণ্ড প্রতারক, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাহার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, লোকটি প্রবঞ্চক ; কিন্তু তাহার সাক্ষ্য বিচার করিবার পূর্ব্বে আমি লাহোরে যে ১০ জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের সাক্ষ্য বিচার করিতে চাই। কারণ যে ধরমদাস নাগা আমার আদালতে হাজির হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্যের উপর ইহাদের সাক্ষ্যের প্রভাব রহিয়াছে। এই ১০ জন সাক্ষী হইতেছে—

মাহার সিং, বয়স ৪৫ বছর, ঠিকানা আউজলা।
লাব সিং, বয়স ৪৮ বছর, ঠিকানা হুল্লা।
উজাগর সিং, বয়স ৪৪ বছর, ঠিকানা আউজলা।
মহুয়া সিং, বয়স ৬৫ বছর, ঠিকানা ডাল মুলতানী।
ওয়াসান সিং, বয়স ৬৫ বছর, ঠিকানা আউজলা।
হুকুম সিং, বয়স ৫০ বছর, ঠিকানা আউজলা।
করম দাস, বয়স ৫০ বছর, ঠিকানা আউজলা।
ওয়াজির সিং, বয়স ৫২ বছর, ঠিকানা আউজলা।
মাখম সিং, বয়স ৪৬ বছর, ঠিকানা আউজলা।
ইকুম সিং, বয়স ৫০ বছর, ঠিকানা আউজলা।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাহাদের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে, সাক্ষ্য

দিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্জ্জন সিং বিদেশী নামক জনৈক ব্যক্তি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একখানি ফটো দেখায়। সেই ফটোখানি মাল সিংএর ফটো বলিয়া তাহারা সনাক্ত করে। হুকুম সিং এবং করমদাস ব্যতীত আর সকল সাক্ষীই ইহা স্বীকার করিয়াছে।

১৯৩৩ সালের ৫ই অক্টোবর লাহোরে সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়া গুরুদ্বারে হুকুম সিং ও মাল সিং অর্জ্জন সিংএর সহিত সাক্ষাৎ করে। অর্জ্জন সিং তাহাদিগকে বাদীর দুইখানা ফটো দেখায়। ডি ১ চিহ্নিত ফটোখানি (এক্স এ ২৪০) বাদীর লুঙ্গি পরা বসা চেহারা; আর ডি ২ চিহ্নিত ফটোখানি বাদীর 'গোর্কি' বা বিকৃতি চেহারা। সাক্ষীরা উক্ত ফটোগুলিকে মাল সিং এর ফটো বলিয়া সনাক্ত করে। তাহারা বাদীর আরও কয়েকটী ফটো সনাক্ত করে। ঐ ফটোগুলি অন্যান্য ফটোর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পি ৪, পি ১ ও পি ২ সংখ্যক ফটো তাহার মধ্যে ছিল। একজন সাক্ষী মধ্যম কুমারের একখানি ফটো দেখিয়া (পি ৬ চিহ্নিত ফটো) তাহাকে মাল সিংএর ফটো বলে। শেষোক্ত ফটো সনাক্ত কালে সাক্ষীর একটু দ্বিধাভাবও দেখা গিয়াছিল।

মাল সিং কে?

পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে বেশ বুঝা যায়, একমাত্র সুন্দর সিং ব্যতীত, মাল সিংহের কোনও আত্মীয় ছিল না। সুন্দর সিং মাল সিংহের পিতার ভগ্নী আক্কীর পুত্র, সুন্দরসিংহের বাড়ী খেন্দুওয়ালায় সাক্ষী ওয়াজীর সিংহের বাড়ীও ঐ গ্রামে। ওয়াজীর সাক্ষ্য দিতে আসিল আর সুন্দর সিং আসিল না কেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এই মাল সিংহের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা এই,—

সে আতর সিংহের পুত্র, অত্যন্ত গরীব রাঠোর শিখ বংশে তাহার জন্ম হয়, তাহার মাতার নাম সোয়ানী। মাল সিংহের যখন ৪ বছর কি পাঁচ বছর বয়স তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার ৭।৮ বৎসর বয়সে তাহার পিতা লোকান্তর গমন করে, তখন সে তাহার পিতার ভগ্নী আক্কির নিকট চলিয়া যায়। আক্কির বাড়ী তাহাদের বাড়ীর অতি নিকট। আক্কির মৃত্যুর পর মাল সিং তাব্বির বাড়ীতে যায়, তাব্বির স্বামীর নাম জয়মল সিং। তাহাদের মৃত্যুর পর মাল সিং সুন্দর সিংহের সহিত বাস করিতে থাকে। সুন্দর সিং আক্কির পুত্র; এখন সে খেন্দুওয়ালায় বাস করে। এ সকল কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাল্যকালে সে রাখাল ছিল। ষোল বৎসর বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং সাধু হয়, সাধু হইবার পর সে প্রায় চারিবার গ্রামে আসে। একবার সে তাহার গুরু ধরম দাসের সঙ্গে আসিয়াছিল। শুনা যায়, একবার সে তাহার হাতের উপরকার উল্কির দাগগুলি দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, উহাতে সুন্দর দাসের ও ধরম দাসের নাম লেখা ছিল। একবার নানকানা সাহেবে তাহাকে দেখা গিয়াছিল। নানকানা সাহেবে যে হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, নানকানার সেই হত্যাকাণ্ডের দুই এক বৎসর পূর্ব্বে শেষবার তাহার সাক্ষাৎ মিলিয়াছিল. লেফটন্যাণ্ট রঘুবীর বলেন, ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে নানকানা সাহেবের হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল।

লাহোর হইতে ৪০ মাইল দূরে নানাকানা অবস্থিত। আউজলা গ্রামের সাক্ষীরা বলে, তাঁহারা নানকানার মেলা দেখিতে যাইয়া, মাল সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মামলার বিষয় এই যে, বাদী ১৯২০ সালে বরাবর নানকানা হইতে ঢাকায় আসে। তাহা ছাড়া অতুলবাবুর দুর্ব্বোধ্য হিন্দী ভাষার কথা বলা সপ্রমাণ করার পক্ষে অন্তরায় ঘটে।

লেফটন্যাণ্ট রঘুবীর সিংহের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়, সাক্ষিগণ একজন আত্মীয়ের এবং দুইজন পিতৃব্যের কথা বলিয়াছিল কিন্তু পরে তাহারা একেবারে উধাও হয়, সে সকল আত্মীয় আদৌ ছিল না। আউজলায় ১৯২১ সালে দারোগা মমতাজউদ্দীনের সহিত যে সকল সাক্ষীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং মঙ্গল সিংহের বাসস্থান ও পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে ২৭শে জুন ধরমদাস যে বিবৃতি দিয়াছিল এবং ম্যানেজারের নিকট মধ্যম রাণীর যে রিপোর্ট সম্বন্ধে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, সে সকল রিপোর্ট কি হইল? কেহই সেই সকল প্রমাণ আহ্বান করেন নাই।

ফটো দেখিয়া সন্তোষজনক রূপে সনাক্ত করা চলে না। তাই বিবাদীপক্ষ খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য করেন। তাঁহারা বলেন, মাল সিংহের হাতের উপর উল্কির চিহ্ন ছিল। ধরমদাস আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসে। তাহাকে পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু শিখান হয় নাই বলিয়াই প্রথমে সে বলিয়াছিল যে, ঐরূপ কোনও চিহ্ন সে দেখে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধরমদাস বলে যে, এলাহাবাদে যখন তাহার সহিত মাল সিংহের শেষ সাক্ষাৎ হয়, তখন সে তাহার হাতে ঐ চিহ্ন দেখিয়াছিল।

জেরার সময় লাহোরের সাক্ষীরা অন্যপ্রকার বর্ণনা দেয়। তাহারা বলে,—তাহার রং ফর্সা, তাহার চুল তাহার পিতার চুলের ন্যায় কালো, মুখে তাহার বাদামী রংয়ের গোঁফ, শরীর মোটা, লম্বা দাড়ি, বিড়ালের ন্যায় চক্ষু (কালো নহে), নাক চ্যাপটা, নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ইত্যাদি। 'তাহার পিতার ন্যায় কালো চুল,—এই উক্তি মামলার বিষয় বস্তু নষ্ট করিয়াছে। তাহা ছাড়া লেঃ রঘুবীরের নিকট তাহার কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়াছে। 'মোটা' বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে,

তাহাও বাদীর পক্ষে খাটে না ; কেন না, ১৯২১ সালে বাদী মোটেই মোটা ছিলেন না। সুতরাং ইহা একেবারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, বাদীই সেই মাল সিংহ কি না, মিঃ চৌধুরী সাক্ষীদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিবেন না।

কিন্তু মামলা তাজা করিবার উদ্দেশ্যে এবং ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাক্ষীদিগেব দ্বারা বলান হইয়াছিল (আমি পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি) যে, চুলে তৈল না দিলে এবং অবহেলা করিলে, কালা চুলও বেগুনে হয়, এই ধারণা কিছুকাল চলিয়াছিল। কিন্তু তার পর যখন প্রমাণ হইল যে, বাদীর চুলের রং বাদামী আভাযুক্ত এবং সাক্ষীরা যখন স্বীকার করিল যে বাদীর চুলের রং এবং মধ্যমকুমারের চুলের রং একই প্রকারের, তখন পূর্ব্বের ধারণা দূর হইল।

আমার নিকট ইহা বড় অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, বাদীকে মাল সিং বলিয়া প্রমাণ করা এবং তাহার দ্বারা নানা স্থানের কথা বলান, এবং তাহাকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মুখ দিয়া খুঁটিনাটি বিষয় বাহির করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। আমি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই ঐ সংক্রান্ত সাক্ষ্য আমি ভালভাবেই বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া বুঝিয়াছি,—এই মাল সিং এমন এক ব্যক্তি, যাহার কোন আত্মীয় স্বজন নাই ; তাহার পূর্ব্ব বাসস্থানেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। খেন্দুওয়ালায় তাহার আত্মীয় ছিল, এ কথাও আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা নিঃসন্দেহ যে, লাহোরের সাক্ষীরা একদল কৃষক মাত্র। একখানি ফটো প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, অথচ সে ফটো সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না, তাহা ছাড়া বাদীকে সনাক্ত ও মাল সিংহের সহিত

অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের মুখ দিয়া কতগুলি খুঁটিনাটি বষয় বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

বাদী কি ভাষায় কথা বলিতেন

বিবাদী পক্ষ বলিতে চাহিয়াছেন বাদী ১৯২১ সালে অদ্ভূত ও অবোধ্য হিন্দী অর্থাৎ পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলিতেন। মিঃ ঘোষাল তাঁহার কমিশন জবানবন্দীতে বলিয়াছেন ১৯২৪ সালে বাদীর সঙ্গে যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বাঙ্গলায় কথা বলিতে পারিতেন না। ইহার অর্থ এই যে, বাদী পরে বাঙ্গলা-ভাষা আরম্ভ করেন এবং জবানবন্দীতে তাহার ফল দেখা গিয়াছে।

বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, তিনি প্রায় ১২ বৎসব সন্ন্যাসী-দের সঙ্গে ছিলেন এবং সেই সময় হইতে আত্মপরিচয় প্রকাশের দিন পর্য্যন্ত (১৯২১ সালের ৪ঠা মে) তিনি শুধু হিন্দীই বলিতেন, তদবধি তিনি বাঙ্গলাই বলিয়া আসিতেছেন। দ্বিতীয়-কুমার খাঁটি ভাওয়ালী ভাষা বলিতেন এবং হিন্দীও বলিতে পারিতেন। তাঁহার ভাওয়ালী ভাষা এমন ধরণের ছিল যে, কলিকাতার একজন সাক্ষী (তিনি তাঁহাকে ১৯০৬ ও ১৯০৮ সালে দেখিয়াছেন) বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কথা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই (বাদীপক্ষের ২১২নং সাক্ষী)। ভাওয়ালের অশিক্ষিত লোকেরা ভাওয়ালী ভাষা বলিয়া থাকে, পশ্চিম বঙ্গের খুব কম লোকেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আদালতে বাদী বাঙ্গলায় সাক্ষ্য দেন। যে সামান্য কয়েকটী হিন্দী শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন এবং আমি যাহা হিন্দী বলিয়া মনে করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে সব শব্দ আমি হিন্দী বলিয়া মনে করিয়াছি তাহা হিন্দী নহে, স্থানীয় ভাষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'তিতর'

(তিতির পক্ষী) শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গে এই শব্দটাকে 'তিতির' বলা হইয়া থাকে। আর একটা শব্দ 'গিণ্ডি' পশ্চিম বঙ্গে ইহাকে 'গণ্ডি' বসা হইয়া থাকে। বিবাদীপক্ষের একজন এডভোকেটও একজন সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার সময় 'গিণ্ডি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ভাওয়ালের অশিক্ষিত লোক 'গিণ্ডিই' বলিয়া থাকে, (বাদীপক্ষেব ৫২০নং সাক্ষী)। এমন কি 'কলকাত্তা' শব্দটীও (যাহা হিন্দী উচ্চারণ) আমি একজন ভাওয়ালের লোকের লিখিত ইস্তাহারে দেখিয়াছি। (একজিবিট টি) ফণী বাবুর জয়দেবপুরের বাড়ীকে নয়া বাড়ী বলা হইয়া থাকে। বাদীও ঐ বাড়ীকে নয়া বাড়ীই বলিয়াছেন এবং যদি উহা তিনি না জানিতেন তাহা হইলে তাহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই স্থির করা যাইত। কথার উপর কোন সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক।

ঐরূপ করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ বাদী যে মাঝে মাঝে হিন্দী বলিয়াছেন এবং তাহা যাহাতে না বলিয়া পারেন তাহারও চেষ্টা করেন। তিনি মাঝে মাঝে ইংরেজীও বলিয়াছেন এবং বিস্কুট, বডিগার্ড, ফ্যামিলী গুপ, জকি প্রভৃতি মোট ৫০টি ইংরেজী শব্দ বলিয়াছেন। আমার মনে হয় না যে, এমন কোন ভারতীয় আছে যে, ট্যাক্স, ট্রেণ, রেলওয়ে, গার্ড, ডবল প্রভৃতি শব্দ না জানে এবং যাহারা ইংরেজী জানেন তাহাদের অধিকাংশ লোকই একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিয়া ৫ মিনিট কাল বাঙ্গলা বলিতে পারেন না। সুতরাং বাদী যদি সত্যসত্যই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ১২ বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া থাকেন (যাহা আমি সত্য বলিয়াই মনে করি) হিন্দী ভিন্ন আর কোন ভাষা বলেন নাই। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়াছেন, উলঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিয়াছেন। কাষ্ঠখণ্ড মস্তকে দিয়া জমিতে শয়ন করিয়াছেন। পায়ে হাঁটিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ

করিয়াছেন। যৌবনের প্রথম অবস্থায় মাতৃভাষার মতই হিন্দী বলিতে পারিতেন এবং হিন্দী উচ্চারণ ও হিন্দী টান আয়ত্ত করিয়াছিলেন—তাহা হইলে তিনি যে পুনরায় বাঙ্গলা বলিতে আরম্ভ করিবার সময় মাঝে মাঝে হিন্দী বলিবেন এবং আদৌ হিন্দী না বলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

একথা কেহ বলেন নাই এবং তাহা বলা নেহাৎ বাজে কথাই হইবে, যে তিনি আত্মপরিচয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পোষাক ত্যাগ করিবার মতই হিন্দী বলা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সুতরাং ইহা দেখা দরকার যে, এইরূপ হিন্দী টান, মাঝে মাঝে হিন্দী বলা এবং হিন্দী টান, দিয়া ভাওয়ালী বাঙ্গলা বলার দরুণ ইহা বুঝা যায় কিনা যে, একজন হিন্দুস্থানী বাঙ্গলা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে অথবা একজন বাঙ্গালীহিন্দী ঢংএ কথা বলিতে শিখিয়াছে কিনা।

এই বিষয় বিবেচনা করিতে যাইয়া দুইটী মতবাদকে সহজেই বাতিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। একটি মতবাদ এই যে, একজন বাঙ্গালী যত দীর্ঘকালই 'হিন্দীভাষী' লোকদের সঙ্গে বাস করুক না কেন সে কখনই হিন্দী টান আয়ত্ত করিতে পারিবে না। মিঃ ও সি গাঙ্গুলী কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনি একজন সলিসিটর ও চিত্র-শিল্পী অথবা চিত্র সমালোচক তিনিও ঐ মতই পোষণ করেন। পরিবার লইয়া যে সব বাঙ্গালী পশ্চিম দেশে বাস করেন তাহাদের পক্ষে ঐ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যাহারা বলেন বাঙ্গালা টানের সঙ্গে হিন্দী টান অথবা বিদেশী টান মিশিতেই পারে না আমি তাহাদের সঙ্গে একমত নই। আমার নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই অথবা যে সব ভারতবাসী ইংরেজদের মতই ইংরাজী বলিয়া থাকেন তাহাদের কথাও

উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কারণ আমার নিকট এমন একজন বাঙ্গালী সাক্ষ্য দিয়াছেন যাহার কথায় হিন্দুস্থানী টান ছিল। তিনি যদি অপর এক ঘরে বসিয়া কথা বলিতে থাকেন, তাহা হইলে কেহই তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবে না। তিনি বিবাদী পক্ষের ৯৯০নং সাক্ষী স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী। তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর এবং তিনি ২২ বৎসর বয়স হইতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরিয়াছেন। অপর সাক্ষী অমলেন্দু বাবু। তিনি ঢাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন লোক। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ১২ বৎসর পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করেন। তিনি মাঝখানে যখন একবার বাড়ী আসেন তখন তাঁহার কথায় হিন্দী টান ছিল।

আর একটী বিষয় এই যে বাদীর কথা কিছু বাধ-বাধ। সাক্ষিগণ ইহাকে বাজা বাজা, ভার ভার, চিবান চিবান, আটকা আটকা, আড় আড় বলিয়াছেন। ইহা ঠিক বর্ণনা করা অসম্ভব। ইহা অনেকটা মুখে কিছু রাখিয়া কথা বলার মত। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, যে ভাষা নিজের নহে ইহা সেই ভাষা বলিবার দ্বিধা। বিবাদীপক্ষের কোন সাক্ষীই এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন নাই। কারণ তাহারা বাদীকে শুধু হিন্দী বলিতেই শুনিয়াছেন। অবশ্য তাহাদের ঐ উক্তি কতটা সত্য তাহা বিবেচ্য বিষয়। বাদী যখন মিঃ ষ্টিফেনের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলেন তিনি তখন উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মিঃ রামরতন ছিলেন একজন পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ার এবং তিনি মাসিক ৫০০ টাকা বেতন পান। ১৯২৫ সালে তিনি ৭নং বাবু পার্কে বাস করিতেছিলেন এবং ঐ সময় ৬নং বাবু পার্কে বাদী বাস করিতেছিলেন। মিঃ রামরতনের সঙ্গে বাদীর হিন্দীতে প্রায়ই কথাবার্ত্তা হইত, তিনিও এই অস্পষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদীর হিন্দী বাঙ্গালীর হিন্দীর মত। তিনি

হিন্দীর সঙ্গে বাংলা মিলাইয়া ফেলিতেন। একজন পাঞ্জাবী ধরা না পড়িয়া ঐরূপ ভাণ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব; আমি এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করি।

উচ্চারণ ও বচন-ভঙ্গী

বাদীর উচ্চারণ ও বচন-ভঙ্গী কেন ঐরূপ হইয়াছিল, বাদীই স্বয়ং তাহা প্রমাণ করিবেন, নচেৎ তাঁহার আত্মপরিচয় সংক্রান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে, আমি এ কথা স্বীকার করি না। অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণে এ বিষয় স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও যদি ঐ অভ্যাস জন্মগত বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে বাদীর প্রকৃত পরিচয় প্রমাণ সম্পর্কে কোনই প্রশ্ন আসিতে পারে না। জিহ্বার নিম্নস্থিত মাংসপিণ্ডের জন্য বাদীর উচ্চারণ ভঙ্গী ঐরূপ হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে। বাদী অথবা অন্য যে কেহ হয় তো বলিতে পারেন, বিষক্রিয়ার ফলে অথবা অন্য কারণে ঐরূপ উচ্চারণ ভঙ্গী হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বাদীর কথা বলার ভঙ্গী ঐ রূপই হইয়া গিয়াছে। জিহ্বার নীচে যদি ঐ প্রকারের মাংসপিণ্ড হওয়া একেবারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলেও বাদীর পরিচয় সপ্রমাণ হওয়ার পক্ষে কোনই ব্যাঘাত হইত না। জিহ্বার নিম্নস্থিত মাংসপিণ্ড, উপদংশ, জিহ্বার উপরিভাগস্থিত গর্ত্ত প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে, উচ্চারণ-ভঙ্গী যে ঐ কারণেই বিকৃত হয় নাই, তাহারও কোনও হেতু দেখিতে পাই না। উচ্চারণ বিকৃতির হয় তো অন্য কারণও থাকিতে পারে; কিন্তু সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও জ্ঞান নাই। বাদী এবং অন্যেরা এই বিষয় লইয়া যেরূপ মাথা ঘামাইয়াছেন, এ ক্ষেত্রে সে প্রকার জল্পনা কল্পনার কোনও

প্রয়োজন নাই। অসম্ভবের দিক ধরিলেও দেখা যায় উভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞগণের কেহই দেখাইতে পারেন নাই যে, বচন ভঙ্গী পরে লাভ করা সম্ভব নয়; অথবা বাগযন্ত্রের দোষে অর্থাৎ তালুর মধ্যে ফাটল না থাকিলে এবং মুখাভ্যন্তরের গঠনের জড়তা ভিন্ন ঐ প্রকার হইতে পারে না, বিশেষজ্ঞগণ তাহাও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহার পরও যদি কেহ অসম্ভব বলিয়া প্রশ্ন তুলেন অর্থাৎ উচ্চারণ বিকৃতি অসম্ভব বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে দৃষ্টান্তক্ষেত্রে বচন বিকৃতির প্রমাণ স্বরূপ ডাঃ টেলারের "রিডিং ইন য়্যাবনর্ম্মাল সাইকোলজি" নামক গ্রন্থের ৩৯১ হইতে ৩৯৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিব।

ঐ স্থলে দেখা যায়, যে সকল সৈন্য যুদ্ধে গিয়াছিল স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু তাহাদের অধিকাংশের কথায় ও উচ্চারণে দোষ হইয়াছিল। তাহাদের কথায় একরকমের 'তোৎলামি' আসিয়াছিল, যাহাকে 'ওয়ার ষ্টাটারিং' বা যুদ্ধজনিত তোৎলামি বলিত। কখনও কখনও অল্প কয়েক দিনই সে তোৎলামি সারিয়া যাইত; কিন্তু অন্ততঃ শতকরা ৫ জনেরও তোৎলামি সারিত না। এখনও এমন অনেক যুদ্ধের ফেরত লোক দেখা যায়, যাহাদের কথার বিকৃতি বরাবরই রহিয়াছে (৩৯২ পৃষ্ঠা)।

এই প্রকারের বচন বিকৃতি যে জন্মকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে, তাহা সপ্রমাণ হয় নাই। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, বাদীর বচন বিবৃতি জন্মগত নহে; উহা পরে জন্মিয়াছিল এবং অন্য ভাষায় কথা বলিবার কালে ইতস্ততঃ করার জন্যও কথায় ঐ প্রকারের বিকৃত ভাব আসে নাই।

উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য

বাদীর কথা বলার ভঙ্গীর বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা

যায়,—আত্মপ্রকাশের পর বাদী বাঙ্গলা বলিতে আরম্ভ করেন, এ সম্বন্ধে সাক্ষ্যের অভাব নাই। বাদীর ভগ্নী এবং আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য বহু সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বাদী ১৯২১ সালে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই সকল সাক্ষীর মধ্যে বাদীর ৬২নং সাক্ষী রেবতীবাবুর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমি এই সাক্ষীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রেবতীবাবু ছাড়া আরও কয়েকজন সাক্ষী আছেন তাঁহাদের নাম,—

(১) বাদীপক্ষের ২৬৩নং সাক্ষী যোগেশচন্দ্র রায়, বি-এ ইনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৯২১ সালের জুন মাসে)।

(২) বাদীপক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইনি কোন সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক, ইনি বাদীর আত্মপরিচয় সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দেন নাই (১৯২১ সালের জুন)।

(৩) বাদীর ২৮৭নং সাক্ষী অরুণ নাগ (১৯২১ সালের মে)।

(৪) বাদীপক্ষের ১৫৫নং সাক্ষী মণীন্দ্র বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২১ সালের অক্টোবর ১লা)।

আমি মাত্র কয়েকজনের নাম নির্ব্বাচন করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা ছাড়া আরও অনেক সাক্ষী আছেন। তাঁহাদের অনেকে ভাওয়ালের লোক, আবার অনেকে ঢাকায় কুমারের সহিত মেলামেশা করিতেন। তাঁহারা কুমারের সহিত বাক্যালাপ করিতেন, কুমারও তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, বাদী বাঙ্গলায় কথা কহিতেন; তবে তাহাতে হিন্দীর টান ছিল। ঐ সকল সাক্ষীর কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদী হিন্দী কথাও ব্যবহার করিতেন; এমন কি যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দী কথা কহিত, তাঁহাদের সহিত বাদী হিন্দীতেই আলাপ করিতেন।

বহুলোক বাদীকে জয়দেবপুরে ও ঢাকায় দেখিয়াছিলেন।

বহুলোক অবশ্যই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সেই সকল লোকের মধ্যে বাদী বহু লোককে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাদিগণ মাত্র দুই-একজনকে হাজির করিতে পারিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহের একজন দরিদ্র উকিল, নারায়ণগঞ্জের দুইজন নবীন মোক্তার, চর সিন্দূর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার (ইনি ছেলেদের বেতনের টাকা চুরি করার অপরাধে বরখাস্ত হন) এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন (যাঁহাদের চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ আছে) বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। হেড মাষ্টার মহাশয় যে বেতন চুরি করিয়া ডিসমিস হইয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষ্যেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে না ঘটিয়াছে, তাহা নহে। তথাপি এই সকল সাক্ষ্যের সমালোচনা প্রয়োজন।

১৯২১ সালের কথা বলিতেছি। বাদী পাঞ্জাবী ভাষায় কথা কহিয়াছিলেন ও বাঙ্গলা আদৌ বুঝিতেন না এবং বরাবর নানকানা হইতে আসিয়াছেন, আউজলার সাক্ষীদিগের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে সকল তর্ক বিতর্কের যোগ্য নহে। বাদী নদীর তীরে থাকার সময়ে, দর্শক লোকজন তাঁহার সহিত বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিত। শ্রীযুক্ত দেবব্রত বাবুর সাক্ষ্য হইতেই এক প্রসঙ্গের উপসংহার হইয়াছে।

জয়দেবপুরে আত্মপ্রকাশ

১৯২১ সালের মে মাসে জয়দেবপুরে যাইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার পর বাদী বাঙ্গলা বলিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বাঙ্গলার সহিত হিন্দী টান এবং হিন্দী কথা ছিল, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই আসিতে পারে না। এই লোক যে বাঙ্গলা বোঝে না, মিঃ নিডহামের রিপোর্টে (৫৯নং একজিবিট) তাহার উল্লেখ নাই। কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস বাদীর বিরুদ্ধে গেলে মোহিনী

চক্রবর্ত্তী ৬ই মে যে রিপোর্ট লেখেন, তাহাতেও বাদীকে প্রতারক বলিয়া প্রমাণের জন্য, বাদী যে বাঙ্গলা জানেন না বা বোঝেন না, তাহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। সেই রিপোর্টে অন্যবিধ কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাদিগণ পাঞ্জাব হইতে আগত যে সকল সাক্ষীকে আদালতে হাজির করিয়াছিলেন, তাহারা আদালতকে এই সাহায্য করিয়াছে যে, আদালত তাহাদের নিকট হইতে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছেন— বরাবর পাঞ্জাব হইতে আসিয়া পাঞ্জাবীরা কি আচরণ করে এবং কিরূপ চাল চলনে তাহারা অভ্যস্ত। আমার মনে হয়,— তাহারা বাঙ্গলায় আসিয়া যদি নিজেদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিত, তাহা হইলে তাহা কত হাস্যাস্পদ হইত। পাঞ্জাবীরা বাঙ্গলা ভাষার এক বর্ণও বুঝিতে পারিত না; তাহাদের চালচলনেই তাহারা ধরা পড়িয়া যাইত। উন্মাদ না হইলে কেহই একজন পাঞ্জাবীকে বাঙ্গালী সাজাইবার কল্পনা মনে আনিতে পারেন না; এবং কালেক্টরের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়া তদন্তের দাবী করিতে সাহসী হইবেন না।

রায় সাহেবের 'আদর্শ-মূলক' সাক্ষ্যের মধ্যে এমন কথা রহিয়াছে যে, বাদী মোটেই বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দীতে কথা বলিবার কোনও প্রসঙ্গ সেখানে নাই। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

১৯২১ সালের ১৯শে মে, জয়দেবপুরের থানায় ডায়েরীতে লেখা ছিল:—

"গত রাত্রিতে অনুমান ৪ ঘটিকায় এখানে প্রবল ঝড় হয়। তাহাতে বাসার বেড়া প্রভৃতি উড়িয়া যায়। শান্তি ভঙ্গের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই কিংবা এলাকার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবেরও সংবাদ নাই। দলে দলে

লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে তিনিই কুমার, টাকায় ৬ সের চাউল বিক্রি হইতেছে।"

বাদীপক্ষের ১০২৮নং সাক্ষী দারোগা আবদুল হাকিম তাঁহার রেজিষ্টারে ঐ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি এখনও চাকুরী করিতেছেন, বাদীপক্ষের প্রয়োজনে আসিবেন না, এমন একটি কথাও তিনি বলেন নাই। ১৯২১ সালের ৫ই মে রায় সাহেব মোহিনীবাবু এবং সাব রেজিষ্টার গৌরাঙ্গবাবু এবং অন্যান্য লোকজন যখন বাদীকে দেখিতেছিলেন ও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন ও পাখী শিকারের সেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন তখন সাক্ষী যে তথায় উপস্থিত ছিলেন সন্দেহ নাই। মোহিনী বাবুর ৬।৫।২১ তারিখের রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আছে। আবদুল হাকিম মানহানীর মামলায় যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহা এড়াইবার চেষ্টা করিতে ক্রুটি করে নাই। কিন্তু তিনি বলেন, মামলায় আমি বাদীকে দেখিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। তিনি হিন্দী গলায় বাঙ্গলা বলিতেছিলেন। ১৯২১ সালের মে মাসে আমি যখন জয়দেবপুর থানায় চাকুরী করিতাম তখন তাহাকে ঐভাবে বলিতে শুনিয়াছি। তাঁহার কথাব আর একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, উহা অস্পষ্ট ছিল। জেরায় সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাঙালীর পক্ষে বাঙলা বলা কি অস্বাভাবিক? তিনি বলেন, না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে ঐ কথা ডায়েরীতে লেখার কারণ কি? তিনি বলেন, হয়ত তিনি পূর্ব্বে বাঙলা বলিতেন না। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ৫ই তারিখে বাদী বাঙলা বলিতেলিলেন না—তিনি কেবলমাত্র তাঁহার নাম বলেন। ১৯শের পুর্ব্বে বাদী বাঙলা বলিতেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। সাক্ষী তাঁহার সহিত আলাপ করেন নাই, তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে কেবলমাত্র বলেন, বাদী হিন্দীগলায় বাঙলা বলিয়াছিলেন। বাদী হিন্দী বলিয়াছেন

অথবা হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা অনেকে বলিয়াছে তিনি হিন্দী বলিতেন। হিন্দীগলায় বাঙলা বলিলে গ্রামের লোক তাকে হিন্দী বলিয়াই মনে করে। বিবাদীপক্ষের ৮৫নং সাক্ষী উহা স্বীকার করিয়াছে। আসল কথা এই যে, বাদী ১৯২১ সালের মে মাসে যে বাঙলা বলিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, হিন্দী তিনি না বলিতে চেষ্টা করিতেন কি না তাহা জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। আমি দেখিতেছি বাদী ১৯২১ সালের মে মাসে বাঙলা বলিতে আরম্ভ করেন, যে সকল সাক্ষী এ সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করিয়াছে তাহাদিগকে আমি অবিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাহারা যে বাদীর সহিত অতীতের জীবন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিয়াছে তাহাও অবিশ্বাস করার কারণ নাই। এ সকল সাক্ষীর মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ :—

অমৃতসরের বিলাসবাবু (বাদীপক্ষের ৯১৪ নং সাক্ষী) বাদী পক্ষের ৪৫৮ নং সাক্ষী ভূপেন ঘোষ প্রভৃতি অনেক সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, ১৯২২ সালে বাদী বাঙালা বলিতেন। তিনি যদি বাঙ্গালা বলিতে না পারিতেন, তাহা হইলে ঐ বৎসর এত লোকের সামনে তিনি রাণী সত্যভামার শ্রাদ্ধ করিতে পারিতেন না। ১৯২৪ সালে মাণিকগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি চন্দ্র আই, সি, এস ঢাকায় বাদীকে দেখিতে যান। তিনি বলেন, "আমি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিয়াছি।" অধিকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। কি ভাবে বাঙলা তিনি বলেন জিজ্ঞাসা করা হইলে মিঃ চন্দ্র বলেন, "ঠিক কি কি কথা বাদী বলিয়াছিলেন, তাহা আমার পক্ষে স্মরণ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার স্পষ্ট ধারণা এই যে, তিনি হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বাঙলায় কথা বলিয়াছেন। ঐ বাঙলা একজন হিন্দুস্থানীর বাঙলার ন্যায়

মনে হইতেছিল।" প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চন্দ্র ইহাও বলেন যে, বাদীর ব্যাকরণ ও বাক্যাংশ মোটেই ঠিক হইতেছিল না। সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। তাঁহার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, বাদী বাঙলা বলিতেছেন, যদি উহা হিন্দী টানের ভাওয়ালী বাঙলা হইয়া থাকে, অথবা কলিকাতার বাঙলী হিন্দী টানে বলার চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে লোক পূর্ব্বে বাঙলায় কোন দিন আসে নাই, তাহার এগার বৎসর পূর্ব্বে উহা মনে থাকা স্বাভাবিক। মিঃ চন্দ্রের ঐ সময় হিন্দীতে কথা বলিতে হয় নাই। বাদীর সহিত কলিকাতায় মিঃ ঘোষালের যখন দেখা হয়, তখন বাদী বাঙলা বলিতে পারিত না যাহারা বলে—উহাতে তাহাদের কথা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণ হয়। মিঃ ঘোষাল হলপ করিয়া বলেন যে, কলিকাতায় বাদী তাঁহার সহিত বাঙলায় কথা বলেন। উহা ১৯২৪ সালের কথা, কারণ বাদী ১৯২৪ সালে কলিকাতা গিয়াছিলেন। মিঃ ঘোষের সহিত তাঁহার অনেকবার দেখা হয়। তিনি তোৎলামী শুনিয়াছেন, কিন্তু হিন্দী টান শোনেন নাই। ঐ বৎসরই বাদীর সহিত বড়রাণীর দেখা হয়, বাদী কোন ভাষায় কথা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ১৯২৫ সালে বাদীর সহিত মিঃ জে এন গুপ্তের দেখা হয়। মিঃ গুপ্ত ঐ সময় রেভিনিউ বোর্ডে সদস্য ছিলেন। মিঃ জে, এন গুপ্তের সহিত তাঁহার দুই এক মিনিটের আলাপ হয়। উহাতেই তিনি তাহার খোট্টাটান শোনেন এবং স্থির করেন যে, তিনি একজন হিন্দুস্থানী প্রতারক। তিনি বাঙলা মোটেই বলিতে পারেন না—যে বাঙলা বলেন তাহাতে খোট্টাটান আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। অন্যান্য কথা কোন্ ভাষায় বলা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহা বলিতে পারেন না। তিনি তখন বলেন 'আমাদের মধ্যে খুব কম কথাই হইয়াছে।'

আসল কথা হিন্দী টান; কেহ যদি হিন্দীটানে কথা বলে অথচ বলে সে বাঙ্গালী, তাহা হইলে মানুষের মনে ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। বিবাদীপক্ষ উহার সুবিধা পুরাপুরিই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যাহারা বাদীকে চিনিত তাহারা উহাতে ভোলে নাই। সকল বিষয়ে অনুসন্ধানের পর বাদীর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যখন নিশ্চিত হওয়া গিয়াছে, তখন উহাতে তাহার কোন নড়চড়ও হইবার নয়।

মিঃ জে এন গুপ্ত সাক্ষ্যে যাহা বলিয়াছেন, মিঃ শরবিন্দু ও মিঃ ও সি গাঙ্গুলী তদপেক্ষা অধিক বলেন নাই। এই দুই ভদ্রলোক কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী, তাঁহারা ভাওয়ালী বাংলা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহারা যে ভাষা শুনিয়াছেন, উহা একজন লোকের হিন্দী ভঙ্গীতে বলা কলিকাতার বাঙলা। আমার মনে হয় যে, বাদী স্বাভাবিকভাবে হিন্দী বলিতে পারিতেন। মিঃ গাঙ্গুলী বলিয়াছেন যে, তিনি কোনপ্রকার গোপন করিতে চেষ্টা না করিয়া হিন্দী বলিতে পারিতেন। বাদী ১৯২১ সালে বাঙলা বলিতে পারেন নাই বলিয়া সাক্ষী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 'বাদী একজন প্রতারকের ভাণ ধরিয়া বাঙলা বুলি নেহি আতা এই প্রকার কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।' যদি বাদী একটা বাঙলাশব্দও না জানিতেন তবে ১৯২১ সালে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা সৃষ্টি হইত না। আমি আবদুল হাকিমের (বাদী পক্ষের ১০২৮নং সাক্ষী) সাক্ষ্য বিশ্বাস করিনা। থানার ডায়েরীতেও ঐ প্রকার উল্লেখই আছে। বাদীর সহিত ব্যারিষ্টার মিঃ এন কে নাগ ও রাজেন শেঠের (বিবাদীপক্ষের সাক্ষী কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে)। সাক্ষাতের বিবরণই আমি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে মিঃ এন কে নাগের সহিত

এবং রাজেন শেঠের সহিতও ঐ সময়ই বাদীর কলিকাতায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আমি পূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়িলে কোন ত্রুটী আছে বলিয়া মনে হয় না। একজন বাঙালীর সহিত আর একজন বাঙালীর এই কথপোকথনের মধ্যে কোন ত্রুটী নাই এবং ইহার মধ্যে কোন হিন্দীর ভঙ্গী বা বাঙলা ভাষার কোন পার্থক্যই নাই।

আমি আর একটা ঘটনা উল্লখ করিতে চাই। ১৯১৯ সালে ১৪৪ ধারার মামলার বাদী ঢাকাতে মিঃ মার্টিনের কোর্টে জবানবন্দী দিয়াছেন। এই মামলায় মোহিনীবাবু ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি যে হিন্দীতে জবানবন্দী দিয়াছেন, কেহ তাহা বলেন নাই। বাদীর ও মধ্যমকুমারের স্বরের মধ্যে কোন প্রার্থক্য আছে বলিয়া ত কেহ বলেন নাই। যদি তাঁহার স্বরের মধ্যে কোন প্রার্থক্য থাকিত, তবে উহা তখনই ধরা হইত এবং ১৯২১ সালের ৬ই মের রিপোর্টে উহা উল্লেখ থাকিত। বাদীর ভাষা দিলেও বাদীর অ বাঙালী মন ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং বাদীর জেরার সময় উহা বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি এখন জেরার একটা অংশ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

জেরার সময় বাদীকে কথাব আবর্ত্তের ফেলা হইয়াছিল। একটা অশিক্ষিত লোকের মানসিক শক্তি কতদূর, শিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় তাহা বুঝেন না। শব্দের মারপ্যাঁচ, হেঁয়ালীপূর্ণ কথা কিম্বা হঠাৎ ধরিয়া কথা—বিলিলে অশিক্ষিত লোকের বিভ্রম সৃষ্টি হয়। খুব কম সুশিক্ষিত লোকই একটা কথা হইতে আর একটা অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। এই জেরা দেখিলে মনে হয় যে, বাদী ঐ প্রকার অবস্থায় উত্তর দেওয়ার

পক্ষে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

প্র—শ্বেতবর্ণের অর্থ কি ?

উ—সাদা।

প্র—রক্তবর্ণ ?

উ—লাল।

প্র—ব্যঞ্জনবর্ণ ?

উ—বেগুনের রং।

প্রথম ত্রশ্ন দুইবার উত্তর ঠিকই হইয়াছে। বর্ণ অর্থ রং কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ অর্থ রং নহে। ব্যঞ্জনবর্ণ বলিলে স্বরবর্ণ ব্যতীত অন্যবর্ণ বুঝায় বাদী উহা জানেন না, তিনি রংই বুঝেন। পাঞ্জাবে বেগুনকে ব্যঞ্জন বলা হয় বলিয়া বলিতে চেষ্টা কবা হইয়াছিল কিন্তু বাদীপক্ষের পাঞ্জাবী সাক্ষী মিঃ রামরতন সিবা পরিশেষে উহার অর্থ করিলে তর্কের অবসান হয়।

শ্লেষাত্মক ভাবে জিজ্ঞাসা না করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলেও এমন অনেক লোক আছে যাহারা বি সি ডি জানে কিন্তু উহা ব্যঞ্জনবর্ণ কিনা তাহা জানে না।

কোনও শব্দ জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গী হইতেও অজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। একজন অশিক্ষিত বাঙালী এই প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন। এই সকল শ্লেষাত্মক কথা লইয়া আলোচনা করার অর্থ সময় নষ্ট করা। আমি মনে করি যদি বিবাদীগণ বাদীকে হিন্দুস্থানীই মনে করিতেন, তবে তাহার মুখোস খুলিবার অন্যরকম চেষ্টা করিতেন। একজন হিন্দুস্থানীর মনের অবস্থাই এইরকম ভাবে তৈরী হয় যে, দীর্ঘদিন বাঙলায় বাস করিলেও তাহা নষ্ট হয় না। বাদীকে যখন অশিক্ষিত এবং মুর্খ বলিয়াই জানে তখন তাঁহার প্রকৃতরূপ বাহির করিতে খুব বেশী ওস্তাদির প্রয়োজন হয় না।

বাদীর ভাষাজ্ঞান পরীক্ষা

বাদীকে ছেলেবেলার ঘুমপাড়ানি গান এবং বাঙ্গলা গানের একটি লাইন বলিতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল. তিনি গান জানেন না বলেন এবং ঘুমপাড়ানি সম্পর্কে বলেন, "মেয়েরা এই প্রকার গান আওড়াইয়া থাকে।" আমি সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গীত সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান নাই, এই প্রকার খুব কম বাঙ্গালী আছেন, যিনি সকলের নিকট গান জানেন বলিয়া স্বীকার করিবেন। ঘুমপাড়ান গান সম্পর্কেও একজন অশিক্ষিত লোক মনে করিতে পারেন যে, উহা 'মেয়েরাই আওড়াইয়া থাকে' এবং পুরুষেরা আওড়ায় না।

বাদী ছড়া জানেন কি মিঃ চৌধুরী বাদীকে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। কৌঁসুলী পূর্ব্ব বঙ্গের ছড়া জানেন না। তিনি নিম্নোক্ত ছড়াটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে।

ইহার ভাষাতেই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ইহা পূর্ব্ববঙ্গের ছড়া নহে; পূর্ব্ববঙ্গে বর্গী বা মহারাষ্ট্রিয়গণ কখনই হানা দেয় নাই। ঘুম পাড়ানো ছড়া আজকাল প্রকাশিত হইতেছে ও দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে, (বিবাদীপক্ষের ৯০৩নং সাক্ষী গিরীশের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) ইনি এষ্টেটের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। সাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, আজকাল ছড়া পুস্তকে মুদ্রিত হইতেছে; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বরাবরই ইহা জানেন। তাঁহাকে ইহা পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলে তিনি

সাক্ষ্যে ও বাদীর নিকট যেরূপভাবে ইহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অন্যরূপে আবৃত্তি করেন এবং 'দিমু' কথার পরিবর্ত্তে 'দিব' কথা বলায় ধরা পড়েন। তিনি ছাপানো পুস্তক হইতে উহা পাইয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্তও উহা ভাল করিয়া জানেন না। সাক্ষী আরও বলিয়াছেন যে, তিনি আর একটী ছড়া জানেন এবং উহা তিনি বাদীর নিকট বলিয়াছেন। ছড়াটি হইতেছে—'ঘুম পাড়ানি মাসী-পিশি', কিন্তু তিনি আর কোন ছড়া জানেন না, আমি তাই ছড়া লইয়া আর আলোচনা করিব না, কারণ উহার সকল-গুলির সম্বন্ধে একই মন্তব্য প্রকাশ করা চলে; এবং আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, অসামী ও ফণীবাবুর প্রদত্ত ছড়ার শব্দগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছড়াব শব্দ অপেক্ষা অন্যরূপ। অতএব ইহাতে মনে হয়, সাক্ষী বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্যই উহা মুখস্থ করিয়াছিলেন ও পরে ভুল করিয়াছিলেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এমন কি একজন কলিকাতার সাক্ষীকেও তাহার ছেলে ঘুমানো ছড়া মনে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, তাহার উহা স্মরণ নাই। ইহাতে মনে হয়, ইহা এমন কিছু অসম্ভাবনীয় নহে এবং ইহা মাতা কিংবা ধাত্রীদের উপরও নির্ভর করিতে পারে। জেরায় বাদীকে হিন্দুস্থানী অথবা একজন অবাঙালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা বলিয়াই আমি বিবেচনা করি এবং বাদী যে বাঙালী ও কুমার তাহা যদি না জানা থাকিত, তাহা হইলে এই ব্যাপার লইয়া এত নাড়াচাড়া করা সম্ভবপর হইত না।

উপসংহার

আমি অতি যত্নের সহিত সমুদয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও

উভয়পক্ষের যোগ্য কৌঁসুলীগণের সওয়াল জবাব বিবেচনা করিয়াছি। কিছুই আমার চোখে বাদ পড়ে নাই। আমার বিশ্বাস মামলায় বাদীর পরিচয়ের বিপক্ষে ও পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণাদির অবতারণা করা হইয়াছে। মামলার সহিত যাঁহারা জড়িত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়টার গুরুত্ব ও এতৎ-সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই সচেতন ছিলেন। পরিচয়ের প্রশ্নে অসিদ্ধান্তকর অনেক কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু একটি বিষয়ই হয়তো মারাত্মক হইতে পারে; অতএব এই ব্যাপারে বিশেষভাবে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা এবং এতল্লিখিত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। আমি পরিচয়ের পক্ষে যে সকল প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণাদি দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করি। কুমারের ভগ্নী, বড়রাণী, মেজ-রাণীর নিজ মামী ও তাহার নিজ মামাত বোন প্রভৃতি প্রায় সকল আত্মীয় এবং বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাই সাক্ষ্যে ইহা বলিয়াছেন। সাক্ষীদিগের মধ্যে এরূপ বহু বিদ্বান, পদমর্য্যাদা সম্পন্ন প্রবীণ ও মহৎ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে কেহ অবিশ্বাস করে না এবং যাঁহারা উপহাসের ভয় করেন, লাভ ক্ষতির দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন না ও সম্ভবতঃ যাঁহারা কুমারকেও ভুল করিতে পারেন না। একজন ভণ্ড প্রতারককে সমর্থন করিবার জন্য ইঁহারা সকলেই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধ করিবেন, ইহা অসম্ভব। তথাপি আমি বলিতেছি যে, এই সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য কেবল তাঁহাদের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিতেছে না। যত প্রকারে সম্ভব, এগুলি পরিক্ষিত হইয়াছে এবং সমস্ত পরীক্ষায়ই এই প্রমাণগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পরীক্ষা এই যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে যখন বাদী নিজেকে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন যে অবস্থার উদ্ভব হইল, তাহা অখণ্ডনীয়।

যাহারা কুমারকে জানিত, তাহারই সেদিন বাদীকে কুমার বলিয়া চিনিল, এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছুই সেদিনকার ঘটনাবলীর সহিত খাপ খায় না। এমন কি বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী রায় সাহেব, যিনি বিবাদীপক্ষের প্রধান তদ্বিরকারক ছিলেন এবং যিনি দ্বিতীয় কুমারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মিথ্যা কথা সমর্থন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, কুমারের ভগ্নি এবং ভগ্নির ছেলেরা সরল বিশ্বাসেই সাধুকে কুমার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তিনি নিজে ইহা বিশ্বাস না করিলে কিছুতেই তিনি ভগ্নি ও ভগ্নির ছেলেদের কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কেন না তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সকলের ন্যায় কুমারকেও জানিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। মিঃ নিডহামের যে রিপোর্ট তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারই রিপোর্ট এবং এই রিপোর্ট হইতেছে জনৈক বিশ্বাসীর রিপোর্ট। অকস্মাৎ একজন পাঞ্জাবীকে আনিয়া দ্বিতীয় কুমাররূপে খাড়া করা, যে ব্যক্তির চেহারা বিভিন্ন, যে ব্যক্তি অপরিজ্ঞাত ভাষায় কথা বলে, তাহাকে কুমার সাজাইবার ষড়যন্ত্র কেন হইতে পারে না, তাহার কারণ এবং তথ্যাদি আমি পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিবাদীপক্ষ হইতে এই ষড়যন্ত্রের যে কাহিনী উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যাখ্যাই হয় না। তবে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কুমারের ভগ্নি এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরগণার লোকই পাগল হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে ইহার কিছুটা অর্থ হইতে পারে। কুমারের ভগিনী যদি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিতা হন, তাহা হইলে অন্যান্য সাক্ষীরাও তাঁহারই মতন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই কথা বলিয়াছেন।

আর একটা পরীক্ষার কথা বলিতেছি। এই পরীক্ষা

হইতেই একেবারে চরম সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। সেই পরীক্ষা হইতেছে শারীরিক অবয়বের সাদৃশ্য, ইহা একেবারে চাক্ষুষভাবে এবং গণিতের ন্যায় কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া গিয়াছে। অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের আকৃতি, অস্বাভাবিক রকমের শারীরিক চিহ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কুমারের ও বাদীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। এই যে প্রমাণ তাহা কাহারও বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। এই সমস্ত বিষয় একযোগে একই ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে এতগুলি জিনিষের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। উপরোক্ত চিহ্নগুলির মধ্যে যদি অর্দ্ধেক সংখ্যক সংখ্যক চিহ্ন বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও খসখসে পা বা পায়ের উপরকার অসংবদ্ধ দাগ এবং শারীরিক অবয়বের সামঞ্জস্য—এই সমস্ত দ্বারাই বাদী ও কুমারের মধ্যে সামঞ্জস্যের কথা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। কতকগুলি আকস্মিক বস্তুর সমন্বয়েই এক একটি ব্যক্তি গড়িয়া উঠে; এই সমস্ত আকস্মিক জিনিষ আর দ্বিতীয়বার জন্মে না। তাহাতেই এক একটী জিনিষ অথবা এক একটী ব্যক্তি অপর হইতে বিভিন্ন অপূর্ব্ব হইয়া থাকে।

বাদীর মনের মধ্যে এমন কিছুই পাই না, যাহাতে এই সিদ্ধান্ত শিথিল হইতে পারে। বিবাদীপক্ষ যেটুকু উদ্‌ঘাটন করিতে সাহস করিয়াছেন তাহাতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। বাদীর হস্তাক্ষর দ্বারা ইহাই অনুমোদিত হয়। দার্জ্জিলিংএ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা দ্বারা কিম্বা তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার পরবর্ত্তী কালের বিবরণ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তিনি যদি অন্ধ বধির কিম্বা বিকলাঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলেও এই সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকিত। তোতলামি এবং হিন্দী টানও এইরূপ ভাবেই উপেক্ষার যোগ্য।

বাদীর মনের দৃঢ়তা

১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে একটা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই তারিখের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর মধ্যেও ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ নাই। সেই তারিখ হইতে বর্ত্তমান মামলার তারিখ পর্য্যন্ত বাদী একদিনও আত্মগোপন করেন নাই। সকলে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিয়াছে, বহু লোক আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছে। ১৯২১ সালের ১৫ই মে তারিখে বহু সংখ্যক প্রজা সমবেত হইয়া বাদীকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছে। নিজের পরিচয় প্রকাশ করিবার ২৪ দিন পরে ২৯শে মে তারিখে তিনি ঢাকার কালেক্টরের নিকটে উপস্থিত হন, একাকী তাঁহার সহিত কথা বলেন এবং একটা তদন্তের জন্য প্রার্থনা করেন। ১৯২১ সালের মে মাস হইতে তাঁহার ভগিনী-গণ এবং পিতামহী বার বার কালেক্টরের নিকট আবেদন করিয়া একটা তদন্তের দাবী করিতেছিলেন। বাদী সকলের সম্মুখীন হইয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ভাওয়াল এষ্টেটকে তিনি নানাভাবে বিব্রত করিয়াছিলেন; প্রজাদের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতেছিলেন, চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন কি ১৯২৯ সালে এবং ১৯৩০ সালে বাদীর কার্য্যে ভাওয়াল এষ্টেটের প্রজাদের নিকট হইতে খাজানা আদায় একপ্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল। তথাপি কেহ তাঁহার সম্মুখে খাড়া হয় নাই, তাঁহাকে প্রশ্ন করে নাই অথবা তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করে নাই। কোনও এক ব্যক্তি চাহিয়াছিলেন যে, বাদীকে যেন প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা না হয়, তাঁহার বিরুদ্ধে যেন আদালতে মামলা আনা না হয় এবং ঢাকার কোনও একটি লোককেও যেন জিজ্ঞাসা

না হয় যে, এই লোকটি কে, যে ব্যক্তির অভিপ্রায় এইরূপ ছিল, সেই ব্যক্তিটি কে, এবিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। তিনি হইতেছেন রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ুয্যে—তিনিই কুমারের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। কুমারের প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে বাস্তবিকই একটা মহা অনর্থ। বাদী যখন তাঁহার পরিচয় ঘোষণা করিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি কতটা সমর্থন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই সত্যেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে, বাদীর পরিচয় ঘোষণার তুই দিন পরেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যুর উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। তিনি তাড়াতাড়ি মিঃ লেথব্রিজের নিকট গমন করেন। তাঁহাকে বলেন যে, কুমারের মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত প্রমাণ সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। তিনি যে মৃত্যুর এফিডেভিট সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন, তাহার কপি তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে ১৫ই মে (১৯২১ সাল) দার্জ্জিলিংএ গমন করেন এবং শব সংকারের সাক্ষীদিগকে ঠিক করিতে চেষ্টা করেন। সাক্ষীরা নিঃসন্দেহে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিল। স্মৃতিকে ঝালাইয়া লইবার পূর্ব্বে এবং যে সমস্ত ব্যাপার অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল তাহার উপর একটা অর্থ আরোপ করিবার পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে এরূপভাবে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ সতর্ক হইয়া মৃত্যুর এফিডেভিট ও শবদাহের প্রমাণ ইত্যাদি মিঃ লিণ্ডসের নিকট প্রেরণ করেন। মিঃ লিণ্ডসে এরূপভাবে মৃত্যুর বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া ঘোষণা জারী করেন যে, বাদী একজন ভণ্ড প্রতারক। অতি অল্প প্রতারকই এরূপ ঘোষণার মুখে টিকিয়া থাকিতে পারে। ইহার ফলে ধারণা জন্মে যে, সাক্ষীদের মধ্যেও অনেকের এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, প্রকৃত-

পক্ষে ১নং বিবাদী ও বাদীর মধ্যে এই মামলা সৃষ্টি হয় নাই—বাদী ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যেই এই মামলার উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী ঘোষণার ফলে একান্ত অসুবিধায় পড়িয়াও বাদী টিকিয়া থাকেন এবং একটা তদন্ত করাইবার আশায় নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকেন; বহু দর্শনার্থীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলে, সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যয়।

মিথ্যা আশ্বাস প্রদান

১৯২১ সালের ২১ শে মে তারিখে মিঃ লিণ্ডসে তদন্তের জন্য আশ্বাস দেন। ১৯২৩ সালে আবার মিঃ কে সি দে বাদীকে তদন্ত হইবে বলিয়া মিথ্যা ভরসা প্রদান করেন। ১৯২৭ সালের পূর্ব্বে কখনও স্পষ্ট কবিয়া বলা হয় নাই যে, গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে তদন্ত করা হইবে না।

এই সমস্ত তথ্যের কথা কতকটা অগ্রাহ্য করিয়া মিঃ চৌধুরী বলিতেছিলেন যে, মামলা রুজু করিতে যথেষ্ট বিলম্ব করা হইয়াছে এবং বাদীকে শিখাইয়া পড়াইয়া কুমারের অনুরূপ করিয়া তুলিবার জন্য এরূপ বিলম্ব করা হইয়াছে। কিন্তু বাদী তাঁহার পরিচয় ঘোবণা করিবার ২৪ দিন পরেই তিনি যাইয়া মিঃ লিণ্ডসেকে তদন্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার ভগিনী আরও পূর্ব্বেই তদন্ত প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদন পঠাইয়াছিলেন। বাদী সর্ব্বদাই অপরের সম্মুখীন হইয়া জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তদন্তের প্রার্থনা কখনও অগ্রাহ্য করা হয় নাই এবং ১৯২৭ সালের পূর্ব্বে কখনও বলা হয় নাই যে, বাদীর জন্য আদালত খোলা আছে। তারপর বিনা মামলায় সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা হয়। ইহাতে ফল না হওয়ায় ১৯৩০ সালে মামলা রুজু করা হয়। একটা

এষ্টেটের বিরুদ্ধে মামলা করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। জেরার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাঁহাকে কতটা শিখান পড়ান হইয়াছে। তিনি যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনই রহিয়াছেন; এমন কি বর্ণমালার জ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহার হয় নাই।

সত্যবাবুর আচরণ কিরূপ?

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাদীর আচরণ সমস্তই খোলাখুলি ধরণের; ইহার মধ্যে গোপনীয়তা কিছুই নাই। কিন্তু যে সত্যবাবু এই সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন তাঁহার আচরণ কিরূপ? এই যে দুর্ভাগ্য লোকটি, এই যে বাদী, সেই যে প্রকৃতপক্ষে কুমার—এই জ্ঞান বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাঁহারই অর্থে এই মামলায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে। কোনও ব্যক্তির আচরণ সত্য কথাই বলিয়া দেয়, মিথ্যা বলিতে পারে না।

সন্ন্যাসী কুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিবার দুইদিন পরে ১৯২১ সালের ৬ মার্চ্চ সত্যবাবু সন্ন্যাসীর ভয়ে মিঃ লেথব্রিজের নিকট ছুটিয়া যান মৃত্যুর প্রমাণাদি হস্তগত করিবার জন্য। ১৫ই মে'র পূর্ব্বে তিনি দার্জ্জিলিংএ ছোটেন শ্মশানের সাক্ষীদিগকে হাত করিবার জন্য। কুমারের দেহের চিহ্ন সম্পর্কে জীবন বীমা কোম্পানীর ডাক্তারের রিপোর্টের জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়, ইহাতে যে শঙ্কিত ভাব দেখা যায় তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিবাদী পক্ষ ঐ রিপোর্ট হস্তগত করিতে পারে নাই। তাহারা উহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও করে নাই। কারণ, তাহারা মনে করিয়াছিল, উহা স্কটল্যাণ্ডে কোম্পানীর অফিসেই থাকিয়া যাইবে। ঐ প্রতারক অভিহিত লোকটিই উহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎপরতার সহিত তিনি অন্যান্য দলিলপত্রও হাত করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার নিজের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে আছে। হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে

হস্তাক্ষর সম্পর্কে মতামত চাহিয়া পাঠাইবার সময়ও একটা শঙ্কিত ভাব দেখা গিয়াছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস যখন তদন্ত আরম্ভ করে, স্বভাবতঃই তাহারা জামার দোকান ও জুতার দোকানের মালিকদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে। তদন্তের ফলাফল কৌঁশুলীর নিকট উপস্থিত করা হয়। ঐ সকল তদন্তের মালমসলা হইতে বিস্তৃত ভাবে কিছু তাঁহার নিকট উপস্থিতও করা হয় নাই, প্রমাণও করা হয় নাই, একমাত্র প্রমাণ করা হয় যে, তাঁহার জুতা ৬ ইঞ্চি ; কিন্তু কৌঁশুলী উহার তখন উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার জুতা কিছুটা বড়। বাদীর জবানবন্দী গৃহীত হওয়ার পরে কৌঁশুলী অদ্ভুত ভাবে এই অভিযোগ করেন যে, লোকটা তাঁহাকে মুস্কিলে ফেলিয়াছে, তাঁহাকে এখন অক্ষর জ্ঞান প্রমাণ করিতে হইবে। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। উহাতে ইহাই মনে হয় যে, কুমারের যে স্তরের শিক্ষা ছিল, তাহা হইতে অক্ষরজ্ঞান ও উচ্চ ধরণের শিক্ষা বাদীর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে ইচ্ছা করিয়াই কোন জেরা করা হয় নাই। ঐ সম্পর্কে বিবাদীপক্ষ হইতে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, বাদীকে শিখান পড়ানোর জন্য অনেকটা সময় পাওয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বে আমি ঐ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছি। উহা যে ১৯২১ সালের পুরাণ পন্থা তাহাই এখানে একবার বলা প্রয়োজন। শিখান হইয়াছে বলিয়া সাক্ষীকে জেরা করা হইবে না—ইহা কেহ কোনদিন শোনে নাই।

জালের জন্য শঙ্কা দেখা যায় নাই, সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িবে, তজ্জন্যই শঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন একটা জটিল মামলায় সত্যটা বেশীক্ষণ চাপা দিয়া রাখা যায় না। আসল ঘটনা প্রকাশ পাইলে সকল প্রকারের থিওরী চুড়মার হইয়া যাইবেই। বিবাদীপক্ষের কাহারও মাথা খারাপ হইয়াছে,

কিন্তু বাদীকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখা যায়। তিনি অদ্ভুত ভাষায় কথা বলিতেন, এক বোন তাঁহাকে আপন মনে করিয়াছে। অপরে তাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছে। তিনি যখন আসেন, কেহ তাঁহাকে চিনেন না। তিনি তখন ঔষধ বিলি করার কাজে ছিলেন, হঠাৎ একদিন তিনি বলিয়া ফেলেন, তিনি কুমার। সমগ্র রাজ পরিবার বজ্রাহত প্রায় হয়, তাঁহাকে ভয় দেখায়, হঠাৎ এক বোন তাঁহাকে আপন বলিয়া স্বীকার করে—অত্যন্ত প্রকাশ্যে বিনা আড়ম্বরে সে তাঁহাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করে এবং কালেকটরকে তাঁহার দাবী সম্পর্কে জানায়। ঘটনার পর ঘটনার কথা বলা হইয়াছে—যাহা সত্য ঘটনার কাছে টিকিতে পারে নাই, অনেক চিন্তা করিয়া ঐ সকল ঘটনার কাহিনী তৈয়ার করা হইয়াছে, দার্জ্জিলিংএ পীড়া ও মৃত্যুর কাহিনী তৈয়ার করা হইয়াছে। কিন্তু উহা এক একটা সত্য ঘটনার কাছে টিকিতে পারে নাই, যেমন—মৃত্যুর সময় সম্পর্কে অথবা রক্তবাহ্যসহ পেটের অসুখের সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা সমস্ত কাহিনী মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দেয়। সকালে যে শবদাহ করা হয় তৎসম্পর্কে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সাক্ষ্যে আসল কথা প্রকাশ পাইয়াছে। চা পার্টির কথা একটা তারিখের গোলমালেই মিথ্যা প্রমাণিত হইল। সুশিক্ষা, ইংরেজী চালচলন, ইংরেজী কথাবার্ত্তা কুমারের চরিত্রে চাপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—উহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ সকল মিথ্যার জাল বুনা হইয়াছে এই কারণে যে, আসল সত্য প্রকাশ পাইলে বাদী ও কুমারে কোন প্রার্থক্য থাকিবে না। কুমার শিক্ষিত ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য জাল পত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। যদি উহা প্রমাণ করা যাইত তাহা হইলে বিবাদীপক্ষ মনে করিয়াছিল, কুমারের মৃত্যুই প্রমাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদিও বিবাদীপক্ষের একদল লোক কর্ম্মচারী প্রভৃতি উহা প্রমাণ

করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে—তাহাতে মামলায় বিবাদী-পক্ষের বিরুদ্ধেই ঐ সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। আসলের সঙ্গে যাহার এত পার্থক্য সে কুমারকে তাহারা কি করিয়া দাঁড় করাইবে? সুতরাং তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, ফণি বাবুকে যেমন এমন সব কথা শিখান হইয়াছিল, যাহা বাদী বুঝিতে পারিবেন না, আশুবাবু যেমন তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন—এই সকল লোকও মামলায় একই ধরণের অংশ গ্রহণ করে। বিবাদীপক্ষের এইগুলি কয়েকটা মারাত্মক ভুল। তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বুদ্ধি, জাল সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া একটা জাল ফটো কর্ণেল রঘুবীর সিংয়ের নিকট উপস্থিত করা ফটো বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া একজনকে অপর ব্যক্তিপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করা।

বাদী ঢাকা ও কলিকাতায় এবং অধিকাংশ সময় ঢাকায় বাস করা সত্ত্বেও ১২ বৎসরকালের মধ্যে এষ্টেট বাদী কে তাহা যে নির্ণয় করিতে পারে নাই, ইহা আশ্চর্য্যের কিছুই নহে। মিঃ লিণ্ডসে পাঞ্জাবে তদন্তের আদেশ দেন; কিন্তু যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কোন ফল তদন্তে পাওয়া যায় তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই তথায় যে চর নিয়োগ করা হইয়াছিল অথবা প্রমাণ অযোগ্য ফটো সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট রঘুবীর সিংএর স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া পাঞ্জাব রিপোর্ট যে রচিত হইয়াছিল, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট জানিতেন না।

ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, অসাধুতার দায়ে বরখাস্ত জনৈক কেরাণী ও এক জ্ঞাতি ভাই ব্যতীত মেজরাণীর উত্তরপাড়াস্থ নিজ সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজন কেহই তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই। যে সকল ভদ্রমহোদয়গণ সাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারকে চিনিতেন, কিন্তু পরে ভুলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদিগকে বাদ দিলে এমন একজনও স্বমতে

প্রতিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ লোক নাই যিনি বাদীকে কুমার বলিয়া অস্বীকার করিবেন।

কুমারের ধর্ম্মপত্নী নহে ভাইয়ের ভগ্নিরূপেই রাণী পরিচিতা

আমি মেজরাণীর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার ভাই সম্পর্কে তাঁহার নিজের কোন মত নাই। আয়ের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা হইলেও সমুদয় টাকা তাহার , ভাইএর নিকট যাইতেছে। এমনকি ব্যাঙ্কেও তাঁহার নিজের কোন হিসাব নাই। এমন কোন নথীপত্রও নাই যাহাতে দেখা যায় যে; তিনি নিজে টাকা রাখেন বা তাঁহাকে টাকা রাখিতে দেওয়া হইয়াছে। জয়দেবপুরের বিগত দিনের স্মৃতি মনে করিয়া আনন্দ পাইবার মত এই নিঃসন্তান মহিলার তেমন কিছুই ছিল না। তিনি যে জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এতাবৎকাল যে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্তৃত্ববোধ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চরিত্র-হীন ও বিশ্রী ক্ষতযুক্ত স্বামীর সহিত যে বিচ্ছেদ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই এবং সর্ব্বোপরি যখন ১৯২১ সালের মে মাসে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ আনীত হইল, তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট তার করিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি আর কুমারের ধর্ম্মপত্নীরূপে পরিচিতা হইবেন না; তিনি তাঁহার ভাইয়ের ভগ্নিরূপেই পরিচিতা হইবেন। তাঁহার ভাই মনে করিয়াছেন যে, কুমারের পুনরাগমনের ফলে তাঁহাকে একটা বড় সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তিনি যে কোন রকমে এই বিপদ এড়াইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন এবং তাঁহার ভগ্নি তাঁহার এই কার্য্যে বাধা হন নাই বলিয়া আমি মনে করি।

আমি এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বাদীই ভাওয়ালের মৃত রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

৬নং ইস্যু

এই মামলায় ঠিকমত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে।

৭নং ইস্যু

এই ইস্যু উঠিতে পারে না। কারণ সংশোধনের ফলে ইহা ইহা একটা দখলের মামলায় দাঁড়াইয়াছে।

৮নং ইস্যু

এই ইস্যু হইয়াছে এই যে, বাদীর আর্জ্জির শেষ অংশের ২নং প্যারাতে যে ওজর দেখান হইয়াছে, তদৃষ্টে আর্জ্জির দাবীকৃত প্রতিকার পাইতে পারে কি না?

২নং প্যারাতে বলা হইয়াছে যে, বাদীর অতীতের স্মৃতি প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া তাহাদের সহিত বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ন্যাসী-জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ও সংসার বিরাগী হইয়াছিলেন।

যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, আইনের দিক হইতে উহার কোন মূল্য নাই। যখন সংসার ত্যাগ করা হয় তখনই হিন্দু আইনমতে উহাকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই অথবা তিনি সংসারের সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই বলিয়া প্যারাতে উল্লেখ আছে। উহাতে আরো

উল্লেখ আছে স্মৃতি লোপের ফলেই তিনি এই প্রকার জীবন যাপন করিয়াছেন। যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করা হয় তবে উহা মৃত্যুর সামিল হইবে (মেনের হিন্দু আইনে সপ্তম সংস্করণের ৮০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বাদী যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংসারে মৃত বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় জন্য যে প্রকার অনুষ্ঠান পালন করিবার প্রয়োজন তিনি সেই প্রকার কোন অনুষ্ঠান পালন করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। এই সম্পর্কে আর আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই প্যারাতে যাহা উল্লেখ আছে উহাতে তাহার প্রতিকারের পক্ষে কোন বাধা নাই বলিয়া আমি মনে করি।

৯নং ইস্যু

এই ইস্যু আর্জ্জির সম্পর্কে আসে না।

২নং ইস্যু

তামাদি সম্পর্কে বলিতে হয় যে, বাদী ১৯০৯ সালের ৮ই মে পর্য্যন্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন. অতঃপর তিনি অদৃশ্য হন এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বিধবা রূপেই তাঁহার স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এবং হিন্দু আইনানুসারে উহা বিধবার সম্পত্তি বলিয়াই ধরা হইয়াছে। বিবাদীপক্ষ বলিতে চাহেন যে, মেজকুমারের স্ত্রী ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে সম্পত্তির মালিক আছেন এবং এই মামলার পূর্ব্বে বার বৎসর ধরিয়া তিনি উহার অধিকারিণী আছেন, সুতরাং এই মামলা তামাদি দোষে বারিত। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু বিধবা হিসাবে সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। বাদী ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তাঁহাকে ভাওয়ালের মেজকুমার বলিয়া পরিচয় দেন। মেজরাণী হিন্দু বিধবা হিসাবে সেইদিন পর্য্যন্তই

সম্পত্তির মালিক ছিলেন। সেই তারিখ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যেই এই মামলা রুজু করা হইয়াছে। বাদীর নিরুদ্দেশ অবস্থায় মেজরাণী বাদীকে মৃত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি সম্পত্তিকে বিধবার সম্পত্তিই মনে করিয়াছেন। তিনি হিন্দু আইনানুসারে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হিসাবেই সম্পত্তি দেখিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর উত্তরাধিকারীই সম্পত্তির মালিক হইতেন। ইহাই হিন্দু আইনের বিধান। তিনি এই বিধানানুযায়ী চলিতেন। তিনি যে স্বামীর পক্ষে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, সেই স্বামীর বিরুদ্ধে 'বিরুদ্ধ দখল' জনিত স্বত্ব জন্মা অসম্ভব। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর উত্তরাধিকারীরা দখলীকার হইবেন; কেননা স্বামী দখলের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ১৯২১ সালের ৪ঠা অথবা ৬ই মে তারিখের পর, বাদীকে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও রাণী বে-দখল হইতে পারেন কিনা সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। কারণ, বিবাদিনী এষ্টেটে তাঁহার স্বত্ব এখনও দাবী করিতেছেন এবং এক-তৃতীয়াংশই তাঁহার দাবীর বিষয়। আমার মতে বাদীর এই মামলা তামাদি-দোষদুষ্ট হয় নাই।

উভয় পক্ষের কৌঁশুলীরা আমাকে যে অমূল্য সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। আমি তাঁহাদের বহু দর্শিতা এবং সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি হইতে অনেক সুযোগ ও সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে আমাকে যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।

মামলার ডিগ্রী ও ঘোষণা

বাদীর প্রার্থনা এই যে, সম্পত্তিতে যদি তাঁহার দখল না থাকা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দখল দেওয়া হউক;

আর যদি দখল থাকা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে আদালত হইতে দখল ঘোষণা করা হউক। যদিও ১৯৩০ সালে বাদী খাজনা আদায় করিয়াছেন এবং মামলা দায়ের হওয়ার পরও পুণ্যাহ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে বে-দখল হইয়া আছেন, তাহা সত্য। সে বে-দখল অবস্থা এখনও বলবৎ আছে।

বাদী যখন ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন; তখন এই মামলার বিষয়ীভূত সম্পত্তির অবিভক্ত এক-তৃতীয়াংশের তিনি অধিকারী। তামাদি দোষে বারিত না হইলে তাঁহার এ অধিকার অক্ষুণ্ণ।

সুতরাং বাদীই যে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মধ্যম পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, এতদ্দারা তাহা ঘোষণা করিয়া এই মামলার ডিগ্রী দেওয়া হইল; এবং ১নং বিবাদিনী অন্যান্য বিবাদীর সহযোগে মামলার বিষয়ীভূত যে সম্পত্তির অবিভক্ত এক তৃতীয়াংশ ভোগ করিতেছেন, এতদ্দারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, সম্পত্তির সেই অংশে বাদীর স্বত্ব-দখল বজায় আছে এবং বাদী তাহাতে দখল পাইবেন।

১নং বিবাদিনীর প্রতিকূলে এই মামলার এক-তরফা ডিগ্রী দেওয়া হইল এবং অন্যান্য বিবাদীদিগের বিরুদ্ধে দো তরফা ডিগ্রী দেওয়া হইল।

বিবাদিগণের যাঁহারা বাদীর বিপক্ষে মামলা চালাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বাদী এই মামলার খরচা—মায় সুদ শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে প্রাপ্ত হইবেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীপান্নালাল বসু।

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ।

২৪।৮।৩৬

(রায় সম্পূর্ণ)

(আর্জি)

জিলা ঢাকার প্রথম সবজজ আদালত

দেঃ মোঃ নং ৭০—১৯৩০ সাল

কুমার শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণ রায়, সাং জয়দেবপুর, থানা জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা, হাং সাং ৪ নং আরমানিটোলা, থানা সুত্রাপুর, ঢাকা।

বাদী—

বনামে—

১। রাজানুপালিতা শ্রীমতী বিভাবতী দেবী পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার মিঃ ঈ, বিগনল্ড, সাং জয়দেবপুর, থানা জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা।

মূল প্রতিবাদিনী—

২। রাজানুপালিতা শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী। ৩। নাবালক রামনারায়ণ রায় পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার মিঃ ঈ, বিগনল্ড। ৪। শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী পতি স্বর্গীয় রবীন্দ্র-নারায়ণ রায় সাং জয়দেবপুর, থানা জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা।

মোকাবিলা বিবাদীগণ—

ডিক্লেটারী ডিক্রী ও দখল স্থিরতরের বা দখল পাইবার এবং মূল প্রতিবাদীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধআজ্ঞা পাইবার প্রার্থনায় ডিক্লেটারী ডিক্রী ও চিরস্থায়ী নিষেধআজ্ঞা পাইবার তায়দাদ ১০৫০০৲ টাকা ও দখল স্থিরতরের বা দখলের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য মঃ ১৪২০০৲ একুনে তায়দায় মোট ১৫২৫০০৲।

উপরোক্ত বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছে ঃ—

১। জিলা ঢাকা এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতির অন্তর্গত পরগণে ভাওয়াল ও অন্যান্য পরগণা মধ্যে যে সমস্ত মৌজা আছে এবং যাহা সাধারণে ভাওয়াল রাজ্য বলিয়া অভিহিত করে উক্ত সম্পত্তি বাদী এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের জমিদারী পত্তনী ইত্যাদি স্বত্ব দখলিয় হইতেছে। বাদীর পিতা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত সম্পত্তির মালিক দখলীকার থাকা কালে তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার দেহান্তে বন্দোবস্ত তাঁহার পত্নী রাণী বিলাসমণি দেবীকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং রাণী বিলাসমণি দেবীর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাদী, কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত ভাওয়াল রাজ্যে সম অংশে স্বত্ববান ও দখলীকার হয়েন। দাবীকৃত সম্পত্তির পরিচয় নিম্ন তপসিলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। গত ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে বাদী তাঁহার পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী এবং কতিপয় আত্মীয় ও কর্ম্মচারী সহযোগে দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। দার্জ্জিলিংএ অবস্থান কালে বাদীর শরীর অসুস্থ হইলে, বাদীর চিকিৎসাকালে বিষপ্রয়োগ নিবন্ধন বাদী অচেতন হইলে বাদীকে মৃত জ্ঞানে ১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে রাত্রিকালে বাদীকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে বাদীর দেহ রাখিয়া বাহকেরা স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বাদীর মৃত দেহ শ্মশানে না পাইয়া ফিরিয়া চলিয়া যান। ঐ ঘটনার কয়েক দিবস পরে বাদী চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি আপনাকে নাগাসন্ন্যাসীগণের মধ্যে দেখিতে পান। এবং সন্ন্যাসীগণের সেবা ও শুশ্রূষাতে বাদী কতক পরিমাণে সুস্থ হইলে উক্ত সন্ন্যাসীগণের সহিত বাস করিতে থাকেন।

তৎকালে বিষ প্রয়োগের ফলে বাদীর পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীদের সহিত তাহাদের দলভুক্তের ন্যায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। বাদী তৎকালে সন্ন্যাসী জীবনে অভ্যস্ত হইয়া সংসারে বিতৃষ্ণ হন।

৩। বাদীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বাদী মৃত উল্লেখে বাদীর পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে বাদীর অংশের জমীদারী প্রভৃতি ভোগ করিতে থাকেন। বাদী বর্ণনা করেন যে ১নং বিবাদিনীর উক্তরূপ ভোগ বাদীর জীবিত কালে বাদীর দখল ,বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরে ১৯১১ সালের ২৮এ এপ্রিল তারিখে ১নং বিবাদিনীকে disqualified proprietress declare করিয়া বাদীর অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ চার্জ্জ লয়েন।

৪। গত ১৯২১ সালের প্রথম ভাগে বাদী উপরোক্তরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ঢাকা সহরে আসিয়া সন্ন্যাসী-বেশে বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতে থাকেন। তথায় অবস্থান কালে বাদীকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া অনেকে চিনিতে পারেন ও অনেকে অনুমান করেন এবং পরে বাদীর আত্মীয় স্বজন এবং স্থানীয় জমিদারগণ বাদীকে মধ্যম কুমার বলিয়া নিশ্চিত জানিয়া বাদীকে আত্মপ্রকাশ জন্য পীড়াপিড়ি করেন। তাহাতে বাদী আত্মপরিচয় গোপন করিতে অক্ষম হইয়া নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন, এবং আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্তি লওয়ান এবং উক্ত ভাওয়াল রাজ্যের প্রজাগণ বাদীকে মধ্যমকুমার স্বীকার করিয়া খাজনা ও নজর দিতে থাকেন। তৎপর ১৯২১ সালের ১৬ই মে জয়দেবপুরে এক বিরাট সভা হয়, এবং বাদীর আত্মীয় ও প্রজাগণ বাদীকে মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রজাগণ তাঁহাকে নজর ও খাজানা পূর্ব্বানুরূপ

সাধারণ ও প্রকাশ্যভাবে প্রদান করিতে থাকেন। এইরূপে বাদী আপন অংশের খাজানা ও নজর আদায় করিতে থাকিলে, কোর্ট অব ওয়ার্ডের খাজানা আদায় সম্বন্ধে বাধা ও বিঘ্ন হওয়ায় ১নং বিবাদিনীর এবং তাহার ভ্রাতার ষড়যন্ত্র মূলে ও প্ররোচনায় ঢাকার তৎকালীন কালেকটার মিঃ লিণ্ডসে গত ১৯২১ সালের ৩রা জুন তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ডিক্লারেসন প্রচার করেন।

নোটিশ

এতদ্দারা ভাওয়াল ষ্টেটের সমস্ত প্রজাবর্গকে জানান যাইতেছে যে, রেভিনিউ বোর্ড নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছেন যে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারের মৃত দেহ ১২ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং সহরে ভস্মসাৎ হইয়াছিল ; সুতরাং যে সাধু দ্বিতীয় কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে প্রতারক, যে কেহ তাঁহাকে খাজানা এবং চাঁদা দিবেন তিনি তাঁহার নিজের দায়িত্বে দিবেন।

বোর্ড অব রেভিনিউর অনুমত্যানুসারে
জে, এইচ লিণ্ডসে—কালেকটার
ঢাকা ৩।৬।২১

বাদী বর্ণনা করেন যে (বোর্ডের নিম্নলিখিত রেজলিউসন এর স্বীকৃত মতেই) বাদীর আইডেনটিটি সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন তদন্ত না হওয়ায় ও তদ্রুপ তদন্ত কি সাক্ষী প্রমাণ লওয়া বোর্ডের কোনরূপ ক্ষমতা না থাকায় উক্ত ডিক্লারেসন অমূলক এবং ভিত্তিশূন্য ও ultravires বটে।

৫। উপরোক্ত ডিক্লারেসন বাদীর অসাক্ষাতে হওয়ায় বাদী মহামান্য বোর্ডে গত ১৯২৬ সালে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এক মেমোরিয়াল দাখিল করেন। উক্ত মেমোরিয়াল ১৯২৭ সালে ৫৪ নম্বরে রেজিষ্টারী ভুক্ত হইয়া বাদীর পক্ষে এবং বিবাদিগণের

পক্ষের বক্ত,তার পর গত ১৯২৭ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে মহামান্য বোর্ডের রিজলিউসন নম্বর ৩৭১৫ডব্লিউ অনুসারে বাদীর মেমোরিয়াল অগ্রাহ্য হয়। উক্ত রিজলিউসনএ প্রজাসাধারণের নিকট বাদীর খাজানা এবং নজর আদায় স্বীকার আছে এবং মহামান্য বোর্ড আরও স্বীকার করিয়াছেন যে বাদীর আইডেনটিটি সম্বন্ধে তাঁহারা কোন তদন্ত করেন নাই। কিম্বা তদনুরূপ বা কোনরূপ তদন্ত করিবার কি সাক্ষী সাবুদ লইবার বোর্ডের কোন ক্ষমতা নাই।

৬। বাদী আপন অংশের সম্পত্তি হইতে প্রজাগণের নিকট খাজানা ও নজর আদায় করিতে থাকিলে গত ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার কালেকটার মিঃ ও, এম মার্টিন বাদীর নাম সুন্দরদাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসী উল্লেখে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার বিধান মতে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করেন—

সুন্দরদাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর প্রতি— ঢাকা—

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে যে তুমি জয়দেবপুরে যাইতে ইচ্ছা কর এবং সেখানে তোমার উপস্থিতি ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস ষ্টেটের নিয়মিতরূপে নিযুক্ত কর্ম্মচারিদিগের বিরক্তি এবং প্রতিবন্ধক উৎপাদন করাইবে, এবং সম্ভবতঃ সাধারণ শান্তির বিঘ্ন ঘটাইবে, আমি এতদ্দারা জয়দেবপুর থানার এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করি, তুমি ১৯২৯ সালের ১১ই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে এই আদেশের বিরুদ্ধে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইতে পার।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতে সিলমোহর দেওয়া গেল

স্বাক্ষর—ও, এম, মার্টিন

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।

৭। বাদী উক্ত নোটিশ তাঁহার প্রতি জারী হইয়াছে

বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নাম সুন্দরদাস নহে, এবং তিনি ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় উল্লেখ করিয়া জয়দেবপুরে তাঁহার নিজ বাটীতে যাওয়ার অধিকার থাকা উল্লেখ করিয়া আপত্তি দাখিল করেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদীর এজাহার গ্রহণকালে বাদী অন্যান্য বর্ণনার সহিত নিম্নলিখিত বর্ণনা করেন ঃ—

আমি ভাওয়াল সম্পত্তি দাবী করি, ইহা আমাব পৈত্রিক। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে আমি জয়দেবপুর পরিত্যাগ করি এবং ১২ বৎসর পরে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসি, কাশিমপুর জমিদার মহাশয় আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। সে স্থান হইতে যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক জয়দেবপুরে আনীত হই, তিনি আমার জন্য হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রজাদিগের নিকট হইতে নজরানা পাই। তাহারা নিজে আসিয়া নজরানা দেয়, তাহাবা ঢাকাতে আসিয়া আমাকে ইহা দেয়। সকল প্রজাই আমাকে কমার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা স্বেচ্ছায় আমাকে খাজনা দিতেছে, আমি খাজনা দিবার জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করি না।

আমি পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি। খাজনা গ্রহণ বন্ধ করিতেও ইচ্ছুক নহি। সম্প্রতি আমি জয়দেবপুর যাইতে ইচ্ছা করি।

৮। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত ১৪৪ ধারার হুকুম ৩০।৫।২৯ তারিখে রহিত করেন। উক্ত হুকুম হওয়ার পরে বিবাদী পক্ষের লোকের উক্তি ও ব্যবহারে বাদী আশঙ্কা করেন যে, তিনি জয়দেবপুর গেলে তাঁহার উক্তস্থানে যাওয়ার পক্ষে বাধা জন্মাইবে। উক্ত কারণে বাদী ইচ্ছাসত্বেও জয়দেবপুর যাইতে আশঙ্কা করেন।

৯। পরে বাদী আপন অংশের সম্পত্তির খাজনা প্রজাগণ বাদীর পত্নী বিভাবতী দেবীকে বা তাহার পক্ষে কোর্ট অব

ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে না দেয় এই মর্ম্মে ভাওয়াল প্রজাসাধারণের মধ্যে গত ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নোটীশ প্রচার করেন।

উক্ত নোটীশ প্রাপ্তির পর প্রজাসাধারণ বাদীর অংশের দেয় খাজনা বাদীকে পূর্ব্বানুরূপ দিতেছেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে ঐ অংশের খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এমতে বাদী আপন অংশের জমিজারী প্রভৃতিতে সম্পূর্ণরূপে দখলীকার আছেন। কিন্তু ১ নং বিবাদিনীর তরফ হইতে মহালের স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া বাদীকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নানারূপ বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাদীর খাজনা আদায়ে বিঘ্ন প্রদান করিবার জন্য এবং প্রজাদের নির্য্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য ১নং বিবাদিনী এবং তাহার পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার অবৈধভাবে প্রতিবাদিগণের তরফ বেআইনী এবং illegal সার্টিফিকেট জারী করিতেছেন। আনন্দকুমারী দেবীর তরফ হইতে যে সার্টিফিকেট জারী হইতেছে তাহা আদৌ without jurisdiction ultra-vires এবং invalid। উক্ত সার্টিফিকেট জারী সত্বেও বাদীর দখল অক্ষুণ্ণ আছে।

১০। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে, ১নং বিবাদিনী এক্ষণে অন্যায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এবং অসৎ লোকের পরামর্শে বাদীকে না দেখা সত্বেও বাদীর identity অস্বীকার করিতে-ছেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের সাহায্যে বাদীর দখল এবং বাদীর বসতবাটী জয়দেবপুরে যাওয়ার সম্বন্ধে বিঘ্ন ও বাধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ২নং বিবাদিনী স্বয়ং বাদীর আইডেনটিটি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে থাকায় তাঁহার ম্যানেজার মিঃ ঈ, বিগনল্ড বাদীর আইডেনটিটি অস্বীকার করিয়া

বাদীর খাজনা আদায়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা করায় তাহাকে পক্ষভুক্ত করা গেল। ৩নং প্রতিবাদী বাদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্য পুত্র উল্লেখে কতক সম্পত্তি দখল করিতেছে, এবং ৪নং বিবাদিনী শ্রীমতি আনন্দকুমারী দেবী উক্ত কুমার রবীন্দ্র নারায়ণের বিধবা পত্নী হইতেছেন। বাদী উক্ত পোষ্য পুত্র বৈধ কি অবৈধ জানেন না। কিন্তু বাদী অবগত হইয়াছেন, যে উক্ত পোষ্যপুত্র রদ সম্বন্ধে ঢাকার ২য় সবজজ আদালতে ১৯২৫ সালের ২১৬নং মোকদ্দমা দায়ের আছে। উক্ত পোষ্য পুত্র বৈধ কি অবৈধ বর্ত্তমান মোকদ্দমায় তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ৩।৪নং বিবাদী বাদীর আইডেনটিটি প্রকাশ্যভাবে deny না করিলেও তাহাদের কার্য্যকলাপে এবং তাহাদের পক্ষীয় লোক ও কর্ম্মচারিগণের উক্তি ও ব্যবহারে তাহারাও বাদীর আইডেনটিটি ভাবতঃ অস্বীকার করা অনুমিত হইতেছে বলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা বিচার হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তাহাদিগকে পক্ষ করা গেল। তাহারা বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে উত্তরদায়ক হইলে তাহাদিগকেও মূল বিবাদী গণ্যে বাদী তাহাদের বিরুদ্ধেও আর্জির প্রার্থিত প্রতিকার দাবী করিতেছেন।

১১। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে উপরোক্ত অবস্থাধীনে বাদীর status সম্বন্ধে ১নং বিবাদীনির কার্য্যের এবং উক্তিদ্বারা cloud thrown হওয়ায় তাঁহার status declared হওয়া আবশ্যক এবং মূল বিবাদিনী যাহাতে বাদীর দখল সম্বন্ধে এবং বাদীর বসত বাটীতে যাওয়া সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে তাহার জন্য চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচাব হওয়া আবশ্যক।

১২। বাদীর বর্ত্তমান মোকদ্দমার cause of action বোর্ডের রিজলউসন্ এর তারিখ ৩০।৩।১৯২৭ হইতে ও তৎপর ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হইয়াছে। ডিক্লারেটারী ডিক্রী with conse-

quention relief নিষেধ আজ্ঞার মূল্য ১০৫০০৲ টাকা ধরিয়া তাহার উপর ৭৭১৸০ টাকা কোর্ট-ফি দিয়া বাদী বর্ত্তমান নালিশ দায়ের করিতেছেন। দখল স্থিরতরের বা দখল পাওয়ার প্রতিকারের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য ১৪২০০০৲ টাকা, উক্ত সম্পত্তির সদর রাজস্ব ষোল আনীতে ৪২৪২৬৸৶৩ পাই বাদীর এক তৃতীয়াংশে ১৪১৪২৶১ পাই, তাহার দশগুণ ১৪১৪২১৷১০ পাই বটে, আদালতের ন্যায় বিচারে, উক্ত এক তৃতীয় অংশ রাজস্বের দশগুণের উপর কোর্ট-ফি দেওয়া সঙ্গত বিবেচিত হইল, উক্ত কোর্ট-ফি বাদী হইতে গ্রহণে বাদী তদ্রুপ প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থনা করিতেছে। অত্র আদালতের এলাকায় বাদীর নালিশের কারণ পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হইয়াছে।

সে মতে প্রার্থনা—

(ক) বাদী ভাওয়ালের রাজা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মধ্যম পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া প্রচার করিবার আজ্ঞা হয়।

(ক ১) নিম্ন তপশীলের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বাদীর দখল স্থিরতর রাখিতে বা প্রমাণ ও অবস্থানুসারে বাদীর দখল না থাকা সাব্যস্থ হইলে উক্ত সম্পত্তির উক্ত অংশে বাদীকে দখল দেওয়াইতে এবং তদবস্থায় বাদী হইতে অতিরিক্ত কোর্ট-ফিস গ্রহণে তদ্রুপ ডিক্রী দেওয়াইতে—

(খ) উক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ত্যক্ত ও পরবর্ত্তী সময়ে অর্জ্জিত সমুদয় ভাওয়াল রাজ্যের অর্থাৎ নিম্নতপশীলের যাহার পরিচয় বিশেষরূপে দেওয়া হইল, তাহাতে এক তৃতীয় অংশে বাদীর দখলের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে তন্মর্ম্মে ১নং বিবাদিনীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা জারী করিবার আজ্ঞা হয়।

(গ) মোকদ্দমা মুলতবী থাকাকালে বিবাদিগণ যাহাতে

বাদীর দখল সম্বন্ধে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারেন, তন্মর্ম্মে বিবাদিগণের উপর অস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিবার আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকদ্দমার অবস্থা ও বিবরণ মতে বাদী অন্যান্য যে কোন প্রতীকার পাইবার হক্‌দার তাহা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) মোকর্দ্দমার সমস্ত খরচ বাদীর অনুকুলে ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

আনন্দকুমারীর লিখিত বর্ণনা

জিলা ঢাকার ১ম সবজজ আদালত

দেঃ মোঃ নং ৭০—১৯৩০

তথাকথিত শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাদী

বনাম

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী গং বিবাদী

উক্ত মোকদ্দমায় ৪নং বিবাদিনীর বর্ণনা।

১। বাদীর নালিশের কোন হেতু কি অধিকার নাই।

২। বাদীর দাবী তামাদিতে বারিত বটে।

৩। আরজির বর্ণিত ও দাবীকৃত সম্পত্তির বাজার মূল্য অন্যূন মঃ ৫০০০০০০৲ লক্ষ টাকা বটে। উক্ত মূল্যের উপর advalorem কোর্ট-ফি না দিয়া এবং দাবীকৃত সম্পত্তিতে সত্বসাব্যস্ত পূর্ব্বক দখলের প্রার্থনা না করিয়া বাদীর বর্ত্তমান দাবী আইনতঃ চলিতে পারে না বিধায়, বর্ত্তমান আর্জিমূলে বাদী কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

৪। আর্জিতে বাদীর যে নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এই বিবাদিনী তৎসমস্ত দৃঢ়রূপে

অস্বীকার করিতেছে। বাদী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায় থাকা কি হওয়ার উক্তি সমূলে মিথ্যা, বানোয়টী ও ফেরেবী বটে।

৫। ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার ৺রমেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ ১নং বিবাদিনীর সহিত স্বাখ্য পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তৎব্যতীত আর্জির দ্বিতীয় দফার বর্ণিত অন্য সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ অলীক বটে। এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে যে উক্ত দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিং যাইবার অল্পকাল পরে তথায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই বিবাদিনী অবগত আছে যে তদনন্তর জয়দেবপুর রাজবাটীতে তাহার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

৬। আর্জির ৪র্থ দফায় বাদী তাহাকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া অনেকে চিনিতে পারা প্রভৃতি যে সমস্ত উক্তি করিয়াছে, তাহা বিবাদিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করে না; এবং তৎসমস্ত মিথ্যা বলিয়া এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে। ভাওয়ালের প্রজাবর্গ কিম্বা ভাওয়াল রাজ পরিবারের আত্মীয় স্বজন কেহই বাদীকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। পরন্তু এই বিবাদিনী অবগত হইয়াছে ও বিশ্বাস করে, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের মাতা ৺স্বর্গীয়া রাণী সত্যভামা দেবী এবং তাহার মধ্যমা কন্যা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যিনি উক্ত কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বয়োজ্যেষ্ঠা বটেন, তাঁহারা উভয়ে বাদী যে সময়ে জয়দেবপুরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাহাকে টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন এবং বাদী তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। বাদী দুরভিসন্ধি মূলে উক্ত ঘটনা গোপন করিয়াছে। বাদীকে অধুনা কোনও ব্যক্তি তাহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া চিনিতে পারা বা তদ্রূপ ব্যবহার করা প্রভৃতি যে উক্তি করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৭। আর্জির ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম দফার বর্ণিত বিবরণ সমূহ কিছুই এই বিবাদিনী অবগত নহে এবং ৮ম ও ৯ম দফার বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করে না।

৮। আর্জির ১০ম দফার উক্তি সমূলে মিথ্যা ও অভিসন্ধি মূলক। ১নং বিবাদিনী বাদীকে দেখিয়াছেন এবং তাহাকে প্রতারক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বাদী যে উক্তি করিয়াছে যে, ২নং বিবাদিনী বাদীর identity স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা এই বিবাদিনী অবগত নহে ও সত্য বলিয়া স্বীকার করে না। ৩নং বিবাদীকে এই বিবাদীনী ও তাহার দত্তক পুত্র ৩নং বিবাদীর সহিত ২নং বিবাদীনী শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবীর মনোবাদ হইয়াছিল এবং তদবধি এই বিবাদিনী ৩নং বিবাদীর সহিত উক্ত ২নং বিবাদিনী নানারূপ বিরোধ ও শক্রুতা চলিয়া আসতেছে। এই বিবাদিনী অনুমান করে যে ৩নং বিবাদীর ভাবি স্বত্ব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ২নং বিবাদিনী বাদীর সহিত যোগদান করা সম্ভব। বাদী এই বিবাদিনী সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছে তদুত্তরে এই বিবাদিনী নিবেদন করে যে এই বিবাদিনী বাদীকে দেখিয়াছে এবং বাদী যে ভাওয়ালের কুমার রামেন্দ্রনারায়ণ রায় নহে তাহার সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে।

৯। ভাওয়াল রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীনে হওয়ার পূর্ব্বে ভাওয়াল রাজপবিোরের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং দূরসম্পর্কিত ও নিঃসম্পর্কিত লোক ভাওয়াল ষ্টেট হইতে অন্ন বস্ত্র ও নানারূপ সাহায্য পাইয়া আসিতেছিল কিন্তু ভাওয়াল রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীন হওয়ার পর হইতে ঐ সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত হয়, এবং তদ্দরুণ উক্ত ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত মনক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষতঃ ১৯১১ সনে ১নং বিবাদিনীর ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাওয়ার পর হইতে ১নং